কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশম খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

KIRITI OMNIBUS Vol X
Collection of Detective Stories & Novels
Published by Amar Sahitya Praashan
7 Tamer Lane, Ca utta-9

থম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩০৬

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রণ :

এম. কে. লাহিড়ী

শ্রীবিজয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস

০০।৬, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,

'কাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

৷ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

কিরীটী গ্রন্থমালার নায়ক কিরীটী রায় অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনীর গোয়েন্দার ন্যায় শখের গোয়েন্দা। গোয়েন্দা নায়কের কথা আলোচনা করতে গেলে আগে গোয়েন্দা-উপন্যাসের কথা একটু বলতে হয়। এ-ধরনের উপন্যাসের শুরু হয় সাধারণত কোন অপরাধমূলক ঘটনা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন হত্যার ঘটনা) নিয়ে। সেই ঘটনাটি খুব জটিল আকার ধারণ করে ব'লে পুলিসের গতানুগতিক তদন্তধারার মধ্যে কোন সন্ধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না; তখন আবির্ভাব হয় একজন শখের গোয়েন্দার। তিনিই কাহিনীর নায়ক, সেজন্য তাঁর চেহারা, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব ও আচরণ এমন হবে যাতে তিনি পাঠকের সহানুভূতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করতে পারেন। তিনি এসেই অভিনব ও অপ্রত্যাশিত রীতিতে অনুসন্ধান শুরু করেন, আপাত গুরুতর বিষয়গুলি উপেক্ষা করেন এবং তুচ্ছ ও দূরবর্তী বিষয়গুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। নাটকের মত গোয়েন্দা কাহিনীর রস নির্ভর করে অবিচ্ছিন্ন সাসপেন্সের মধ্যে। কাহিনী যত অগ্রসর হয়, সাসপেন্স তত বাড়তে থাকে। জটিল সূত্রগুলি আরও জটিল হতে থাকে, ঘটনার পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃততর হয়ে ওঠে। নাটকের মতই গোয়েন্দা কাহিনীরও দুই অংশ—গোড়ার অংশে জটিলতা এবং শেষের অংশে জটিলতামোচন। এই জটিলতামোচনের অংশে দেখা যায়, পাঠকদের সাধারণ বুদ্ধি ও অনুমান যাকে অপরাধী ভেবে বসে আছে আসল অপরাধী সে নয়, আসল অপরাধী হল সে যাকে আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ ও নির্দোষ বলে মনে করেছে। গোয়েন্দা-কাহিনীর শেষে একটা অপ্রত্যাশিত নাটকীয় মোচড় থাকে। পাঠকের ধারণা ও প্রত্যাশাকে উলটিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা নায়ক এবং ঔপন্যাসিক আকস্মিক চমক সৃষ্টি করেন, নাটকের মত গোয়েন্দা কাহিনীর রস হল ওই চমকসৃষ্টির মধ্যে। পাঠকরা বোকা বনে গিয়ে যেন বেশ মজা বোধ করে। তবে প্রকৃত অপরাধীকে পাঠকের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলতে গেলে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ-সন্নিবেশ প্রয়োজন। কাহিনীর গোয়েন্দা নায়ককে শেষ অংশে সেজন্য অনেক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

নিকৃষ্ট ধরনের গোয়েন্দা কাহিনীতে অতিরিক্ত খুনখারাপি, মারামারি ও উত্তেজক

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সস্তা উপায়ে পাঠকের উত্তেজনা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্তু উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনীতে প্রাথমিক দু-একটি অপরাধমূলক ঘটনা ছাড়া সস্তা উত্তেজনাপূর্ণ কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকে না। এই ধরনের উচ্চাঙ্গের গোয়েন্দা গল্পের আবেদন প্রধানত পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির কাছে, স্থূল উত্তেজনালোভী নেশার কাছে নয়। শারলক হোমসের কাহিনীগুলির মধ্যে গোলাগুলি, মারামারির ঘটনা খুবই কম, সূক্ষ্ম বুদ্ধিচালিত অনুসন্ধানের ধারাই সেগুলির মধ্যে বর্তমান। শারলক হোমসের মত সত্যসন্ধানী কিরীটীও প্রত্যক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে না, সে শুধু অবিচলিত মনোযোগ দিয়ে রহস্যের সূত্রগুলি সন্ধান করে অবশেষে সত্যে উপনীত হয়, গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্গে রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর পার্থক্য রয়েছে। রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর মধ্যে অপরাধমূলক ঘটনাগুলির বিস্তারিত অবতারণা থাকে, কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে 'ডিটেকশান' অর্থাৎ সত্যনির্ধারণই হল আসল উদ্দেশ্য। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী গ্রন্থগুলিকে আমরা গোয়েন্দা কাহিনীই বলব, রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনী বলব না।

নীহাররঞ্জন আর্থার কোনান ডয়েলের মতই পেশাতে ডাক্তার, সেজন্য রোগনির্ণয়ের ন্যায় অপরাধের কারণ নির্ণয়েই তাঁর এত আগ্রহ, বিশ্লেষণের অনুবীক্ষণ দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কর্তিত একখণ্ড ঘটনার মধ্যে অপরাধের কত বীজ নিহিত তা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর কিরীটী শারলক হোমসের মতই তীক্ষ্ণধী, মিতবাক্, সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীল ও অবিচলিত আত্মবিশ্বাসী। কিরীটী সকলের প্রতি মনোযোগী কিন্তু কারও উপরে যেন আস্থাশীল নয়, সে প্রত্যেকের কথা শোনে কিন্তু কারও কাছে নিজের মন খুলে দেয় না। সে প্রচণ্ড শক্তিমান, কিন্তু তার শক্তির বাহ্য দেমাক নেই। সেসকলের উপকারী, কিন্তু তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আবদ্ধ। সে যথার্থই সত্যসন্ধানী, তাই সে আপসহীন। অন্যায়ের দূরীকরণ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই তার ব্রত, মিথ্যার কলঙ্কিত অন্ধকার ভেদ করে সত্যের নির্মল মূর্তি ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। গোয়েন্দাগিরি তাঁর পেশা, কিন্তু পরোপকার তার নেশা। তার মত লোক আছে বলে পাপীরা এখনও ভয় পায়, সৎ লোকেরা আশ্বস্ত হয়।

কিরীটী অমনিবাসের দশম খণ্ডে তিনটি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমটি হল ঘুম নেই। সমগ্র উপন্যাসটি ডায়েরী রীতিতে রচিত। এখানে লেখক ও অপরাধী একই ব্যক্তি। ডায়েরীর মধ্য দিয়ে অপরাধী যেন তার স্বীকারোক্তি করে গেল। কিন্তু কাহিনীর একেবারে শেষ অংশে ছাড়া কোথাও তার অপরাধ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসে না। বরং মনে হয়, সেও যেন সূর্যপ্রসাদের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী

তাঁর হত্যাকারীর সন্ধান পাবার জন্য আগ্রহী এবং কিরীটীর সঙ্গে তার পুরোপুরি সহযোগিতাই লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু শেষকালে তাকেই যখন হত্যাকারীরূপে জানা যায় তখন যেন মনের মধ্যে অকস্মাৎ অবিশ্বাসের ধাক্কা লাগে। কি কারণে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত এম. আর. সি. পি. ডাক্তার তিন-তিনটে খুন করতে গেল? ডাক্তারের ডায়েরী থেকে তার শেষ স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, অর্থের নেশা আর পাপের নেশাই তাকে এই ভয়াবহ পথে নিয়ে গিয়েছিল। অর্থের নেশা বোধ হয় এমনই যে তা আর প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন মানুষ আর অর্থকে পায় না, অর্থই মানুষকে পেয়ে বসে। একটিমাত্র উপার্জনশীল বোন যার সংসারে সেই উচ্চবিত্ত ডাক্তারের অপরাধমূলক পথে অর্থলাভের প্রয়োজন কোথায়? হয়তো অর্থের নেশা তাকে এমনি পেয়ে বসেছিল যে, স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনের বিবেচনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর পাপের নেশাও বোধ হয় অদৃশ্য অপদেবতার মত কাঁধে চড়ে মানুষকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, ম্যাকবেথের মত তখন আর একটি খুন করে থামতে পারে না। একটির পর আর একটি, তার পর আর একটি খুনের পথ ধরে চলতে থাকে। প্রথমে জগৎজীবন, তারপর পুলকজীবন, অবশেষে সূর্যপ্রসাদ—নিষ্কৃতি পাবার জন্য ডাক্তার একটি পর একটি খুন করে চলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি সে পায় নি, অদৃশ্য বিধাতার শাস্তি অনিবার্যভাবে তার উপরে এসে পড়েছে। এই নৃশংস সমাজপ্রতারক পাপীর অন্তরতলে কি প্রায়শ্চিত্তের আগুন অহরহ জ্বলছে? বোন মিত্রার চোখে ধরা পড়েছে যে দাদা রাত্রে ঘুমোয় না। ডাক্তার নিজের ঘুমকে যে হনন করেছে, তাই তার ঘুম নেই। কিন্তু ঘুম যে তার বড় দরকার। সূর্যপ্রসাদকে সে আর্সেনিক দিয়েছিল কিন্তু সে বেছে নিল ভেরোনল। সেই ভেরোনলই তাকে চিরকালের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল।

কিরীটীর বর্ণনা ডাক্তার এভাবে দিয়েছে—'চমৎকার দেহসৌষ্ঠব ভদ্রলোকের।··· পরিধানে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পায়জামা, গায়ে একটা সাদা শাল, পায়ে চপ্পল, মুখে বর্মা চুরুট।' ঝকঝকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় চেহারা। অন্যান্য জায়গার মত এখানেও সে প্রশান্ত, কিরী সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণশীল এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে অভ্রান্ত জ্ঞানসম্পন্ন। অন্য সক্রিয়, প্র ন একটা বদ্ধমূল ধারণায় বশীভূত তখন সে-ই ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছে। ধরা তাতে প্রমাণের একটির পর একটি সূত্র অনুসন্ধান করে চরম সত্যে উপনীত সন্ধানের একটা নস্যির কৌটো, জুতোয় কাদার চিহ্ন, মাটিতে পায়ের দাগ, চেয়ারের মধ্যে জায়গাটু স্থানান্তর ইত্যাদি নানা আপাততুচ্ছ বস্তু থেকে সে তার সত্যসন্ধান

পেয়েছে। চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সে তার নোতুন নোতুন সন্ধানসূত্র আবিষ্কার করে অবশেষে তার লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। তার আত্মগত ভাবনা বজ্রনির্ঘোষে তার শেষ সিদ্ধান্তের মধ্যে ফেটে পড়ে—'আপনি। হ্যাঁ আপনি, ডাক্তার সেনই—সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী!'

গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে কিছু কৌতুকের স্পর্শ, কিছু প্রণয়ের রক্তরাগ থাকলে কাহিনী আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে কৌতুকচরিত্র হল দারোগা ব্রিজনন্দন পাণ্ডে। তার প্রত্যেক কথার মধ্যে 'মারো গোলি' শ্রোতাদের চিন্তাক্লিষ্ট মনেও যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করে। সে একবার সমর, আর একবার আবদুলকে অপরাধী ভেবে যে ধরনের নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ বোধ করেছে তাও কম কৌতুক-রসাত্মক হয় নি। সমরের প্রতি মিতার ভালবাসা যে চাপা বেদনা ও গোপন অশ্রুনির্ঝরের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা হিংসা-সন্দেহ-ষড়যন্ত্র ও হত্যার চতুর্দিকব্যাপী বিষবাষ্পের মধ্যে অমৃতের একটি স্নিগ্ধ আলোকরেখার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য খণ্ডের দ্বিতীয় গ্রন্থ কলঙ্ককথা। এ উপন্যাসের অপরাধমূলক ঘটনাটি একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে অর্থের নেশা কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অপরাধমূলক ঘটনার প্ররোচনা দেয় নি। এখানে সেই প্রণয়ঘটিত ঈর্ষা ও ব্যর্থতার জ্বালাই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। ষড়যন্ত্র ও হত্যার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি angry generation-এর বিপ্লবী প্রতিনিধি, যারা ক্রুদ্ধ, উদ্ধত, বেপরোয়া ও আগুনের ঝাণ্ডাধারী, কিন্তু আসলে তারাও সকলে সেই আদিম রিপুর বশীভূত। সেই আদিম ঈর্ষা ও নিঃসপত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাদের অন্ধ জিঘাংসায় উত্তেজিত করে তুলেছে। মনে হয়, বিপ্লব ও সংগ্রামের স্লোগানগুলি তাদের পক্ষে কত বিসদৃশ, কত হাস্যকর!

সত্যসন্ধানী কিরীটীকে সেই যৌবনদীপ্ত, সদাসক্রিয় গোয়েন্দারূপে এখানে দেখি না। এখানে সে যেন একটু বয়সের ভারে মন্থর, ক্লান্ত মনে উদ্যমের অভাব, কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহ যেন আর নেই—'একদিন ছিল নেশা আর [illegible]জনা—কিন্তু আজ যেন সেই নেশা আর উত্তেজনা ঝিমিয়ে এসেছে।' তাঁ[illegible] বাক্যা[illegible]। প্রথমটি [illegible]
যেন অনেকটা উপদেষ্টার ভূমিকা, ক্রিয়ার মধ্যস্থলে রয়েছে সু[illegible] সক[illegible] ও অপরা[illegible]
থানা অফিসার সুদর্শন মল্লিক ব্রিজনন্দন পাণ্ডের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ন[illegible] অনুমা[illegible]র গেল। কি[illegible]
বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বশালী ও সঠিক পথে তদন্তে সক্ষম। এখানে [illegible] হয়েছে [illegible]র্ক বিন্দুমা[illegible]
এবং কিরীটীর তদন্তধারা অনুসরণ করে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধা[illegible] সামান্য[illegible] চাতুর্য্যের
শেষের দিকে অবশ্য কিরীটীও প্রত্যক্ষভাবে সত্য উদ্ঘাটনে[illegible]

তখনও কিরীটী ও সুদর্শনের সক্রিয়তা পাশাপাশি চলেছে।

কিরীটীকাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জেরা করে করে একটি প্রত্যাশিত স্বীকারোক্তির দিকে তাদের নিয়ে যাওয়া। কিরীটী ও সুদর্শন এভাবে সুশান্তর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিকে জেরা করে হত্যারহস্যের সন্ধানের দিকে এগিয়েছে। শেষকালে মোক্ষম প্রমাণ মিলল পার্কে ফেলে যাওয়া চপ্পল থেকে। তবে মূল হত্যাকারিণী প্রতিভার স্বভাব ও ক্রিয়ার পরিচয় খুব কম পাওয়া গেছে, তাই সে যখন হত্যাকারিণীরূপে প্রমাণিত হল তখন বিস্ময়ের আঘাত কাটিয়ে উঠতে আমাদের একটু সময় লাগে।

এ উপন্যাসে দুটি ঘরোয়া পরিবেশ রয়েছে। সুদর্শন ও সাবিত্রী এবং কিরীটী ও কৃষ্ণাকে নিয়ে দুটি স্নিগ্ধ, প্রীতিপ্রদ পরিবেশ। ঘৃণা-বিদ্বেষ ও রক্তপাতের বেষ্টনীর মধ্যে দুটি নিরাপদ শান্তির নীড়। স্নেহে-যত্নে-নর্মালাপে মধুর দুটি সুখী পরিবার।

আলোচ্য খণ্ডের তৃতীয় উপন্যাস 'হীরা চুনি পান্নার' কাহিনী দূরবর্তী নির্জন অঞ্চলে একটি জমিদারী এস্টেটকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, সেজন্য ঘনীভূত রহস্যের বিস্তারে উপন্যাসটি বিশেষ চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। রতনগড়ের ভয়সংকুল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কত না বিসর্পিল ষড়যন্ত্র, রক্তাক্ত হিংসা আর অবরুদ্ধ কান্নার স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে! সেই প্রাসাদের এক রহস্যরোমাঞ্চিত কক্ষে দুর্ধর্ষ রবিশঙ্কর দিনরাত তার অটল একাকিত্বের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে। চতুর্দিকব্যাপী রাতের অন্ধকারের মধ্যে তার ঘরের হাজার পাওয়ারের আলোটি সকলের মনে তীক্ষ্ণ আতঙ্ক জাগিয়ে অবিরাম জ্বলছে। রবিশঙ্কর চরিত্রটি শেষকালে যেন হঠাৎ খুব বেশি পোষমানা ও শান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার বন্দিত্বের আগে পর্যন্ত সে মূর্তিমান ত্রাসের মত সমগ্র কাহিনীকে রহস্যকণ্টকিত করে রেখেছে। রতনগড় এস্টেটের জমিদার পরিবারের লোভ-কামনা-হিংসা-ষড়যন্ত্র নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। এই জমিদার-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে ডাঃ ঘোষালের পরিবার। এ কাহিনীর একদিকে রয়েছে লোভ ও হিংসার বীভৎস রূপ অন্যদিকে রয়েছে ভালবাসা, ত্যাগ ও দুঃখবরণের করুণ বেদনাসিক্ত মূর্তি।

কিরীটী এখানে 'কলঙ্ককথা'র ক্লান্ত ও বিশ্রাম-প্রয়াসী প্রৌঢ় নায়ক নয়; সদা-সক্রিয়, প্রখর দৃষ্টিশীল সত্যসন্ধানী। তার ক্ষিপ্রতা ও দৈহিক শক্তি রবিশঙ্করের পিস্তল-ধরা হাতে বিদ্যুৎবেগে লাথি মারার মধ্যে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। হারানো পান্নার সন্ধানের কিছু সূত্র পাবার জন্য সে রতনগড়ে এসেছে এবং ঘটনার জটিল আবর্তের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। হারানোর রহস্য ভেদ করতে এসে আবার তাকে হত্যার

রহস্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশেষে সব রহস্য ভেদ করে সে সত্য উদ্‌ঘাটন করেছে। যে ভাবে শেষকালে সে একটির পর একটি রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে অপরাধের সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলির উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া অন্ধকারের যবনিকার অন্তরাল থেকে প্রকাশ্য জানার আলোকে এনে তুলে ধরেছে তাতে তার ভয়োদর্শন, পরিশ্রম-সাধ্য অনুসন্ধান এবং অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো তার যেমন ব্রত, নির্দোষকে সন্দেহমুক্ত করাও তেমনি তার ধর্ম। রতিকান্তকে সে অপরাধীরূপে প্রমাণ করতে পেরেছে, আবার তার দাদা সদাশয়, স্নেহশীল ও উদারপ্রাণ ডাঃ ঘোষালকে সে সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘুম নেই

উৎসর্গ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

॥ এক ॥

কাল রাত্রেও আবার তুমি কাঁদছিলে দাদা।

চায়ের টেবিলে বসে টি পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে মিতা বললে।

দ্বিতীয় কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে আমি মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

আজ কয়েকদিন থেকেই বোন মিতা আমাকে ঐ কথাটা বলছে। প্রথম দিন হেসে ওর বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছি, দ্বিতীয় দিনও স্বপ্ন দেখেছে বলে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আর কেন যেন কোন প্রতিবাদই আমার কণ্ঠ থেকে বের হল না।

অন্যমনস্ক ভাবে চায়ের কাপে চামচটা ডুবিয়ে নাড়তে লাগলাম নিঃশব্দে।

চায়ের কাপে একটা মৃদু চুমুক দিয়ে মিতা বোধ হয় আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই এবারে বললে, তুমি নিজেই একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার দাদা, বলা বাহুল্য তবু বলছি. একবার তুমি কলকাতায় গিয়ে কাউকে কন্‌সাল্ট করে এলে পারতে।

হ্যা, তাই যাবো না হয়, কিন্তু সত্যি তুই মিতা আমাকে রাত্রে কাঁদতে শুনেছিস?

এক আধদিন নয়, পর পর কয়েক রাত্রিই তো শুনছি, তুমি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ।

তোর শোনাটা ভুলও তো হতে পারে মিতা! বেশ জোর দিয়েই কথাটা এবারে বলি।

না, ভুল নয়। স্পষ্ট আমি শুনেছি কান্নার শব্দ। প্রথম রাতে কান্নার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যেতেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে শোনার পর তোমাকে তো বলেছি, কেমন কৌতূহল হল। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। তোমার ও আমার শোবার ঘরের মাঝখানের দরজাটা সেদিন খোলাই ছিল। মনে হল স্পষ্ট যেন তোমার ঘরের ভিতর থেকেই চাপা কান্নার শব্দটা আসছে। প্রথম তো ভেবেই পাই না, তোমার ঘরের থেকে কান্নার শব্দ আসছে কি করে! তারপর এগিয়ে গিয়ে তোমার বিছানার সামনে দাড়াতেই চমকে উঠলাম। দেখি তুমিই ঘুমের মধ্যে কাঁদছ। ভাবলাম তখন, হয়তো কোন স্বপ্ন দেখে কাঁদছ। কিন্তু তার পরের এবং তার পরের রাত্রেও যখন তোমাকে কাঁদতে শুনলাম, তখনই সবপ্রথম তোমাকে আমি কথাটা না বলে পারিনি। কিন্তু কথাটা শুনে তুমি আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিলে। পরের দিনও বলতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছি।

মিতার কথায় আর আমি কোন জবাব দিলাম না। চায়ের টেবিল থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়লাম।

বেলা আটটা প্রায় বাজে।

ডিস্‌পেনসারীতে রোগীর ভিড় জমতে শুরু করেছে।

নিজের শয়নঘরে এসে জামা গায়ে দিয়ে ডিস্‌পেনসারীতে যাবার জন্য ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললাম।

বাড়ি থেকে সামান্যই দূরে বড় রাস্তার উপরে আমার ডিস্‌পেনসারী।

দীর্ঘদিন ধরে রাঁচি শহরে আছি আমরা।

বাবা প্রথম যৌবনে কনট্রাক্‌টারির কাজ নিয়ে এসেছিলেন রাঁচি শহরে। তারপর এ শহরের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এখানেই একটু নির্জনে শহরের প্রান্তে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরী করে বসবাস শুরু করে দেন। সেও আজ খুব কম করে ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

ভাই-বোন আমরা মাত্র দুটিই, আমি আর মিতা।

মিতা আমার চাইতে প্রায় চোদ্দ বছরের ছোট বয়েসে।

আমার যখন ষোল বছর ও মিতার মাত্র দু বছর বয়স সেই সময় মা মারা যান।

চিরদিন বিহারে মানুষ, বাবাও বিহারেই বলতে গেলে জীবনের দীর্ঘদিন কাটিয়ে বিহারেই ডোমিসাইলড্‌ হয়ে গিয়েছিলেন।

মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করার পর বিলাতে এম. আর. সি. পি. পরীক্ষা দেবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি সেই সময় বাবার মৃত্যু হয়।

তারপর বিলাত থেকে ফিরে এসে রাঁচি শহরেই প্র্যাকটিস্‌ শুরু করলাম, কারণ বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল ঐখানেই প্র্যাকটিস্‌ করি।

এবং প্র্যাকটিস্‌ করতে বসে দেখলাম ভুল করিনি। পিছনে একটা মোটা রকমের বিলাতী খেতাব থাকার দরুন অল্পদিনেই প্র্যাকটিস্‌ জমে উঠল।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে বিলাতে পড়বার সময় ছাত্রাবস্থায় অর্থের অভাব বেশই হয়েছিল। কারণ সারাজীবনে বাবা যেমন প্রচুর উপায় করেছিলেন তেমনি খরচও করে গিয়েছিলেন দু হাতে।

সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল রাঁচির ঐ বসতবাটিটি ও মার কিছু অলঙ্কার।

বিলাত থেকে ফিরে এসে প্র্যাকটিস্‌ করতে বসে ও প্র্যাকটিস্‌টা না জমে ওঠা পর্যন্ত অর্থের অভাবটা বেশ তীব্রই ছিল। সে-সব দিনের কথা ভুলব না।

ইদানীং আর অবিশ্যি সে অভাবটা নেই।

সংসারও আমাদের ছোট্ট। আমি আর একটিমাত্র ছোট বোন মিতা

আমিও বিয়ে করিনি, মিতাও করেনি।

বি. এ পাস করে মিতা এখানেই গার্লস স্কুলে চাকরি করছে বছরতিনেক হল।

একই মা-বাপের সন্তান হলেও মিতা ও আমি—আমাদের দুজনের মধ্যে চেহারায় ও চরিত্রে একেবারে কিন্তু মিল নেই।

আমার রঙ কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, আর এও আমি জানি দেখতে আমি কুৎসিতই। অথচ মিতা আমার নিজের সহোদরা, রোগাটে পাতলা চেহারা, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ এবং চোখ-মুখ অতীব সুশ্রী। ঠিক বিপরীত।

অপরিচিতেরা প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমরা আপন সহোদর ভাই-বোন।

মিতার গলার স্বরটি মিষ্টি।

আমার গলার স্বর কর্কশ, তাও আমি জানি।

চট্ করে আমি মেজাজ খারাপ করি না। অতি বড় শত্রুর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করি না।

উচিত জেনেও নিষ্ঠুর সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা পাই।

অথচ মিতা চট্ করে মেজাজ খারাপ করে, শত্রুকে দু চোখে দেখতে পারে না এবং কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলে দেয়।

স্থানীয় ডাক্তার হলেও আমার হৃদ্যতা বলে কারো সঙ্গেই বড় একটা কিছু নেই। অর্থাৎ এক কথায় আমি আদৌ মিশুকে নই।

কিন্তু মিতার সঙ্গে শহরের অনেকেরই একটা মধুর হৃদ্যতা তো আছে দেখি।

মিতার বন্ধু ও বান্ধবীর অভাব নেই, আমার সত্যিকারের বন্ধু বলতে এ শহরে কেউই নেই।

ডিস্‌পেনসারীতে এসে দেখি সেদিন দু-তিনটির বেশী রোগী নেই।

তাদের দেখে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে ঘণ্টাখানেকও লাগল না।

পার্টিশন দেওয়া চেম্বারের মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

রাঁচি শহরে এবারে পৌষের গোড়াতে দেখছি শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। খোলা জানালাপথে রাস্তার প্রবহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা টানতে টানতে আবার মিতার কথাগুলোই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সত্যিই কি আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে কাঁদি!

কিন্তু কেন?

ঘুমের ঘোরে আমি কাঁদতেই বা যাব কেন?

মনের কোথায়ও কোন দুঃখই তো আমার নেই।

কোন দুশ্চিন্তাই নেই মনের কোথাও আমার।

অথচ দিন পনের থেকে নাকি মিতা রাত্রে আমাকে ঘুমের ঘোরে কাঁদতে শুনেছে।

সুইংডোরের ওপাশে সহসা কিরীটী রায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডাক্তার সেন আছেন নাকি?

কে? মিঃ রায়, আসুন আসুন।

কিরীটী রায় এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন সুইংডোর ঠেলে।

এত সকালে? কি খবর, বসুন বসুন।

কিরীটী রায় সামনের একঠা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠব ভদ্রলোকের। প্রথম পরিচয়ের দিন যেমন দেখেছিলাম. আজও দেখলাম। পরিধানে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পায়জামা, গায়ে একটা সাদা শাল, পায়ে চপ্পল।

মুখে বর্মা-চুরোট।

কথা বললাম আবার আমিই, তারপর আরো কিছুদিন এখানে আছেন তো?

হ্যাঁ।

সকালে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, বেশ লাগে সকাল বেলাটা ঘুরতে এখানে। বলেই একটু থেমে বললেন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম ডাক্তার সেন। আচ্ছা এখানকার এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম পুলকের দাদা জগৎজীবনবাবুও কাল নাকি টি. বি হয়েই মারা গিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করে কিরীটী রায় আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কার মুখে শুনলেন?

ঐ যে আমি যে বাড়িটায় আছি সেই বাড়িরই পাশের বাড়িতে নির্মল চৌধুরী—

হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। আমার চিকিৎসাতে তো তিনি কিছুদিন ছিলেনও। ওঁদের এক বোনও নাকি টি. বি.-তে মারা গিয়েছিলেন। ইন্‌ফেক্‌শনটা বোধ হয় ওঁদের দু ভাইয়ের সেখান থেকেই হয়েছিল। বললাম আমি।

স্বাভাবিক। তারপর একটু থেমে কিরীটী রায় বললেন, পুলকের দাদাও টি বি.-তে তাহলে মারা গেছেন! পুলকের যে টি. বি. হয়েছে সে কথাটা অবিশ্যি আমি বছর পাঁচেক আগে তারই এক চিঠিতে জেনেছিলাম।

আপনি জানতেন ?

হ্যা, এককালে পুলকের সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে বছর দুই একত্রে পড়েছিলাম। সেই সময়েই আমাদের-মধ্যে হৃদ্যতার সূত্রপাত। কিন্তু তারপর ওর চিঠিতেই জেনেছিলাম, ও নাকি একেবারে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

হ্যা, হয়েছিলেন।

মাঝখানে বছরখানেক আগে ওর সঙ্গে একবার কলকাতায় দেখা হয়েছিল, তখনো দেখেছিলাম চমৎকার চেহারা। হাসতে হাসতে আমাকে বললে, রোগ নাকি তাঁর শরীর থেকে পালিয়ে বেঁচেছে!

আমি নিজেও কম আশ্চর্য হইনি মিঃ রায়, পুলকবাবুর রোগটা হঠাৎ flare up করায়। শেষের মাসখানেক তো আমিই চিকিৎসা করেছিলাম। কোন ঔষধই যেন আর ধরল না।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হল।

মনে হল খোলা জানলাপথে বাইরের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কি ভাবছেন।

এক কাপ চা হবে নাকি মিঃ রায় ?

চা! না, ধন্যবাদ—বলেই উঠে পড়লেন মিঃ রায়।

এবং যেমন ক্ষণপূর্বে হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি হঠাৎই যেন আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥

কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ আমার মাত্র দিন পাঁচেক হবে।

আর আলাপটাও হয়েছিল আমার বোন মিতার মধ্যস্থতায়।

আমাদের বাড়ি 'বিরাম কুটির'এর পাশ দিয়ে যে অপ্রশস্ত কাঁচা পায়ে চলার রাস্তাটা চলে গিয়েছে তারই সাত-আটখানা পরের বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি 'সানি লজে' উনি দিন দশেক হল এসে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে একদিন ওঁকে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের ক্লাব 'সান্ধ্যবাসরে' ওঁরই এখানকার পাশের বাড়ির ভদ্রলোক নির্মল চৌধুরী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই আমার বোন মিতার সঙ্গে নাকি ওঁর আলাপ হয়।

তারপর মিতাই ওঁকে পরের দিন আমাদের বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করে এনে-

ছিল। এবং আমার আলাপ ওঁর সঙ্গে সেইদিনই হয়।

মিতার মুখেই শুনেছি উনি একজন বিখ্যাত বেসরকারী সত্যসন্ধানী। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ্।

আমাদের দেশে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ্ আছেন বলে তো কই কখনো শুনিনি। তবে ওঁর নাকি খুব নাম।

ভদ্রলোকটির চোখমুখের দিকে তাকালেই অবিশ্যি বোঝা যায়, সেখানে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

তবে লোকটিকে যেন কেমন একটু গম্ভীর ও দাম্ভিক প্রকৃতির বলেই মনে হয়।

কিরীটীবাবুর ক্ষণপূর্বের কথাগুলো আবার মনে পড়ল। আশ্চর্য, পুলকজীবন তাহলে কিরীটী রায়ের এককালে সহপাঠী ছিলেন এবং হৃদ্যতাও হয়েছিল!

পুলকজীবনের দাদা জগৎজীবনবাবুর সঙ্গে অবিশ্যি আমার অনেকদিন থেকেই আলাপ ছিল, এবং আলাপটা আমি বিলাত থেকে ফিরে এসে এখানে প্র্যাকটিস্ শুরু করার পর থেকেই রীতিমত হৃদ্যতাতেই পরিণত হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর ডিস্‌পেনসারীর কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই জগৎ-জীবনের ওখানে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে যাওয়াটা তো রীতিমত একটা আমার অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

চমৎকার মিশুকে লোক ছিলেন জগৎজীবনবাবু।

বিয়ে-থা করেননি। আপনার জন বলতে সংসারে ছিল ঐ একটিমাত্র ভাই—পুলকজীবন। কলকাতায় পাটের দালালী করতেন জগৎজীবন।

এবং শোনা যায় দালালী করে রীতমত দু'পয়সা উপার্জনও করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ টি. বি. হওয়ায় কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন কিছুদিন থাকবেন বলে। শেষটায় পুলকেরই মুখে শুনেছিলাম, রাঁচি জায়গাটা নাকি ভারি পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এখানেই একটা বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে থেকে যান।

সেও আজ বছর দশেক আগেকার কথা। তারপর সুস্থ হবার পর স্টেশন রোডেই একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের অফিস খোলেন। কাজকর্ম ভালই হত। ছোট ভাই পুলক-জীবন প্রায় আট বছরের ছোট জগৎজীবনবাবুর থেকে। ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন জগৎজীবন। পুলকজীবন ইংরাজী সাহিত্যে এম এ. পাস করে বোম্বাইয়ে অধ্যাপনার কাজ করছিলেন একটি কলেজে।

বছর দুই আগে হঠাৎ জগৎজীবনবাবুর পুরাতন টি. বি, রোগটা নতুন করে দেখা দিল এবং মাস তিনেক ভুগে তিনি মারা গেলেন। জগৎজীবনয়ে অসুখটা যখন

বাড়াবাড়ি চলেছে, ছোট ভাই তার পেয়ে এখানে চলে আসেন। তারপর আর তিনিও বোম্বাইয়ে ফিরে যাননি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দাদার অফিসটাই দেখাশোনা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস তিনেক আগে তাঁকেও ধরল ঐ রোগে এবং মাত্র দিন পনের হল পুলকজীবন মারা গিয়েছেন।

জগৎজীবন ও তাঁর ভাই পুলকজীবননের কথাই ভাবছিলাম। কম্‌পাউণ্ডার সতীশ এসে ঘরে ঢুকল, স্যার!

হ্যাঁ—

সূর্যপ্রসাদবাবুর ওখান থেকে সকালে ফোন করেছিলেন, তিনি -

স্যার সূর্যপ্রসাদ ফোন করেছিলেন?

হ্যা, বললেন সকালে চার-পাঁচবার নাকি আপনার বাড়িতে ট্রাই করেছিলেন তিনি—

তা হবে। কাল রাত থেকেই বাসার ফোনটা আউট-অফ-অর্ডার হয়ে আছে। তা কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ বলেছেন, পারেন যদি আজ একবার তাঁর ওখানে হয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

সতীশ চলে গেল ঘর থেকে।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম।

সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ যেতে বলেছেন কেন? কারো অসুখ-বিসুখ নয় তো? বয়েস হলেও সূর্যপ্রসাদের আমি গত দেড় বৎসরের মধ্যে সামান্য সর্দি-জ্বরও হতে দেখিনি।

চমৎকার স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের। এ বয়েসে ওরকম স্বাস্থ্য বড় একটা দেখাও যায় না।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত রাঁচি শহরে বসবাস করছেন তা প্রায় বছর ষোল হল।

পুরাতন বাসিন্দা এ শহরের।

ভদ্রলোকের শোনা যায় নাকি প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। এবং তাঁর ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক সম্পর্কে এ শহরের অনেকেই অনেক কথা বলে। কেউ বলে বিশ, কেউ বলে দশ লাখ।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে বিরাট বাড়িটিই তাঁর। বাড়িটা এককালে পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছিল। এবং পড়েই থাকতো খালি বেশির ভাগ সময়।

সূর্যপ্রসাদ এসে বাড়িটা কিনে প্রচুর অর্থব্যয় করে নিজের পছন্দমত সেটাকে চমৎকার বাসোপযোগী করে নেন।

সূর্যপ্রসাদ সম্পর্কে একটা গুজব শোনা যায়, কোথাকার কোন্ এক নেটিভ স্টেটের

নাকি তিনি দেওয়ান বাহাদুর ছিলেন। কি কারণে স্টেটের মহারাজার সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় রাতারাতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। এবং কলকাতায় কিছুদিন বসবাস করে মন না বসায় শেষ পর্যন্ত এখানেই এসে রাঁচি শহরটি পছন্দ হওয়ায় এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেন।

ভদ্রলোকের বর্তমান বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির বেশী হবে না। আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। একটি মাত্রই সন্তান। ছেলে সমর।

একটিমাত্র ছেলে হলেও সূর্যপ্রসাদের সংসাটি কিন্তু ছোট নয়।

ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ এককালে খুলনায় ওকালতি করতেন। কিন্তু বড় সংসার ও পসারও তেমন কিছু না হওয়ায় বৎসর দুই হল তিনিও সপরিবারে এসে রাঁচিতে ভাইয়ের আশ্রয়েই ডেরা বেঁধেছেন কায়েমী ভাবে।

সূর্যপ্রসাদের চাইতে বয়েসে রাধিকাপ্রসাদ আট-নয় বৎসরের ছোট হলেও, দেখায় কিন্তু তাঁকে তাঁর দাদার চেহারার তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধ। বোধ হয় দারিদ্র্য ও অভাবেই শরীরটা তাঁর অকালে বুড়িয়ে গিয়েছে।

রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী গত বৎসর এখানেই মারা গিয়েছেন। চার ছেলে ও চার মেয়ে। তার মধ্যে চার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড় দুটি ছেলে অমল ও কমল কোথায় যেন রেলে চাকরি করে। তাদের বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তৃতীয় ছেলে বিমল গত বৎসর বি. এ. পাস করেছে। এখানেই থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টায় আছে। সর্বকনিষ্ঠ সুবল লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায়নি, শরীরচর্চা, ডন, বারবেল ইত্যাদি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। বিমল শান্ত স্বভাবের ও সুবল চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির।

সূর্যপ্রসাদের একমাত্র ছেলে সমর।

বিরাট ধনী বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে হওয়ায় এবং অল্প বয়সে মা মারা যাওয়ায় সমর লেখাপড়ায় স্কুলের চৌকাঠও ডিঙোতে পারেনি। তবে গানবাজনার নেশা ছাড়াও সেতারবাদ্যে কিন্তু সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। এবং গানবাজনার নেশা ছাড়া আরো একটা নেশা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে—জুয়া খেলার। জুয়ার নেশা থেকে ছেলেকে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, কিন্তু সক্ষম হননি। এবং ঐ জুয়ার নেশার জন্য সমরের যে প্রায়ই টাকার প্রয়োজন হত সেটা আমি জানতাম। যার ফলে প্রায়ই এর ওর কাছে সমরকে ধার করতে হত। আমিও অনেক সময় তাকে ধার দিয়েছি। লেখাপড়া বিশেষ না হলেও এবং জুয়ার নেশা থাকলেও মানুষ হিসাবে কিন্তু সময় এখানকার সকলেরই প্রিয়। তার মিষ্টি-মধুর ব্যবহারের জন্য তাকে ভালবাসে না এ শহরে এমন কেউ নেই। বিশেষ করে মেয়েদের মহলে সমরের যে একটা বিশেষ

প্রিয় স্থান আছে—সেটার মূলে হচ্ছে গানবাজনার খ্যাতি ও তার চমৎকার সুশ্রী দেহ-সৌষ্ঠব। অমন চমৎকার দেহশ্রী চট করে বড় একটা কারো নজরে পড়ে না। আমাদের বাড়িতে সমরের যথেষ্ট যাতায়াত এবং তার মূলে যে আমার বোন মিতা সে সংবাদটা আমার অজ্ঞাত নয়। মিতারও যে সমরের উপর বিশেষ দুর্বলতা আছে সেটাওবহুদিন বহু ব্যাপারেই আমি টের পেয়েছি। সূর্যপ্রসাদ আমাকে বিশেষ করে দেখা করতে বলে-ছেন। সতীশের মুখে কথাটা শোনা অবধি একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে হচ্ছিল।

তবে কি সমরের ব্যাপারেই সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখা করতে বলেছেন!

দিন কুড়ি হবে সমর নিরুদ্দিষ্ট। তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। কানা-ঘুষায় শুনেছি, সমর নাকি সূর্যপ্রসাদের সই জাল করে হাজার পাঁচেক টাকা তার বাপের ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। ইদানীং সমরের জুয়া খেলার জন্য কিছু ধার হয়ে গিয়েছিল জানতাম কিন্তু তাই বলে বাপের সই জাল করে সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে এমন প্রকৃতির ছেলে তো সে নয়!

তবু সূর্যপ্রসাদ যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার যেতে হবে তাঁর ওখানে।

সমরের কথাই ভাবতে ভাবতে ডিস্‌পেনসারী থেকে বের হলাম।

গাড়িতে উঠতে যাব, ড্রাইভার রামরূপ বললে, গাড়ি স্টার্ট নিতে আবার গোলমাল করছে স্যার—

তাহলে কি করবে! নন্দ মিস্ত্রীর ওখানে নিয়ে যাও না হয় গাড়িটা, বললাম।

ও তো এই নিয়ে তিনবার সারিয়ে দিল। আমাকে যদি একদিনের ছুটি দেন তো হাজারীবাগে একজন ভাল মিস্ত্রী আছে, নিজে আমি তাকে গিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

বেশ, তাই না হয় যাও।

এক্ষুনি তাহলে সাড়ে নটার বাসে চলে যাই স্যার?

তাই যাও।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে হেঁটেই বাজারের দিকে চললাম।

কিছুদূর এগুতেই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ডাকে চমকে তাকালাম।—ডাঃ সেন?

এই যে মিঃ গুপ্ত—আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন শুনলাম?

হ্যাঁ, ডাক্তার।

সমরের কোন খোঁজখবর পেলেন? নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশ্নটা করলাম।

না। সে যাক্, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল ডাক্তার।

বেশ তো, আমি বিকেলের দিকে যাব'খন।

বিকেলে নয়। একটু নিরিবিলিতে সময় নিয়ে কথাটা বলতে চাই। বরং আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানেই ডিনার খাবে। ডিনারের পরই কথাবার্তা হবে'খন। বলদেববাবু, মেজর কৃষ্ণস্বামীকেও বলেছি ডিনার খেতে—

বেশ, যাব।

হ্যাঁ, এস।

বলে আর দাঁড়ালেন না সূর্যপ্রসাদ।

সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চওড়া চেহারা সূর্যপ্রসাদের। সত্তরের কাছাকাছি বয়স হয়েছে তবু হাটেন এখনও সোজা হয়ে।

উঃ, হাড়কৃপণ লোকটা! এত টাকা—ইচ্ছা করলে আট-দশটা গাড়ি রাখতে পারেন, তবু পায়ে হেঁটে সব জায়গায় যাবেন।

ভগবানের বিচার বলব অদ্ভুত!

কাউকে দেবেন তো একেবারে দু হাতে ঢেলে দেবেন।

আর যাকে দেবেন না তো একেবারেই দেবেন না।

॥ তিন ॥

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

রবিবার বলে মিতার স্কুল নেই।

মিতা বাইরের ঘরেই একটা সোফার উপরে বসে উলের কি একটা যেন বুনছিল। আমার পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।—দাদা, একটা ভাল সংবাদ আছে।

মিতার মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা না বলে, মৃদু হেসে ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে মিতা বলে ওঠে, চলে যাচ্ছ যে! সত্যি বলছি, গুড্ নিউজ!

কালা তো নই, শুনতে পাচ্ছি। বলে দু পা এগিয়ে গেলাম।

মিতা এবার সোফা থেকে উঠে আমার পেছনে এসে দাঁড়ায়। আমি এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম, মিতাও পেছনে পেছনে এসে সেই ঘরে ঢুকল।

গেস্ করতে পার, গুড্ নিউজটা কি দাদা?

গা থেকে জামাটা খুলতে খুলতে বললাম, তুই না হয় ইদানীং একজন হবু গণৎকার

হয়ে উঠেছিস, কিন্তু আমার পেশা হচ্ছে ডাক্তারী।

সত্যি, তুমি একেবারে হোপলেস্, অ্যাব্‌সলুটলি হোপলেস্ !

তবু আমি নিরুত্তর।

জানি, আন্দাজও করতে পারবে না। সমর এই রাঁচি শহরেই আছে—

সমর !

জানতাম, তোমার কাছে সারপ্রাইজই মনে হবে নিউজটা।

কি আবোল-তাবোল বকছিস্ মিতা !

একেবারেই আবোল-তাবোল নয়। সত্যিই সমর রাঁচি শহরেই বর্তমানে আছে।

রাঁচি শহরে আছে ?

হ্যাঁ, আজ সকাল বেলা তুমি বের হয়ে যাবার পরই কয়েকটা জিনিস কিনতে আমি বাজারের দিকে গিয়েছিলাম, মতি স্টোর্স থেকে জিনিসগুলো কিনে বের হচ্ছি, রাস্তার উল্টোদিকে যে রেস্টুরেণ্টটা আছে তারই পাশের পান-সিগারেটের দোকানের সামনে আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

তারপর ?

কিন্তু হঠাৎ ঐসময় উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি এসে পড়ায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। চট্ করে সে যে কোন্ দিকে চলে গেল—

যেমন তুই, কাকে না কাকে দেখেছিস্ ! অমনি ভাবলি সে বুঝি সমর।

কি বলছ তুমি দাদা, সমরকে চিনতে আমি ভুল করব ?

নিশ্চয়ই ভুল করেছিস। নইলে—

না দাদা, ভুল আমি করিনি। তারপরই কতকটা যেন আত্মগতভাবে মিতা মৃদু কণ্ঠে বলে, পুওর সমর ! ঝোঁকের মাথায় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে এখন হয়তো রিপেনটেড্। কে জানে হয়তো হাতের টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছে। যে রকম ময়লা জামাকাপড় গায়ে দেখলাম—

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

স্নান করবার জন্য বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু স্নান করতে করতেও মিতার মুখে শোনা ক্ষণপূর্বের কথাগুলোই ভাবছিলাম।

আশ্চর্য !

সত্যিই কি তাহলে সমর রাঁচি শহরের মধ্যেই কোথাও না কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে ? কিন্তু তারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? সূর্যপ্রসাদ যতই কঠোর প্রকৃতির লোক হোন না, হাজার হলেও সমর তার আত্মজ তো ! মাতৃহারা একমাত্র সন্তান।

সূর্যপ্রসাদ কথাটা শুনলে হয়ত আশ্চর্যই হবেন। কারণ তিনি নিশ্চয়ই একথা জানেন না। আর যদি জানতেনই, আমাকে কি কথাটা বলতেন না?

সত্যিই বেচারী সমর!

কিন্তু মিতা দেখতে ভুল করেনি তো?

ভুলও তো সে দেখে থাকতে পারে! নিশ্চয়ই তাই। নইলে সূর্যপ্রসাদ কি এই কদিন ধরে সমরকে কম খুঁজছেন!

না, না—মিতা নিশ্চয়ই দেখতে ভুলই করেছে।

কিন্তু সূর্যপ্রসাদ আমার সঙ্গে কি এমন প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে চান?

বলবেন আবার নিরিবিলিতে, সময় লাগবে আলোচনাটা করতে!

কি জানি কি আলোচনা আমার সঙ্গে তিনি করতে চান?

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিস্‌পেনসারী থেকেই সূর্যপ্রসাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বের হলাম।

একে প্রচণ্ড শীত পড়েছে, তার উপরে আবার চলছে হাওয়া। চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বিঁধছে। গায়ের গরম লংকোটের কলারটা উল্টে দিলাম। মাথার টুপিটাও একটু নীচের দিকে টেনে দিলাম।

ডিস্‌পেনসারী থেকে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়ি প্রায় আধমাইলটাক তো হবেই।

গাড়িটা বিগড়েছে, হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বড় রাস্তার ঠিক উপরে সূর্যপ্রসাদের 'লিলি কটেজ' নয়। খানিকটা ভিতরের দিকে। জায়গাটাও নির্জন।

দুপুরের দিক থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিছুদূর এগুতেই টিপ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হল।

বেশ দ্রুতই পা চালালাম।

শীত, বৃষ্টি ও হাওয়া সব মিলে যেন ঠাণ্ডাটা আরও তীব্র করে তোলে।

টিপ্ টিপ বৃষ্টি এবারে বড় বড় ফোঁটায় শুরু হল।

আরও দ্রুত পা চালালাম।

একটা উঁচু জমির উপরে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজ'।

গেট পার হলেই বাড়ির সামনে একটি চমৎকার ফুলের বাগান। নানাজাতীয় রঙ-বেরঙের মরসুমী ফুলের সমারোহ, বৈচিত্র্য।

আমি আদৌ কবিপ্রকৃতির নই, একান্ত বাস্তববাদী। তবু যখনই সূর্যপ্রসাদের গেট

দিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছি, দু চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়েছে।

বাড়ির গেটটা খোলাই ছিল।

কাঁকর-বিছানো পায়ে-চলা-পথটা সামনের ঝুল-বারান্দার নীচে গিয়ে মিশেছে। সামনেই দুদিক ঘোরানো বারান্দা। সেখানেও সব ফুলের টব দিয়ে সাজানো।

বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই যেন পরিচ্ছন্ন একটা রুচির আভিজাত্য সর্বত্র চোখে পড়ে।

বারান্দায় একটা অল্পশক্তির বিদ্যুৎবাতি জ্বলছিল। সেখানে কোন, মানুষজন দেখতে পেলাম না।

সামনেই পারলার।

পারলারের দরজাটা ভেজানোই ছিল। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম।

পাওলারের আলোটা নেভানো। ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু বাঁ পাশে যে মাঝারি আকারের ঘরটা তারই দরজার ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে ওপাশের ঘরের মধ্যে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাড়িয়ে রইলাম।

সহসা একটা কথা মনে হতে, নিঃশব্দে সেই পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ল্যাচ্-কি'টা ঘোরাতেই কাচের দরজাটা খুলে গেল।

এ বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত. কারণ বহুবার এ বাড়িতে আমি আসা-যাওয়া করেছি।

ঘরের আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীও নেই।

ঘরের মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো এবং চারপাশের আলমারিতে ইংরেজী বাংলা নানা ধরনের বই সাজানো।

ঘরের মধ্যস্থলে খান-দুই সোফা ও একটি গোল টেবিল।

বই পড়া সূর্যপ্রসাদের প্রচণ্ড নেশা। এটা তাঁর লাইব্রেরী ঘর। লাইব্রেরী ঘরেরই সংলগ্ন পশ্চিমদিকে আর একটি ছোট ঘর আছে। এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে কোন কপাট নেই, আছে কেবল একটি পর্দা ঝোলানো।

পারলার-সংলগ্ন পশ্চিম দিককার ঐ ঘরটি জানি আকারে ছোট। এবং ঘরটিকে একটি মিউজিয়াম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ সূর্যপ্রসাদের যেমন বই পড়ার নেশা তেমনি আর একটি নেশা হচ্ছে তাঁর নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য জিনিস—কিউরিও সংগ্রহ করা।

ঐ ঘরটির মধ্যে সেই সব কিউরিওগুলিই সযত্নে সাজানো আছে।

আর এও আমি জানতাম, সূর্যপ্রসাদের অবসরজীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে হয় এই লাইব্রেরী-ঘরে, না হয় ঐ পাশেরই মিউজিয়াম-ঘরে।

তবে কি সূর্যপ্রসাদ ঐ ঘরেই আছেন ? নচেৎ এ ঘরে এ সময় আলো জ্বলছে কেন ?

পাশের ঘরটার দিকে এগুতে যাব, হঠাৎ ঐসময় খুট করে একটা শব্দ এল সেই ঘর থেকে এবং পরক্ষণেই দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার পর্দাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রাধিকাপ্রসাদের ছোট ছেলে সুবল।

এবং এ ঘরে পা দিয়েই ঘরের মধ্যে আমাকে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার সেন, আপনি ! গলার স্বরে সুবলের কেমন যেন একটু দ্বিধা।

মৃদুকণ্ঠে সুবলের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আজ যে এখানে রাত্রে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ—

হ্যাঁ, তাই আব্দুলের কাছে শুনছিলাম বটে। তা উপরে যান। বলদেববাবু ও মেজর কৃষ্ণস্বামী এসেছেন। সকলে বসে জেঠামণির ঘরেই একটু আগে দেখেছি গল্প করছেন।

একটানা সুবল কথাগুলো যেন ছেদহীন ভাবে বলে গেল।

এবং কেমন যেন আমার মনে হল সুবল আমাকে উপরে পাঠাবার জন্য বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আর তার কথাবার্তায় ও হাবভাবে যেন সেই ব্যস্ততাটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

সুবলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন মনে হল একটু চঞ্চল, অস্থির।

আচ্ছা আমি আসি—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে একটু যেন দ্রুতই সুবল আমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পরক্ষণেই।

আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম তারপরও।

সহসা সুবল ঘর ছেড়ে চলে যেতেই একটা কথা আমার মনে হল, এই ঘরে পর্দা তুলে প্রবেশের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কিসের যেন ঠুক্ করে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। এবং শব্দটা যেন মনে হয়েছিল একটা ছোট বাক্সের ডালা বা ঐ ধরনের কিছু বন্ধ করবার মতোই একটা শব্দ, আর ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখে সুবল যেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হল। তারপর তার অস্থিরতা এবং তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে যাওয়া, সব কিছু জড়িয়ে মনে হল সুবল যেন এই সময় আমাকে ঠিক ঐ ঘরের মধ্যে আশা করেনি।

কিন্তু কেন ?

সত্যি, মানুষের মন কি সন্দিগ্ধ !

শেষ পর্যন্ত কৌতূহলটাকে যেন কিছুতেই আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না ।

পর্দা তুলে নিঃশব্দে আমি পশ্চিমের ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলাম ।

ঘরটার মধ্যে কেমন যেন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ ।

বলা বাহুল্য, ঘরের মধ্যে তখনও আলোটা জ্বলছিল ।

ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম । কেন তাকালাম তা অবিশ্যি বলতে পারি না । কোন সন্দেহ ? না, তাই বা কিসের ?

পূর্বেই বলেছি, ওটা সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ।

ঘরের দেওয়ালের চারপাশে কাচের শো-কেস ও র‍্যাকে পুরাতন দিনের সব বিচিত্র কিউরিও সযত্নে সাজানো ।

ভাঙাচোরা পাথরের মূর্তি, শিলালিপি, ধাতুপাত্র, অস্ত্র, মুদ্রা, পুঁথি ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার ।

মাঝখানে ছোট একটি গোল টেবিল ও খান-দুই নীচু ধরনের আরামকেদারা ।

এই ঘরে পূর্বে আরও বহুবার আমি এসেছি ।

ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলোলাম । এবং মনে হল যেখানকার যা সবই যেন তেমনই আছে । ঐ যে ভাঙা পাথরের নৃসিংহ মূর্তিটি, তার পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধা কৃষ্ণরাধা, ডান পাশের সেলফে হরগৌরীর মূর্তি । তারই পাশে অর্ধনারীশ্বর—কিন্তু এ ঘরের পশ্চাতের বাগানের দিককার জানলার ঐ কবাট দুটো খোলা কেন ?···

এই সময় ঘরের ঐ গরাদহীন জানলার কবাট দুটো হা-হা করছে খোলা । আশ্চর্য !

এ ঘর সম্পর্কে যতদূর আমি জানি, সূর্যপ্রসাদ অত্যন্ত সতর্ক । কাউকেই বাড়ির বড় একটা এ ঘরে কখনও প্রবেশ করতে দেন না, এও আমি জানি ।

তবে ! তাছাড়া সুবলই বা এই সময় একাকী আলো জ্বেলে এই ঘরের মধ্যে কি করছিল একটু আগে ?

আর কেনই বা এ সময়ে এ ঘরে এসেছিল ?

॥ চার ॥

সুবল !

সত্যি, সুবলের এ ঘরে কি এমন দরকার পড়েছিল এ সময় ?

আর ঐ জানলাটাই বা খোলা কেন ? সুবলই কি তবে জানলাটা খুলেছিল ? এবং ঐ জানলাপথেই একটু আগে ঘরে প্রবেশ করেছিল, যার শব্দই আমি ক্ষণপূর্বে শুনেছিলাম ? না, না—তাই বা হতে যাবে কেন ?

এই বাড়িরই ছেলে সুবল, এ ঘরে যদি কোন কাজ তার থাকবেই, সে জানলা-পথেই বা এ ঘরে প্রবেশ করতে যাবে কেন ?

অকস্মাৎই যেন ঐ সময় একটা কথা মনে পড়ে। সুবল একটু আগে এ ঘরে যখন এসে ঢুকেছিল, ওর চোখে মুখে ও চুলে বৃষ্টির জল লেগে ছিল দেখেছিলাম।

তবে কি—

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আরও একটা জিনিস আমায় আকর্ষণ করল।

দক্ষিণ দিককার দেওয়াল ঘেঁষে স্ট্যাণ্ডের উপরে বসানো ভাঙা শ্বেতপাথরের বুদ্ধ-মূর্তিটার ঠিক পাশেই একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডের উপরে রক্ষিত চন্দনকাঠের বাক্সটা যেন আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বাক্সের ডালাটা ঠিক ভাল করে মুখে মুখে বন্ধ হয়নি। খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে যেন।

কি ভেবে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাক্সটার কাছে।

ক্ষণপূর্বের কৌতূহলটা মনের মধ্যে তখন যেন আবার দানা বেঁধে উঠছে।

ঐ বাক্সটার মধ্যে হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা চামড়ার খাপে ভরা ধারালো একটা ছুঁচালো ম্যাক্‌সিকান ছোরা আছে আমি জানি।

ছোরাটা একদিন সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখিয়েছিলেনও।

ওঁর বন্ধু মেজর কৃষ্ণস্বামী, বর্তমানে তিনি এই শহরেই একটা বাড়ি কিনে তাঁর বাঙালী স্ত্রীসহ রিটায়ার্ড লাইফ অতিবাহিত করছেন সূর্যপ্রসাদেরই অনুরোধে। বহু-দিনের বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে। গত মহাযুদ্ধের সময় এককালে মেজর কৃষ্ণস্বামী যখন যুদ্ধের চাকরি ব্যাপদেশে ম্যাক্‌সিকোতে ছিলেন, তখন ঐ ছোরাটা কিনে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু সূর্যপ্রসাদকে। এবং চন্দনকাঠের সুন্দর কাজ করা বাক্সটাও তিনিই একবার মহীশূরে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনে ওঁকে দিয়েছিলেন। সযত্নে তাই সূর্যপ্রসাদ ঐ বাক্সের মধ্যেই ছোরাটা রেখে দিয়েছেন।

এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালাটা ধীরে ধীরে তুললাম।

কিন্তু এ কি! চমকে উঠলাম। বাক্সের মধ্যে ছোরাটা তো নেই!

ছোরাটা কি তবে সূর্যপ্রসাদ অন্যত্র কোথায়ও রেখে দিয়েছেন?

ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক ভাবে বাক্সের ডালাটা বোধ হয় বন্ধ করেছিলাম। খুট করে একটা মৃদু শব্দ হতেই যেন চমকে উঠি।

হঠাৎ মনে হল সুবল পারলারে ঢোকবার পূর্বমুহূর্তে ঠিক যেন এই রকমই শব্দ একটা আমার কানে এসেছিল।

কি খেয়াল হল, অন্যমনস্ক ভাবে দু-তিনবার ডালাটা খুলে আবার বন্ধ করে শব্দটা পরীক্ষা করলাম।

আবার ঘরের চারিদিকে একবার তাকালাম।

না, কেউ কোথায়ও নেই।

* * * *

বাইরের অন্ধকার বাগান থেকে একঘেয়ে ঝিঁঝির একটা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শো'

ধীরে ধীরে চন্দনকাঠের বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে ঘরের আলোট' যাচ্ছে ঘরের বের হয়ে এলাম ঘর থেকে।

অন্ধকারেই পারলারটা অতিক্রম করে দোতলার ওঠবা ঘরের আলো জ্বেলে দাড়ালাম। সহসা ঐ সময় পদশব্দ পেয়ে সামনের দিকে তাকি

খাস ভৃত্য আব্দুল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। য়েই শোন জানি।

প্রায় দীর্ঘ পনের বৎসর আব্দুল সূর্যপ্রসাদের এখানে কাজ ক

হয়েছে। পাকা চুল-দাড়ি। লম্বা রোগাটে চেহারা। কিন্তু ভিতর থেকে

অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকটা নাকি। এবং একাধারে ভৃত্য ও বা

বলাই বাহুল্য, চিরদিনই একটু সাহেবী-ভাবাপন্ন। ন!

যাই হোক্, এ বাড়িতে আব্দুলের বিশেষ একটা স্থান আছে।

ডক্টর-সাব্—কখন এলেন? আব্দুল প্রশ্ন করল।

এই আসছি। তোমার সাহেব কোন্ ঘরে?

উপরে তাঁর ঘরে। মেজর সাব্, বলদেববাবু সবাই আছেন—

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম।

আব্দুল নীচে নেমে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার সামনেই একটা বারান্দা। বলদেববাবুর প্রাণখোলা হাসির শব্দ কানে এল।

আশ্চর্য প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন ভদ্রলোক !

বলদেব সিংহও বিহারেই ডোমিসাইলড্।

বেঁটে-খাটো, হাসি-খুশি রসিক মানুষটি। বয়স প্রায় ষাটের কোঠা ছাড়াতে চলেছেন।

সিং অ্যাণ্ড সনস্-এর মোটরবাস সার্ভিস কোম্পানীর মালিক।

পনের-কুড়িটা বাস আছে, রাঁচি হাজারীবাগ চাঁইবাসার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে।

রীতিমত ধনী ব্যক্তি বলেই বলদেব সিংহকে এ তল্লাটে সকলে জানে। বর্তমানে কাজকর্মের ভার দুই ছেলের হাতে তুলে দিয়ে আনন্দে অবসর জীবনযাপন করছেন।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বিশেষ বন্ধু তিনি।

প্রতি সন্ধ্যায়ই লিলি কটেজে এসে ঘণ্টা দুই-তিন কাটিয়ে যান বন্ধুর সঙ্গে।

আমি পর্দা তুলে সূর্যপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করতেই বলদেববাবু বলে উঠলেন, এই সঙ্গে স, ব্যাপার কি বল তো! খাবারগুলো সব যে এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার

দক্ষিণ দি

মূর্তিটার ঠিক হয়ে গেল—একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম।

আমার দৃষ্টিকে বিদেরি কেন গুপ্ত, আব্দুলকে বলো টেবিলে খাবার দিতে। জানই তো

বাক্সের ডালাটাটিম, হজম না হলে আবার সারাটা রাত ছট্‌ফট করতে হবে।

যেন। ু‌ল—চিৎকার করে ডাকলেন সূর্যপ্রসাদ।

কি ভেবে নিঃশব্দুল এসে ঘরে ঢুকল।

ক্ষণপূর্বের বেল রেডি কর।

ঐ বাক্সটার

ছুঁচালো ম্যাশ্‌ষ হবার পর ডিনার-টেবিলেই পরিষ্কার করে একটা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে বলদেববাবু ও মেজর কৃষ্ণস্বামী দাবার ছক নিয়ে বসলেন।

সূর্যপ্রসাদ ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা ততক্ষণ একদান খেলো সিংহ, ডাক্তারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। চল ডাক্তার—

সূর্যপ্রসাদ তাঁর শয়নঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

শয়নঘর অতিক্রম করে সূর্যপ্রসাদ সেই ঘরেরই সংলগ্ন নিরিবিলি যে ছোট ঘরটি, তার মধ্যে গিয়ে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

শয়নঘরের অনুপাতে ঐ ঘরটি ছোট হলেও একেবারে খুব ছোট নয়।

ঘরের দুটি দরজা।

একটি দরজা, সংলগ্ন কক্ষ ও ঐ ঘরের মধ্যবর্তী। যাতে করে শয়নঘর থেকেই ইচ্ছে হলে ঐ ঘরে যাতায়াত করা যায়।

অন্য দরজাটি বাইরের দিকে। এবং দুটি জানলা পাশাপাশি। একটি জানলার কবাট খোলা ছিল।

মেঝেতে পুরু দামী কার্পেট বিছানো।

আসবাবপত্রের মধ্যে একটি বড় হাইব্যাক্ আরামকেদারা ও তার পাশে দুটি গদিআঁটা চেয়ার। একটি গোল টেবিল।

টেবিলের উপরে ফ্লাওয়ার-ভাসে রক্ষিত একরাশ মরসুমী ফুল।

হাইব্যাক্ আরামকেদারাটার উপরে নিজে বসে আমার দিকে তাকিয়ে সূর্যপ্রসাদ মৃদু কণ্ঠে বললেন, বসো ডাক্তার।

আমি নিঃশব্দে সামনেরই একটা চেয়ারে বসলাম।

ঘরের এক কোণে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল। তাতেই ঘরটা বেশ

কিন্তু খোলা জানলাপথে শীতরাত্রের হিমকণাবাহী হাওয়া আসছে।

ইফ্, ইউ ডোণ্ট্, মাইণ্ড্, ঐ জানলাটা বন্ধ করে দিই মিঃ গুপ্ত? যাচ্ছে ঘরের

সূর্যপ্রসাদ অন্যমনস্ক ভাবে যেন কি ভাবছিলেন। আমার কথায়

উঠে বললেন, অ্যা! ঘরের আলো জেলে

বলছিলাম, ঐ জানলাটা—

হ্যা, বন্ধ করে দাও। য়েই শোন জানি।

উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। এবং জানলাটা বন্ধ

সূর্যপ্রসাদ বললেন, বেডরুমের ঐ দরজাটাও বন্ধ করে দাও ডাক্তার। কিন্তু ভিতর থেকে

অন্য দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল, দ্বিতীয় দরজাটাও তা করে আবার এসে চেয়ারে বসলাম।

সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম। অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছেন!

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

দুজনেই চুপচাপ বসে আছি।

ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেসের প্রজ্বলিত আগুনের রক্তাভা সূর্যপ্রসাদের মুখের উপর পড়ে যেন মনে হচ্ছিল ব্রোঞ্জের তৈরী মুখটা, নিষ্প্রাণ।

ধীরে ধীরে একসময় কিমোনোর পকেট থেকে পাইপ ও টোবাকো পাউচ্‌টা বের করে পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন সূর্যপ্রসাদ।

তীব্র কটু তামাকের গন্ধটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সহসা একসময় পাইপটা হাতে নিয়ে সূর্যপ্রসাদ বললেন, যে আলোচনা করবার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি সেটা জরুরী এবং গোপনীয়।

আমি কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম।

সত্যি কথা বলতে কি, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঠিক ঐভাবে যেন কোনদিন সূর্যপ্রসাদকে কথা বলতে শুনিনি।

ব্যাপারটা যদিও এখনো পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনি ডাক্তার, আর বিশ্বাস করবার মতোও নয়, তবু নিজেদের মধ্যে একটা ওপেন্ ডিস্কাসন করে আমার মনে হয় ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নেওয়াই ভাল। কি বল? সূর্যপ্রসাদ বললেন।

নিশ্চয়ই, কিন্তু—

বলছি। পরশু বিকেলের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছি—

চিঠি!

কে লিখেছে জান?

সঙ্গে

দক্ষিণ লিখেছে মৃত জগৎজীবনের ভাই মৃত পুলকজীবন—

মূর্তিটার ঠিক তিনি তো—

আমার দৃষ্টিকে বি ন আগেই সে মারা গিয়েছে। মরার ঠিক দিন দুই আগেই চিঠিটা

বাক্সের ডালাটা লিখেছিল।

যেন। তিনি?

কি ভেবে নিঃশ তুমি চেনো না। সে এখানে থাকেও না। কিন্তু তাঁকে আমি খুব

ক্ষণপূর্বের দে। সেই ভদ্রলোকটিই চিঠিটা ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঐ বাক্সটার কাছে—

ছুঁচালো ম্যা রিণ সেই চিঠির মধ্যে এমন কতকগুলো কথা আছে, যার সঙ্গে আমারও

বলদেবব রক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

দেখুন মিঃ গুপ্ত, সে চিঠির ব্যাপার আমি যে কি ভাবে—

শোন ডাক্তার, তুমি জান, জগৎ আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। আর তার ভাইকেও আমি যথেষ্টই স্নেহ করতাম, সেও তুমি জান।

কিন্তু—

লেট্ মি ফিনিস ডাক্তার! সে চিঠিটার মধ্যে তাদের ও আমার ফ্যামিলি সংক্রান্ত অনেক কথা আছে তো বটেই, বিশেষ যে ব্যাপারটার জন্য তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে জগৎ ও পুলকের মৃত্যু সম্পর্কে, অনেক কথাই আছে।

ক্ষমা করবেন আমাকে মিঃ গুপ্ত, আমি কিন্তু এখনও ব্যাপারা
পারছি না!

শোন, চিঠিটা আমি পড়ছি আগাগোড়া, তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে। বলতে বলতে সূর্যপ্রসাদ তাঁর কিমোনোর পকেটে হাত চালিয়ে একটা মুখ-ছেঁড়া 'ব্লু' রঙের এনভেলাপ বের করলেন।

কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ গুপ্ত, ও চিঠি আমার বোধ হয় না শোনাই ভাল আপনাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত ব্যাপার, আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি—

না, না,—ডাক্তার। চিঠিটা আমি পড়ি, তুমি শোন—

খাম থেকে চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন :

প্রিয় বঙ্কিম,

আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমার শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ মৃত্যুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মরতে আমাকে হ যেহেতু চরম নির্বুদ্ধিতায় এই মৃত্যুকে যে আমিই ডেকে এনেছি। জানি না, ভুল করলাম। কিন্তু আর যখন উপায় নেই, তখন যে আমাকে এমনি ক যাচ্ছে ঘরের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তারও আসল রূপটা আমি সকলের সামনে চাই। আর সেই কারণেই তোমাকে এই চিঠিটা শেষ বিদায়ের ঘরের আলো জ্বেলে ভাই। আর একজনকে এ কথাগুলো আমি জানিয়ে যাব ভেবে একসময়কার সহপাঠী ও বিশেষ পরিচিত কিরীটী রায়। কিন্তু তাকে য়েই শোন জানি। আমার সাহস হল না। কারণ তাতে করে আমার প্রতি সহানু ঘৃণাটাই বেশী হবে। যাক্, যে কথা বলতে চাই! তোমরা জান, কিন্তু ভিতর থেকে জগৎজীবন আপন সহোদর ভাই ছিলাম। কিন্তু তা নয়। দাদা আমার ছিলেন। এবং বাবার মৃত্যুর পরই সেই কথাটা প্রথম জানতে পারি। শুধু তুন! সঙ্গে এও জানতে পারি, বাবার যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দাদার নামেই লি গিয়েছেন। আমাকে একটি কপর্দকও দেননি। কারণ আমি জুয়াড়ী। জুয়ার ে আমার ছিল। দাদা আমার বৈমাত্রেয় ভাই হলেও তিনি যে আমাকে কি গভীরভাবে ভালবাসতেন তা তোমরা জান না। তবু বাবার উইলের সব সংবাদ জানার পর আক্রোশে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম কিছুই করবার নেই তখন একান্ত বাধ্য হয়েই দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ এমন অনর্থ যে শেষ পর্যন্ত দূরে গিয়েও সেই অর্থের প্রলোভনেই জঘন্য চক্রান্ত করে দেবতার মত অমন দাদাকেও আমার হত্যা করতে হাত এতটুকু কাঁপেনি। এমনি নরাধম, এমনি

পশাচ আমি ! দাদাকে আমি বিষ দিয়ে হত্যা করেছিলাম জান ? কিন্তু সে বিষ কে যুগিয়েছিল আমাকে জান ? তোমারই পিসতুতো ভাই, সূর্যপ্রসাদবাবুর ছেলে সমর—

ঐ পর্যন্ত চিঠিটা পড়তেই আমি এবারে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, একস্‌কিউজ মি, মিঃ গুপ্ত, আপনার ও চিঠি আমি আর শুনতে চাই না।

না না, ডাক্তার, শোন, তোমাকে শেষটুকু শুনতেই হবে। বললেন সূর্যপ্রসাদ।

চেয়ার ছেড়ে আমি ততক্ষণে উঠে পড়েছি। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, ক্ষমা করবেন মিঃ গুপ্ত, ও চিঠি শুনতে পারব না।

বসো, বসো ডাক্তার, শরীরটা আমার ভাল নয়, কাল সুবিধা হবে কিনা জানি না। বসো, আজকেই—

বুঝলাম সূর্যপ্রসাদ কিছুতেই ছাড়বেন না, তাই শেষ পর্যন্ত বললাম, বেশ, আজ
জ আমারও শরীরটা ভাল নেই। কাল, না হয় পরশু বা অন্য একসময় এসে
সঙ্গে া আপনার শুনব।
দক্ষিণ বলে আর আমি এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না। বাইরের দরজাটা খুলে
মূর্তিটার ঠিক ক বের হয়ে এলাম।
আমার দৃষ্টিকে বি লে বাইরের বারান্দায় পা দিতেই আব্দুলের সঙ্গে আমার মুখোমুখি
বাক্সের ডালাট

যেন। গরম কফি নিয়ে দরজার একেবারে গোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে
কি ভেবে নিঃশ
ক্ষণপূর্বের াকে সহসা ঐভাবে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে যেন
ঐ বাক্সটার মত খেয়ে থেমে গেল।
ছুঁচালো ম্যা এখানে কি করছিলি রে দাঁড়িয়ে?
বলদেববা গুপ্ত, সাহেবের জন্যে কফি নিয়ে—

কফি আজ রাত্রে আর তিনি খাবেন না। নিয়ে যা। আমাকে বলে দিলেন শরীরটা তাঁর ভাল নেই। তাঁকে যেন রাত্রে কেউ আর না বিরক্ত করে।

কি হয়েছে সাহেবের, ডাক্তারবাবু? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আব্দুল প্রশ্ন করে।

সেই হার্টের ব্যথাটা বোধ হয়—

আব্দুল আর দাঁড়াল না। ট্রে নিয়ে চলে গেল।

বারান্দাপথে আব্দুল অদৃশ্য হয়ে গেলে, আমিও ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সিঁড়ির আলোতেই হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম, সময়টা কত দেখবার জন্য।

ঠিক রাত সাড়ে দশটা।

কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সূর্যপ্রসাদ অত করে বার বার চিঠিটা শোনবার জন্য বলছিলেন, চিঠিটা শুনলেই হত।

কিন্তু কে ঐ বঙ্কিম?

পুলকজীবনের বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। শুধু পুলকজীবন কেন, সূর্যপ্রসাদেরও তিনি বিশেষ পরিচিত বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কই, কখনও পুলকজীবনের মুখে ঐ নামটা শুনেছি বলে তো আগে মনে পড়ে না! আর কি সব আবোল-তাবোল চিঠিতে লিখেছে পুলক! তার দাদা জগৎজীবনের মৃত্যুর জন্য নাকি সে-ই দায়ী!

সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেল, কিরীটী রায়ের সঙ্গেও পুলকের বিশেষ ছিল চিঠিতে সে লিখেছে। কোন্ কিরীটী রায়? যে কিরীটী রায় বর্তমা স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছেন তিনিই? সম্ভবতঃ তাই। একই ব্যক্তি। আ বোধ হয় পুলক সম্পর্কে আমাকে এত কথা তিনি জিজ্ঞাসা করছিলে

যাচ্ছে ঘরের

ঘরের আলো জ্বেলে

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হল।

তবে কি কিরীটী রায়ের এ সময় রাঁচিতে আসাটা একটা অ তাই। নচেৎ এই দুর্দান্ত শীতে কেউ রাঁচিতে আসে নাকি!

য়েই শোন জানি।

কিন্তু ভিতর থেকে

॥ পাঁচ ॥

বন।

উঃ! রাত মাত্র সাড়ে দশটা, এর মধ্যে শীত যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।

বাগান পার হয়ে অন্ধকারে গেট অতিক্রম করে এসে রাস্তায় নামতেই, অন্ধক যেন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল আমার অতর্কিতে।

মনটা এমনিতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, দেখে রাস্তা চলেন না!

সঙ্গে সঙ্গে যেন অনুতপ্ত পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, স্যরি, অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

আমি আর কোন জবাব না দিয়ে এগুতে যাব, সেই সময় আবার পশ্চাৎ থেকে পূর্বকণ্ঠে প্রশ্ন এল, মশাই, শুনছেন?

কি বলছেন ?

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

সামনেই। ওই যে গেট দেখা যাচ্ছে।

ধন্যবাদ।

আমি আবার আমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হলাম।

ঢং ঢং ঢং—অদূরবর্তী গীর্জার পেটা ঘড়িতে রাত্রি এগারোটা ঘোষিত হল।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন বললেও চলে।

লংকোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন আরও কনকনে হয়ে উঠেছে।

নিজন রাস্তায় শুধু নিজের পায়ের জুতোর শব্দটাই কানে আসছে।

ঠাণ্ডায় নাকের ডগাটা চিনচিন করছে একটা বিশ্রী যন্ত্রণায়।

অন্যমনস্কতায় চলার গতিটা একসময় শ্লথ হয়ে এসেছিল। গতিবেগ বাড়িয়ে
সঙ্গে

দক্ষিণ।

দেখি মিতার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

মূর্তিটার ঠিক

পাশাপাশি ঘরে ভাই-বোন দুজনে আমরা শুই। মাঝখানে একটা দরজা

আমার দৃষ্টিকে বি

মিতার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তার ঘরেই ঢুকলাম।

বাক্সের ডালাট

সর্বাঙ্গ ঢেকে সোফার উপর বসে মিতা কি একটা বই পড়ছিল।

যেন।

মুখ তুলে তাকাল, এত রাত পর্যন্ত কি করছিলে দাদা ?

কি ভেবে নিঃশ

ওয়াল-ক্লকে দেখি, রাত প্রায় পৌনে বারোটা বাজে।

ক্ষণপূর্বের দে

ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফায়ার-

ঐ বাক্সটার

প্লেসের জন্য ঘরের হাওয়াটা বেশ গরম।

ছুঁচালো ম্যা

ব্যাপার, হঠাৎ সূর্যপ্রসাদ তোমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলেন !

বলদেবব

ওর প্রশ্নে ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিলাম, কেন, নিমন্ত্রণ করতে নেই নাকি ?

তা কেন ! সমরের বাবার মত একের নম্বরের কিপ্টে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলেন তাই বলছি—

শুধু আমিই নয়—

তবে ?

বলদেব সিং ও মেজর কৃষ্ণস্বামীও ছিলেন।

তাহলে রীতিমত ডিনার বল !

তাই।

কি খাওয়াল ?

স্যুপ,, ফিস ফ্রাই—স্টু—

ইস্, বুড়োর দেখছি রাতটা ঘুম হবে না।

মিতার কথার আর কোন জবাব দিলাম না। ফায়ার-প্লেসের আগুনটা নিভে আসছিল। নিবন্ত ফায়ার-প্লেসের রক্তাভার দিকে তাকিয়ে রইলাম অন্যমনস্ক ভাবে।

এমন সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল, ক্রিং. ক্রিং ক্রি···

এত রাত্রে আবার কে রে বাবা!

নিতাই উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বললাম, বস্ তুই, আমিই দেখছি!

আমার ঘরে ফোন।

ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম, হ্যালো, কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তার সেন স্পিকিং! অ্যাঁ, কি বললে, সূর্যপ্রসাদ খুন হয়েছেন?···না, না—অ্যাবসার্ড! ইম্‌পসিবল!···ও সিওর! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এখুনি আমি আসছি—

যাচ্ছে ঘরের

ইতিমধ্যে ফোনে আমার কথা শুনে মিতা আমার পাশেই এসে

অবশ হাতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মি

ঘরের আলো জ্বেলে

কি ব্যাপার দাদা? কে খুন হয়েছে?

সূর্যপ্রসাদ।

য়েই শোন জানি।

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ, কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না মিতা! এই

ন্তু ভিতর থেকে

ডিনার খেয়ে আমি আসছি। একটু আগেও লোকটাকে কোয়াইট্ অ্যাণ্ড স্ট্রং দেখে আসছি! হাউ অ্যাবসার্ড—

মন!

কিন্তু কে—কে তোমাকে ফোন করছিল?

আব্দুল বলেই মনে হল—

মিতা বোবার মতই আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি নিজে যেন কেমন বোবা বনে গিয়েছি।

শুনতে ভুল করলাম না তো কথাটা!

সূর্যপ্রসাদ কেমন করে খুন হবেন? না, না—নিশ্চয়ই আমি শুনতে ভুল করেছি মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

পাথরের মতই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে মিতা।

আমি—আমি একবার লিলি কটেজ থেকে ঘুরে আসি মিতা—

অ্যাঁ !

আমি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসি—

যাবে ?

যাব না ? যাওয়া কি উচিত নয়, এমন একটা সংবাদ পাবার পর ?

বেশ, যাও।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে রক্ষিত টেবিলের উপর থেকে ডাক্তারীর কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে আবার মিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, দরজাটা তাহলে তুই আটকে দে মিতা।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি !

হনহন করে হেঁটে চলেছি।

মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বলই মনকে স্তোক দিতে লাগলাম, গিয়ে হয়তো দেখব, সূর্যপ্রসাদ সুস্থই
সঙ্গে
তাই যেন হয়। কৃপণ হোক আর যাই হোক, লোকটি সত্যিই ভাল।
দক্ষিণ
জের গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে দেখি সদর বন্ধ। কলিং বেলের
মূর্তিটার ঠিক
আমার দৃষ্টিকে বি
বল বাজাবার পর দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে
বাক্সের ডালাট
বেচারী বোধ হয় একটুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছিল। চোখ ডলতে
যেন।
খুলে দিয়েছে। আব্দুল তো আমাকে দেখে অবাক।
কি ভেবে নিঃশ
ক্ষণপূর্বের রে
হয়েছে তোমার সাহেবের ?
ঐ বাক্সটার
কেন, কি হবে ? সাহেব তো তাঁর ঘরে ঘুমুচ্ছেন !
ছুঁচালো ম্যা
বলদেববা
, একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিই !

কিন্তু তবে তুমি একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলে কেন ?

আমি আপনাকে ফোন করেছি ! কি বলছেন ডক্টর সাব ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমিই ফোন করেছ। আমি স্পষ্ট তোমার গলা শুনেছি।

আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম। আপনার কলিং বেলের শব্দে উঠে আসছি।

আশ্চর্য ! অথচ ফোনে নাম বললে আব্দুল। সত্যি বলছ, তুমি আমাকে ফোন করনি ?

নিশ্চয়ই না।

হাউ ফানি! তারপর একটু থেমে বললাম, তোমার সাহেব সত্যিই ঘুমুচ্ছেন, জান তো?

নিশ্চয়ই। এত রাত্রে—

ঠিক আছে। এতদূর যখন এসেছিই চল একবার, ভাল করে খোঁজ নিয়ে যাই।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি সাহেব ঘুমিয়ে থাকেন ডক্টর সাব্—

ঘুমিয়েই যদি থাকেন তো ভালই। সুস্থ থাকলেই হল। চল—

আসুন।

দরজা বন্ধ করে আব্দুল এগিয়ে চলল, আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে।

নিস্তব্ধ নিঝুম সব।

সিঁড়ি অতিক্রম করে আব্দুলের সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের দরজার সামনে এসে দুজনে দাঁড়ালাম।

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, জানলাপথে আলো দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

ঘরে আলো জ্বলছে দেখছি! তোমার সাহেব কি রাত্রে ঘরের আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমান নাকি আব্দুল?

না তো! রাত্রে ঘুমের আগে তিনি তো বরাবর আলো নিভিয়েই শোন জানি।

তা হলে?

বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া-শব্দই পেলাম না।

আব্দুল ঐ সময় বললে, মধ্যে মধ্যে সাহেব রাত জেগে পড়াশুনা করেন!

॥ ছয় ॥

দরজায় নক্ করে দেখব? আব্দুলকেই শুধালাম।

একটু যেন ইতস্তত করেই সে বলল, দেখুন।

বন্ধ দরজার কপাটের গায়ে মৃদু নক্ করলাম।

কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া বা শব্দই পাওয়া গেল না।

এবারে কি ভেবে পুনরায় দরজার গায়ে নক্ করবার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, মিঃ গুপ্ত, জেগে আছেন কি ?

না, কোন সাড়া-শব্দই নেই।

আব্দুল এবারে বললে, সাহেব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন ডক্টর সাব্।

আব্দুলের কথায় কোন কান না দিয়ে আবার আমি দরজার গায়ে নক করার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের পর্দা একটু বেশ উঁচুতে তুলেই ডাকলাম, মিঃ গুপ্ত, জেগে আছেন কি ?

মিঃ গুপ্ত! আবার ডাকলাম পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে।—আমি ডাক্তার সেন।

তবু কোন সাড়া নেই।

দরজার কপাটে এবারে ধাক্কা দিলাম।

পূর্ববৎ। কোন সাড়া-শব্দই নেই।

এবারে হঠাৎ খেয়াল হতেই দরজার 'কি হোল' দিয়ে নীচু হয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলাম।

টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখলাম।

আব্দুল!

বলুন।

টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখছি। আমার যেন কেমন ভাল মনে হচ্ছে না।

কি বলছেন ?

হ্যাঁ, মিঃ গুপ্তর ঘুম আমি যতদূর জানি পাতলা। সামান্য শব্দেও তাঁর ঘুম ভেঙে যায় শুনেছি। দরজায় নক্ করলাম, নাম ধরে ডাকলাম, দরজায় ধাক্কা দিলাম—তবু কোন সাড়া নেই কেন ?

আর একবার দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে দেখুন তো ডক্টর সাব্। আব্দুল বললে।

আব্দুলের কথামত এবারে সশব্দেই দরজার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ জোরেই ডাকলাম, মিঃ গুপ্ত, আমি ডাক্তার সেন—দরজাটা খুলুন।

এবারেও পূর্ববৎ কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

সত্যি সত্যি এবারে মনটা যেন আমার রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এত জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, চেঁচিয়ে ডাকলাম, তবু সাড়া নেই সূর্যপ্রসাদের। পাতলা ঘুম ভদ্রলোকের, ঘুম না ভাঙারও তো কথা নয়।

কি করি বল তো আব্দুল ? আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই ভাল ঠেকছে না।

আব্দুলও যেন কেমন বিহ্বল হযে গিযেছে।

ইতিমধ্যে আমার উচ্চকণ্ঠের ডাকাডাকিতে রাধিকাপ্রসাদ ও তার ছেলে বিমল সেখানে এসে হাজির হল।

কি ব্যাপার? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাধিকাপ্রসাদ আমাকে প্রশ্ন করলেন. আপনি ডাঃ সেন, এ সমযে।

এই যে রাধিকাপ্রসাদবাবু, কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না—বলে সংক্ষেপে আমি আমার ঐ রাত্রে লিলি কটেজে আসবার কারণটা বললাম।

কিন্তু দাদার ঘুম তো এত গাঢ নয় যে এত ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙবে না। বললেন রাধিকাপ্রসাদ।

তাই তো আমার কি রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে রাধিকাপ্রসাদবাবু।

এমন সময দেখি মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেব সিং৬ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার? এ কি ডাক্তার, এত গোলমাল কিসের? তুমি বাড়ি যাওনি? মেজর কৃষ্ণস্বামীই প্রশ্নটা করলেন।

কিন্তু আপনারা? আপনারা রাত্রে বাড়ি যাননি? প্রশ্ন করলাম আমি।

জবাব দিলেন রাধিকাপ্রসাদই, না, এখান থেকে তো ওদের বাড়ি অনেকটা দূরের পথ, সেই কাঁকেতে। তাই আর রাত্রে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বুড়ো মানুষ ওদের যেতে দিই নি আমি।

হ্যাঁ, দাবা খেলতে খেলতে অনেক রাত হয়ে গেল—তাই এখানেই দুজনে থেকে গিযেছি। বললেন বলদেব সিং।

আমি তখন সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললাম ওঁদের।

কিন্তু ব্যাপারটা যে কি রকম সন্দেহজনক মনে হচ্ছে ডাঃ সেন। বললেন এবারে, মেজর কৃষ্ণস্বামীই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

ওসব কোন কাজের কথা নয়। দরজাটা ভেঙে ফেলা যাক। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

শেষ পর্যন্ত রাধিকাপ্রসাদের কথাতেই সকলে সায় দিলেন।

আব্দুল, আমি ও বিমল অতঃপর ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেললাম।

সর্বপ্রথমে আমিই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অন্যান্য সকলে আমার পশ্চাতে ঘরে প্রবেশ করলেন একে একে।

কিন্তু এ কি! সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ তো শূন্য!

ঘরে কেউ নেই।

খাটের উপর নিভাঁজ শয্যা। দেখলেই বোঝা যায় কেউ স্পর্শও করেনি শয্যাটা তখনো পর্যন্ত।

টেবিলের উপর ঘরের মধ্যস্থলে ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে।

সাহেব কি আজ রাত্রে তাহলে শুতেই আসেননি? বললে আব্দুলই।

সকলেই আমরা নিঃশব্দে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

চল তো দেখি ওঁর প্রাইভেট রুমে। ঐ ঘরেই আছেন হয়তো। বলে এবারেও সর্বাগ্রে আমিই দুই ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজাপথে প্রাইভেট রুমের দিকে পা বাড়ালাম।

সে ঘরেও একটি আলো জ্বলছিল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন জানি না মনটা যেন আমার হঠাৎ কেমন করে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সেই উঁচু ব্যাকৃওয়ালা বড আরামকেদারাটায, আজ রাত্রে বিদায়ের পূর্বে ঠিক যেমনটি সূর্যপ্রসাদকে এই দরজার দিকে পিছন করে উপবিষ্ট দেখে গিয়েছিলাম, তেমনই বসে আছেন তখনও।

তবে কি ঐ চেয়ারে বসে বসেই সূর্যপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছেন!

মাথার মাঝখানের টাকটা দেখা যাচ্ছে, আলোয় চক্‌চক করছে।

অন্যান্য সকলেই ইতিমধ্যে আমার পিছনে পিছনে ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

জমাট একটা হিম-স্তব্ধতা যেন ঘরটার মধ্যে।

দু পা আরও আমি এগিযে গেলাম।

এবং এগুবার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁডিযে গেলাম।

ভয়বিহ্বল দৃষ্টি তখন আমার সামনের দিকেই স্থিরনিবদ্ধ। সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ের কাছে ওটা কি চক্‌চক্ করছে সাদা মত?

কি? কি ওটা?

নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়েছিলাম। এবং সেই মুহূর্তেই একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার আমার গলা দিয়ে বের হয়ে এল বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই।

সকলেই তখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে একটা ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে। এবং বাঁটটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ ছোরার ফলাটাই বিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর মাংসল ঘাড়ে।

এ কি, দাদা—কি সর্বনাশ। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে রাধিকাপ্রসাদ দু হাতে চোখ ঢাকলেন।

হাউ হরিবল্! মেজর কৃষ্ণস্বামীর কণ্ঠে শোনা গেল, মার্ডার!

তারপরই যেন একটা মৃত্যুশীতল জমাট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে নেমে এল। কারও মুখেই আর কোন কথা নেই।

কয়েকটি নির্বাক্ মুহূর্ত।

তারপরই একটা শব্দ হতে দেখি, বলদেববাবু বোধ হয় ঐ ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ফেইণ্ট্ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে সামনের খালি চেয়ারটার উপর বসিয়ে দিলেন।

॥ সাত ॥

বিহ্বলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি।

কি ভয়াবহ, কি বীভৎস দৃশ্য।

এমনি করে সূর্যপ্রসাদকে কে হত্যা করল? এ যে শুধু আকস্মিকই নয়, অভাবনীয়ও। চিন্তারও অগোচর।

না, না—এ আমি দেখতে পারছি না আর, সহ্য করতে পারছি না। বলতে বলতে স্খলিতপদে রাধিকাপ্রসাদ পূর্ব দ্বারপথেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বলদেববাবু তখনও চেয়ারটার উপরে চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মেজরই বললেন, বিমল, সিংহকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

বিমলবাবু বলদেব সিংহকে হাত ধরে সযত্নে তুলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে এবারে রইলাম কেবল আমি, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও ভৃত্য আব্দুল। এবং চেয়ারের উপরে উপবিষ্টবস্থায় সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে ছোরাবিদ্ধ নিষ্প্রাণ দেহটা।

অখণ্ড একটা স্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে থমথম করছে।

সে যে কি একটা অসহনীয় পরিস্থিতি ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য নাভ দেখলাম প্রৌঢ় মেজর কৃষ্ণস্বামীর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিহ্বলতা মেজর কৃষ্ণস্বামীর দেখেছিলাম, তার যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তখন তাঁর কথায়বার্তায়।

অদ্ভুত শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে মেজর ডাকলেন, ডাক্তার সেন ?

চমকে সে ডাকে তাঁর দিকে তাকালাম।

উই মাস্ট ডু সামথিং নাও !

কি বললেন মেজর ?

বলছিলাম, পুলিসে একটা এক্ষুনি সংবাদ পাঠানো আমাদের কর্তব্য নয় কি ?

পুলিসে ?

হ্যাঁ। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি পুলিসে একটা ফোন করে আসি বলে আর দাঁড়ালেন না মেজর, ঘর থেকে শান্তপদে নিক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ফোনটা নীচের তলায়।

আব্দুলও মেজরের পিছনে পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে আমি একা।

সামনেই চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহ ও আমি।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় একসময় পায়ে পায়ে কেদারাটার খুব কাছে এগি গিয়েছিলাম। এবং এবারে আরও কাছ থেকে ছোরার বাঁটটার উপর নজর পড়তে যেন চমকে উঠলাম। সর্বনাশ! এ যে সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘরে চন্দনকাঠে বাক্সের মধ্যে মেজর কৃষ্ণস্বামীরই উপহার দেওয়া সুদৃশ্য হাতীর দাঁতের বাঁটওয়া সেই ম্যাকসিক্যান ছোরাটা।

কি ভয়ানক! সেই ছোরা বিঁধিয়েই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে!

কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুর কাজটা করল? আর কখনই বা করল? রাত সা দশটায় যখন এ ঘর ছেড়ে আমি যাই, তখনও তো উনি বেঁচে ছিলেন। তার প নিশ্চয়ই কেউ এসে ওঁকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কেন, কেন হত্যা করল ?

এ শুধু চিন্তারই অতীত নয়, অবিশ্বাস্য।

সত্যিই কি সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছেন? না, জেগে জেগে আমি দুঃস্বপ্ন দেখ মাত্র ?

এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে সূর্যপ্রসাদের সামনের দিকে আবার।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

মুখে একটা যন্ত্রণার যেন সুস্পষ্ট চিহ্ন।

হাত দুটি শ্লথ ভঙ্গিতে কোলের দুপাশে ঝুলছে।

হঠাৎ যেন গা-টা কেমন আমার ছমছম করে উঠল। এদিক-ওদিক তাকালা

ন হল বায়বীয় কিছুর একটা উপস্থিতি যেন আমার একেবারে পাশটিতেই। কে ন চাপা গলায় কথা বলে উঠল। আমার নাম ধরে যেন ডাকল, ডাক্তার সেন।

কে?

কি আশ্চর্য। জেগে জেগেই আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি!

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, অবিকল সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, াক্তার সেন!

চমকে সামনের দিকে তাকালাম।

দেখি ঘরে প্রবেশ করছেন মেজর কৃষ্ণস্বামী ও তাঁর পশ্চাতে বিভ্রান্তের মত মলেন্দু।

অমলেন্দু চক্রবর্তী।

লিলি কটেজে বছরখানেক হবে এসেছে। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়স হবে। াগাটে চেহারা। সূর্যপ্রসাদের দেশে একই গ্রামে বাড়ি অমলেন্দুর।

গরীব বিধবার ছেলে। মামাদের আশ্রয়েই মানুষ। কোনমতে আই. এ. পর্যন্ত আর লেখাপড়া চালাতে পারেনি। চাকরি-বাকরির কোন সুবিধা করতে না ের শেষ পর্যন্ত রাঁচিতে এসে সূর্যপ্রসাদকেই ধরেছিল একটা কিছু করে দেবার জন্য। প্রসাদ অমলেন্দুর কোন একটা ব্যবস্থা না করে দিতে পারলেও তাকে যেতে নি অন্যত্র। মনে পড়ে কথায় কথায় আমাকেই একদিন বলেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, লেটি বড ভাল হে ডাক্তার। যেমন অনেস্ট্ তেমনি পরিশ্রমী। তাই ওকে জের কাছেই রেখে দিয়েছি।

বৌদ্ধ যুগের উপর একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন সূর্যপ্রসাদ। অমলেন্দু তাঁকে সেই ধার ব্যাপারেই ইদানীং সাহায্য করত।

গুছিয়ে সব কপি করে দেওয়া, নোট করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই অমলেন্দু করত।

এক শত টাকা করে মাস মাস দিতেন অমলেন্দুকে সূর্যপ্রসাদ।

মেজরের পিছনে পিছনে অমলেন্দুও এসে ঘরে ঢুকল।

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ইতিমধ্যেই সে মেজরের মুখে সব শুনেছে।

ওদের পশ্চাতে দেখি আব্দুলও এসে দরজার গোড়াতে নিঃশব্দে দাঁড়াল আবার।

সহসা মেজরের প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম।

কতক্ষণ আগে ব্যাপারটা ঘটেছে বলে তোমার মনে হয় ডাক্তার?

কিছুই বুঝতে পারছি না আমি মেজর। সাড়ে দশটা নাগাদ এ ঘর থেকে আজ

রাত্রে যখন আমি বের হয়ে যাই, দরজার সামনেই আব্দুলের সঙ্গে আমার দেখা। আব্দু সে সময় ট্রেতে করে মিঃ গুপ্তের জন্য কফি নিয়ে এই ঘরেই আসছিল। মিঃ গুপ্ত আমা বাড়ির লোকদের বলতে বলে দিয়েছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ না বিরক্ত করে।

কেন ?

তা জানি না। বোধ হয় শরীর বা মন তেমন ভাল ছিল না।

সহসা ঐ সময় আব্দুল বললে, আপনার কথা শুনেই তো আমি চলে গিয়েছিল ডক্টর সাব্।

কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, মেজরই আবার বললেন, নিশ্চয় তারপর কেউ কেউ এ ঘরে এসেছিল।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে ! কিন্তু কে এসেছিল তারপর এ ঘরে ? বললাম আমি।

অকস্মাৎ ঐ সময় দরজার গোড়ায় বিমলের কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ সকলেই আম চমকে দরজার দিকে তাকালাম।

বিমলই ইতিমধ্যে কখন যে আবার দরজার গোড়ায় আব্দুলের পশ্চাতে এ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে, কেউ আমরা জানতেও পারিনি।

বিমল বললে, আমি একবার আজ রাত সাড়ে দশটার পর এ ঘরে জেঠামণি সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

আপনি এসেছিলেন ? প্রশ্ন করলেন মেজরই।

হ্যাঁ।

কেন ?

একটা জরুরী কথা ছিল জেঠামণির সঙ্গে আমার।

জরুরী কথা !

হ্যাঁ।

ও। তা রাত তখন কটা আন্দাজ হবে বলতে পারেন ?

হ্যাঁ, রাত সোয়া এগারটা হবে তখন। আর আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাব সময় আমাকেও তিনি বলেছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ আর না বিরক্ত করে।

আর কিছু বলেননি ? প্রশ্ন করলাম এবারে আমি।

হ্যাঁ, আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেববাবু চলে গিয়ে কিনা। কিন্তু আমি তখন বললাম যে তাঁরা যাননি, তখনো দাবা খেলছেন। কথা শুনে বললেন, এই ঠাণ্ডার মধ্যে যেন তাঁরা এত রাত্রে আর না ফিরে যা তাঁদের এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন।

ও। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাত সোয়া এগারটা পর্যন্ত মিঃ গুপ্ত জীবিতই ছিলেন. জর! বললাম আমিই কথাটা।

রাত সোয়া এগারটা তো বটেই। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্তও তিনি বোধ হয় জীবিতই ছিলেন। কথাটা বললেন এবারে আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে।

কি রকম? তাকালাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেজরের মুখের দিকে।

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদই হবে, আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ই সামনের ও-বারান্দা দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট আমি মিঃ গুপ্তর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।

আপনি তাঁর গলার স্বর শুনেছিলেন?

হ্যাঁ। কাকে যেন তিনি বেশ চড়া গলায় কি সব বলছিলেন। কথাগুলো অবিশ্যি স্পষ্ট আমি শুনতে পাইনি, তবে বাথরুমের জানলা-পথে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় এক একজন লোককে আমি খুব দ্রুত এ বাড়ির পিছনের বাগানে যে আউট-হাউসটা আছে, সেই দিকে যেতে দেখেছি—

কি বলছেন আপনি মেজর? প্রশ্নটা না করে আমি পারি না।

হ্যাঁ, তখন ব্যাপারটা বিশেষ কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এখন—

আশ্চর্য! অত রাত্রে কে বাড়ির পিছনের বাগানে গিয়েছিল আর কেনই বা সেই বাগানের মধ্যেকার আউট-হাউসের দিকে গিয়েছিল?

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বিশ্রী গোলমেলে মনে হয়।

বললাম, কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে কে আবার আউট-হাউসে যাবে আর কেনই বা যাবে—এটাই তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না মেজর!

কিন্তু কেউ যে গিয়েছিল সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না ডাক্তার।

তা পারে না। তবে—, বলে আমি আব্দুলের মুখের দিকে তাকালাম, আব্দুল!

ডক্টর সাব্—

আমি চলে যাবার পর কেউ কি তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? কারও আজ রাত্রে আসবার কোন কথা ছিল?

কেউ তো আসেনি। আব্দুল বললে।

অমলেন্দুবাবু, আপনি কিছু জানেন?

না।

হুঁ। তা হলে কেউ আসেনি তুমি ঠিক জান আব্দুল?

কি বলছেন ডক্টর সাব্, কেউ এ বাড়িতে এলে আমি জানতে পারতাম না? তা

ছাড়া আপনি তো জানেন, সদর দরজার পাশের ছোট ঘরটাতেই আমি থাকি আপনি চলে যাবার পর থেকে তো আমার ঘরেই আমি ছিলাম।

সত্যিই তো, কেউ এসে থাকলে আব্দুল নিশ্চয়ই জানত। মেজর বললেন।

কথাটা ঠিক তা নয় মেজর। বলে আমি আজ রাত্রে এ বাড়ি থেকে চলে যাবা সময় যে অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিল, সেই ঘটনাটা সংক্ষে বর্ণনা করলাম।

আই সি—তা হলে—

কিন্তু মেজরের কথা শেষ হলো না।

বাইরে ঐ সময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

এবং সকলেই আমরা সেই শব্দে যেন সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

॥ আট ॥

আমিই সর্বপ্রথম বললাম, একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল যেন!

বোধ হয় থানার ও. সি. ব্রিজনন্দন পাণ্ডে এলেন। মেজর বললেন।

মিঃ চক্রবর্তী, যান, দেখুন গিয়ে। বললাম আমি।

অমলেন্দু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত নয়। একটু পরেই জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে অমলেন্দ সঙ্গে থানা-অফিসার পাণ্ডে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

লোকটির সঙ্গে আমার কিছুটা পূর্ব-পরিচয় ছিল।

যেমন বেঁটে তেমনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটার গায়ের রঙ। তার উপরে আবার স প্যাকাটির মত চেহারা। চুপসে যাওয়া গাল। ওষ্ঠের উপর একজোড়া কাঁচায়-পাক মেশানো বিরাট গোঁফ। উলের একটা মাঙ্কি-ক্যাপ মাথায় থাকার দরুন গোঁফজোড়া একটু যেন বেশীই উদ্ধত দেখাচ্ছিল। পায়ে ভারী বুট, গায়ে কালো গরম গ্রেট কোট

লোকটার চেহারাটা যেমন কুৎসিত, তেমনি আচরণে দাম্ভিক এবং মেজাজটা রুক্ষ-কর্কশ।

কথাবার্তার মধ্যে একটা মুদ্রাদোষ আছে। অজস্রবার 'মারো গোলি' কথা ব্যবহার করেন।

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই রুক্ষ-কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ঠাণ্ডার রাত্রে এসব

ব্যাপার? মারো গোলি! আরে কিউ, ডক্টর সাব্—

হ্যাঁ, মিঃ পাণ্ডে—

মারো গোলি! লেকেন সাচ্‌মুচ্ কেয়া—

হ্যাঁ দেখুন না, এই যে—বলে ইঙ্গিতে মৃত সূর্যপ্রসাদকে দেখালাম।

এগিয়ে এসে এবারে স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখে পাণ্ডে বলে উঠলেন, মারো গোলি! এ যে দেখছি সত্যি-সত্যিই—

হ্যাঁ—

কিন্তু কি করে এ হলো? পাণ্ডেই আবার প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে আমিই তখন ব্যাপারটা বলে গেলাম।

শুনতে শুনতে পাণ্ডে তাঁর বিরাট গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। আমার বক্তব্য শেষ হতেই বললেন, কিন্তু সে যাই হোক, মারো গোলি, কেউ ঘরের মধ্যে আজ রাত্রে এখান থেকে আপনার চলে যাবার পর কোন এক সময়ে সকলের অজ্ঞাতে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। এবং সে-ই ওঁকে মার্ডার করে গিয়েছে।

সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বললেন মেজর।

মারো গোলি! কিন্তু আপনারা তো বলছেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, আপনারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন! তবে হত্যাকারী এ ঘরে ঢুকল কোন্ পথে?

কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পাণ্ডের চোখের তারা দুটো যেন সহসা আনন্দে নেচে উঠল। তিনি বললেন, মারো গোলি! সমঝ গিয়া, ওই খিড়কিপথে নিশ্চয়ই সে ঘরে ঢুকেছিল। বলে বাগানের দিককার খোলা জানলাটার প্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সত্যিই তো। জানলাটা যে খোলা, এতক্ষণ তো কারোরই নজরে পড়েনি। নিশ্চয়ই ঐ জানলাপথেই তো অনায়াসে কোন আততায়ী এই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে যেতে পারে।

সহসা ঐ সময় সেই খোলা জানলাপথে একঝলক শীতের মধ্যরাত্রির হিমকণাবাহী হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল আমার সর্বদেহে।

মারো গোলি! চলেন, চলেন—পাশের ঘরে চলেন ডক্টর সাব্! পাণ্ডে হঠাৎ বললেন।

অতঃপর সকলে আমরা পাশের ঘরে এলাম।

সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর।

মিঃ পাণ্ডের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল সকলেই এসে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ভৃত্যদের মধ্যে একমাত্র আব্দুল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিল বাইরের বারান্দায় ঐ ভিড়ের মধ্যে। এবং ঘরের মধ্যে রইলেন রাধিকাপ্রসাদ, মেজর কৃষ্ণস্বামী। বলদেব সিংহও তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন বলে তিনিও এলেন। এবং সুবল বিমল তারাও ঘরের মধ্যে রইল। আমি তো ছিলামই।

মিঃ পাণ্ডে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে বসলেন পুলিসী মর্যাদায় ও গাম্ভীর্য নিয়ে।

বাকি অন্যান্য সকলে আমরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েই রইলাম।

কথা বললেন প্রথমে মিঃ পাণ্ডেই. কেউ এসেছিল ঘরের মধ্যে ঐ জানলাপথেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর সেই লোকই মিঃ গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমরা সকলেই নিঃশব্দে মিঃ পাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পাণ্ডে আবার বলতে লাগলেন, আচ্ছা একটা কথা, এই ঘর বা ঘরের মধ্যে থেকে কোন কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়? রাধিকাবাবু অমলেন্দুবাবু, একবারটি সব পরীক্ষা করে দেখুন তো। আব্দুল তুমিও দেখ।

পাণ্ডের নির্দেশমত রাধিকাবাবু, আব্দুল ও অমলেন্দু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

মেজর ঐ সময় পাণ্ডেকে উদ্দেশ করে বললেন, মিঃ পাণ্ডে, আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা চুরি-ডাকাতির মত কিছু?

মারো গোলি! তা ছাড়া আর কি হতে পারে? এভাবে ঘাড়ের পিছনদিকে নিজের হাতে ছোরা বিঁধিয়ে নিশ্চয়ই কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন না! মিঃ গুপ্তকে হত্যা করেছে কেউ, আপনি কি বলেন ডক্টর সাব্?

কথাগুলো বলে পাণ্ডে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি কোন জবাবই দিলাম না।

মারো গোলি! ইট ইজ মার্ডার, রাইট এনাফ! মাথাটা দুলিয়ে গোঁফে ত দিয়ে পাণ্ডে আবার কথাটা বললেন।

ঐ সময় রাধিকাপ্রসাদ ও আব্দুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। রাধিকাপ্রসা বললেন, না মিঃ পাণ্ডে, ঘরের থেকে কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না যেখানকার যেটি তেমনিই আছে।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

তা হলে তো দেখা যাচ্ছে স্রেফ সূর্যকে হত্যা করবার জন্যই কেউ এ ঘরে এসেছিল আজ রাত্রে। মিঃ গুপ্তকে হত্যা করা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। কথাটা বললেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

তাই যদি হয় তো এ খুনের উদ্দেশ্য কী? বললাম আমি।

মারো গোলি! রাইট ইউ আর ডক্টর সেন—তা হলে কেন মিঃ গুপ্তকে হত্যা করা হল? বললেন পাণ্ডে।

ঐ সময় অমলেন্দু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তার হাতে খানকয়েক চিঠি।

ওগুলো কি অমলেন্দুবাবু? প্রশ্নটা করলেন মেজর।

এই চিঠিগুলো মিঃ গুপ্তর চেয়ারের নীচে পড়েছিল।

মারো গোলি, দেখি, দেখি—হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিলেন পাণ্ডে।

চিঠিগুলোর উপর নজর পড়তেই দেখলাম, আজ রাত্রে বিশেষ করে যে ব্লু রঙের এনভেলাপ থেকে ব্লু রঙের লেটার কাগজে লেখা চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ কিছুটা আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন, চিঠিগুলোর মধ্যে সেই বিশেষ চিঠিটি কিন্তু নেই।

মুখ দিয়ে সেই চিঠির কথাটা প্রায় আমার বের হয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে আমি আপাততঃ কথাটা চেপেই গেলাম। কারণ সে চিঠির কথা উঠলেই হয়তো আরও অনেক কথা এসে পড়বে।

কাজ কি আর সূর্যপ্রসাদের পারিবারিক কলঙ্ককে ঘাঁটিয়ে! তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভাল। বিশেষ করে বোবার শত্রু নেই।

পাণ্ডে চিঠিগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে সেগুলো নিজের পকেটেই রেখে দিলেন।

একটা কথা মিঃ পাণ্ডে –

মেজরের কথায় পাণ্ডে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, বলুন!

আপনি বলছেন, হত্যাকারী ঐ ঘরের জানলাপথেই ও-ঘরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু হাউ? দোতলায় ঘরের জানলাপথে এসে সেই আততায়ী কি করে তা হলে ঘরে ঢুকল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, জানলাটা আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল। বলতে বলতে পাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

বলা বাহুল্য আমরাও সকলে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আবার সেই ঘর।

জানলাটার পাল্লা দুটো বাইরের দিকে খোলা থাকলেও পদাটা টানা ছিল। হাত

দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে জানলাপথে পাণ্ডে বাইরের দিকে ঝুঁকে, পকেট থেকে একটা টর্চবাতি বের করে তার আলোয় পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

দেখা গেল জানলাটার ঠিক নীচেই গ্যারেজটা।

এবং ঢালু অ্যাসবেশটাসের ছাত।

অতএব অনায়াসেই সেই ছাত থেকে জানলার ঠিক নীচেই চওড়া কার্নিসের উপর উঠে এই ঘরে জানলাপথে প্রবেশ করাটা কারও পক্ষে এমন কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার একটা নয়।

পাণ্ডের হাতের টর্চের আলোয় আরও একটা অকাট্য প্রমাণও আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। কতকগুলো কাদামাখা রবার-সোল জুতোর ছাপ সেই গ্যারেজের ছাতে ও জানলার নীচে কার্নিসে তখনও সুস্পষ্ট রয়েছে।

ইউ সি ডক্টর সেন, জুতোর ঐ ছাপগুলো '

হ্যাঁ—

তা হলেই বুঝতে পারছেন, ধারণা আমার মিথ্যা নয়? সামবডি এই জানলা-পথেই এ ঘরে আজ রাত্রে এসে মিঃ গুপ্তকে ব্রুটালি মার্ডার করে গিয়েছে। পাণ্ডে বললেন।

হুঁ।

আর আমার মনে হয়, আজ এখান থেকে ফেরবার পথে গেটের সামনে যে লোকটির সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল, যে আপনাকে লিলি কটেজের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, এ নিশ্চয়ই সেই। এ তারই কাজ। পাণ্ডে বললেন।

আমি কোন জবাব দিলাম না পাণ্ডের কথায়।

আবার আমরা সকলে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম।

রাধিকাপ্রসাদ ঐ সময়ে বললেন, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না দারোগা সাহেব—

কি?

দাদার তো কেউ শত্রু ছিল বলে আমি জানি না। তা ছাড়া ঘরের কোন কিছু চুরিও যায়নি, তবে সেক্ষেত্রে কে এমনি করে দাদাকে হত্যা করে গেল?

মারো গোলি! সে সব কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে। আপাততঃ আমরা বুঝতে পারছি, ঐ জানলাপথে এসেই কেউ মিঃ গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে। আর হত্যা করেছে এও বুঝতে পারছি সেই লোকটিই, যার সঙ্গে আজ রাতে গেটের সামনে ডাঃ সেনের ধাক্কা লেগেছিল। তাকে ধরতে পারলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। আমি

তাকে ধরবই। কিন্তু রাত প্রায় দুটো হল। আজ চলি। আমি আবার কাল সকালে আসব।

পাণ্ডে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এবং যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দুজন পুলিস-প্রহরী লিলি কটেজে মোতায়েন রেখে আমি ও মিঃ পাণ্ডে সে রাতের মত লিলি কটেজ থেকে বের হয়ে এলাম।

চলুন ডাঃ সেন, আপনাকে আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

না, ধন্যবাদ—এ পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব।

হাতের কালো ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে আমি হাঁটা শুরু করলাম।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। পাণ্ডের গাড়ি চলে গেল আমার পাশ দিয়ে।

॥ নয় ॥

শয্যায় শোবার পর সে-রাত্রে ক্লান্ত দু'চোখের পাতায় কখন যে ঘুম নেমে এসেছিল টের পাই নি।

ঘুম ভাঙল মিতার ডাকে।

চোখ মেলে দেখি, হাতে এক কাপ চা নিয়ে শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। সন্থ স্নানের শেষে ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর ছড়ানো।

মিতার প্রিয় কেশতৈল কালিফোর্নিয়ান পপির মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। ডাকিসনি কেন রে?

চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে মিতা বললে, বিমলবাবু সেই কখন থেকে এসে তোমার জন্য যে বাইরের ঘরে বসে আছেন।

বিমলবাবু! হঠাৎ?

তা জানি না, দেখ গিয়ে।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলাম।

বিমলবাবু কি খবর, এই সকালে?

একটা চেয়ারের উপরে কেমন যেন নিঝুম হয়ে বসেছিলেন বিমলবাবু। চোখেমুখে একটা বেদনার বিষণ্ণ ক্লান্ত ছায়া।

আমার ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকালেন।

টিকতে পারলাম না বাড়িতে ডাঃ সেন। ব্যাপারটা যেন সত্যিই বিশ্বাস করতে

এখনও পারছি না। জেঠামণি নেই এ যেন ভাবতেও পারছি না এখনও। বলতে বলতে চোখ দুটো বিমলবাবুর ছলছল করে উঠল। গলার স্বরটা যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে এল।

চা খেয়েছেন ?

না।

বসুন, মিতাকে চা দিতে বলি।

না না—চায়ের কোন দরকার নেই ডাঃ সেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—

বলুন ?

মিতা দেবী বলছিলেন—

মিতা ! কি বলছিল সে ?

বিখ্যাত কে এক প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ নাকি এখানে আছেন ঐ 'সানি ভিলায়'—

কিরীটীবাবুর কথা বলছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—উনি বলছিলেন, তাঁর সাহায্য নিলে নাকি অনায়াসেই তিনি জেঠামণির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারবেন।

তা পারবেন কিনা জানি না। তবে ভদ্রলোক শুনেছি খুব নামকরা একজন ডিটেক্‌টিভ। এবং অনেক বড় বড় জটিল হত্যারহস্যের মীমাংসাও করেছেন। কিন্তু—

না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই থাকতে পারে না ডাঃ সেন। জেঠামণির এইভাবে মৃত্যু, মিঃ পাণ্ডের দ্বারা কতদূর কি সম্ভব হবে জানি না। কিন্তু সমর যখন নিরুদ্দিষ্ট তখন আমাদেরও তো একটা কর্তব্য বলে জিনিস আছে তাঁর প্রতি !

তা নিশ্চয় আছে। তবে—

একটা কথা গত রাত থেকেই কি আমার মনে হচ্ছে, জানেন ডাঃ সেন ?

কি ?

শেষ পর্যন্ত আমিই জেঠামণিকে শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছিলাম। এক্ষেত্রে কেউ মুখে না বললেও বা প্রকাশ না করলেও, আমার উপরে একটা সন্দেহ হওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়।

কি বলছেন আপনি বিমলবাবু ?

হ্যাঁ,ডাক্তার সেন,আপনি কাল রাত্রে লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না,কিন্তু সোয়া বা সাড়ে এগারোটার সময় আমি জেঠামণির ঘরে গিয়েছিলাম কথাটা শোনার পরই মেজর কৃষ্ণস্বামীর চোখেমুখে ও মিঃ পাণ্ডের চোখে যে ভাবটা আমি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সেই কথাটাই আমি বাকি রাতটুকু শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

মনে হচ্ছিল, আপনি, আপনিও কি তাঁদেরই মত—

ছিঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ বিমলবাবু।

না না—ডাক্তার সেন। ভগবান জানেন, জেঠামণির দেহ কাল রাত্রে আমি স্পর্শও করিনি। কিন্তু এ সন্দেহের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব না, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণিত হচ্ছে যে সত্যি সত্যি অন্য কেউ—

কথাটা অবিশ্যি আপনি একেবারে মিথ্যে বলেননি বিমলবাব, তবু আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

পুলিস এ ব্যাপারে যেমন অনুসন্ধান করতে চায় করুক। কিরীটীবাবুকে এ ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনাটা বোধ হয় বিবেচনার কাজ হবে না।

কেন? কেন আপনি এ কথা বলছেন ডাঃ সেন?

ধরুন কিরীটী রায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে হাত দিলে যদি এমন কোন আপনাদের পারিবারিক কলঙ্কই শেষ পর্যন্ত বের হয়ে পড়ে, তখন আপনারা সকলেই কি—

তা হোক। তবু-তবু এর একটা মীমাংসা আমার দিক থেকে আমি চাই-ই। আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না ডাক্তার সেন।

তবে আর কি বলব বলুন।

আপনার তো শুনলাম কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, চলুন না একবার তাঁর কাছে যাই—

বেশ। কিন্তু আপনার বাবার একটা মতামতের তো প্রয়োজন আছে।

তা আছে অবশ্যই। তবে আমি জানি, বাবা নিশ্চয়ই এতে অমত করবেন না।

তবু আপনি কিরীটীবাবুর কাছে যাবার আগে রাধিকাবাবুকে একটা ফোন করে নিলে পারতেন—

বেশ তাই করছি।

অতঃপর আমার বাড়ি থেকেই ফোনে বিমলবাবু তাঁর বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাকে বললেন, চলুন ডাঃ সেন, বাবা মত দিয়েছেন।

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ, এখুনি যাব—চলুন।

বেশ চলুন।

আমাদের বাড়ি থেকে 'সানি ভিলা'র দূরত্ব সামান্যই।

কিরীটীবাবু বাইরের বারান্দায় রোদের মধ্যে একটা বেতের চেয়ারে বসে কি একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন, ডাঃ সেন। তারপর সকাল বেলাতেই, কি খবর?

বিমলবাবুর পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে তখন আমাদের আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই সহসা মনে হল যেন কিরীটীবাবুর চোখের তারা দুটো সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে ক্ষণেকের জন্য কি এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চক্‌চক করে উঠল।

এবং পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে কিরীটীবাবু চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, সে কি!

হ্যাঁ, আর বিমলবাবু তাই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছেন যদি আপনি অনুগ্রহ করে ওঁর জেঠামশায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটার মীমাংসা করে দেবার ভারটা নেন।

আমার কথা শুনে কিরীটীবাবু কযেক মুহূর্ত কোন কথাই বললেন না। নিঃশব্দে বসে রইলেন যেমন ছিলেন।

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে কিরীটীবাবু কথা বললেন, কিন্তু একমাত্র যে কারণটি বললেন মিঃ গুপ্ত, সেই কারণেই কি আপনি আমার সাহায্যের জন্য ডাক্তার সেনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছেন? না আপনার মতে জেঠামণির একমাত্র পুত্র, নিরুদ্দিষ্ট সমরবাবুর উপরেও পুলিসের সন্দেহ পড়তে পারে সেই জন্যই—

আশ্চর্য! আশ্চর্য! আপনি ঠিক—ঠিক ধরেছেন মিঃ রায়। বিমলবাবু বললেন, সমর আমার সমবয়সী এবং জেঠতুতো ভাই-ই কেবল নয়, সে আমার সত্যিকারের বন্ধু ও সুহৃদ। আর ডাঃ সেনের চাইতে তাকে আমি ঢের বেশী চিনি।

এ কথা কেন বলছেন? আমিই বিমলবাবুকে প্রশ্নটা করলাম।

কেন যে কথাটা বলছি আপনার বোঝা উচিত ছিল ডাঃ সেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিমলবাবু প্রত্যুত্তর দিলেন।

না, বিমলবাবু, আপনি ভুল করেছেন। সমরবাবুর কথা মুহূর্তের জন্যও আমার মনে হয়নি।

তাই যদি না হবে তো কেন আপনি কাল অত রাত্রে আমাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন ডাঃ সেন?

বিমলবাবুর কথায় মুহূর্তকাল আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। চেয়ে দেখলাম কিরীটীও নির্বাক বসে আমাদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আপনি তা হলে গতরাত্রে আমাকে অনুসরণ করেছিলেন বিমলবাবু?

না।

তবে আপনি জানলেন কি করে যে, কাল রাত্রে আমি 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলাম?

আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

কেন বলুন তো ?

কথাটা তা হলে আপনাকে খুলেই বলি মিঃ রায়, কাল সন্ধ্যাবেলাতেই বাজার থেকে ফেরবার পথে আমার যেন মনে হয়েছিল সমরকে 'তাজ' হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে কাজ থাকায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়েছিল বলে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে পারিনি সে সময়। কিন্তু গতরাত্রের ব্যাপারের পর আজ ভোরে উঠেই 'তাজ' হোটেলে না গিয়েও আমি পারিনি।

সহসা ঐ সময় কিরীটী রায় প্রশ্ন করলেন, সমরবাবুর সঙ্গে দেখা হল ?

না মিঃ রায়। তবে দেখা তার না পেলেও সমর যে গত দুদিন 'তাজ' হোটেলেই ঘর ভাড়া করে ছিল সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি।

কিসে নিঃসন্দেহ হলেন বিমলবাবু ? প্রশ্ন করলে আবার কিরীটীই।

হোটেলের রেজিস্টারে তার নাম রয়েছে। আর সেইখানকার চাকরদের মুখেই শুনলাম, কাল রাত্রে ডাঃ সেন সেখানে গিয়েছিলেন।

বাধা দিলেন এবারে কিরীটীই। বললেন, ডাঃ সেনের কথা থাক্। সমরবাবুর কথাটাই আগে শেষ করুন বিমলবাবু।

কাল রাত নটার পর সমর হোটেল থেকে সেই যে কোথায় চলে গিয়েছে আর সে ফিরে আসেনি।

হুঁ। তার জিনিসপত্র কিছু ছিল না হোটেলে ?

হ্যাঁ, একটা সুটকেস ও একপ্রস্থ জামাকাপড় সে হোটেলেই ফেলে রেখে গিয়েছে।

হুঁ। বলে কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাঃ সেন, আপনি তা হলে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, অফকোর্স ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—

নিশ্চয় না। বিমলবাবু ঠিকই ধরেছেন। সমরকে আমি খুব ভাল করেই জানি মিঃ রায়। এবং সে জুয়া খেললেও এবং বাপের নাম জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিলেও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, সে তার বাপকে ঐভাবে নিষ্ঠুরের মত হত্যা করতে পারে। তবে এটা ঠিকই, সমরের উপরে পুলিসের সন্দেহ জাগতে পারে ভেবেই আমি গিয়েছিলাম তাকে আপাততঃ গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্য কিছুদিন বলতে।

আই সি। তা হলে আপনি জানতেন যে সমরবাবু 'তাজ' হোটেলেই ছিলেন ?

হ্যাঁ। মিতার মুখে কথাটা শুনে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে সে 'তাজ' হোটেলেই আত্মগোপন করে আছে।

কিন্তু ডাঃ সেন, আমি যদি বলি ঠিক ঐ কারণেই কাল অত রাত্রে আপনি 'তাজ' হোটেলে যাননি?

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! তবে আমি কি জন্য গিয়েছিলাম বলে আপনার ধারণা?

আপনি মনে মনে চেয়েছিলেন যে সমর যেন কাল সারারাত হোটেলেই থাকে। আর সেই জন্যই আপনি গিয়েছিলেন কাল অত রাত্রে হোটেলে। হ্যাঁ, তবে এও ঠিক সমরবাবু এইভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ায় স্বভাবতই পুলিস তাঁকে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবেই। এবং বর্তমানে তার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পোজিসন যে অত্যন্ত সন্দেহজনক সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু যাক সে-কথা। বিমলবাবু, আমি আপনার জেঠামণির হত্যারহস্যের ব্যাপারে সত্যিই একটু ইণ্টারেস্টেড ফিল করছি

আপনি তা হলে কেসটা হাতে নিন মিঃ রায়। বিমলবাবু বললেন।

নিয়েছি। চলুন একবার অকুস্থানটা দেখে আসি।

চলুন।

সকলে তখুনি আমরা 'লিলি কটেজে'র উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম।

॥ দশ ॥

আমরা সকলে গিয়ে যখন 'লিলি কটেজে' উপস্থিত হলাম, মিঃ পাণ্ডে তার আগে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

আমিই কিরীটী রায়ের সঙ্গে মিঃ পাণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিলাম ও তাঁর আসা উদ্দেশ্যটাও ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু পাণ্ডের চোখমুখের ভাব দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, ব্যাপারটা তাঁর বিশে মনঃপূত হয়নি। তবে কথায় সেরকম কিছু প্রকাশ না করে কেবল বললেন, বেশ তো বেশ তো, অত্যন্ত আনন্দের কথা।

কিরীটীও জবাব দিলেন, বর্তমান কেসের ইনভেসটিগেশনের ব্যাপারে আমি অংশ গ্রহণ করলেও আমি কিন্তু আপনার পিছনেই থাকতে চাই মিঃ পাণ্ডে। আপনিই আসল, আমি শুধু আপনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করব।

বুঝলাম সুচতুর কিরীটী রায় একটি চালেই পাণ্ডেকে মাত করে দিলেন। পাণ্

কিরীটীর কথায় বিশেষ খুশী হয়ে বললেন, বিলক্ষণ, আপনার নাম যে আমার অজানা তা তো নয় মিঃ রায়। জানি বৈকি আপনিও গুণী ব্যক্তি।

না না—আপনাদের বাদ দিয়ে আমাদের কতটুকুই বা ক্ষমতা! আপনারা নেহাৎ সাহায্য করেন বলেই না—

মারো গোলি!

সকলে হেসে উঠলেন।

কিরীটী অতঃপর বললে, ডাঃ সেন ও বিমলবাবুর মুখে অবিশ্যি ইতিপূর্বেই কিছুটা শুনেছি, তা হলেও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামতটাই সর্বাগ্রে আমি জানতে চাই মিঃ পাণ্ডে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—বলে পাণ্ডে সোৎসাহে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেলেন।

সব শোনার পর কিরীটী বললে, ডাঃ সেনের কথায় ও আপনার কথায় তা হলে বোঝা যাচ্ছে মিঃ পাণ্ডে, কাল রাত্রে আব্দুলের মুভমেণ্ট সত্যিই একটু সন্দেহজনক ছিল, কি বলেন!

আপনিই বলুন না মিঃ রায়, তাই নয় কি?

কিরীটী তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে, ভাল কথা, সমরবাবু সম্পর্কে আপনার কি ওপিনিয়ন মিঃ পাণ্ডে?

কিরীটীর দ্বিতীয় প্রশ্নে এবারে দেখলাম মিঃ পাণ্ডে যেন অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলেন। এবং বেশ সানন্দের সঙ্গেই বললেন, ম্যায দেখতাহুঁ কি আপ সাচ্চা জহুরী হ্যায! ইয়ে ভি বহুৎ খুশীকি বাত হ্যায় যে আপকো মাফিক হুঁশিয়ার ব্যক্তিকে সাথ মুঝে কাম করনেকো মৌকা মিলা। সত্যিই বলেছেন মিঃ রায়, সবার আগে আমাদের সমরেরই খোঁজ করতে হবে।

কিন্তু মিঃ পাণ্ডে, হঠাৎ বিমলবাবু বলে উঠলেন বাধা দিয়ে, আপনার একটু ভুল হচ্ছে না কি?

ভুল!

হ্যাঁ, আমি হলপ করে বলতে পারি, সমর এ কাজ করতে পারে না।

কে যে কি পারে আর কে যে কি পারে না আপনি যদি জানতেন বিমলবাবু—হাসতে হাসতে পাণ্ডে জবাব দিলেন।

এবারে কথা বললাম আমিই, কিন্তু সমরকে সন্দেহ করার ব্যাপারে আপনার নিশ্চয় যুক্তি আছে কিছু মিঃ পাণ্ডে!

যুক্তি? নিশ্চয়ই। যুক্তি আছে বৈকি। হুটপাট করে আমরা পুলিস অফিসাররা

কখনও কোন কাজ করি না ডাক্তার সাব্ ?

তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু—

প্রথমতঃ ধরুন, আমরা সকলেই জেনেছি তার স্বভাবচরিত্র আদৌ ভাল ছিল না জুয়োতে সে অভ্যস্ত ছিল। এবং মাত্র কিছুদিন আগে সে তার বাবার সই জাল ক ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলেছিল। যার ফলে সে কিছুদিন থেকে অ্যাবসকণ্ড ক বেড়াচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ বদ অভ্যাসের জন্য বরাবরই তার একটা অর্থাভাব ছি তৃতীয়তঃ সে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে ছিল।ফোর্থ পয়েণ্ট হচ্ছে, যতদিন তার ব সূর্যপ্রসাদবাবু বেঁচে থাকতেন তার পক্ষে এ বাড়ির দরজা ততদিন বন্ধই থাকত।···

কিন্তু—, বাধা দেবার চেষ্টা করলেন আবার বিমলবাবু।

শুনুন, লেট্ মি ফিনিশ! সই জাল করার ব্যাপারেই আলাপপ্রসঙ্গে মাত্র ক দিন পূর্বেই আমি সূর্যপ্রসাদবাবুর মুখেই শুনেছিলাম ছেলের উপরে তিনি এতখানি বি হয়েছিলেন যে, তার আর মুখদর্শনও করবেন না কোনদিন বলেছিলেন। শুধু তাই এ কথাও বলেছিলেন তিনি, তাঁর সম্পত্তির একটি কপর্দকও ছেলেকে দেবেন ন তারপর আমার ষষ্ঠ যুক্তি হচ্ছে, গতরাত্রে সাড়ে নটার পরে সেই যে সে 'তাজ' হো থেকে বের হয়ে যায়, তারপর আর সে এখন পর্যন্ত সেখানে ফেরেনি। সপ্তম প আমাদেরই একজন কনেস্টবল তাকে গতরাত্রে সাড়ে দশটা থেকে এগারটার ম স্টেশন রোডে ঘুরতে দেখেছে।শুধু তাই নয়, আমার সর্বশেষ যুক্তি—যেটি অত্যন্ত গু পূর্ণ, সেটা হচ্ছে আজ নিজে আমি সকালে 'তাজ' হোটেলে কনেস্টবলটির মুখে সম সংবাদ পাবার পর তার অনুসন্ধানে গিয়ে তার ঘরে কি পেয়েছি জানেন বিমলবাবু

কি ?

রবার-সোল দেওয়া একজোড়া নয়, দুজোড়া একই প্যাটার্নের জুতো···

জুতো ?

হ্যাঁ, আর সেই জুতোর একজোড়ার সোলে এখনও কাদা লেগে আছে। এবং জুতোর ছাপের সঙ্গে লিলি কটেজের ঘরের জানলার কার্নিসে ও গ্যারেজের ছা জুতোর ছাপের হুবহু মিলও পেয়েছি।

ঝড়ের মত একটানা একটার পর একটা একগাদা যুক্তি এমন ভাবে কণ্ঠে দিয়ে পাণ্ডে বলে গেলেন যে, আমরা সকলেই যেন কয়েকটা মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থা

এর পরও কি বিমলবাবু আপনি বলবেন, সমরবাবু সন্দেহের বাইরে! নো নে আই অ্যাম ডেফিনিট—এ আর কারো কাজ নয়। সমরবাবুই—

না না—তবু, তবু বলব মিঃ পাণ্ডে, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

বেশ তো। তার জন্য আপনি ব্যস্তই বা হচ্ছেন কেন বিমলবাবু? আদালত না প্রমাণে তো আর কিছু তাকে শাস্তি দেবে না। ব্যাপারটা আদালতই বিচার রে দেখবে। কিন্তু যাক ওসব কথা। আমি এখুনি গিয়ে থানা থেকে ঠেলাগাড়ি াঠিয়ে দিচ্ছি, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাবার জন্য।

পাণ্ডে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

আপনি চলে যাচ্ছেন মিঃ পাণ্ডে? প্রশ্ন করলে কিরীটী।

হ্যাঁ মিঃ রায়। কেসটার একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।

সন্ধ্যার দিকে যদি আপনার ওদিকে যাই তো দেখা হবে?

নিশ্চয়ই আসবেন।

মিঃ পাণ্ডে অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা পাষাণ-ব্ধতা নেমে এল।

সকলেই বোবার মত দাঁড়িয়ে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললে প্রথম কিরীটীবাবুই।

ডাকলে মৃদুকণ্ঠে, ডাঃ সেন!

বলুন।

মৃতদেহ যে ঘরে আছে একবার চলুন সেই ঘরটা দেখব।

আসুন—

অনেকগুলো যুক্তি সহযোগে মিঃ পাণ্ডে বেশ জোর গলায় সমরই যে তার পিতার র ব্যাপারে সুনিশ্চিত সন্দেহে চিহ্নিত, কথাটা বলে যাবার পর থেকে মনটা সত্যিই কেন আমার বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। বাড়ির অন্যান্য সকলেও যেন মনে হল ান নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, মিঃ পাণ্ডের কথাগুলো যেন কিরীটী রায়ের মনে এতটুকু াও কাটতে পারেনি। কোন পরিবর্তন, কোনরূপ ভাববৈলক্ষ্যণই যেন কিরীটীর খেমুখে দেখতে পেলাম না।

তিনি যেন একান্ত নির্বিকার।

নিঃশব্দে কিরীটীবাবুকে নিয়ে আমি ও বিমলবাবু মৃতদেহ যে ঘরে ছিল সেই ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

লক্ষ্য করলাম, কিরীটী দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়েই একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের

যাবতীয় সব কিছুর উপরই চোখ বুলিয়ে নিলে।

শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বললেই ভুল হবে, যেন ছুরির ফলার মতই দুটি চোখের তারা তা ঝক্-ঝক্ করছিল সে সময়।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কিরীটী একসময় মৃতদেহের সামনাসামনি একেবারে এসে দাঁড়াল।

মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতিও হয়নি।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম কাল রাত্রে যেন তেমনটিই আছে।

মনে হল সূর্যপ্রসাদ যেন তখনও জীবিত। চেয়ারের উপরে তাঁর চিরাচরি অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই বসে আছেন যেন চোখ দুটি বুজে।

ডাঃ সেন।

হঠাৎ কিরীটীর ডাকে চমকে তার মুখের দিকে তাকালাম।

একবার ভাল করে সব দিকে চেয়ে দেখুন তো, কাল রাত্রে এ ঘরের মধ্যে প্রবে করে ঠিক যে যে জিনিস যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনটিই আছে তো?

কিরীটীর নির্দেশে চারদিকে একটিবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, তাই তো ম হচ্ছে।

খুব ভাল করে দেখে বলুন। বিমলবাবু আপনিও দেখে বলুন। কিরীটী আ বললে।

হ্যাঁ, অ্যাজ ইট ইজ আছে বলেই তো মনে হচ্ছে মিঃ রায়। আমিও বলল এবারে।

বিমলবাবু।

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

আব্দুলকে একবারটি ডাকুন তো বিমলবাবু।

তখনি আব্দুলকে ডেকে আনা হল। এবং আব্দুলকেও কিরীটী একই প্রশ্ন করে

আব্দুল কিন্তু চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে বাবু, ঐ চেয়ারটা, মানে যেটার উপর এখনও বাবু বসে আছেন, ওটা যেন ঠিক ঐ জায় ছিল না বলেই মনে হচ্ছে।

কি রকম?

আজ্ঞে, মনে হচ্ছে চেয়ারটা যেন সে সময় দেখেছিলাম ঐ দেওয়ালের দিকে এ একটু ঘেঁষে ছিল।

কি রকম ছিল দেখাও তো!

আব্দুল তখন মৃতদেহ সমেতই চেয়ারটা সামান্য ঠেলে দিল এবং তার নীচে চাকা
ানো থাকায় নিঃশব্দে কার্পেটের উপর দিয়ে চেয়ারটা সরে গিয়ে প্রায় দু' ফুট
ওয়াল বরাবর গিয়ে দাঁড়াল, যাতে করে চেয়ারটা সেই ঘরে বন্ধ দরজার ঠিক
খামুখি একই লাইনে হয়ে গেল।

কাল রাত্রে চেয়ারটা এইখানেই ছিল প্রথমে যখন এ ঘরে এসে ঢুকেছিলাম।
াব্দুল বললে।

আই সি! চেয়ারটা তা হলে সরাল কে? চেয়ারটার পোজিশন দেখেই
বিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল কেউ নিশ্চয় চেয়ারটা সরিয়েছে!

কি বলছেন মিঃ রায়? প্রশ্নটা আমিই করলাম।

এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম ডাঃ সেন যে, চেয়ারটা একটু আগে যেভাবে ছিল,
াধারণতঃ কেউ সেভাবে ঘরের দিকে পিছন করে দরজার মুখোমুখি বসবে না। কিন্তু
থা হচ্ছে, তা হলে কে চেয়ারটাকে ঐভাবে সরিয়ে রাখল? আব্দুল, তুমি?

আজ্ঞে না তো বাবু!

আপনি, ডাঃ সেন?

না।

একটা কথা বলব বাবু—আব্দুল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

বল।

আজ্ঞে আমার মনে পড়ছে, পুলিসের সঙ্গে গতরাত্রে দ্বিতীয়বার যখন এই ঘরে
সে ঢুকি তখনই যেন চেয়ারটা একটু আগে যেমন ছিল তেমনি সরানো
দখেছিলাম। কিন্তু তখন কিছুই নয় ভেবে অতটা নজর দিইনি।

কিন্তু সামান্যতম ঐ ব্যাপারের এমন কোন গুরুত্ব আছে কি মিঃ রায়? বললাম
ামি।

কিরীটী মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকালে।

ডাঃ সেন, আপনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। রোগীর দেহের কোন রোগকে
আবিষ্কার করবার জন্য যখন ইনভেস্টিগেশন করেন, তখন যেমন সামান্যতম ব্যাপারের
াধ্যেও বিশেষত্ব থাকে বলে আপনাদের ধারণা, আমাদের ক্রাইমের ইনভেস্টিগেশনের
্যাপারেও ঠিক তেমনি আমরা তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম কিছুই যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়
সেদিকে সতর্ক থাকি। থাকতে হয় সর্বদা।

আব্দুল যে মিথ্যা বলবে মিঃ রায়, তা আমি অবিশ্যি বলছি না। তবে ওর ধারণা
া দেখবার ভুলও তো হতে পারে! বললাম আমি।

কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি ভুল দেখিনি। আব্দুল প্রতিবাদ জানাল।

'অদ্ভুত দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করলে, না আব্দুল, আ বুঝতে পারছি তুমি ভুল করোনি। মিথ্যাও বলোনি। আচ্ছা এবারে তুমি যে পার। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী বললে, চলুন ডাঃ সে পাশের ঘরে গিয়েই কথাবার্তা বলা যাক। আপাততঃ এ ঘরে যা দেখবার ছি আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

॥ এগারো ॥

সকলে আমরা আবার সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

বসুন ডাঃ সেন—বলে কিরীটী নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সর্বাগ্রে উপবেশ করল। পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বের করে একটা সিগার নিয়ে তাতে অ সংযোগ করতে করতে মৃদু কণ্ঠে বললে, চেয়ারটার ব্যাপারটা আপনি সামান্য ও তু বলে ইগ্‌নোর করতে চাইলেন ডাঃ সেন, কিন্তু কি জানেন, ঐ ধরনের ঘটনার আ বা পরে যা কিছু অকুস্থানে থাকে বা যাঁরা সেখানে থাকেন তা সে জড়বস্তুই কিছু হো বা জীবিত কোন প্রাণীই হোক, সেই জড়বস্তুর বা জীবিত প্রাণীর প্রত্যেকেরই কিছু কিছু গোপনীয় থাকে বা সেই সব জড়বস্তু কিছু না কিছু indicate করে, এ ধরনে ব্যাপারে আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

তা হলে তো আমারও কিছু গোপনীয় আছে বলুন এ ব্যাপারে মিঃ রায়?

কিরীটী হেসে ফেলল এবং হাসতে হাসতেই বললে, তা আছে বৈকি, থাকাটাই তো অস্বাভাবিক।

তা হলে অনুমানও নিশ্চয়ই সেটা আপনি করেছেন মিঃ রায়?

তা করি নি বললে মিথ্যাই বলা হবে ডাক্তার সেন।

যদি কিছু মনে না করেন তো কথাটা—

এই ধরুন না কেন, সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সম্পর্কে আমার ধারণা, অনে কিছুই আপনি হয়তো জানেন যা সব আমাকে এখনও বলেননি বা বলতে চান বলে গোপন করে যাচ্ছেন।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় সহসা বুঝতে পারি আমার চোখেমুখে একটা বিব্র ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিরীটী সেটা বোধ হয় লক্ষ্য করেই বলে ওঠে, না

ক্তার সেন, আমার কথায় আপনার লজ্জিত বা বিব্রত হবার কিছু নেই।

মিঃ রায়!

হ্যাঁ, যতটুকু আপনি আমাকে বলেছেন তার বেশী কিছুই আমি জানতে চাই না। নিড্ নট্ বি ওরিড্, যা জানবার আমি ঠিকই জেনে নেব। যাক সে কথা। আচ্ছা বদুল, কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আব্দুল এক সময় এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বলল, বলুন?

কাল রাত্রে প্রথম যখন তুমি তোমার বাবুর ঘরে ঢোক, ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটা নও জ্বলছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আর ফায়ার-প্লেস মানে ঘরের চুল্লিটা—সেটা তখনও বেশ ভাল ভাবেই জ্বলছিল, নিভু-নিভু হয়ে এসেছিল, মনে আছে তোমার?

আজ্ঞে ঠিক মনে নেই বাবু।

হুঁ।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য যেন নিশ্চুপ হয়ে কি ভাবে। তারপর আবার সময় বলে, ডাক্তার, আপনি আবার এখুনি হয়তো মৃদু হেসে বলবেন, এটাও তুচ্ছ পার একটা!

না না—সে কি?

ঘরের ঐ চেয়ারটার মত ফায়ার-প্লেসের ব্যাপারটাও কেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ রল জানেন?

কেন?

মনে আছে বোধ হয় আপনার, রাত সাড়ে দশটার সময় যখন আপনি ঐ ঘর কে চলে যান, আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন, ঐ ঘরের বাগানের দিককার নলাটা ছিল বন্ধ এবং ঘরের দ্বিতীয় দরজাটা ছিল খোলা। কারণ ঐ দরজা-থেই ঘর থেকে আপনি বের হয়ে গিয়েছিলেন। তাই নয় কি ডাক্তার?

হ্যাঁ।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আপনারা সকলে এ ঘরের দরজা ভেঙে যখন আবার গিয়ে শের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন কিন্তু ছিল ঠিক উল্টোটি ··

তার মানে?

মানে দরজাটা ছিল বন্ধ এবং জানলাটা ছিল খোলা। তাই তো?

হুঁ।

তা হলেই দেখুন, স্বভাবতঃ একটা কথা মনে জাগতে পারে আমাদের, এমনা কেন হল? দরজাটাই বা বন্ধ কেন এবং জানলাটাই বা খোলা কেন?

তা—

তা হলেই দেখুন, নিশ্চয়ই কেউ জানলাটা খুলে দিয়েছিল ও দরজাটা বন্ধ কা দিয়েছিল, রাত সাড়ে দশটার পর থেকে রাত বারোটায় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয় এই সময়টুকুর মধ্যেই কোন এক সময়। অবিশ্যি সেটা সূর্যপ্রসাদ নিজেওকরতে পারে

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ ঘরের মধ্যে একা ছিলেন। এবং তাঁর পক্ষে জানলাটা কে এক সময় খুলে দেওয়াটা আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়। তা ছাড়া দুটো কার জানলাটা তিনি খুলতে পারেন। প্রথমতঃ চুল্লির আগুনে ঘরটা হয়তো খুব গ হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁকে জানলাটা খুলতে হয়েছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনা এক্ষে থাকতে পারে না বলেই আমার ধারণা—

কেন? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কারণ কাল রাত্রে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হওয়ায় ও হাওয়া থাকায় শীতটা একটু বেশী পড়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর মত একজন বৃদ্ধ জানলা খুলেছেন মনে হয় না। আ দ্বিতীয়তঃ জানলা খুলে সকলের অলক্ষ্যে হয়তো তিনি এমন কোন আগন্তুককেঐ ঘ ঢুকিয়েছিলেন, যে হয়তো তাঁর খুবই পরিচিত ছিল। এবং পরে সেই আগন্তুক ঘ থেকে চলে যাবার পর হয়ত জানলাটা আর বন্ধ করবার অবকাশই ঘটেনি।

সত্যি! এ দিকটা তো একটিবারও আমার মনে আসেনি মিঃ রায়। অথচ হা সিমপ্‌ল ইট্‌ ওয়াজ।

তাই তো বলছিলাম ডাক্তার সেন, যত কঠিন মিস্ট্রিই হোক,তার আগের ওপর ঘটনাগুলোকে যদি পর পর ঠিকমত সাজানো যায়,সে মিস্ট্রিকেও আয়ত্তের মধ্যে আ যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখা যাক, কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় মেজর ক স্বামী যে শুনেছিলেন, সূর্যপ্রসাদের ঘরের মধ্যে কার সঙ্গে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে ব বলছিলেন, সে কার সঙ্গে? তবে কি এ সেই ব্যক্তি, যেঐ জানলাপথে ঘরে ঢুকেছিল

তারপর একটু যেন থেমেই আবার কিরীটী বলতে লাগল, যদিচ রাত সাড়ে দশট পর অর্থাৎ ডাক্তার সেন সূর্যপ্রসাদকে জীবিত দেখে যাবার পরও বিমলবাবু তাঁর জে মণির ঘরে গিয়ে তাঁকে জীবিতই দেখেছিলেন, তথাপি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা রাত্রির বিশেষ সেই মিস্টিরিয়াস আগন্তুক সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারছি ততক্ষণ রহস্যের মীমাংসা অবিশ্যিই হতে পারে না। কেননা এমনও তো হতে পারে যে,

মিষ্টিরিয়াস আগন্তুক সূর্যপ্রসাদেরই পূর্ব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট মত তাঁর সঙ্গে ঐ জানলা-পথেই গোপনে অত রাত্রে দেখা করতে এসেছিল। এবং সে কারণেই হয়তো সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে কেউ যাতে আর না তাঁকে বিরক্ত করে সেকথা একবার ডাক্তার সেন ও একবার বিমলবাবুকে বলেছিলেন, পাছে সেই আগন্তুকের আইডেনটিটি প্রকাশ হয়ে যায় সেই ভয়ে। তারপর হয়তো সেই আগন্তুক এসে সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর কোন এক সময় খুনী. যে সম্পূর্ণ অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি, ঐ জানলাপথে এসে ঘরে ঢুকে তার কাজ হাসিল করে চলে গিয়েছে।

কিন্তু—, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম কিরীটী রায়কে।

রায় আমাকে থামিয়ে দিযে বললে, হ্যাঁ, হয়তো খুনী পূর্বাহ্ণেই জানত, সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে রাত্রে ঐরকম কারও দেখা করবার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে এবং সে সেই সুযোগটুকুই গ্রহণ করেছে। অথবা এও হতে পারে, সেই প্রথম ব্যক্তিই হয়তো দ্বিতীয়বার সেই জানলাপথে ঘরে প্রবেশ করে সূর্যপ্রসাদকে ঘুমন্ত অবস্থায় মার্ডার করে গিয়েছে!

সকলে আমরা নির্বাক হয়ে কিরীটীর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ শুনছিলাম।

কিরীটী এবারে অমলেন্দুকে ডেকে বললে, অমলেন্দুবাবু, দুটো খবরের যে আমার বিশেষ প্রয়োজন!

বলুন?

টেলিফোন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানুন, কাল রাত্রে ডাক্তার সেনের কলটা কোথা থেকে হয়েছিল? আর—

বলুন—

আর ঐ সঙ্গে মুড়ি জংশনের স্টেশন মাস্টারকেও ফোন করে জানুন, রাত বারোটার পর আপ বা ডাউন কোন ট্রেন আছে কিনা?

অমলেন্দু নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঐ সময় একজন পুলিস এসে ঘরে ঢুকল। বললে, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাবার জন্য নাকি ঠেলাগাড়ি এসে গিয়েছে।

মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাবার পর একসময় কিরীটী বিমলবাবুকে সম্বোধন করে বললে, মিঃ গুপ্ত, চলুন এবার বাড়িটা ঘুরে দেখি।

চলুন!

আমাকে ছেড়ে দিলে হতো না এবারে মিঃ রায়? একবার ডিস্‌পেনসারিতে না গেলে—

হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, ডাক্তার মানুষ আপনি! আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছি

সেটাই তো অন্যায়। আমিও যাব, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে আপনার সঙ্গেই যাব, আর কয়েক মিনিট।

মৃদু হেসে বললাম, বেশ, তাই চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ আবার কিরীটী প্রশ্ন করলে, ভাল কথা ডাক্তার সেন, ঘরের মধ্যে একমাত্র আপনাকে যে নীল রঙের লেটার পেপারে লেখা চিঠিটা সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, সেটি ছাড়া আর কিছুই তা হলে খোয়া যায়নি, তাই তো?

হুঁ, সেই রকমই তো মনে হল।

মাঝামাঝি সিঁড়ি অতিক্রম করতেই দেখা গেল অমলেন্দুবাবু ফিরে আসছেন।

কি খবর মিঃ চক্রবর্তী? জানতে পারলেন কিছু? কিরীটীই প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ। বাজারের কাছাকাছি একটা ড্রাগ ও কেমিস্ট সপ্ থেকে নাকি কলটা করা হয়েছিল। আর বারোটা কুড়ি মিনিটে নাগপুর প্যাসেঞ্জার কলকাতার দিকে গিয়েছে।

ধন্যবাদ মিঃ চক্রবর্তী।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে লাগল।

কিন্তু মিঃ রায়, হঠাৎ অমলেন্দুই আবার কথা বললেন, কে যে ড্রাগ হাউস থেকে ডাক্তার সেনকে ফোন করলেন সেটা তো কিছু বোঝা গেল না। আর কেনই বা ঐ ধরনের একটা নিউজ ফোনে দিয়েছিল?

সত্যি, টেলিফোনের ব্যাপারটা মাথামুণ্ডু কিছু আমিও বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়। বললাম আমিও।

কিরীটী পূর্ববৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই বললে, অফকোর্স টেলিফোন কলটার একটা উদ্দেশ্য ছিল বৈকি।

উদ্দেশ্য!

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী এবারে মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ।

কিন্তু—

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যেত এতক্ষণ ডাক্তার সেন!

এবং একথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী সহসা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, ভাল কথা ডাক্তার সেন, রাত্রি তো তখন ঠিক এগারটা, যে সময় কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে সেই লোকটার গেটের সামনে ধাক্কা লেগেছিল?

হ্যাঁ। সময়টা আমার মনে আছে, কারণ ঐ সময় পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত

গ্যারোটা ঘোষণা করছিল।

হুঁ, তাই তো বলছিলাম। আচ্ছা ডাক্তার সেন, দোতলায় সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট
ঘ থেকে অর্থাৎ যে ঘরে গতরাত্রে বসে আপনাদের কথাবার্তা হচ্ছিল, সে ঘর থেকে
ইরের গেট পর্যন্ত যেতে কতক্ষণ লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

তা সোজা অন্য কোথাও না থেমে চলে গেলে দু-তিন মিনিটের বেশী লাগবে
ন? বড জোর মিনিট চার-পাঁচ—

একজ্যাক্টলি! আচ্ছা আর একটা কথা অমলেন্দুবাবু, গত সপ্তাহের কোনদিন
গান অপরিচিত লোক কি মিঃ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

অমলেন্দুবাবু এবারে যেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ।

এসেছিল? কে সে?

ট্রেডার্স বুরো থেকে একজন সেলস্ম্যান গত শনিবার—মানে পাঁচদিন আগে বড-
বুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তবে তাঁকে ঠিক অপরিচিত তো বলা যায় না
ঃরায়!

কেন বলুন তো?

কেননা গত মাস দুয়েক থেকেই মিঃ গুপ্ত একটা 'ডিক্টাফোন' কিনবেন কিনবেন
হচ্ছিলেন, সেই সংক্রান্ত ব্যাপারেই ট্রেডার্স বুরোর এজেণ্ট মহেন্দ্রবাবু যাতায়াত
াছিলেন।

ডিক্টাফোন!

হ্যাঁ।

ডিক্টাফোন! কিরীটী আবার কথাটা যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই উচ্চারণ
রলে। তারপরই পুনরায় প্রশ্ন করলে, তা তিনি কিনেছিলেন সেটা?

না।

হুঁ। আচ্ছা আপনাদের সেই মহেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকটির চেহারার একটা বর্ণনা
তে পারেন আমাকে মিঃ চক্রবর্তী?

বেঁটে, বেশ সুশ্রী চেহারা…

পরক্ষণেই কিরীটী আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনি
তরাত্রে গেটের সামনে যে লোকটিকে দেখেছিলেন, তার চেহারার সঙ্গে ঐ
হেন্দ্রবাবুর চেহারার কোন মিল আছে বলে আপনার মনে হয়?

না। সে লোকটি বেশ লম্বা ছিল।

হুঁ।

অতঃপর কিরীটী একপ্রকার চুপচাপই সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং বাড়ি দেখবার পর আমরা বিদায় নিতে যাব ঐ সময় আব্দুল অমলেন্দুবাবুকে এসে বলল, বাবুর সলিসিটার মিঃ দাস এসেছেন। আপনাকে আর বিমলবাবুকে ছোটবাবু ডাকছেন উপরে।

বিমলবাবু আর অমলেন্দু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ বারো ॥

আমরাও যাবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, ভাল কথা—সব দেখা হল এ বাড়ির ডাক্তার সেন, কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর মিউজিয়াম ঘর, যে ঘরে চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে সেই ম্যাক্সিক্যান ছোরাটা ছিল সেটা তো একবার দেখা হল না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না, এই তো পারলারের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্ ছোট ঘরটাই!

মিউজিয়াম ঘরের মধ্যে কিরীটীকে নিয়ে গেলাম।

কিরীটী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের যাবতীয় বস্তু ও বিশেষ করে চন্দনকাঠের বাক্স খুলে ও বন্ধ করে দেখে বললে, চলুন, এবারে ফেরা যাক।

রাস্তায় নেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করলে, এখন ডিস্‌পেনসারিতেই তো যাবে ডাক্তার সেন?

হ্যাঁ।

চলুন, একবার আমিও থানাটা ঘুরে যাই।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। কিন্তু শীতকাল হলেও রৌদ্রের তীব্রতা বে অনুভূত হয়।

কিরীটীর পাশাপাশি আমি চলেছি।

সত্য কথা বলতে কি, কিরীটীর স্তব্ধতা যেন আমার কেমন বিশ্রী লাগছিল। ত নিজেই একসময় কথা বললাম, সত্যি মিঃ রায়, আমার একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানে

কি?

যদি ঘরের দেওয়ালগুলোও অন্ততঃ মানুষের মত কথা বলতে পারত তবে এতক্ষ আমরা অনায়াসেই কি জানতে পারতাম না যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে?

তা বটে। তবে কথা বলার ব্যাপারে একটা মুখ ও সেই সঙ্গে জিহ্বা থাকাট

তা বড় কথা নয় ডাক্তার সেন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, সিমেণ্ট ও ইট দিয়ে গাঁথা ঘরের বোবা দেওয়াল-গুলোর ভাষা প্রকাশের জন্য জিহ্বা না থাকলেও দেখবার ও শোনবার ক্ষমতা তো আছে। আর সেটা প্রকাশের ভাষাও তাদের আছে বইকি।

কি বললেন ?

হ্যাঁ, তাই। শুধু ঘরের দেওয়ালই নয়, ঘরের মধ্যে অবস্থিত টেবল চেয়ার প্রায় প্রতিটি জড়বস্তুই সেই ভাষাতেই আমাকে অনেক সংবাদ পৌঁছে দেয়।

তাই বুঝি ? তা কি খবর আজ পেলেন সূর্যপ্রসাদের ঘরের দেওয়াল আর ফার্নিচারগুলোর কাছ থেকে মিঃ রায় ?

কথার মধ্যে আমার যে একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হুল ছিল সেটা যেন আদপেই গায়ে না নিয়ে চলতে চলতে পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠেই কিরীটী বললে, ঘরের একটি খোলা জানলা, একটি বন্ধ দরজা ও একটি উঁচু ব্যাকরেস্ট দেওয়া চেয়ার, যেটা স্থানচ্যুত হয়েছিল—ঘরের ঐ বিশেষ তিনটি জড়পদার্থ তাদের নিজস্ব ভাষায় কেবলই আমাকে কি বলছিল আজ জানেন ডাক্তার সেন ?

কি ?

তারা যেন বলছিল, ভেবে দেখ, কেন—কেন এমনটা হল ? কেন জানলা আমি খোলা রইলাম, আর কেনই বা দরজা রইল বন্ধ, আর কেন চেয়ারই বা আমি স্থানচ্যুত হলাম !

মনে মনে না হেসে পারি না। লোকটা হয় পাগল, না হয় একের নম্বর বুদ্ধু !

এত নাম শুনেছি লোকটার, সব কি তাহলে গল্পকথা !

কিন্তু কিরীটীকে থানা পর্যন্ত যেতে হল না।

সহসা ঐ সময় মোটর-বাইকের প্রচণ্ড ফট্‌ফট্‌ শব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দারোগা সাহেব মিঃ পাণ্ডে তাঁর চিরপরিচিত মোটর-বাইকে চেপে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উড়িয়ে এইদিকেই আসছেন।

মিঃ পাণ্ডে !

কই ?

ঐ যে এইদিকেই মোটর-বাইকে চেপে আসছেন। বললাম আমি।

থামতে বলুন ওঁকে। কিরীটী বললে।

কিন্তু থামতে বলতে হল না। পাণ্ডে এসে আমাদের কাছবরাবরই বাইক থামালেন।

এই যে মিঃ রায়, আপনার খোঁজেই আমি যাচ্ছিলাম।

কি ব্যাপার? কিরীটী প্রশ্ন করে।

খুনের একপ্রকার কিনারা করে ফেলেছি মিঃ রায়।

বটে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে জলের মতই ক্লিয়ার।

বেশ বেশ—চলুন, ডাক্তার সেনের চেম্বারে বসেই শোনা যাবে'খন।

বেশ তো, তাই চলুন।

মিঃ পাণ্ডের চোখেমুখে একটা খুশীর আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

আমরা তিনজনে এসে আমার ডিস্পেনসারির চেম্বারেই বসলাম।

চায়ের জন্যে বলি মিঃ রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, বলুন মিঃ পাণ্ডে।

বললে হয়তো বলবেন দম্ভ বা বড়াই করছি কিরীটীবাবু, সোৎসাহে বলতে লাগলেন পাণ্ডে, কিন্তু এই এগারো বছরের চাকরির জীবনে এ ধরনের খুনজখম তো কম দেখলাম না। হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—

তা ধরতে পারলেন নাকি খুনী কে? সহসা বাধা দিয়ে বললে কিরীটী।

মারো গোলি, নিশ্চয়ই। আরে মশাই বড়লোকের একমাত্র ছেলে, অতিরিক্ত আদরে গোল্লায় গেলে যা হয়—

তার মানে, বলতে চান সমরই?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কিসে স্থিরনিশ্চিত হলেন মিঃ পাণ্ডে যে সমরই তার বাপের হত্যাকারী?

মারো গোলি, আরে মশাই এ হচ্ছে ডিটেক্‌সনের মেথড্, বুঝলেন!

কি রকম?

বলছি, বলছি—আচ্ছা, সূর্যপ্রসাদবাবুকে কাল সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত দেখা গিয়েছে—অর্থাৎ তাঁর ভাইপো বিমলবাবু ঐ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কেমন কি না?

হ্যাঁ, সেই রকমই তো আপাততঃ শোনা যাচ্ছে। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

মারো গোলি, বেশ। অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেণ্ড পয়েন্ট হচ্ছে,

ডাক্তার সেন রাত বারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে' যাবার পর সকলে মিলে ঘরে ঢুকে দেখলেন মিঃ গুপ্ত মার্ডারড, কেমন কি না ?

তা—

হুঁ ।

আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনারা যখন মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন তার কতক্ষণ আগে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছিল ? কিরীটী ম.না আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলে । তাঁকে

তা আধ ঘণ্টাটাক আগে তো হবেই । মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলাম আমি ।

মারো গোলি । তাই যদি হয়ে থাকে বা দু-দশ মিনিট আগে-পিছেও গত হচ্ছে হত্যা করা হয়ে থাকে, এইটাই বোঝা যাচ্ছে যে সাড়ে এগারোটা বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন এক সময় মিঃ গুপ্তকে হত্যাকারী হত্যা ক.ন তেমনিই আমরা মেনে নিতে পারি কি না ?

বেশ বলুন—কিরীটী বললে । স ছেলে

মারো গোলি । নাউ 'লিলি কটেজে' গতরাত্রে যাঁরা যাঁরা ঐ সময়ে উপ. যে ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মুভ্‌মেণ্টস সম্পর্কে আমি একটা মোটামুটি খসড়া করেছি । এই দেখুন—বলে পকেট থেকে মিঃ পাণ্ডে একটা সাদা কাগজের সীট টেনে বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন ।

কিরীটী নিঃশব্দে কাগজটা হাতে নিয়ে দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলে ।

ইংরাজীতে টাইপ করা কাগজটা ।

কাগজটায় যা টাইপ করা ছিল :

১ । মেজর কৃষ্ণস্বামী । ডাইনিং রুমে বসে সাড়ে নটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বলদেব সিংহের সঙ্গে দাবা খেলেছেন । এবং রাত দশটা থেকে অমলেন্দুবাবুও ওঁদের পাশেই বসে দাবা খেলা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন । অমলেন্দুবাবু ও ওঁরা দুজনেই পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করেছেন তাঁদের জবানবন্দিতে ।

২ । বলদেব সিং । ডাইনিং রুমে দাবা খেলছিলেন প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ।

৩ । রাধিকাপ্রসাদবাবু । তিনি তার পরে ঘরে বসে প্রাত্যহিক নিয়মিত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত গীতাপাঠ করে শুতে যান । আব্দুলের সাক্ষ্যে তা প্রমাণ হয়েছে ।

৪ । সুবলবাবু । রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শরীরটা ভাল না থাকায় ঘুমোতে যান ।

বিমলবাবু, রাধিকাবাবু ও অন্যান্য ভৃত্যেরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

৫। বিমলবাবু রাত সোয়া এগারটায় তাঁর জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক
সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। আব্দুল ও অন্য একজন সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬। অমলেন্দুবাবু। ডাইনিং রুমেই ছিলেন প্রমাণিত হয়েছে পূর্বেই।

৭। আব্দুল। রাত সোয়া এগারোটায় নীচে তার ঘরে শুতে যায়। অন্যা
দের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

হাঁ। ’ বাবুর্চি ও বাঁধুনী—আব্দুলকে বাদ দিলে বাচ্চা, পণ্টু, গোমেশ ও লছমন

বেশ ে বাচ্চা ও পণ্টু, একজন পাঁচ বছর ও একজন তিন বছর ঐ বাড়িতে কা

বেশ ে গোমেশ বছর দুই ও লছমন সাত বছর কাজ করছে। বাড়ির সকলের

মিঃ পা যেমন নিরীহ তেমনি বিশ্বাসী। এবং ওদের কারও সম্পর্কে কারও কো

আমরা নেই।

চায়ের

হ্যাঁ ডলেন মিঃ রায়? পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

হুঁ। বলে কাগজটা নিঃশব্দে আবার কিরীটী পাণ্ডের হাতে তুলে দিলেন।

অবিশ্যি একমাত্র ওদের মধ্যে আব্দুল সম্পর্কে সামান্য একটু যে সন্দেহ জাগে ন
তা নয়। বাকি সকলে সন্দেহের একেবারে বাইরে। বললেন পাণ্ডে।

অ্যানালিসিসটা আপনার ভালই হয়েছে বলব মিঃ পাণ্ডে, কিরীটী বললে, তবে—

তবে কি?

আব্দুল যে মিঃ গুপ্তকে খুন করেনি সে সম্পর্কে আমি কিন্তু স্থিরনিশ্চিত।

মারো গোলি। আমিও তো তাই বলছি। তা হলেই বুঝছেন মিঃ রায়, ব্যাপার
গিয়ে কোথায় দাঁড়াচ্ছে। সোৎসাহে আবার বলতে লাগলেন পাণ্ডে, বাড়ির মধ্যে যাঁর
কাল ঐ সময় উপস্থিত ছিল তারা যখন কেউই আমাদের সন্দেহের তালিকায় পড়
না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির বাইরেই নজর দিতে হবে, কেমন কি না?

তা দিতে হবে বইকি। কিরীটীই বললে।

পূর্ববৎ উৎফুল্ল ভাবে মিঃ পাণ্ডে বলতে লাগলেন, মারো গোলি। এখন দেখা যাক
বাড়ির মধ্যে গতরাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তারা যদি কেউ এ কাজ না করে থাকে
তো বাড়ির বাইরে থেকে সর্বাপেক্ষা কার বেশী সম্ভাবনা ছিল ঐভাবে এসে সূর্য
প্রসাদকে হত্যা করে যাওয়া সেরাত্রে!

কার? প্রশ্নটা এবারে করলাম আমিই।

মারো গোলি। এখনও বুঝতে পারছেন না ডাক্তার সেন? সমর! হ্যাঁ, হি ইজ

পার্সন! চাপা গর্বিত কণ্ঠে বললেন পাণ্ডে।

সময় ?

মারো গোলি, আই অ্যাম সিওর। সূর্যপ্রসাদের ঐ ছেলে সমর, বাপের সই জাল
:রে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে গা-ঢাকা দিয়ে এতদিন বেড়ালেও ঐ ঘটনার দিন পূব
।কেই সে যে এই শহরেই 'তাজ' হোটেলে অবস্থান করছিল সে কথা তো নিঃসন্দেহে
মাণিত হয়েছে। এবং গতকাল রাত সাড়ে নটার পর থেকে খোঁজ নিয়ে জানা
।য়েছে, সে হোটেলে আর ছিল না। অথচ রাত সাডে এগারোটায় তাঁকে'
।মাদেরই একজন কনেস্টবল মহাবীর সিং স্টেশন রোডে দেখেছে।

বেশ তো। তাতে করে সে-ই যে তার পিতার হত্যাকারী কথাটা প্রমাণিত হচ্ছে
: করে মিঃ পাণ্ডে? বললাম আবার আমি।

পাণ্ডে যেন আমার কথায় কানই দিলেন না। যেমন বলে যাচ্ছিলেন তেমনিই
.ল যেতে লাগলেন।

মারো গোলি! এখনও বুঝতে পারছেন না, সূর্যপ্রসাদবাবুর সেই পলাতক ছেলে
মরই নিশ্চয় এই দুষ্কর্মের হোতা? রাত সাডে এগারোটা নাগাদ মেজর সাহেব যে
র্যপ্রসাদের ঘরে তাঁকে উত্তেজিত ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন, আমার
:তে নিশ্চয়ই তিনি তখন তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সমর তাদের বাড়ির সব
ন্ধিসন্ধি জানত, তাই তার পক্ষে বাগানের গ্যারেজের ছাত দিয়ে তার বাবার ঘরে
।বেশ করা সহজই ছিল। এবং বাপের সঙ্গে তার পূর্ব মনোমালিন্যের দরুন সে-ই
য়তো একটা হঠাৎ অন্ধ আক্রোশের বশে কাল রাত্রে বাপের সঙ্গে বচসা করতে
রতে তাকে খুন করেছে। তারপর হয়তো ঘটনার পরিস্থিতিতে বিহ্বল হয়ে
।লিয়েছে, হঠাৎ বাপকে ঐভাবে হত্যা করে ফেলে।

বুঝলাম, তা হলে ডাক্তার সেনকে ফোনে সংবাদটা দিল কে? সহসা কিরীটী
শ্ন করলে ঐ সময়।

মারো গোলি, সমরই! জবাব দিলেন পাণ্ডে।

সমর?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? যদি সে, আপনি যেমন বলছেন মিঃ পাণ্ডে, পূর্বেকার মনোমালিন্যের
রুনই একটা আক্রোশের বশে বাপকে হত্যা করেই থাকে, সে সংবাদটা ডাক্তার
।নকে সে দিতে যাবেই বা কেন হঠাৎ গায়ে-পড়া হয়ে?

মারো গোলি! অবিশ্যি সহসা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন মিঃ রায়, তবে

কি জানেন, এ লাইনে দীর্ঘ এগারো বছরের অভিজ্ঞতায় তো হামেশাই দেখছি, হত্যা কারীরা হত্যা করবার পর এক-এক সময় এমন এক-একটা উদ্ভট কাজ করে বসে ও করে সেই সময়কার মানসিক আন্‌ব্যালেন্সের মধ্যে যে, সব সময় তার কোন যুক্তি হয়তো খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়া আমার ঐ যুক্তি ছাড়াও আর একটি মারাত্ম প্রমাণের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন মিঃ রায়!

মারাত্মক প্রমাণ?

হ্যাঁ, ঘরের জানলার কার্নিসে ও গ্যারেজের ছাতে জুতোর ছাপটা ও 'তাজ' হোটে সমরের ঘরে যে কাদামাখা জুতো পাওয়া গিয়েছে—হুবহু একেবারে একই জুতোর ছাপ

কিন্তু একই প্যাটার্ন বা একই মেকের জুতো তো অনেক লোকই ব্যবহার করে পারে মিঃ পাণ্ডে! কিরীটী আবার বললেন।

মারো গোলি! নিশ্চয়ই পারে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু কাদামাখা জু ও সমরের গা-ঢাকা দেওয়াটা?

সত্যিই অন্যায় হয়েছে।

বুঝুন, এখন তা হলে আগাগোড়া সব কিছু বুঝে দেখুন। মোটিভ, পসিবিলি সব কিছুই একমাত্র সমরের পক্ষেই প্রমাণিত হচ্ছে না কি? তাই বলছিলাম, অ্যাম ডেফিনিট্—এ তারই কাজ। সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে।

তা হলে এখন কি করছেন মিঃ পাণ্ডে?

তাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে। আর তা করবও। যাবে কোথায় আমার চোখে ধুলো দিয়ে? আচ্ছা এবার তা হলে উঠি মিঃ রায়।

পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্যে।

কিরীটী শুধু মৃদু কণ্ঠে বললে, আসুন।

জুতোর মচ্‌ মচ্‌ শব্দ তুলে নিজের আবিষ্কারের সাফল্যে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত পা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যেন বিজয়-গর্বে।

॥ তেরো ॥

মুখে যতই আস্ফালন করুন মিঃ পাণ্ডে, সমরের কোন সন্ধানই কিন্তু দীর্ঘ সাত ধরে বহু পরিশ্রম করা সত্ত্বেও করতে পারলেন না।

সমর যেন কর্পূরের মতই সহসা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে হত্যার রাত্রি থেকেই

ইতিমধ্যে দিন-দুই মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল এবং তার মুখেই সব
ছিলাম।

ইচ্ছা থাকলেও এই সাত দিন কিরীটীর সঙ্গে কিন্তু দেখা করে উঠতে পারিনি।
ণ গত সাত দিন গোটা-দুই কঠিন রোগী নিয়ে আমাকে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে
ছিল।

মোট কথা, ইতিমধ্যে সূর্যপ্রসাদের আকস্মিক রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারের
জনাটা যেন কতকটা ঝিমিয়েই এসেছিল ক্রমশঃ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি কিন্তু
সময়ের জন্যও ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি।

অদৃশ্য একটা কাঁটার মতই যেন সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে কট্‌কট করে বিঁধছিল
ারটা।

আর অবিশ্যি অন্য একটা কারণও ছিল।

সমরের প্রতি আমার ছোট বোন মিতার যে একটা দুর্বলতা ছিল সেটা অবিশ্যি
ার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অজ্ঞাত ছিল এইটাই যে, সমরের প্রতি মিতার যেটা
া সামান্য দুর্বলতা বলে মনে মনে জেনেছিলাম সেটা ঠিক দুর্বলতাই কেবল নয়—
চাইতেও বেশী কিছু অর্থাৎ সমরের প্রতি মিতার গভীর ভালবাসা। মিতা সত্যই
কে ভালবেসেছিল।

এবং ঐ সত্যি কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম।
সমর! সমরের মত একটা জুয়াড়ী, ধনীর খেয়ালী মূর্খ ছেলেকে মিতার মত শিক্ষিত
টি মেয়ে ভালবাসতে পারে এ যেন সত্যিই আমার কল্পনারও অতীত ছিল বুঝি।
এবং রহস্যটা দৈবক্রমেই যেন আমার কাছে সেদিন উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

কয়েক দিনের একটু বেশী পরিশ্রমে সত্যিই ক্লান্ত হযে পড়েছিলাম। সেদিন
হরে বিছানায় শুয়ে নিদ্রাটাও বোধ হয় তাই একটু গভীরই এসেছিল।

এবং ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনে সহসা
ার অজ্ঞাতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

বুঝলাম কিরীটী আর মিতা পাশের ঘরে বসে কথা বলছে।

কি ভেবে সাড়া না দিয়ে চুপ করে শয্যায় শুয়ে কান পেতে রইলাম।

কানে এল মিতা বলছে, সে যাই হোক মিঃ রায়, আমি হলপ করে বলতে পারি,
ার কাজ নয়। আমি তো জানি তাকে। এতখানি নিষ্ঠুরতা কথনও তার
আমি কল্পনা করতেই পারি না।

কিন্তু সে যদি সত্যি সত্যি নির্দোষীই, তবে এমন করে গা-ঢাকা দিয়েই বা আ
কেন মিস সেন ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমার মনে হয় মিঃ রায়, ভয়ে।

ভয়ে ?

হ্যাঁ, সে যে কি ভয়ানক ভীরু সে তো আমার অজানা নয়। কিন্তু সে কথা থাক
আপনিও কি পুলিসের মতই মনে করেন যে সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে ?

একটা কথা বলব মিস সেন ?

বলুন।

সমরবাবুকে যে আপনি ভালবাসেন তা কি আপনার দাদা জানেন ?

দাদা!

হ্যাঁ।

না, দাদার কাছে বলতে আমি সাহস পাইনি। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভা
জবাব দিল মিতা শুনলাম।

কেন ?

কারণ জানি, দাদা কিছুতেই আমাদের এ ভালবাসাকে মেনে নেবে না।

কিন্তু আমার মনে হয় ফলটা তাঁর জানা থাকলে বোধ হয় ভালই হত।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

যাক সে কথা। হাতের তীর যখন একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তখন আর উ
নেই। তবে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারি মিস সেন, সত্যিকা
ভালবাসা মৃত্যুকেও জয় করে।

আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না। তাই এবারে ডাকলাম, মিতা!

ঐ দাদা বোধ হয় ঘুম থেকে উঠল। আপনি বসুন মিঃ রায়, আমি আসছি।

চোখেমুখে জল দিয়ে মিতাকে চা দিতে বলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, তা
মিঃ রায়, কতক্ষণ ?

এই আধ ঘণ্টাটাক হবে।

কিন্তু ডাকেননি কেন ?

ঘুমুচ্ছেন, বিরক্ত করিনি তাই।

না না, তাতে কি—ডাকলেই পারতেন! তা কেসের কতদূর কি হল ?

সে প্রশ্নের আমার জবাব না দিয়ে কিরীটী বললে, চলুন না, মিঃ গুপ্তর
কটেজ'টা একবার ঘুরে আসি।

বেশ তো, চলুন।

মিতা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

নিজের কর্মব্যস্ততায় এ কদিন মিতার মুখের দিকে ভাল করে নজর পড়েনি। াজ ওর মুখের দিকে তাকাতেই যেন মনে হল, চাপা একটা বেদনার বিষন্ন ক্লান্তি র মুখের উপর ছড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে ট্রে-টা ত্রিপয়ের উপরে রেখে মিতা আমাদের দুজনকে দু কাপ চা করে ল।

এলোমেলো চিন্তায় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে গলাম।

বাপ-মা-মরা ছোট বোন ঐ মিতা, আপনার বলতে তো ও-ই আমার একজন।

এ পৃথিবীতে আর তো আমার কোন ভালবাসারই বন্ধন নেই।

বিয়ে-থা করিনি, আর করবও না জানি।

কে আর তবে আছে আমার এ সংসারে! কিন্তু মিতা এ কি করল? ঐ ধনীর দার্থ, অশিক্ষিত জুয়াড়ী ছেলেটাকে এমনি করে কেন ভালবাসল!

ইতিমধ্যে কিরীটীবাবুর চা-পান হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন াক্তার সেন!

চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম।

বৈকালের বিষন্ন আলোয় চারিদিক তখন যেন কেমন ম্রিয়মাণ মনে হয়।

নিঃশব্দে দুজনে হেঁটে চলেছি পাশাপাশি।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়।

কি ভাবছেন ঐ মুহূর্তে মিঃ রায় কে জানে!

সূর্যপ্রসাদের কথা বা তাঁর হত্যাকারীর কথাই কি? না সমরের কথা? না তার কথা?

মিঃ রায়!

আমার ডাকে সহসা মিঃ রায় আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

কিছু বলছিলেন?

মিঃ পাণ্ডের মত আপনিও কি মনে করেন—

কি ?

সত্যি সমরই তার বাপকে হত্যা করেছে ।

আপনার কি মনে হয় ডাক্তার সেন ?

অতর্কিতে কিরীটীর প্রশ্নে যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলাম । এবং কয়েক মুহূর্ত কোন জবাবই দিতে পারলাম না ।

নিঃশব্দে হেঁটেই চলি ।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করলেন, কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না ডাক্তার ?

সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়—

কি, থামলেন কেন, বলুন ?

সমর এভাবে সহসা গা-ঢাকা না দিলে—

কিন্তু একটা কথা আপনার বুঝতে পারছি না ডাক্তার, বাপকে হত্যা করেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে এ কথাটাই বা বার বার আপনারা সকলে ভাবছেন কে সম্পূর্ণ অন্য কারণেও সে গা-ঢাকা দিতে পারে ! বা কারও প্ররোচনায় হয়তো গা-ঢা দিতে বাধ্য হয়েছে, এমনও তো হতে পারে ।

কি বলছেন মিঃ রায় ?

মানুষের এক-এক সময়ের কার্যকারণ এমন বিচিত্র হয় ডাক্তার যে তার হা মেলাই ভার হয় !

আপনার কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়।

সময় হলে সবই বুঝতে পারবেন । ব্যস্ত হবেন না ।

'লিলি কটেজে' পৌঁছতেই গেটের মুখে আব্দুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ।

ছোটবাবুকে ডেকে দেব ডক্টর সাব্ ? আব্দুল বললে ।

না আব্দুল, আমি আর ডাক্তারবাবু বাগানটা একটু ঘুরে দেখতে চাই । জ দিলে কিরীটী রায় ।

আমি সঙ্গে যাব ? আব্দুল বিনীতভাবে শুধায় ।

না না, ডাক্তারবাবুরই তো এখানকার সব জানা—ওঁকে নিয়েই আমি বাগা ঘুরে দেখতে পারব'খন । তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ।

আব্দুল বাড়ির ভিতর চলে গেল ।

আমি আর মিঃ রায় দুজনে 'লিলি কটেজে'র পশ্চাতে বাগানের দিকে অগ্রসর হল পূর্বেই বলেছি প্রায় দশ-বারো কাঠা জায়গা নিয়ে বাড়ির পশ্চাতের বাগানটা । ন

প্রকারের ফল ও ফুলের গাছ বাগানে।

কিছুক্ষণ অনির্দিষ্ট ভাবে বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বাগানের একেবারে দক্ষিণ-প্রান্তে যে পাশাপাশি করোগেটের সেড্ তোলা দুখানি ঘর সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিঃ রায় আমাকে প্রশ্ন করলেন, ঐ দুটো কিসের ডাক্তার সেন জানেন ?

একটাতে মালী থাকে, অন্যটা যতদূর জানি খালিই পড়ে আছে।

চলুন, ঘর দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি ।

চলুন।

মালী কোথায়, তাকে দেখছি না তো ?

হয়তো কোথাও আছে।

মালীর ঘরটায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। পাশের ঘরটির দরজায় কোন তালা ছিল না। ভেজানো দরজা ঠেলে দুজনে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বন্ধ-থাকার দরুন ঘরের মধ্যে পা দিতেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে এসে লাগল। কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিলে।

খানিকটা হাওয়া ও দিনশেষের ম্লান আলোর একটা ঝাপটা এসে জানলা-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরটি মৃদু আলোকিত করে তুলল।

বহুদিনের অব্যবহারে ঘরের মেঝেতে এক পর্দা ধুলো জমে আছে।

একটা চামচিকে ডানা ফড়ফড় করে উড়তে লাগল ঘরময়।

মিঃ রায় ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। এবং একসময় সহসা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দু-দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ এঘরে এসেছিল ডাক্তার সেন!

এঘরে আবার কে আসবে ? আর কেনই বা আসতে যাবে ?

কেন এসেছিল তা বলতে পারি না, তবে এসেছিল যে কেউ না কেউ এ ঘরে সেটা নিশ্চিত।

কি করে বুঝলেন ?

চেয়ে দেখুন ঐ মেঝের ধুলোতে—

কিরীটী রায়ের নির্দেশে তাকালাম মেঝের দিকে।

সত্যি ঘরের মেঝেয় ধুলোর ওপরে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কতকগুলো জুতোর ছাপ এখনও স্পষ্ট বোঝা যায়।

হুঁ, তাই তো দেখছি, জুতোর ছাপ রয়েছে !

শুধু জুতোর ছাপই নয়, আর একটা ছাপ লক্ষ্য করুন !

কি বলুন তো ?

ঐ জুতোর ছাপের পাশে পাশে কতকগুলো ছোট ছোট গোলাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না ডাক্তার সেন ?

হুঁ তাই তো, কিন্তু—

কিসের দাগ ওগুলো বলে আপনার মনে হয় ডাক্তার সেন ?

ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ রায়।

সহসা ঐ সময় কিরীটী দু'পা এগিয়ে গিয়ে ধূলিকীর্ণ মেঝে থেকে নীচু হয়ে কি যেন একটা তুলে নিলে হাতে।

কি মিঃ রায় ?

দেখুন—

কিরীটী আমার দৃষ্টির সামনে হস্তটি প্রসারিত করে ধরতেই ঘরের মৃদু আলো আমার নজর পড়ল জিনিসটার উপরে।

কিরীটীর হাতের পাতায় রয়েছে একটি ছোট কালো মোষের শিংয়ের নস্যি কৌটো।

নস্যির কৌটো বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

কথাটা বলে পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে মিঃ রায় ডাকলেন, ডাক্তার সেন

বলুন।

আচ্ছা এই ঘর থেকে সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ-সংলগ্ন প্রাইভেট রুমের জানলার নীচে পৌঁছতে কোন মানুষের ঠিক কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয় ডাক্তার সেন ?

তা—তা কত আর সময় লাগবে, মিনিট দুই-তিন !

হ্যাঁ, বড় জোর চার মিনিট লাগতে পারে, তার বেশী নয়—কি বলেন ?

কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন মিঃ রায় !

কিছু না, এমনি একটা কথা মনে পড়ল তাই। থাক্ চলুন, এসেছি যখন একবার রাধিকাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই, কি বলেন ?

চলুন।

॥ চৌদ্দ ॥

াদ্দ্লের মুখেই শুনলাম রাধিকাপ্রসাদবাবু দোতালায় তাঁর ঘরেই আছেন। মৃত র্যপ্রসাদবাবুর আইন-উপদেষ্টা সলিসিটার এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

আমি আর মিঃ রায় রাধিকাপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর ছেলে বিমলবাবু ও সূর্যপ্রসাদের সলিসিটার ঘরের মধ্যে স কথাবার্তা বলছিলেন।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বিমলবাবুই সাদর আহ্বান জানালেন, মিঃ য, কিরীটীবাবু—আসুন!

সলিসিটার আমাদের ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে আমাদের দিকে কিয়েছিলেন।

বিমলবাবুই পরিচয় করি...

মহিমবাবু, ডাক্তা.. সেন—আর উনি হচ্ছেন মিঃ কিরীটী রায়।

সলিসিটার ম..িমবাবু হাত তুলে কিরীটী ও আমাকে নমস্কার জানালেন, নমস্কার।

বিমলবাবুই ..তঃপর সংক্ষেপে কিরীটী রায়ের পরিচয়টা দিলেন মহিমবাবুকে।

আপনি যখ.. মৃত সূর্যপ্রসাদবাবুর আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর উইল সম্পর্কে চয়ই জা..ই বো.. কথা! কিরীটী মহিমবাবুকেই প্রশ্নটা করলে অতঃপর।

হ্যাঁ, হঠাৎ.. আর সেই উইলের ব্যাপারেই ওঁদের বলতে এসেছিলাম। মবা.. উদ্দেশ্যটা।

ও, ..চয় তার..কাবাবু, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো সূর্যপ্রসাদবাবুর লে..ন্তু সে উ.. ব্যাপারটা জানতে পারি কি?

র..ক সে খো..দর মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী রায় প্রশ্নটা করলে।

নি..বে কি মহিমবাবু, ওঁকে বলুন না। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

উ.. করছে? ..মুটি যা লেখা আছে তা হচ্ছে, মহিমবাবু বলতে লাগলেন, ব্যাঙ্কের নগদ ..কিন্তু কাকে..াশ হাজার টাকা পাবেন তাঁর একমাত্র ছেলে সমরবাবু, ভাইপো বিমলবাবু ব..াকে সে সমান দশ হাজার করে, রাধিকাবাবু পাবেন দশ হাজার। অমলেন্দুবাবু ন..তরে আ..ার ও চাকরবাকরেরা প্রত্যেকে এক হাজার করে টাকা পাবে। বাদবাকি ..ান..জার বা..হাজার টাকা মূল্যের এই বাড়ি যতদিন সমরবাবু জীবিত থাকবেন ভোগ ত পা.. আসুন। তাঁর মৃত্যুর পর এটা একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত হবে।

বলেন কি! অনেক টাকার সম্পত্তি তো! কথাটা বললে মিঃ রায়।

হুঁ, সূর্যপ্রসাদ সত্যিকারের ধনী ব্যক্তিই ছিলেন। নিম্নকণ্ঠে আমি বললাম।

একটা কথা মহিমবাবু, হঠাৎ কিরীটী রায় প্রশ্ন করলে, উইলটা কবে লে হয়েছিল?

আজ থেকে মাস-দুই আগে।

ওই বোধ হয় প্রথম ও শেষ উইল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা এবার তা হলে উঠি, নমস্কার। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

গেট অতিক্রম করে রাস্তায় এসে যখন নামলাম, চারিদিকে সন্ধ্যার তরল অন্ধক ঘনিয়ে এসেছে।

[illegible]

রাত বেশী হয়নি। মাত্র সাড়ে আটটা।

শীতের প্রকোপটা যেন আজ একটু বেশীই। সন্ধ্যা সাতটার ধ্যাই রোগী দেখবা পাট চুকে গিয়েছিল।

ডিস্‌পেন্‌সারিতে নিজের চেম্বারে বসে ডাইরী লিখছিলাম।

কি বিচিত্র খেয়াল জানি না, প্রথম থেকেই সূর্যপ্রসাদ স্যপূর্ণ মৃত্যু ব্যাপারটা ও তৎসংক্রান্ত তদন্তের ব্যাপারটা যেমন যেমন ঘটেছে নলা মতাম সহকারে ডাইরীর মধ্যে লিখে রাখছি সেই গোড়া থেকেই।

সত্যি। ব্যাপারটা আগাগোড়া যেন একটা জোরালো রহস্যরাি

এখনও মধ্যে ম[illegible] অতর্কিতে যেন মানসপটে ভেসে ওঠে সেটাম্যি সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহটা।

সত্যিই আশ্চর্য!

কে যে লোকটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল?

আর কেনই বা হত্যা করল কে জানে?

প্রশ্নগুলো বার বার মনের মধ্যে ইদানীং খুব বেশীই যেন আন্দ পাে

কিছুতেই যেন কথাটা ভুলতে পারি না।

কম্পাউণ্ডারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, স্যার!

কি?

একজন লোক কিরীটীবাবুর কাছ থেকে এইমাত্র চিঠিটা দিয়ে গেল আপনাকে দবার জন্য। বলে গেল খুব জরুরী।

মুখ-আঁটা খামের একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন কম্পাউণ্ডারবাবু আমার দিকে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বললাম, লোকটা চলে গেছে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আপনি যান।

চিঠিটা খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলাম।

প্রয় ডাক্তার সেন,

কাল রাত্রে ন'টা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজে' একবার যেতে হবে, শেষ প্রয়োজন। সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার সম্পর্কে সকলে মিলে একটা খোলা-লি আলোচনা করব স্থির করেছি। দুর্ঘটনার রাত্রে যাঁরা যাঁরা 'লিলি কটেজে' পস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন তার ব্যবস্থা াপনাকেই করতে হবে। কাল রাত আটটায় আপনার ওখানে যাব। ওখান থেকে কসঙ্গেই আমরা 'লিলি কটেজে' যাব। নমস্কার। ভবদীয়।

কিরীটী রায়

পরের দিন রাত্রে।

চেম্বারেই বসে কিরীটী রায়ের অপেক্ষা করছিলাম। সব ব্যবস্থাই করেছি।

কিন্তু হঠাৎ কিরীটীর এইভাবে সকলকে 'লিলি কটেজে' একত্রিত করে আলোচনা রবার উদ্দেশ্যটা যে কি, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

নিশ্চয় তার একটা কোন এ ব্যাপারে উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কি?

র[illegible]কি সে খোলাখুলি সকলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে চায়?

নি[illegible]বে কি কিরীটী রায় আমাদের মধ্যেই কাউকে সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে উ[illegible] করছে?

কা[illegible]কিন্তু কাকে?

স্ব[illegible]কাকে সে সন্দেহ করছে?

বেন[illegible]তরে আসতে পারি?

মান[illegible]জার বাইরে কিরীটী রায়ের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে যেন চমকে উঠি।

াতে পা[illegible] আসুন, মিঃ রায়।

কালো রঙের একটা গ্রেট্ কোট গায়ে কিরীটী এসে ঘরে ঢুকল, গুড্ ইভনিং ডক্টর সেন।

গুড্ ইভনিং। বস্থন।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে নটা বাজতে, চা দিতে বলি?

আপত্তি নেই।

কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে চা দিতে বললাম।

পকেট থেকে পাইপ ও টোব্যাকো পাউচটা বের করে পাইপের মুখে তামাক ভরতে ভরতে মৃদু কণ্ঠে কিরীটী হঠাৎ বললে, চেয়ারটা সম্পর্কে কারও কাছেই কোন মনোমত বা ডেফিনিট্ জবাব পাওয়া গেল না ডাক্তার সেন!

চেয়ার?

হ্যাঁ, ওই যে চেয়ারটায় সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহ ছিল!

ও।

মেজর স্বামী, বলদেববাবু, বিমলবাবু, সুবলবাবু, রাধিকাপ্রসাদ, অমলেন্দু, আন্দু ও আপনি সকলেরই এক জবাব, চেয়ারটা কেউ সরায়নি।

সামান্য ওই চেয়ারের ব্যাপারটা নিয়ে এতই বা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন মি রায়, বলুন তো?

মৃদু হেসে এবারে আমি বললাম।

প্রত্যুত্তরে মৃদু কণ্ঠে কিরীটী বললেন, সামান্য ব্যাপার আদপেই নয় ডাক্তার সেন।

ওই সময় কম্পাউণ্ডারবাবু গরম গরম দু কাপ চা নিয়ে এসে আমাদের সামনে টেবিলের উপরে রাখলেন।

নিন, চা নিন।

মিঃ রায় একটা কাপ তুলে নিলেন।

আমিও একটা কাপ তুলে নিয়ে বললাম, মিঃ রায়, আপনি হয়তো কথাটা শুনে হাসবেন। তবে আমি এই হত্যার ব্যাপারটা গোড়া থেকে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত পর্যালোচনা করে, বিশেষ বিশেষ কতকগুলো পয়েণ্টস্ আমার যা মনে হয়েছে—

বেশ তো, বলুন না শোনা যাক। এমনও তো হতে পারে যে, কোন কিছু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি—

না না, সে রকম হয়তো কিছু না। তবে—

বলুন, বলুন?

প্রথম পয়েণ্ট হচ্ছে: সূর্যপ্রসাদ রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর ঘরের মধ্যে ারও সঙ্গে যে কথা বলছিলেন সে কথা প্রমাণিত হয়েছে?

তা হয়েছে।

দ্বিতীয় পয়েণ্ট: ওই রাত্রেই সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কেউ না কড সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে আমার তাঁর ঘর থেকে চলে আসবার পর যে দেখা করতে গয়েছিল ওই কথাবার্তা শোনা থেকেই সেটা বোঝা যায়, তাই না মিঃ রায়?

তা যায়।

তা হলে কার পক্ষে ওই সময় সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে সকলের অজান্তে দেখা করা সম্ভব ছল বলে আপনার মনে হয় বলুন, একমাত্র ওই সমর ছাড়া?

কিন্তু—

না না, ভেবে দেখুন, জানলার কার্নিসে ও হোটেলের ঘরের মেঝেতে যে জুতোর াপ পাওয়া গিয়েছে সেটা যে সমরেরই, সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি না? তারপর ধরুন তৃতীয় পয়েণ্ট, ওই রাত্রেই সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সমরকে স্টশন রোডে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল।

হুঁ। কিন্তু—

কিন্তু নয় মিঃ রায়। একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই আমার যুক্তির সারবত্তাটা গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা জানি, ইদানীং সমরের রীতিমত অর্থকষ্ট চলছিল। এবং সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে সে তার বাপকে সাহায্যের জন্য বলা সত্ত্বেও, সূর্যপ্রসাদ তার সে কথায় কান দেননি। তাই হয়তো সে আবার তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হয়েছিল—

সহসা ওই সময় কিরীটী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার সেন!

কি?

রাত সোয়া এগারোটায় বিমলবাবু সূর্যপ্রসাদের ঘরে ঢুকেছিলেন এবং তখনও তিনি জীবিতই ছিলেন।

না, কথাটা আমি ভুলে যাইনি মিঃ রায়। আমার ধরণা—

কি?

আপনার সেদিনকার যুক্তিটাই ঠিক।

কি বলুন তো?

সেই আগন্তুকই হয়তো রাত সাড়ে এগারোটার পর অর্থাৎ বিমলবাবু তার জেঠা-

মণির সঙ্গে দেখা করে চলে আসবার পরই দ্বিতীয়বার আবার জানলা-পথেই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে আবার জানলা-পথেই বের হয়ে গিয়েছে।

অতর্কিতে যেন সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী প্রশ্ন করলে, তা হলে আপনার মতে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে ডাক্তার সেন?

সে-রাত্রের সেই অচেনা আগন্তুক। যার সঙ্গে গেটের কাছে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

ও, তারপর যেন একটু হেসে বললে, তা সেই ছোরাটা। যার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে? সেই ছোরাটা সেই আগন্তুক যোগাড করল কি করে?

সে আর এমন কি শক্ত ব্যাপার। হয়তো ঐ আব্দুলের সঙ্গেই পূর্ব হতে একটা তার যোগাযোগ ছিল এবং আব্দুলই তাকে ছোরাটা সাপ্লাই করেছিল!

তা হলে বলতে চান, সে-রাত্রের হত্যার ব্যাপারে একটা পূর্ব ষড়যন্ত্র ছিল ডাক্তার?

অস্বাভাবিক নয় থাকাটা।

তা অবিশ্যি নয়। তবে—

তবে?

টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ দেওয়াটা আর ঘরের ওই চেয়ারটা—

সত্যি, চেয়ারটার ব্যাপারটায় আপনি যেন অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে!

হঠাৎ কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে, কিন্তু নটা বাজতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। আমাদের এবারে বেরিয়ে পড়া দরকার। সকলেই হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, ডাক্তার সেন!

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমিও।

॥ পনেরো ॥

আমারই গাড়িতে করে আমরা 'লিলি কটেজে' এসে পৌছলাম।

পথে উভয়ের মধ্যে আমাদের আর কোন কথাই হল না।

আমাদের আলোচনার জন্য সেরাত্রে কিরীটীর পূর্ব পরামর্শ মতই যে ঘরে সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছিলেন সেই ঘরটিই নির্দিষ্ট হয়েছিল।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক।

ঘরের মধ্যে সকলেই আমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করছিলেন।

এবং ঘরের মধ্যে সব কিছু যেমন পূর্বে ছিল ঠিক তেমনিই যেন রয়েছে দেখলাম। দল কিরীটীর পূর্ব পরামর্শ মত ডাইনিং হল থেকে বড টেবিলটা এনে ঘরের মধ্যে তা হয়েছিল ও খানকতক চেয়ার সকলের বসবার জন্য টেবিলটার দু'পাশে পেতে ওয়া হয়েছিল।

সে-রাত্রেও বাইরে প্রচণ্ড শীত পড়ায় ঘরের ফায়ার প্লেসটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। বিলটার চারপাশে চেয়ারে সকলেই বসে আছে, সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে লাম।

আমাকে ও মিঃ রায়কে নিয়ে উপস্থিত আমরা তখন ঘরের মধ্যে আটজন।

মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেব সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ, বিমল, সুবল, অমলেন্দু, আমি ও কিরীটী রায়।

ঘরের সিলিংয়ের বিদ্যুৎবাতি নিভিয়ে টেবিলের উপরে একটি নীল ডোমে ঢাকা বিল-ল্যাম্পটি জেলে দেওয়া হয়েছে।

নীলাভ আলোর অস্পষ্টতায় সমগ্র ঘরটি জুড়ে যেন একটি বিচিত্র রহস্য ঘনীভূত য় উঠেছে।

ফায়ার প্লেসের উর্ধ্বে ও পার্শ্বসীমানায় অগ্নির একটা চক্রাকার রক্তাভা যেন ছড়িয়ে য়েছে।

আটটি প্রাণী আমরা ঘরের মধ্যে উপস্থিত, কিন্তু কারও মুখেই যেন টু শব্দটি পর্যন্ত ই। বোবা সকলে।

প্রথমে কিরীটী ও তার পশ্চাতে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কসঙ্গে যেন ছ'জোড়া চক্ষুর নীরব দৃষ্টি যুগপৎ কিরীটীর মুখের উপর বারেকের জন্য বনিবদ্ধ হল।

খোলা জানলা-পথে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সহসা যেন ঘরের মধ্যে একটা প্রেতের র্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেল।

চকিতে সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে রক্ষিত সেই হাইব্যাক্ য়ারটির উপর।

সেই চেয়ার! মাত্র কয়েক রাত্রি আগে ওই চেয়ারের উপরেই সকলে মিলে মরা এই ঘরেই আবিষ্কার করেছিলাম ছুরিকাবিদ্ধ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর হিমশীতল াণহীন দেহটা।

আজ আবার রাত্রে সেই নৃশংস হত্যার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্যই

আমরা একত্রে এই ঘরে এসে মিলিত হয়েছি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

শ্বাসরোধকারী একটা মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা যেন।

মৃত্যু—মৃত্যু এসেছিল সবার অলক্ষ্যে সে-রাত্রে এই কক্ষে।

পা টিপে টিপে এসেছিল। হাতে ছিল তীক্ষ্ণ ছোরা।

কেমন করে—কেমন করে হত্যা করেছিল হত্যাকারী ?

ঢং ঢং ঢং—রাত্রি নটার সংকেতধ্বনি শোনা গেল ঐ সময় সহসা। এবং সঙ্গে স কিরীটীই ঘরের সেই মুহূর্তের জমাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, সকলেই তা হলে আপনা এসেছেন! এই শীতের রাত্রে এভাবে আপনাদের এখানে টেনে এনে কষ্ট দিতে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর নৃশংস হত্যা-ব্যাপারটারও একটা মীমাং হওয়া দরকার আপনাদের সকলের দিক থেকেই, তাই নয় কি ?

কিরীটী উপবিষ্ট সকলের মুখের প্রতিই তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলে।

বলা বাহুল্য, কেউ কোন শব্দ পর্যন্ত করলেন না।

যে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন নির্বাক, নিস্পন্দ।

দুটি চেয়ার তখনও খালি ছিল।

একটিতে আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে অন্যটা টেনে নিয়ে বসল মিঃ রা পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে তা থেকে একটা সিগার নিয়ে অগ্নিসংযে করলে।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত আবার গড়িয়ে গেল।

তারপর কিরীটীই আবার কথা শুরু করলে।

বললে, শুধু খোলাখুলি আলোচনাই নয়, আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আম এই রাত্রে এখানে আপনাদের সকলকে এভাবে একত্রিত করবার। কিন্তু সেটা বলব আগে—বিমলবাবু, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।

নিঃশব্দে তাকালেন বিমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে।

বিমলবাবু! কিরীটী অতঃপর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল, জানি আপ সমরবাবুর শুধু ভাই নন, তাঁর সমবয়সী বন্ধু—সমরকে সত্যিই আপনি ভালবাসে তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি সত্যিই সমরবাবুর বর্তম গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানেন—কোথায় তিনি আছেন বা থাকতে পারেন, তাঁ আপনি অবিলম্বে ফিরে আসতে বলুন!

বোবার মতই যেন চেয়ে আছেন দেখলাম বিমলবাবু কিরীটীর মুখের দিকে।

মিঃ রায় আবার বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এভাবে আত্মগোপন
। থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। এখনও তিনি ফিরে
। হয়তো আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজে পেতেন। নিজেকে defend করবার
টা যুক্তি পেতেন। কিন্তু এর পর হয়তো সে সুযোগটুকুও আর তাঁর থাকবে না।

কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না মিঃ রায়, ওই নৃশংস ব্যাপারে সমরের এত-
ও হাত আছে। বললেন বিমলবাবু।

তাই তো বলছি বিমলবাবু, এখনও তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে বলুন। এখনও
বার সময় আছে।

চেয়ে দেখলাম কিরীটীর শেষের কথায় সহসা যেন বিমলবাবুর মুখটা কেমন
কাশে হয়ে গেল।

শুষ্ককণ্ঠে কোনমতে বিমলবাবু কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, এখনও
য় আছে।

হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমি কিরীটী রায় আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোন
তই আপনার হবে না। যদি জানেন তো এখনও বলুন, কোথায় সমরবাবু
ত্মগোপন করে আছেন ?

বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, রুদ্ধকণ্ঠে বিমলবাবু বললেন, সত্যিই সমরের কোন সন্ধানই
মি জানি না।

জানেন না ?

না, না।

এবারে রাধিকাবাবু কথা বললেন, যদি জান তো কেন বলছ না বিমল ?

বিশ্বাস করুন বাবা, সত্যিই আমি জানি না সমরের কোন সংবাদ। জেঠামণির
্যুর রাত্রে বা তারপর একটিবারের জন্যও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

বেশ। বলে কিরীটী রায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত আমাদের সকলের উপরেই নিঃশব্দে
বার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে, আজ এ ঘরে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন
দের প্রত্যেককেই আমি অনুরোধ করছি, যদি কেউ আপনাদের মধ্যে সমরবাবুর
বাদ জানেন তো অনুগ্রহ করে বলুন আমাকে এখনও।

কিন্তু সকলেই নির্বাক।

কারও মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন থমথম্ করছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাধিকাপ্রসাদই আবার বিমলবাবুকে সম্বোধন করে

বললেন, কেন বোকামি করছ বিমল, জান যদি তো বল না সমর কোথায়? সে অন্যায় করেই থাকে তো—

কিন্তু শেষ হল না রাধিকাপ্রসাদের কথা। আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান বিমল এ আপনি কি বলছেন বাবা। আপনিও কি মনে করেন সমরই জেঠামণিকে করেছে? তাকে কি আপনি চেনেন না?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে পাল্টা প্রতিবাদ জানালেন রাধিকাপ্রসাদ, থাম, কতটুকু তুমি সংসারের জান? সমর যে ইদানীং গোল্লায় গিয়েছিল, জুয়ো-নেশা কোন কিছুই যে বাদ ছিল না তা কে না জানে। তা ছাড়া আমি নিজে তো জানি, দাদাকে অর্থের জন্য জানিয়েছিল।

সহসা বিমলবাবু এবারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভগ্ন করুণ কণ্ঠে উঠলেন, মিঃ রায় আপনি কি একটি কথাও বলতে পারছেন না? কেন— আপনি চুপ করে আছেন?

উনি আর কি বলবেন বিমলবাবু। বললেন মেজর স্বামী।

বিমলবাবু, শান্ত হোন। কিরীটী আবার মুখ খুললে, ব্যস্ত হবেন না।

তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মিঃ রায় আবার আমাদের সকলের মুখের দি তাকিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, আমি যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়েছি, যেমন করে উপায়েই হোক এ রহস্যের কিনারা আমি করবই। চাই কি এ ব্যাপারে আপন কেউ আমাকে সাহায্য করুন বা না করুন!

সহসা মেজর কৃষ্ণস্বামী প্রতিবাদ জানালেন, আপনি এ কথা বলছেন কেন রায়? আমরা কি আপনাকে সূর্যপ্রসাদের হত্যারহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে সাহায্য করিনি বলতে চান?

না, করেননি—

মানে?

মানেটা তো বোঝা তেমন কঠিন নয় মেজর স্বামী। এখানে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন এই মুহূর্তে, যদি বলি তাঁরা সকলেই তাঁদের জবানবন্দীতে কি না কিছু গোপন করেছেন, কথাটা কি মিথ্যা বলা হবে?

নিশ্চয়ই। বললেন আবার মেজর স্বামী।

না, মিথ্যা নয়। আমি বলছি, আপনাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আমার কা গোপন করেছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে যতটুকু জানেন ওই ব্যাপা আমাকে অকপটে সব খুলে বলেননি।

এবারে সবাই চুপ।

বলুন, ঈশ্বরের নামে, আপনাদের প্রত্যেকের বিবেকের নামে শপথ করে বলুন আমার কথা মিথ্যা?

চুপ। সবাই চুপ। সবাই যেন একেবারে বোবা।

আপনাদের প্রত্যেকের নীরবতাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। যাক, াব আর কিছু বলবার নেই। যা আমার আজ বলবার ছিল সব বলা হয়েছে।

কিরীটী আর দাঁড়ালে না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ষোল ॥

াব দিন প্রত্যুষে ডিস্‌পেন্‌সারির চেম্বারে রোগী দেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি. হঠাৎ নটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং ··

রিসিভারটা তুলে নিলাম, হ্যালো, ডাক্তার সেন স্পিকিং।

ফোনে থানা-অফিসার মিঃ পাণ্ডের গলা শোনা গেল।

কে, ডাক্তার সেন? আমি পাণ্ডে কথা বলছি। মিঃ রায়কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি াব 'লিলি কটেজে' যদি আসেন—

কি ব্যাপার মিঃ পাণ্ডে?

আসুন না। এলেই সব জানতে পারবেন। দেরি করবেন না।

যাচ্ছি।

ফোনটা রেখে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

কিরীটী তার বাসাতেই ছিল।

আমার মুখে সব শুনে বললে, বেশ, চলুন।

আমারই গাড়িতে দুজনে 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

গেটের কাছে একজন কনেস্টবল আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে-ই াদের বললে, সোজা উপরে একেবারে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর সংলগ্ন বসবার ঘরে া যাবার জন্যে। মিঃ পাণ্ডে নাকি সেই ঘরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সূর্যপ্রসাদের বসবার ঘরে ঢুকতেই পাণ্ডে আমাদের আহ্বান জানালেন, আসুন মিঃ

রায়, ডাক্তার সেন—

ব্যাপার কি মিঃ পাণ্ডে! এত জরুরী তলব একেবারে! কিরীটীই প্রশ্নটা করলে

বিশেষ কিছু না। পরশুদিন থানায় আপনি আমাকে বলেছিলেন না মিঃ রায়, গুপ্তর শয়নঘরটা আর একবার ভাল করে মাইনিউটলি সার্চ করে দেখবার জন্য—

হ্যাঁ।

গতকাল একটা ডাকাতি কেসে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, সময় করে উঠতে পারিনি তাই আজ যখন এলাম সার্চ করে দেখবার জন্য, ভাবলাম আপনারাও উপস্থিত থাকু তাই ডেকেছি। পাণ্ডে বললেন।

বেশ চলুন, দেখা যাক।

কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমতই সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরটা তাঁর নিহত হবার পর খানাতল্লাশী করবার পর থেকেই পুলিসের জিম্মায় তালাবন্ধ ছিল। এবং চাবি ছি পাণ্ডের কাছেই। এ কদিন আর ঘরটা খোলা হয়নি।

আজ সকলের উপস্থিতি ও সাক্ষাতেই তালা খুলে আমরা সকলে পুনরায় প্রসাদের শয়নঘরে প্রবেশ করলাম।

জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হল কার দীর্ঘশ্বাস একটা শুনতে পেলা সেদিন প্রত্যূষে যেমন দেখেছিলাম আজও ঠিক তেমনটিই রয়েছে সব ঘরের মধ্যে

কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের জানলা দুটো খুলে দিল।

প্রথম দিনের প্রসন্ন আলো খোলা জানলা-পথে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল

সিঙ্গল পালঙ্কে শয্যাটি তেমনি পাতা আছে।

পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি আয়রন চেস্ট গড্‌রেজের। ঘরের এক ছোট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ার।

শয্যার তলাতেই সিন্দুকের চাবি ছিল।

পাণ্ডে চাবির সাহায্যে সিন্দুকটা খুললেন। সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া গেল এ দামী কাসকেটের মধ্যে সূর্যপ্রসাদের মৃত স্ত্রীর গহনাগুলো, কিছু পুরাতন চিঠি বেশীর ভাগই সেগুলো সূর্যপ্রসাদের প্রথম জীবনে স্ত্রীর লেখা।

এবং পাওয়া গেল একটা আইভরির কৌটোর মধ্যে গোটাপাঁচেক বাদশা মোহর।

অতঃপর পাণ্ডে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুললেন। প্রথম কেই কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে লাল সুতোয় বাঁধা দশ টাকার নোটের একটা

ড়া পাওয়া গেল। নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে পাণ্ডে বললেন,
শ্চর্য, ড্রয়ারের মধ্যে মিঃ গুপ্ত এতগুলো নগদ টাকা এভাবে রেখে দিয়েছিলেন!

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অমলেন্দু। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরাবর তো ঐভাবে
ারের মধ্যেই টাকা রাখতেন মিঃ গুপ্ত।

তাই নাকি! মারো গোলি, তা এ যা চাবি দেখছি, এ ড্রয়ার তো অনায়াসেই
ঙে খোলা যায়। পাণ্ডে আবার বললেন।

অমলেন্দু আবার বললেন, চাকরবাকরদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তবে
টাকাটা মনে হচ্ছে, যে রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার
কা আমি তাঁরই নির্দেশে তুলে এনে দিয়েছিলাম, বোধ হয় সেই টাকাটাই।

হাজার টাকা তুলে এনে দিয়েছিলেন? প্রশ্ন করলেন আবার পাণ্ডে।

হ্যাঁ। সব দশ টাকার নোট ছিল।

এবারে বিনা বাক্যব্যয়ে লক্ষ্য করলাম, পাণ্ডে নোটের তাডাটা গুনছেন। বার
গুনে অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মারো গোলি, কিন্তু এতে তো
খছি হাজার নেই। পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট কম।

পঞ্চাশখানা মানে পাচশত টাকা কম! অমলেন্দু বললেন।

তাই তো গুনে দেখছি। হয়তো পাঁচশত টাকা কাউকে তিনি দিয়েছিলেন এর
ধ্য থেকে। বললেন পাণ্ডে।

টাকাকড়ি যখন যাকে দেওয়া হত ইদানীং বরাবর আমার কাছেই হিসাব থাকত।
উকে পাঁচশত টাকা সেদিন দিলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম। তা ছাড়া টাকাগুলো
। আমি তাঁকে সেদিন রাত্রে ডিনারের অল্প আগে দিয়েছিলাম। এবং আমারই
মনে তিনি টাকাগুলো ড্রয়ারে রেখেছিলেন।

কিরীটী এবারে বললে, ডিনারের পর হয়তো কাউকে টাকাটা তিনি দিয়েছেন।

না, তা হতে পারে না, কারণ আমাকেই তিনি বলেছিলেন টাকাটা পরের দিন
ালে তাঁর প্রয়োজন আছে। কণ্ঠে বেশ কিছুটা জোর দিয়েই কথাগুলো বললেন
লেন্দু।

কিন্তু পাঁচশত টাকা যখন বাণ্ডিলের মধ্যে কম তখন তিনি সেই রাত্রেই টাকাটা
উকে দিয়েছিলেন কিংবা কেউ সেই রাত্রে তাঁর অজান্তেই ঘরে ঢুকে টাকাটা—আই
ট সে—চুরি করেছে!

মারো গোলি, ইয়েস, ইউ আর রাইট মিঃ রায়! কিরীটীর মন্তব্যকে সমর্থন
লেন পাণ্ডে।

আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কে কে সে রাত্রে ডিনারের পর এ ঘরে এসেছিলে
হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

জবাব দিলেন অমলেন্দুই, তা তো ঠিক বলতে পারি না, তবে ডিনারের
বিছানা ঠিক করে দিতে রোজকার মত আব্দুল এসেছিল এ ঘরে, আমি জানি।

আব্দুলকে তখুনি ডাকানো হল পাণ্ডের নির্দেশে।

আব্দুল ?

আজ্ঞে—

সে রাত্রে সাহেবের বিছানা ঠিক করবার জন্য তুমি এ ঘরে এসেছিলে তো,
প্রশ্ন করেন পাণ্ডেই।

হ্যাঁ।

তোমার সাহেবের ঐ ড্রয়ারে হাজার টাকার নোট ছিল, কিন্তু এখন পাঁ
টাকা কম দেখা যাচ্ছে !

আল্লার কসম হুজুর, টাকার কথা কিছুই আমি জানি না।

প্রায় কেঁদে ফেলে আব্দুল।

পাণ্ডে কিন্তু চিৎকার করে ধমকে উঠলেন আব্দুলকে, মারো গোলি, আ
মিথ্যে বলছিস ! চোর বদমাস—ডাকু কাঁহেকা। গোলি মারকে একদম
নিকাল দেগা, সাচ্ মুচ্ বাতাও !

দোহাই হুজুরের, টাকা আমি নিইনি, বিশ্বাস করুন।

জরুর তুম্ লিয়া হ্যায়। গর্জন করে উঠলেন পুনরায় পাণ্ডে।

না হুজুর, সত্যিই আমি নিইনি--

মারো গোলি। ব্রিজনন্দন ?

হোজুর !

সিপাই ব্রিজনন্দন এসে ঘরে ঢুকল। খট্ করে সেলাম দিল।

আব্দুলের শপথ বা কান্নায় কোন কানই দিলেন না পাণ্ডে। তখুনি ব্রিজনন্দ
জিম্মায় হাতকড়া লাগিয়ে আব্দুলকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে আব্দুল চলে গেল।

এবং অনুসন্ধানের ব্যাপারেও আপাততঃ ঐখানেই ইতি পড়ল। মিঃ পাণ্ডের
সঙ্গে আমি ও মিঃ রায়ও বের হয়ে এলাম 'লিলি কটেজ' থেকে।

আমারই গাড়িতে সবাই ফিরে চললেন।

হয়তো আছে একটা কিছু।

মারো গোলি! হয়তো আছে? কিন্তু কি? বলে নিজেই বললেন মিঃ পাণ্ডে, তার টাকার প্রয়োজন অতএব এই সময় যে কোন উপায়ে তার বাপকে সরাতে পারলে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবে এবং অভাবটাও মিটবে এই বোধ হয়।

একেবারে না-ই বা বলি কি করে! কিরীটী পুনরায় মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলে।

মারো গোলি! ননসেন্স্! ঝুটমুট সে তার বাপকে হত্যা করতে যাবে কেন ন তো? সে ভাল করেই জানত তার প্রতি তার বাপের রীতিমত দুর্বলতা আছে।

দুর্বলতা!

নিশ্চয়ই। নইলে ঐভাবে চেক জালের ব্যাপারের পরও সূর্যপ্রসাদ কখনো ব্যাপারটা একড দিয়ে দিতেন?

ণের দ্ব টা স্নেহ না হয়ে তার পুত্রের প্রতি নিজের পারিবারিক কলঙ্ককে চাপা দেওয়ার কিরীটী তো হতে পারে, মিঃ পাণ্ডে! কিরীটী বললে।

যে দি রো গোলি! মোটেই তা নয়।

আছে য়?

যেতে শচয়ই না। হিউম্যান কারেক্টার আমার মত যদি study করতেন তো বুঝতে বের তন মিঃ রায়, ঐ সময়ই নিশ্চয় আক্কলকে হাত করে তাকে দিয়ে বাপকে ন কিনা ছ।

তা হয়ে রীটী আবার মৃদু হাসলে।

এবং ডাক্তা ছন যে মিঃ রায়?

বে দরজার কটা সম্ভাবনার কথা এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ পাণ্ডে!

গিয়েছিল। য?

ডাক্তার সেন সনের জবানবন্দিতে একটা কথা আমরা শুনেছিলাম—

মারো গোলি!

থতমত খেয়ে গিয় খাম ও লেটার-পেপারে লেখা সূর্যপ্রসাদের কাছে তার বন্ধুর চিঠিটা—

কি আপনার ধারণা?

সম্ভবতঃ সূর্যপ্রসাদকে হ'সাদের পড়ে শোনাবার জন্য ডাক্তার সেনকে বার বার পীড়া

স্থিতিটা বুঝে নিতে এতে বলতে মিঃ রায় একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে

vementsকে সন্দেহ করে শুনে শোনেননি বা শুনতে চাননি উনি, তাই না ডাক্তার সেন

লক্ষ্য করলাম এবারে কিরীটী

একটা হাসির রেখা চকিতে দেই চিঠিটার মধ্যে সময়ের উল্লেখ ছিল। তাই না ডাক্তার

মৃদু কণ্ঠে আমি সমর্থন জানালাম, হ্যাঁ।

তা হলে এমনও তো হতে পারে, ঐ চিঠির মধ্যে সূর্যপ্রসাদের কোন পারিবারিক কলঙ্কের কথা সত্যিই ছিল?

পারিবারিক কলঙ্ক!

ডাক্তারও তো তাই সমর্থন করেন। তাই না ডাক্তার সেন? কিরীটী আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলে।

হ্যাঁ, মানে—

যাক সে কথা। বলছিলাম এমনও তো হতে পারে, সমরই কোন না কোন উপায়ে জগৎজীবনবাবুর মৃত্যু ঘটিয়ে পুলকজীবনবাবু তার ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাবার ভয় দেখিয়ে, তার কাছ থেকে টাকা দোহন করছিল! অর্থাৎ সাদা কথায় পুলকজীবনকে black-mailing করছিল! আর সেই কথাটারই হয়তো উল্লেখ ছিল সেই ব্লু রঙের চিঠিতে।

আশ্চর্য! Poor সমর, ক্রমেই দেখছি তার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণগুলো ঘোরালো হয়ে উঠছে একের পর এক। কথাটা বললাম আমিই এবার।

চকিতে কিরীটী রায় আমার দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, হচ্ছে নাকি?

তাই তো দেখছি মিঃ রায়। জবাব দিলাম।

কিন্তু ওইখানেই ডাক্তার সেন আপনার ও মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আমার মতভেদ ঘটছে

মারো গোলি? কিউ? প্রশ্ন করলেন পাণ্ডে।

কারণ যদিও তাঁর বর্তমান দুরবস্থার জন্য নিদারুণ অর্থাভাব, জুয়ার প্রতি তাঁর নেশা ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং শেষোক্ত দুটি জোরালো কারণ প্রভৃতি তার মোটিভই প্রমাণ করছে, তথাপি—

তথাপি কি মিঃ রায়? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

ধীর শান্ত মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন এবারে মিঃ রায়, তথাপি কোনমতেই এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সমরবাবুই তাঁর পিতার হত্যাকারী।

মারো গোলি! কিউ? প্রশ্ন করলেন পাণ্ডে আবার।

সহজ ও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে। যাকে বলেন আপনারা common-sense

মারো গোলি!

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে তিনজনে আমরা যে ঘোরাপথে হাঁটতে হাঁটতে কিরীটীর বাসাবাড়ি 'সানি ভিলা'র গেটের সামনে এসে গিয়েছি, আমি বা পাণ্ডে টের পাইনি

কিরীটী রায়ের পরবর্তী কথাতেই চমক ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা খেয়াল হল।

আসুন ডাক্তার সেন, মিঃ পাণ্ডে—গরীবের বাড়িতে এক কাপ করে চা খেয়ে যান।

না না—চা—, বাধা দেবার চেষ্টা করলাম আমিই।

কিন্তু কিরীটী কানই দিলে না যেন সে কথায়।

বললে, আরে আসুন আসুন!

কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি কত বড় একটা বিস্ময় পরমুহূর্তেই কিরীটীর 'সানি ভিলা'য় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

'সানি ভিলা'র গেট দিয়ে প্রবেশ করে, বাইরের ঘরের পর্দা তুলে ভিতরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঘরের মধ্যে একাকী একটা সোফায় দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বিমলবাবু।

কে? বিমলবাবু?

কিরীটীর সচকিত প্রশ্নে চমকে মাথা তুলে তাকালেন বিমলবাবু আমাদের দিকে।

সমস্ত মুখখানার মধ্যে তখন যেন তাঁর মনে হল, লজ্জা অপমান ও নিদারুণ একটা হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিমলবাবু! আবার নিরুত্তর বিমলবাবুর দিকেই তাকিয়ে ডাকলে মিঃ রায়।

মারো গোলি! আপ কেইসে হিয়া আ গেই বিমলবাবু?

বিমলবাবু তবু নিরুত্তর।

বসুন বসুন মিঃ পাণ্ডে, বসুন ডাক্তার সেন! কিরীটীই আবার বললে।

আমরা উভয়েই অতঃপর দুটো সোফায় উপবেশন করলাম।

লেকেন বাত্ কেয়া বিমলবাবু, আপ হিয়া কিউ?

বিমলবাবু তথাপি নিরুত্তর।

কি হয়েছে বিমলবাবু? কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটীর স্নেহভরা কণ্ঠস্বরে এবারে মুখ খুললেন বিমলবাবু।

মিনিট দশেক হবে এসেছি মিঃ রায়।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন বিমলবাবু, আপনারা আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সাইকেলে চেপে এখানে চলে এসেছি সোজা মিঃ রায়।

মৃদু হেসে এবারে কিরীটী হঠাৎ বললে, কিন্তু যা আপনার আমাকে বলার ছিল সেটা গত রাত্রেই আমাকে বলতে পারতেন।

মিঃ রায়—

হ্যাঁ, আপনাকে তো আমি আশ্বাস দিয়েছিলামই। সেক্ষেত্রে সত্যটুকু বলবা মত সৎসাহস আপনাদের সকলের কাছেই কিন্তু আমি আশা করেছিলাম—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল।

কে এল ?

উঠে দাঁড়াল মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়।

খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়ে দেখি, মিঃ পাণ্ডের অধীনস্থ পুলিস কর্মচারী সতীনা বাবু সাইকেল থেকে নামছেন।

সতীনাথ সাইকেলটা একপাশে ঠেসান দিয়ে রেখে সোজা একেবারে এসে ঘ ঢুকলেন।

মিঃ পাণ্ডেই সর্বপ্রথম সতীনাথকে প্রশ্ন করলেন।

কেয়া বাত্, হায় সতীনাথ ?

সতীনাথ তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন, সে লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে স্যার।

কে ? কাকে পেয়েছেন ? প্রশ্ন করলে এবারে মিঃ রায়।

সেই যে—যার সঙ্গে সেরাত্রে, মানে মিঃ গুপ্তর হত্যার রাত্রে 'লিলি কটেজে' গেটের সামনে ডাঃ সেনের ধাক্কা লেগেছিল !

মারো গোলি ! মিল গিয়া—সাবাস সতীনাথ ! জিন্দ্ রহো বেটা ! তুম ত সব কামাল কর দিয়া মেরে লাল !

আনন্দে একেবারে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিঃ পাণ্ডে।

॥ আঠারো ॥

সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো তখন একেবারে থ।

কিন্তু পাণ্ডে তখনও সোৎসাহে বলে চলেছেন, মারো গোলি ! হুঁ হুঁ বাবা, ঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। Long eleven years experience in this line ! কি মিঃ রায়, হাম আপকো বোলা নেই—ও শালাকো জরুর হাম পাকার লেঙ্গে ?

মিঃ পাণ্ডে গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

কিরীটী রায় ধীরপদে সোফা থেকে উঠে গিয়ে ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত একটি সুদৃ রৌপ্যাধার থেকে একটি চুরোট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে পুনরায় নিঃশ

:সে সোফার উপরে বসল।

ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোন গুরুত্বই নেই।

নিতান্ত স্বাভাবিক দৈনন্দিনের একটি ঘটনা মাত্র।

সতীনাথবাবু! সহসা কিরীটী কথা বললে।

বলুন ?

লোকটিকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

না। তবে আপাততঃ তাকে পুলিসের নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে সন্দেহের বশে।

জবাব দিলেন সতীনাথবাবু।

ও। তা লোকটার কোন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে ?

একের নম্বরের ঝানু আর বদমাস লোকটা মিঃ রায়। কোন কথা বলতেই চায় না।

হুঁ। কোথায় নজরবন্দী করে রেখেছেন তাকে ?

মুড়ি পুলিশ স্টেশনে।

মারো গোলি! তা হলে তো এখুনি আমাদের একবার সেখানে যাওয়া দরকার, কি বলেন মিঃ রায় ?

তা দরকার বৈকি। কারণ যে ধরা পড়েছে সে-ই যে সেই রাত্রের অচেনা লোকটি সেটা তো এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে তার সনাক্তকরণেরও তো একটা দরকার আছে। বললেন মিঃ রায়।

সনাক্তকরণ! ও তো জরুর হো যায়গা। যব পাকার গিয়া ভাগেগা কিধার!

তা সত্যি। তা হলে ডাক্তার সেন—

বলুন ?

তাকালাম আমি মিঃ রায়ের মুখের দিকে।

বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার সাহায্যেরই তো সব চাইতে বেশী প্রয়োজন আমাদের।

আমার ?

হ্যাঁ। কারণ it was you—যাঁর সঙ্গে সেরাত্রে ঐ লোকটির 'লিলি কটেজে'র সামনে ধাক্কা লেগেছিল! মিঃ রায় বললে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—রায় সাব বিলকুল ঠিক বোলা। সমর্থন করলেন মিঃ পাণ্ডে।

তাই বলছিলাম, আপনি identify করলেই তো ব্যাপারটা চুকে গেল।

জরুর। চলিয়ে ডক্টর সেন।

বেশ, চলুন।

পুলিস ভ্যানে চেপেই আমরা অতঃপর থানা থেকে মুড়ি পুলিস স্টেশনের দিকে

রওনা হলাম সকলে।

বলা বাহুল্য পূর্বেই বিমলবাবুকে তখনকার মত বিদায় দেওয়া হয়েছিল।

বেলা তখন গোটা-বারো হবে।

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে আকাশটা যেন একেবারে পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

পুলিস ট্রাকটা গন্তব্যস্থানের দিকে চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটছিল।

সকলেই চুপচাপ ভ্যানের মধ্যে বসে। একমাত্র অনর্গল বক্তা মিঃ পাণ্ডে ব্যতীত। পাণ্ডে সতীনাথকে বাহবা দিয়ে বলছিলেন, তুম হে জরুর প্রমোশন মিলনা চাইয়ে সতীনাথ। আজই রাতকো হাম পাটনা মে রিপোর্ট ভেজা দুঙ্গা। তোম এস্ আই. বন যায়গে বেটা।

সতীনাথ কিন্তু চুপ।

কারণ বাকসর্বস্ব পাণ্ডেকে তিনি বোধ হয় ভাল করেই চিনতেন। পাণ্ডে যে ঠিক উল্টোটিই করবেন তা হয়তো তাঁর জানা ছিল।

সমস্ত বাহাদুরি নিজে পকেটস্থ করেই তিনি রিপোর্ট দেবেন।

আমার মাথার মধ্যে তখন কিন্তু একটিমাত্র চিন্তাই পাক খাচ্ছিল। বিমলবাবু কি বলতে এসেছিলেন মিঃ রায়কে!

কি এমন কথা যা পূর্বে তিনি গোপন করেছিলেন এবং যা শেষ পর্যন্ত বলতে প্রস্তুত হয়েছিলেন!

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ ভ্যানটা এসে মুড়ি আউট-পোস্টের সামনে এসে দাঁড়াল।

কাঁটা তার ও রাংচিতার বেড়া দেওয়া ছোট কম্পাউণ্ড ও তার মধ্যস্থলে ছোট একতলা একটা বাড়ি।

ভ্যান থেকে নেমে সকলে আমরা এগিয়ে চললাম।

সর্বাগ্রে মিঃ পাণ্ডেই ভারী অ্যামুনিশান বুটের মচ্ মচ্ শব্দ তুলে এগিয়ে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে আমি, মিঃ রায় ও সতীনাথ।

ঘরে ঢুকতেই থানা-ইন্‌চার্জ মিঃ চৌবে তাঁর বিরাট ভুঁড়িটা নিয়ে কোনমতে হাঁস-ফাঁস করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন, বোধ হয় সকলকে অভ্যর্থনা জানাতেই।

মিঃ পাণ্ডে কাউকে থানা-ইনচার্জের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ধার দিয়েও গেলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, কিধার হ্যায় উ আদমী? ইধার বোলাইয়ে—

তখুনি দরোয়ানকে ডেকে চৌবে লোকটাকে অফিসঘরে আনতে বললেন

যেদঘর থেকে।

একটু পরেই দরোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এসে ঘরে ঢুকল।

বয়েসে যুবক। বাইশ-তেইশের বেশী বয়স হবে না যুবকটির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে াকালাম আমি তার দিকে।

বেশ ঢ্যাঙা, রোগাটে এবং পাকানো চেহারা।

রসকষহীন দীর্ঘ অত্যাচার-সাক্ষরিত রুক্ষ একটা ভাব চেহারার মধ্যে সুস্পষ্ট।

রোগা এবং ঢ্যাঙা হলেও দেহের প্রতিটি পেশী যেন দেহে শক্তিরই সাক্ষর দেয়।

মাথাভর্তি তৈলহীন রুক্ষ বিপর্যস্ত কেশ।

মুখের রং কিছুটা রোদে পোড়া, তামাটে এবং এককালে যে গায়ের রঙ পরিষ্কারই ছল, একালে আজও তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

পরিধানে একটা মলিন চকোলেট কালারের লংস ও গায়ে একটা কালো রঙের রাতন লংকোট।

কোটের কলার উল্টানো।

মুখটা ভেঙে গিয়েছে, ছোট ছোট দাড়িতে ভর্তি মুখটা।

চোখের দৃষ্টিতে যেন একসঙ্গে ঘৃণা ও আক্রোশ ফুটে বের হচ্ছিল।

কেয়া নাম তোমারা? প্রশ্ন করলেন পাণ্ডেই সর্বপ্রথম লোকটিকে।

রুক্ষ বিরক্তিভরা কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, কেন, কতবার বলতে হবে? কমল—

কমল কি? আপনার পদবী কি? জিজ্ঞাসা করলে এবারে কিরীটী।

পূর্ববৎ রুক্ষ কর্কশ বিরক্তিভরা কণ্ঠে জবাব এল, কেন বলুন তো নাম, গোত্র, পদবী, কুজি সব চাইছেন? কি করেছি আমি?

কঠোর কণ্ঠে এবারে জবাব দিলেন মিঃ পাণ্ডে, দেখিয়ে বাবুজী, ভাল ভাবে কথার বাব না দেন তো ঠাণ্ডি গারদে আটকে রাখব। কুছ্ খানা পানি ভি নেহি মিলেগা।

কেন? আমি চুরি করেছি না খুন করেছি?

হঠাৎ কিরীটী রায়ের কণ্ঠে চমকে উঠলাম, ডাক্তার সেন।

বলুন?

কি, লোকটাকে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে?

হুঁ। লম্বা লোকটা অনেকটা এই রকমই বটে—তবে অন্ধকারে একটুক্ষণের ন্য দেখেছিলাম—

কিরীটী আমার কথার জবাব দিলে না।

লোকটির দিকে আবার কি যেন তাকিয়ে দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে।

তারপরই আবার সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে, কই কমলবাবু, আপনার পদবীটা তো বললেন না ?

এবারে যেন সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র ব্যাঘ্রের মতই গর্জন করে উঠল কমল, বলব না—শুনছেন, বলব না !

বলবেন না ?

না—না—না। তারপরই পার্শ্বে দণ্ডায়মান চৌবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ আক্রোশভরা কণ্ঠে, আমাকে ছেড়ে দেবেন কি না বলুন ?

কঠোর কণ্ঠে এবারে প্রত্যুত্তর দিলেন পাণ্ডে, না, ছাড়া হবে না।

হবে না ? কিন্তু কেন শুনতে পাই কি ! কিসের জন্য এভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন ?

জবাব দিলেন এবারে সতীনাথবাবু, আজ ভোররাত্রের দিকে আপনি 'লিলি কটেজে'র পিছনের বাগানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন কেন ?

আমার খুশি—

বেশ খুশিই না হয়, কিন্তু আমাদের একজন পুলিস-প্রহরী আপনাকে দেখতে পেয়ে যখন ডেকেছিল, আপনি তখন সাড়া না দিয়ে পালিয়ে এলেন কেন ?

কে বললে পালিয়ে এসেছি ! মিথ্যে কথা।

আমি একাগ্রচিত্তে কমলের বদানুবাদ শুনছিলাম।

এবং এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি, ঐ লোকের সঙ্গেই সেরাত্রে 'লিলি কটেজে'র সামনে আমার ধাক্কা লেগেছিল, ওর কণ্ঠস্বরও আমি চিনতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায়ের মুখের দিকে চেয়ে চাপা-কণ্ঠে বললাম, মিঃ রায়, চিনেছি এই লোকের সঙ্গেই সেরাত্রে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

চিনতে পেরেছেন ?

হ্যাঁ।

কমলবাবু !

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কমল। কিরীটীর ডাকে কোন সাড়াই দিল না।

শুধু গতকাল রাত্রেই নয়, কিছুদিন আগেও এক রাত্রে আপনি এগারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে'র সামনে গিয়েছিলেন—

তাই নাকি !

হ্যাঁ, আর যে লোকের সঙ্গে সেরাত্রে আপনার ধাক্কা লেগেছিল ও যাকে আপনি 'লিলি কটেজে'র কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এখানেই উপস্থিত। আপনাকে তিনি

নতে পেরেছেন।

বেশ করেছেন।

কিন্তু গিয়েছিলেন কেন ?

আমার খুশি আমি গিয়েছিলাম। আমি কোথায় যাব না যাব তাও কি অন্যকে জ্ঞাসা করে যেতে হবে নাকি ? ঝাঁজালো কণ্ঠে জবাব দিলেন কমলবাবু।

তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে সেরাত্রে আপনি 'লিলি কটেজে'র সামনে যেছিলেন ? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে।

গিয়ে থাকি গিয়েছি, না গিয়ে থাকি না গিয়েছি। কিন্তু মশাই জিজ্ঞাসা করতে রি, এসব অবান্তর জেরা কেন আমাকে করছেন আপনারা ?

আপনি কি সংবাদপত্রে 'লিলি কটেজে'র মালিক সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর রহস্যজনক ত্যার কথা পড়েননি কমলবাবু ?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে মিঃ রায় কমলের দিকে।

বলিহারি বাবা ! কি বুদ্ধি আপনাদের। সত্যি আপনাদের বুদ্ধির বালাই নিয়ে ামার জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা করছে। অ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমাকেই তবে সূর্যপ্রসাদের ত্যাকারী ঠাওরে নিয়েছেন আপনারা। ব্রেভো !

কিন্তু সেরাত্রে আপনি রাত এগারোটার সময় 'লিলি কটেজে'র গেটের সামনে পস্থিত ছিলেন, এ কথাটা তো অস্বীকার করতে পারেন না কমলবাবু ?

কিরীটী আবার বললে পূর্ববৎ দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে।

কিন্তু আমি যদি বলি, না, যাইনি ?

যাননি ?

না।

যাননি ?

না, না।

কিন্তু আমি বলছি আপনি গিয়েছিলেন।

গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চান নাকি কথাটা ?

না, গায়ের জোরে নয়। প্রমাণ আছে আমার।

প্রমাণ ! কি, ফটো তুলে রেখেছিলেন বুঝি সে-সময় আমার একটা ?

না, ফটো নয়। কিন্তু দেখুন তো—, বলতে বলতে চকিতে পকেটে হাত চালিয়ে রীটী সেই সূর্যপ্রসাদের বাগানে মালীর ঘরের পাশের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া নস্যির বেটা বের করে কমলের সামনে ধরে বললে, চিনতে পারছেন এটা ?

কিন্তু আশ্চর্য, জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিলে মুহূর্তে যেমন জোঁকের অবস্থা ঠিক তেমনি যেন ছোট্ট হয়ে গেল সহসা কমলের মুখখানা কিরীটীর হাতে কা রঙের সেই নস্যির কৌটোটা দেখে। এবং ক্ষণপূর্বের তার সেই ঔদ্ধত্য ও আত্ম যেন দপ্ করে ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাবার মত নিবে গেল।

কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্য।

পরক্ষণেই কমলের মুখের ভাব ও চেহারা পরিবর্তিত হল।

এবং ক্ষণপূর্বের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললে, চমৎকার, একটা অতি সাধারণ কা রঙের নস্যির কৌটো প্রমাণ করে দিল যে সেরাত্রে 'লিলি কটেজে' আমি গিয়েছিলা

অদ্ভুত একটা কাঠিন্য যেন চকিতে কিরীটী রায়ের সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ও তিনি ঋজু কঠিন কণ্ঠে এবারে বলেন, কমলবাবু, কিরীটী রায়ের সঙ্গে আপনার পরি নেই, নচেৎ বুঝতে পারতেন সে যখন কোন ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হয় তখন তার যু ও প্রমাণের সাহায্যেই হয়। কিন্তু এই তো বয়েস আপনার, কোকেন অভ্যাস ব দিন হল করেছেন?

কোকেন?

অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কমল কথাটা উচ্চারণ করলে।

হ্যাঁ, কোকেন। এবং পরক্ষণেই পূর্ববৎ কঠিন স্বরেই বললে, আপনার কথা শু মনে হচ্ছে, জীবনে যেন ও বস্তুটির নামও আপনি শোনেননি! শুনুন কমলব কোকেনে যারা অভ্যস্ত তাদের লক্ষণগুলো আমার অজানা নয়। আপনার দাঁ ঠোঁট ও চোখের তারারন্ধ্র তার সাক্ষী দিচ্ছে। তা ছাড়া নস্যির সঙ্গে কো মেশানো থাকলেও, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে সেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে।

কমল এবারে একেবারে নিথর স্তব্ধ।

কি কমলবাবু, এবারে বোধহয় স্বীকৃতি দিতে আপত্তি হবে না আপনার?

পাণ্ডে এবারে বললেন, মারো গোলি! কিউ আভি বোলো ও রোজ রাত 'লিলি কটেজমে' তুম গিয়া কি নেহি?

মৃদু শান্তকণ্ঠে এবার কমল জবাব দিলে, হ্যাঁ, সেরাত্রে সেখানে আমি গিয়েছিলা কিন্তু—

বলুন?

সোয়া এগারোটার সময়েই সেখান থেকে আমি চলে আসি। সেখান লোকেরাই তার সাক্ষী দেবে।

বেশ, এন্‌কোয়ারি করে যদি তাই প্রমাণ হয় তো আপনি যে নির্দোষ মেনে

া। কিন্তু আপনার নির্দোষিতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পুলিসের বন্দী হয়ে থাকতে হবে কমলবাবু। কিরীটী বললে।

বেশ।

কিন্তু সেরাত্রে ঐ সময় কেন 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন? পুনরায় প্রশ্ন করলে টী।

দরকার ছিল আমার।

কি দরকার ছিল?

একজনের সঙ্গে সেখানে আমি—

বলুন?

একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

অত রাত্রে?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

বলতে পারব না।

বলবেন না?

না।

কেন?

কারণ কথাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া রাত সোয়া বাটায় যদি সেখান থেকে চলেই এসে থাকি, তা হলেই তো আমার নির্দোষিতা হয়ে যায়। তবে কেন আবার এসব প্রশ্ন!

প্রশ্ন করছি এই জন্য যে, রাত্রি সোয়া এগারোটায় সেখান থেকে চলে আসবার য আবার আপনি রাত বারোটার মধ্যে কোন এক সময় সেখানে যাননি সেটা ওর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না কমলবাবু!

আমি বলছি আপনাকে, সূর্যপ্রসাদকে আমি হত্যা করিনি।

সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ।

কেন?

কারণ যতক্ষণ না সেরাত্রে সোয়া এগারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই পঁয়তাল্লিশ ট সময়ের মুভমেণ্টস্ আপনার আমরা সঠিকভাবে জানতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত াই বা আপনার কথাটা সত্যি বলে একেবারে মেনে নিই কেমন করে বলুন?

বেশ, মানতে হয় মানবেন, না মানতে হয় না-মানবেন। আমার যা বলবার ছিল

বলেছি, এবারে আপনাদের যেমন খুশি করুন।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত কমলবাবুকে আপাততঃ নজরবন্দী অবস্থায় রেখে এসে
ভ্যানে চেপে বসলাম।

ভ্যান আবার রাঁচি শহরের দিকে ছুটে চলল ফিরতিপথে।

॥ উনিশ ॥

একপাশে বসে কিরীটী রায় নিঃশব্দে ধূমপান করছিল।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিঃ পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন কিরীটীকে, মিঃ রায়!

বলুন?

লোকটা যা বললে, তা আপনি বিশ্বাস করেন?

হুঁ।

করেন?

হুঁ, করি।

আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে মিঃ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সমগ্র ফিরতিপথে কেউ আর একটি কথাও বললেন না।

প্রায় থানার কাছাকছি এসে মিঃ পাণ্ডেই আবার কতকটা যেন আত্মগত
বললেন মৃদুকণ্ঠে, আশ্চর্য, লোকটা কিছুতেই স্বীকার করল না!

কি মিঃ পাণ্ডে? প্রশ্নটা করলাম আমি।

কেন লোকটা যে সেরাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিল সেই কথাটা!

দু চোখ বুজে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই যেন অলস ভঙ্গীতে কিরীটী এতক্ষণ
সীটে হেলান দিয়ে বসেছিল, হঠাৎ চোখ না খুলেই মৃদু শান্তকণ্ঠে বললে, স্বীক
করলেও আমি জানি কেন কমলবাবু সেরাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন!

প্রশ্নটা করলাম এবারে আমিই সবিস্ময়ে, আপনি জানেন সে কেন গিয়েছিল

হ্যাঁ।

কিন্তু—

লোকটা কেন গিয়েছিল জানেন ডাক্তার সেন?

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

কিন্তু তার জবাবটা আর শোনা হল না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাচ্ করে ব্রেক থানার সামনে এসে আমাদের ভ্যানটা দাঁড়ালো।

কিরীটী সহসা চোখ খুলে বললে, চলুন নামা যাক।

এবং নামতে নামতে বললে, মিঃ পাণ্ডে, বড্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে যে!

মারো গোলি! চলুন চলুন, নিশ্চয়ই—

সোৎসাহে আহ্বান জানালেন মিঃ পাণ্ডে।

কিন্তু থানায় যে আমাদের জন্য আরও একটি নতুন বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, সেটা ভাবতেই পারিনি।

অফিসঘরে বসেই মিঃ পাণ্ডে চায়ের হুকুম দিলেন।

কিরীটী একটা সিগারে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করলে। আমি বসে বসে কমল-কথাই চিন্তা করতে লাগলাম।

মিঃ পাণ্ডে সেদিনকার ডাকে আগত চিঠিপত্রগুলো খুলে একে একে দেখতে লেন। এবং হঠাৎ ফেলে রঙের একটা টাইপ করা সরকারী কাগজ দেখতে বলে উঠলেন, মারো গোলি! বড়ি তাজ্জব কি বাত্!

কি হল? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কিরীটীও তাকাল মিঃ পাণ্ডের মুখের দিকে।

যে সব ভিসারা ও বডির পার্টস্ কলকাতায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য পাঠানো ছিল, তার মধ্যে সূর্যপ্রসাদের বডির সব কিছুতেই arsenic পাওয়া গিয়েছে।

Arsenic! কথাটা একই সঙ্গে আমি ও মিঃ রায় বললাম।

হাঁ, arsenic।

মৃত্যুর কারণটা তা হলে কি দাঁড়াল মিঃ পাণ্ডে? প্রশ্ন করলাম আমিই।

আপনার কি মনে হয় ডাক্তার সেন? কিরীটী আমার মুখের দিকে সহসা যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলে।

আমার?

হাঁ, আপনি তো একজন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, আপনিই বলুন না, মৃত্যুর কারণটা এত্র আসলে কি হতে পারে?

আমার—আমার মনে হয় stabbing-ই মৃত্যুর কারণ।

ঠিক। আপনার অনুমানই সত্য ডাক্তার সেন। তবে এও ঠিক—

কি মিঃ রায়?

হতভাগ্য সূর্যপ্রসাদকে মোক্ষম বা চরম মৃত্যু-আঘাত দেবার পূর্বে আর্সেনি
সে কো-বিষ দিয়ে slow poisoning নিশ্চয় করা হচ্ছিল—

মারো গোলি ! এ আপ্ কেয়া কহেতে হেঁ রায় সাব্ ? পাণ্ডে বলে উঠলেন

কেন. আপনার হাতের রিপোর্টই তো তাই প্রমাণ করছে মিঃ পাণ্ডে। তা
না হত, মৃতের ভিসারা এবং চুলে ও নখে নিশ্চয়ই আর্সেনিক পাওয়া যেত
কেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশানে আর্সেনিকের trace বডি টিস্যু ও ভিসারায়
গিয়েছে, অথচ অ্যাকিউট্ আর্সেনিক poisoning-এর কোন সিম্‌টমস্ পাওয়া
মৃত্যুর পূর্বে, তাতেই কি মনে হয় না যে ছোরার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা
পূর্বে নিশ্চয়ই আর্সেনিকের সাহায্যে নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে হতভাগ্যকে এ
থেকে সরাবার জন্য slow poisoning চলছিল। এবং এতে করে এই সিদ্ধ
আমরা অনায়াসেই পৌঁছতে পারি যে—

কি ?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারটা সর্বতোভাবেই পূর্বপরিকল্পিত।

মারো গোলি !

হ্যাঁ মিঃ পাণ্ডে, prearranged and premeditated ! বেচারীর মৃত্যু
সত্যিই ঘনিয়ে এসেছিল।

সহসা মিঃ পাণ্ডে কিরীটীর শেষের কথায় যেন বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠে ব
মারো গোলি ! আপ ঠিক ঠিক বোলা। তব্ তো জরুর ওহি বদমাশ হোগি
অ্যাব্ ম্যায়নে সমঝ লিয়া।

মিঃ পাণ্ডে !

কিরীটীর ডাকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে পাণ্ডে জবাব দিলেন.
তো বুঝতে পেরেছেন মিঃ রায়—

কি ?

ওহি আব্দুলই উস্‌নে খুন কিয়া হোগা জরুর।

আব্দুল !

নিশ্চয়ই। সেই যখন সূর্যপ্রসাদকে সর্বদা খাবার ও পানীয় সরবরাহ করত
সেক্ষেত্রে আব্দুল ছাড়া আর কার পক্ষে ঐভাবে মিঃ গুপ্তকে arsenic-এর
slow poisoning করার সুবিধা ছিল বলুন ? হ্যাঁ, জরুর ওহি হোগা।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন মিঃ পাণ্ডে !

কি ?

সূর্যপ্রসাদকে arsenic দিয়ে slow poisoning করা হলেও, তাঁর মৃত্যুর কারণটা
ম পর্যন্ত কিন্তু stabbingই—arsenic নয়।

মৃদু শান্তকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললে।

ধ্যাৎ তেরি শালা, মারো গোলি!

একটা হতাশ ও ব্যর্থতা ফুটে ওঠে মিঃ পাণ্ডের কণ্ঠস্বরে পরক্ষণেই।

পরের দিন।

বেলা তখন প্রায় গোটা-দশেক হবে।

চেম্বারে রোগীর তেমন বিশেষ ভিড় না থাকায় সাড়ে নটা নাগাদই হাতের কাজ
ম হয়ে গিয়েছিল।

ডাইরিটা খুলে বসেছি গত কদিনের ঘটনাগুলো টুকবো বলে, দরজার বাইরে
শব্দ পাওয়া গেল।

ভিতরে আসতে পারি ডাক্তার সেন?

কে, মিঃ রায়? আসুন, আসুন।

কিরীটী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

পরিধানে একটা পাতলা ট্রপিক্যাল ট্রাউজার ও গায়ে তদ্রূপ হাফ্‌সার্ট।

চা দিতে বলি মিঃ রায়?

অমৃতে অরুচি কবে আমার বলুন।

চায়ের কথা বলে বসলাম এসে আবার।

দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর হঠাৎ একসময় আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মিঃ
য, গতকাল মুড়ি আউটপোস্ট থেকে ফেরবার পথে, কমলবাবু কেন সেরাত্রে 'লিলি
টেজে' এসেছিলেন, কথাটা যে বলতে বলতে থেমে গেলেন—

হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন—

কিন্তু এবারেও কিরীটী রায়ের কথাটা শেষ হল না।

বাইরে ফট্ ফট্ ফট্ পরিচিত মোটর-বাইকের গর্জন শোনা গেল।

কি ব্যাপার? মিঃ পাণ্ডে হঠাৎ এসময় এদিকে? বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন
: রায়।

মিঃ রায়ের অনুমান মিথ্যা নয়।

মিঃ পাণ্ডেই এসে পরক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করলেন, মারো গোলি! আপনি
ানে মিঃ রায়, আর সারাটা শহর আপনাকে আমি ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি!

হাঁপাতে হাঁপাতে পাণ্ডে বললেন।

কি ব্যাপার, মিঃ পাণ্ডে? বসুন, বসুন।

মারো গোলি! আপ্ ঠিক কহেথে।

কি ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, কমল গুপ্ত লোকটা—

কমল গুপ্ত! কিরীটী যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ, লোকটার পদবীও জানা গিয়েছে।

হুঁ, তা কি বলছিলেন?

সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

নির্দোষ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রমাণ পেয়েছেন তা হলে?

বিনা প্রমাণে পাণ্ডে এক পাও এগোয় না।

কিন্তু কি প্রমাণ পেলেন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল শহরে বাঙালীদের যে ক্লাবটা আছে, তারই পিছনে যে রেস্টুরেণ্ট ও হোটেলটা আছে—ঐ যে যার নাম ম্যানিলা হোটেল, সেখানেই রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে জুয়োর আড্ডায় ছিল। অর্থাৎ ফ্লাশ খেলছিল।

বটে!

হ্যাঁ। তা হলে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যখন মিঃ গুপ্ত সেরাত্রে বেঁচেছিলেন, সেক্ষেত্রে কমলবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনমতেই মার্ডার করতে পারেন না!

তা বটে।

তা হলে আর ভদ্রলোককে খুনের ব্যাপারে জড়ানো চলে না, কি বলেন?

তা আর চলে কি করে? মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

॥ কুড়ি ॥

কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপরই কিরীটী পাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কমল গুপ্তকে তা হলে

ক দিচ্ছেন বলুন ?

অগত্যা।

একান্ত যেন হতাশার সঙ্গেই কথাটা বললেন মিঃ পাণ্ডে।

কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম মিঃ পাণ্ডে, তা হলে কমল গুপ্তকে এখনই ছেড়ে নাম না।

মারো গোলি! কিউ ?

দিতাম না, তাই বললাম।

হস্তধৃত সিগারে একটা শিথিল টান দিয়ে কথার শেষে কিরীটী খানিকটা ধোঁয়া লে।

মারো গোলি ? লেকেন সাব্‌, ওহি তো হাম পুছতা হুঁ—কিউ!

কেন ?

হ্যাঁ হাঁ, বলে একটু থেমে আবার বললেন, মিঃ সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে লবাবু যে জড়িত নন, এটা তো আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন মিঃ রায়!

বোধ হয় তো কমলবাবু খুনের ব্যাপারে জড়িত নন। কিন্তু তাই বলে স্থিরনিশ্চিত বও তো কিছু এখুনি বলা যাচ্ছে না যে সত্যই তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মারো গোলি! এটা তো ঠিকই যে, রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে রোটা পর্যন্ত সে ম্যানিলা হোটেলে ছিল ? অতএব উড়ে এসে নিশ্চয়ই সে সকলের ক্ষ্য ঐ সময়ের মধ্যে মিঃ গুপ্তকে হত্যা করে যায়নি ?

মিঃ পাণ্ডে, আমি কালাও নই—বুদ্ধি-বিবেচনাও যৎসামান্য আমার আছে। পনার যুক্তি আমি শুনেছিও। কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়াই আপনি ভুলপথে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছেন।

ভুলপথে বিচার করছি!

হ্যাঁ।

লেকেন—

শুনুন মিঃ পাণ্ডে, আমরা জানি সেরাত্রে মিঃ সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত সোয়া এগারোটা য় বেরিয়েছিলেন, কেমন কিনা ?

হ্যাঁ।

অথচ কমলবাবু ম্যানিলা হোটেলে ছিলেন রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত ড়ে বারোটা পর্যন্ত, তা ছাড়া—

তা ছাড়া ?

যে ঘটনা সুনিশ্চিত ভাবে এখনও প্রমাণিত হয়নি, এমন কোন ঘটনাই আমি বিশ্বাস করি না।

মারো গোলি! এ কথা তো বিমলবাবুর জবানবন্দি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে আগেই যে, রাত সোয়া এগারোটার সময় মিঃ গুপ্তর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল অর্থাৎ তখনও তিনি বেঁচেছিলেন!

হ্যাঁ, কিন্তু তবু কথাটা কি জানেন মিঃ পাণ্ডে?

কি?

আজকালকার একজন যুবকের সব কথাই আমি বিশ্বাস করি না—যা তারা বলে বিশেষ করে বিমলবাবুর মত লোকের কথা!

মারো গোলি! কিন্তু আব্দুলও তো তার জবানবন্দিতে বলেছে—

কি বলেছে?

ঐ সময়েই ঠিক মিঃ গুপ্তর প্রাইভেট রুম থেকে সে বিমলবাবুকে বের হতে দেখেছে

সহসা যেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠল, না, সে দেখেনি।

আমরা দুজনেই চমকে যুগপৎ কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

তারপর মৃদুকণ্ঠে আমিই প্রশ্ন করলাম, দেখেনি?

না।

লেকেন—, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিঃ পাণ্ডে, কিন্তু তাঁকে বাধা দিলে মিঃ রায়, না ডাক্তার সেন, আসলে আব্দুল বিমলবাবুকে আদপেই মিঃ গুপ্তর প্রাইভেট ঘর থেকে বের হতে দেখেনি সেরাত্রে ঐ সময়।

তবে? প্রশ্ন করলাম আবার আমিই।

দেখেছে সে বিমলবাবুকে দরজার সামনে। ঘর থেকে ঠিক বের হতে দেখেনি

কিন্তু মিঃ রায়, এবারে বললাম আমিই, ঘর থেকে যদি ঐ সময় বিমলবাবু বের হয়ে থাকবেন তো তাঁকে দরজার সামনেই বা আব্দুল দেখতে পেল কেমন করে কোথায়ই বা তবে সে-সময় তিনি ছিলেন?

হয়তো নীচে নামবার সিঁড়ির ঠিক উপরেই।

জবাব দিলে কিরীটী।

সিঁড়ির উপরে?

হ্যাঁ, আমার অনুমান তাই।

কিন্তু তাও যদি হয়, সেই সিঁড়ির ঠিক সামনেই তো সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর দরজাটা?

তাই বটে।

তা ছাড়া আরও একটা কথা—

বলুন?

এক্ষেত্রে মিথ্যা বলবারই বা বিমলবাবুর কি কারণ থাকতে পারে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক্টর সাব্ তো সাচ্ বাত বোলা। সায় দিলেন মিঃ পাণ্ডে।

কিন্তু সেটাই তো এক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রশ্ন মিঃ পাণ্ডে। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে রায়।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা আমার মনে উদয় হয় এবং যে প্রশ্নটা ঐ মুহূর্তে আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে হাজির হয়, সেটা না উচ্চারণ করে আমি পারি না।

আমি তাই বলেই ফেলি, তার মানে আপনি কি এই বলতে চান মিঃ রায়—

কি? বাধা দিয়ে বলে উঠলো মিঃ রায়।

যে বিমলবাবুই সেই পাঁচ শত টাকাটা সেরাত্রে তাঁর জেঠামশাইয়ের শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে চুরি করেছিলেন?

স্পষ্ট করে আপাততঃ কারও সম্পর্কেই কিছুই আমি বলতে চাই না ডাক্তার সেন। তবে—

তবে?

বিমলবাবু সম্পর্কে আপনারা কতটা এখনো পর্যন্ত কি জানেন আমি জানি না, তবে গোপনে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, ইদানীং ভদ্রলোকের রীতিমত একটা আর্থিক অনটন চলেছিল।

বিমলবাবুর?

হ্যাঁ, বলতে পারেন বিশ্রীভাবেই আথিক অনটনের ব্যাপারে ইদানীং কিছুকাল যাবৎ তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

এ আপ্ ঠিক কহেতে হেঁ রায় সাব?

জি। জেঠা সূর্যপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে বিমলবাবু প্রতি মাসে যে হাতখরচা বাবদ মাসোহারা পেতেন, তাতে করে তাঁর কুলোচ্ছিল না, তাঁর বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জন্যই। আর ঐখানেই ছিল তাঁর সঙ্গে সমরবাবুর হৃদ্যতা। কিন্তু যাক সেকথা, যা বলছিলাম পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঐ কারণেই তাঁর বেশ কিছু ধার-কর্জ হয়ে যায়। ইদানীং তারা তাগাদা দিয়ে বিমলবাবুকে বেশ অস্থির করে তুলেছিল। তার উপরে ঐ দুর্ঘটনার মাত্র হপ্তাখানেক আগে এখানকার এক বেনের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে

শ'তিনেক টাকা বিমলবাবু কর্জ নিয়েছিলেন সাতদিনের মেয়াদে। এবারে তা হলে ভেবে দেখুন, টাকার তাগাদায় অস্থির হয়েই যদি অন্য কোন পথ না পেয়ে সেরাত্রে তাঁর জেঠার শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেই থাকেন—

হাঁ হাঁ, জরুর হো সাক্‌তা!

তাই বলছিলাম, হয়তো ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে যেমন বিমলবাবু ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির মুখে এসেছেন, সিঁড়িতে আব্দুলের পায়ের শব্দে চমকে তাকে দেখতে পেয়েছেন। এবং পাছে আব্দুল তাঁকে এসময় শয়নঘরের দরজার সামনে দেখে কোনরূপ সন্দেহ করে, তাই হয়তো পরক্ষণেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে করে আব্দুল তাঁকে ঐখানে ঐ সময় ঐ অবস্থায় দেখতে পেলেও কোনরূপ সন্দেহ তো করবেই না, বরং মনে করবে হয়তো তখনি তিনি তাঁর জেঠামশাইয়ের প্রাইভেট ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এবং পরমুহূর্তেই যেমনি তার আব্দুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজের পোজিশন বাঁচাবার জন্য আব্দুলকে একটা মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়েছিলেন। আশা করি ডাক্তার সেন ও মিঃ পাণ্ডে, আমি কি বলতে চাইছি তা আপনারা বুঝতে পারছেন।

জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ. তারপর?

তারপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথার সত্যতার উপরেই বর্তমানে সূর্যপ্রসাদের জটিল হত্যারহস্যের অনেকখানিই নিভর করছে তখন তাঁর ঐভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে বলুন! কাজেই নিজেকে বাঁচাবার জন্য একবার যখন মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন, তখন কতকটা বাধ্য হয়েই সেই মিথ্যারই পুনরাবৃত্তি তাঁকে করতে হয়েছিল, যখন তিনি বুঝলেন যে টাকা-চুরির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত পুলিসের গোচরীভূত হয়ে গিয়েছে!

হঠাৎ ঐ সময় মিঃ পাণ্ডে বলে উঠলেন, মারো গোলি! এ যা বলছেন আপনি —একেবারে simply absurd! অসম্ভব। নেহি নেহি, এ কভি নেহি হো সাক্‌তা।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে কোন জবাব দিল না, মৃদু একটু হাসির আভাস তার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল মাত্র।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসির আভাসটুকু দেখেই আমি বুঝেছিলাম, কতখানি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করলে তবে মানুষ ঐভাবে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে ঐ ধরনের যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে।

তাই আমিও প্রশ্ন করলাম।

বললাম, এইমাত্র যা বললেন—এ কথাটা কি আগে থাকতেই আপনি ভেবেছিলেন মিঃ রায় ?

ধীর সংযত এবং দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলে কিরীটী রায়, হ্যাঁ, ঐ সম্ভাবনাই প্রথম থেকে আমার মনে উদয় হয়েছিল ডাক্তার সেন।

সত্যি বলছেন !

হ্যাঁ। আমি বরাবরই জানতাম, বিমলবাবু সুনিশ্চিতভাবে আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছেন। আর সেই কারণেই গত পরশু সন্ধ্যার দিকে বিমলবাবুকে নিয়ে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলাম আমি।

হ্যাঁ। বলে একটু থেমে যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় বলতে লাগল মিঃ রায়'

॥ একুশ ॥

আমি আর মিঃ পাণ্ডে নিঃশব্দে কিরীটীর কথা শুনতে লাগলাম।

শুনুন মিঃ পাণ্ডে ও ডাক্তার সেন, কিরীটী বলতে লাগল, পরশু সন্ধ্যায় আমি 'লিলি কটেজে' গিয়ে বিমলবাবুর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করি, সেই দুর্ঘটনার রাত্রে ঠিক যেভাবে সূর্যপ্রসাদের ঘরের সামনে দুজনের দেখা হয়েছিল ও পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল—সেটা যতটা সম্ভব তাঁদের মনে আছে আব্দুলকে সঙ্গে নিয়ে পুনরাভিনয় করে আমাকে একটিবার দেখানোর জন্য।

মারো গোলি ! আচ্ছা, সাবাস্ রায় সাব্' বোলিযে বোলিয়ে, উস্কা বাদ কেযা হুয়া ? পাণ্ডে বললেন।

আব্দুলকে ডেকে নিয়ে তক্ষুনি আমরা উপরে গেলাম, কিরীটী বলতে লাগল, এবং ব্যাপারটা যেমন যেমন ঘটেছিল, পুনরাবৃত্তি করবার সময় ওরা যা বলেছিল তা হচ্ছে এই :

বিমল। আব্দুল, জেঠামণি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আব্দুল। ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

বিমল। হ্যাঁ, আজ রাত্রে যেন আর তাঁকে বিরক্ত করা না হয়।

আব্দুল। আপনি এতক্ষণ সাহেবের ঘরেই ছিলেন নাকি ?

বিমল। হ্যাঁ, প্রায় মিনিট পনেরো ছিলাম।

কিন্তু আসলে ঠিক তা তো নয়। কিরীটী বলতে লাগল, বিমলবাবুর মুভমেণ্টস্ সম্পর্কে ভাল করে অনুসন্ধান নিতে গিয়ে অমলেন্দুবাবুর মুখেই শুনেছিলাম, এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট অর্থাৎ সোয়া এগারোটায় নাকি বিমলবাবু বাগান থেকে বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করেন।

এ আপ্ কেয়া কহেতে হেঁ রায় সাব্! হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিঃ পাণ্ডে।

ঠিকই বলছি মিঃ পাণ্ডে।

এবারে আমিই বললাম, সত্যিই সেরাত্রে বিমলবাবু বাগানে গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। এবং যে সময় বাগান থেকে বাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেই সময় অমলেন্দুবাবু চাকরদের থাকবার জন্য নীচের তলায় যে সিঁড়ির মুখের কাছের ঘরটা সেখানেই উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সবে দাঁড়িয়েছেন। ওই সময়েই দুজনের দেখা হয়। আর ঠিক সেই সময়, সিঁড়ির সামনেই নীচের তলায় যে ওয়াল-ক্লকটা দেওয়ালে বসানো আছে সেটায় তখন ঠিক রাত এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। অসতর্ক মুহূর্তে বিমলবাবুর মুখ দিয়ে পরশু সত্য কথাটা বের হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি সে-সময় ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, আমার কাছে সেই মুহূর্তেই সব দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তাঁর সেই সময়ের কয়েকটা কথায়।

তব্ তো বিমলবাবুকা ফির পুছনা সব জরুরী হায়। মিঃ পাণ্ডে বললেন।

বেশ তো, চলুন না এখুনি সেখানে?

হাঁ হাঁ, চলিয়ে চলিয়ে।

চলুন ডাক্তার সেন।

চলুন।

বেলা তখন বোধ করি পৌনে এগারোটা হবে।

আমারই গাড়িতে চেপে আমরা 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

'লিলি কটেজে' যখন গিয়ে আমরা পৌঁছলাম, বিমলবাবু ঐ সময় বাইরের ঘরেই ছিলেন।

একাকী একটা সোফায় বসে বিমলবাবু ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন।

আমাদের পদশব্দে তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কি ব্যাপার, এসময় আপনারা?

কিন্তু স্পষ্ট যেন মনে হল, বিমলবাবুর কণ্ঠে একটা আশঙ্কা ও সংশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাঁ, আপনার কাছে এসেছি আমরা বিমলবাবু। কথাটা বললে মিঃ রায়ই।

আমার কাছে ?

হ্যা। মিঃ পাণ্ডে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চান।

প্রশ্ন!

হাঁ হাঁ, বৈঠিয়ে—বৈঠিয়ে না বিমলবাবু। বলতে বলতে মিঃ পাণ্ডে একটা সোফায় স পড়লেন আরাম করে।

আমরাও দুজনে দুটো সোফায় বসলাম।

বিমলবাবু! পাণ্ডে ডাকলেন।

বলুন ?

দেখুন আপনি আপনার যে জবানবন্দি পুলিসকে দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে, ঃ ঠিক সোয়া এগারোটার সময় দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি আপনার জেঠার সঙ্গে কথা ল তাঁর ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই নাকি আব্দুলের সঙ্গে াপনার সেই ঘরের দরজার সামনে দেখা হয়।

হ্যাঁ, বলেছিলাম তো।

স্পষ্ট মনে হল, বিমলবাবুর মধ্যে যেন একটা বিচলিত ভাব।

লেকেন বাত এয়ি হ্যায, রায় সাব্ আপকো ও বাত্ বিশ্বোয়াস নেহি করতে হেঁ।

বিশ্বাস করছেন না ? শঙ্কাকুল দৃষ্টি যেন বিমলবাবুর দুই চোখে।

না, উনি বলছেন—

আমাকে বলতে দিন মিঃ পাণ্ডে. বাধা দিলে মিঃ রায় এবং বললে বিমলবাবুর ক এবারে চেয়েই, আমার ধারণা বিমলবাবু, আপনি আদপেই আপনার জেঠামণির ইভেট ঘরে সেরাত্রে প্রবেশ করেননি!

প্রবেশ করিনি ?

না।

তবে—তবে আমি কোথায় গিয়েছিলাম ?

আপনি সেরাত্রে ঢুকেছিলেন তাঁর প্রাইভেট ঘরে নয়—তাঁর শয়নঘরে। এবং মার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো শয়নঘর ওপ্রাইভেট ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা সে য প্রাইভেট ঘরের দিকথেকে বন্ধই ছিল। এখন বলুন, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে?

বিমলবাবু একেবারে চুপ।

কি, চুপ করে রইলেন যে—বলুন, জবাব দিন বিমলবাবু?

সহসা মনে হল যেন কিরীটীর শেষের কথায় ঘরের মধ্যে একটা নিদারুণ নাটকীয় র্ত ঘনিয়ে উঠেছে অকস্মাৎ।

এবং সেটা ক্ষণেকের জন্যই। কেননা পরমুহূর্তেই নাটকের গতি পরিবর্তিত হল বিমলবাবু সহসা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, হ্যাঁ মি রায়, আপনার—আপনার কথাই ঠিক, আমি চোর সত্যিই আমি চোর। আমি সে রাত্রে জেঠামণির শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচ শত টাকা চুরি করেছি। বলতে বলতে দু হাতে মুখ ঢেকে ঘটনার আকস্মিকতায় এবং লজ্জা ও গ্লানিতে সোফাটার উপরে পুনরায় বসে পড়লেন।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপর পূর্ববৎ ভগ্নকণ্ঠে দু হাতের মধ্যে মুখ ঢেকেই বিমলবাবু বলতে লাগলেন হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি চোর, আমি চুরি করেছি। দিনের পর দিন পাওনাদারদের তাগাদায় তাগাদায় আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই—তাই শেষ পর্যন্ত আমাকে চুরিই করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় যে রাধিকাপ্রসাদবাবু ঐ ঘরে এসে ঢুকেছেন, কেউ আমরা টের পাইনি। এবং টের পাইনি যে রাধিকাপ্রসাদবাবু তাঁর ছেলের শেষের কথাগুলো সব শুনেছেন।

হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরে সকলে আমরা চমকে যুগপৎ দরজার দিকে তাকালাম।

বিমল! বিমল!

কে, বাবা? হ্যাঁ হ্যা, আমিই সেরাত্রে জেঠামণির ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করে বাবা।

তুমি—তুমি চুরি করেছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিশ্বাস করতে পারছেন না বাবা যে আমি চুরি করেছি, না? কি আমি এখন মুক্ত, আমি নিশ্চিন্ত। আর মিথ্যার পর মিথ্যা দিয়ে সব কিছু আমা গোপন করতে হবে না।

রাধিকাপ্রসাদ যেন পাথরের মতই অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে পুত্রের দিকে তাকি দাঁড়িয়ে রইলেন।

অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছেন কি বাবা, সত্যিই আমি চুরি করেছি সে রাত্রে ডিনারের পর একবারও আমার জেঠামণির সঙ্গে দেখা হয়নি, মিঃ রায়ে ধারণা ঠিকই। আমি—আমি আপনাদের কাছে মিথ্যে বলেছি মিঃ পাণ্ডে, ইচ্ছা করলে আমাকে এবারে জেলে দিতে পারেন।

বিমল!

না বাবা না—আমি চোর, আমি চোর—, বলতে বলতে ঝড়ের মতই যেন ছু

লবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন অকস্মাৎ।

ঘরের মধ্যে সবাই নির্বাক, বিহ্বল।

শুধু প্রৌঢ় রাধিকাপ্রসাদের দুই চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে ছে।

সহসা ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিঃ পাণ্ডে বললেন, না, সব—সব গোলমাল হয়ে চ্ছে মিঃ রায়, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মারো গোলি!

মৃদু কণ্ঠে আবার মিঃ রায় কথা বললে, এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন মিঃ পাণ্ডে, প্রসাদ সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না। তার আগেই তিনি নিহত য়েছেন।

তার আগেই!

হ্যা। ডাক্তার সেন তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পরই অর্থাৎ রাত সাড়ে টা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

কি বলছেন মিঃ রায়? বললাম এবারে আমিই।

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, ঐ পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যেই তিনি নিহত হয়েছেন।

তা হলে? বললেন মিঃ পাণ্ডে।

তা হলে এবারে ভেবে দেখুন মিঃ পাণ্ডে, আর একবার আমাদের কমলবাবুর কথাটা ভবে দেখুন। তিনি যে কেন সে রাত্রে এ বাড়িতে এসেছিলেন এবং কি করতে এসে ছলেন, কি তাঁর প্রয়োজন ছিল তার কোন জবাবই এখনো পর্যন্ত তিনি দেননি।

এবারে আমিই বললাম মিঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে, আপনি তো সেদিন বলে-ছিলেন, আপনি জানেন মিঃ রায়, কেন তিনি সেরাত্রে এখানে এসেছিলেন?

ঘুরে আমার দিকে তাকালে কিরীটী রায় এবং বললে, হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আমি জানি কেন সেরাত্রে কমলবাবু এই 'লিলি কটেজে' এসেছিলেন।

কেন?

কেন যে তিনি এসেছিলেন সেকথা বলবার আগে একটা সুনিশ্চিত ভাবে আপনাদের বলতে পারি আমি মিঃ পাণ্ডে—

কি?

তিনি সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাঁর মাথার একটি কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। এমন কি সূর্যপ্রসাদ যে ঘরের মধ্যে নিহত হয়েছেন সে ঘরের কুড়ি ভেতর মধ্যেও যাননি।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে মিঃ পাণ্ডে। আমি কিরীটী রায় একথা বলা বলেই সঙ্গে সঙ্গে অদূরে তখনও বিহ্বলভাবে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রাধিকাপ্রসাদের দি তাকিয়ে তাঁকে সম্বোধন করে কঠিন ঋজুকণ্ঠে বললে কিরীটী, রাধিকাবাবু, আপ মেজো ছেলে সুবলবাবু কোথায় ?

সুবল !

বিহ্বলের মতই যেন কথাটা উচ্চারণ করলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন বিমলবাবু, সুবলবাবু ও কমলবাবু একই মায়ের সন্তান কি বলুন, আমার কাছে আর গোপন করে কোন লাভ নেই কথাটা !

এ আপ কেয়া বলতে হে রায় সাব্‌। বললেন পাণ্ডে।

ঠিকই বলছি মিঃ পাণ্ডে। সেদিন কমলবাবুর মুখের দিকে যদি একটু নজর দি তাকাতেন তা হলে আপনারও ভুল হত না। তিনটি ভাইয়ের মুখ চোখ ন কপাল একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। কোথায়ও এতটুকু পার্থক্য বা এতটুকু গড়মি নেই। আর সেই কারণেই সেদিন মুড়ি আউটপোস্টে কমলবাবুকে প্রথম দেখেই অ চমকে উঠেছিলাম। এমন কি ওঁদের তিন ভাইয়ের গলার স্বরের মধ্যেও অদ্ভুত এক মিল আছে।

আপনার—হ্যাঁ আপনার কথাই ঠিক মিঃ রায়, বিমল, সুবল ও কমল ওরা আম ছেলে, একই মায়ের গর্ভে ওদের জন্ম। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি আমার কথা কমল সত্যিই নির্দোষ। সে এ কাজ করেনি। এ কাজ সে করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি রাধিকাবাবু যে, অন্ততঃ কমলবাবু সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেননি কিন্তু তা হলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি যে, কি প্রয়োজনে এবং ক সঙ্গে দেখা করতে সেরাত্রে কমলবাবু এখানে এসেছিলেন, ততক্ষণ তাঁর নির্দোষি তো প্রমাণ হবে না। ভুলে যাবেন না, এটা আইনের ব্যাপার। আর হত্যা ব্যাপারে তিনি পুলিসের সন্দেহের তালিকাভুক্ত।

॥ বাইশ ॥

বলব, বলব—সবই আপনাকে আমি বলব মিঃ রায়, বলে উঠলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ বলুন। কোন কথাই গোপন করবেন না, কারণ তাতে জটিলতারই সৃষ্টি হ মাত্র।

া, না—গোপন করব না।

মল এসেছিল সেরাত্রে আপনারই সঙ্গে দেখা করতে, তাই না? বললে

ায়।

া। কিন্তু আপনি—

কমন করে জানলাম সেকথা, তাই না? আমি জেনেছি—কিন্তু কি করে জানেন? সময় আপনি ঐ যে লাঠিটি আপনার হাতে ব্যবহার করেন—, বলে কিরীটী রাধিকাবাবুর হাতের লাঠিটি নির্দেশ করলে।

আমরা সকলেই নির্বাক।

কিরীটী বলতে লাগল, বাগানের মালির ঘরের পাশে অব্যবহৃত ঘরটির মধ্যেই হয় আপনি গোপনে আপনার পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেরাত্রে!

া, আমি আর সুবল গিয়েছিলাম।

সটা বুঝতে পেরেছি। কারণ সেই ঘরের মেঝের ধুলোয় আপনার ঐ লাঠির দাগ পড়েছিল। যা এখনও সেখানে রয়েছে। কিন্তু বলুন এবারে কেন দেখা গিয়েছিলেন সেরাত্রে ঐ ঘরে কমলবাবুর সঙ্গে?

অতঃপর রাধিকাপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন।

কমলের যখন মাত্র বারো কি তেরো বছর বয়স, তখনই সে এমন দুর্দান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে তাকে কোনরকমেই বাগ মানানোই যেত না। লেখাপড়ার এতটুকু মন ছিল না। দিনরাত বাইরে বাইরেই কেবল হৈ-হৈ করে বেড়াত। ঐ খুলনার একদল বিদেশী সার্কাস পার্টি এসে মাঠে খেলা দেখাবার জন্য তাঁবু ফেলল।

লুন।

কমল ঐ বয়সেই নানাপ্রকার খেলায়, বিশেষ করে বার, ট্রাপিজ ও রিংয়ের ে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। যা হোক, ঐ সার্কাস পার্টির সঙ্গেই এক রাত্রে কমল কে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যায় চাকরি নিয়ে। এবং ঐ সার্কাসের দলে তই কুসংসর্গে ক্রমশঃ কমল অধঃপাতের পথে নেমে যায়। নানাপ্রকার নেশা এমন কি কোকেনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি তা জানি। বলুন তারপর? কিরীটী বললে।

অবশেষে একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের ক্যাশ ভেঙে হাজার দুই টাকা গা-ঢাকা দেয়।

তারপর?

ম্যানেজার এদিকে সব জানতে পেরে কমলের নামে পুলিসে ডাইরী করে। পুলিস

কমলের নামে ওয়ারেণ্ট বের করে সর্বত্র তার অনুসন্ধানে ফিরতে লাগল। থেকেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কমল পুলিসের ভয়ে এখনও আত্মগোপন করে বেড় দাদা যে রাত্রে নিহত হন, তারই দিন দশেক আগে কলকাতা থেকে কমলের চিঠি পাই আমি। সেই চিঠিতেই সব কথা সর্বপ্রথম ও আমাকে জানায় এবং ই অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছে বলে আমার কাছে কিছু অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠায়। আমার কাছে টাকা কোথায়? অগত্যা তাই দাদার কাছেই আমি কিছু টাকা

তিনি দিয়েছিলেন টাকা?

না। বরং সব কথা শুনে বলেছিলেন, আমার নাকি কর্তব্য তাকে পু হাতেই ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাপ হয়ে তা পারিনি মিঃ রায়। তাই নিজের ঘড়ি ও চেন বিক্রী করে কিছু টাকা সংগ্রহ করি তাকে দেবার জন্য, পাছে জানতে পারেন সেই ভয়ে গোপনে টাকাটা দাদার মিউজিয়াম ঘরে যে চন্দনক বাক্সটার মধ্যে সেই ছোরাটা ছিল, তারই মধ্যে রেখে দিই এবং কমলকে নির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট সময়ে এসে টাকা নিয়ে যাবার জন্য চিঠি দিই। ও দেখা করতে আসে, আমি ও সুবল গিয়ে ওর সঙ্গে বাগানের সেই ঘরে দেখা করে টাকাটা তাকে দিয়ে

রাত কটার সময় সেরাত্রে আপনাদের দেখা হয়েছিল?

রাত আটটায়।

ও। ঘরে ফিরেছিলেন কখন?

রাত রাড়ে আটটা নাগাদ হবে।

কোন পথে ফিরেছিলেন?

পাছে কেউ জানতে পারে বলে গোপনে আমি আর সুবল, তারই পরামর্শম মিউজিয়াম ঘরের জানলা-পথেই বাগানে গিয়েছিলাম ও ফিরেও এসেছিলাম।

আপনাদের মধ্যে কে আগে ফিরেছিলেন?

সুবল।

হুঁ। তাহলে সেরাত্রে আপনিই চন্দনকাঠের বাক্সর ডালাটা খুলে রেখেছি রাধিকাবাবু?

বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে খুলেই রেখে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা একটা কথা রাধিকাবাবু—

বলুন?

যখন টাকাটা বের করে নিয়ে যান বাক্স থেকে, আপনার মনে আছে ছোরাটা তার মধ্যে ছিল কি না?

হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। ছিল···

আচ্ছা ফিরে আসবার পর লক্ষ্য করেছিলেন কি বাক্সটা ?

হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো ? ডালাটা খোলা আছে দেখে ভরতে গিয়েছিলাম।

ও। তখন তার মধ্যে ছোরাটা দেখেছিলেন ?

না।

দেখেননি ?

না।

ঠিক মনে আছে আপনার ?

আছে। কিন্তু আমার ছেলে কমল আর বিমল এদের কি হবে মিঃ রায় ?

সে কথার জবাব আপনার উনি, মিঃ পাণ্ডে একমাত্র দিতে পারেন রাধিকাবাবু।

বেলা অনেক হল মিঃ পাণ্ডে, এবারে চলুন ফেরা যাক !

বলতে বলতে কিরীটী একেবারে উঠে দাঁড়াল।

থানায় মিঃ পাণ্ডেকে ও 'সানি ভিলা'য় কিরীটী রায়কে নামিয়ে দিয়ে যখন তে ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

নানা এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মতই পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল। সত্যিই গত কিছুদিন ধরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কোন কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি না।

ব কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। যে অন্ধ দুরাশা এতদিন দিবারাত্র কে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, সেটা যেন আর অনুভব করি না।

নে হয় সব পুরুষকার মিথ্যা। নিষ্ঠুর নিয়তিই সব।

আবও মনে হয়, এই তো মানুষের জীবন। এই তো বিশ্বাসের ভিত্তিটা। যেটা এত শক্ত ও দৃঢ় মনে হচ্ছে, কাল সেটা মনে হয় বুঝি যেমনি পলকা তেমনি ান।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবলই যেন একটা মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে ন হওয়া। জীবনে আকাঙ্ক্ষারও যেমন অন্ত নেই, তেমনি সত্যিকারের তৃপ্তিও কোথায়ও নেই।

বাইরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

সুব্রতা একাকী নিঃশব্দে বসে বাইরের ঘরে একটা সোফার উপরে। আর চোখের

কোণে তার দুটি প্রবহমান অশ্রুধারা।

মিতা!

আমার ডাকে মিতা নিঃশব্দে সেই অশ্রু-ভেজা দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকা

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে।

মৃদু কণ্ঠে শুধালাম, কি হয়েছে রে মিতা?

হাতের পাতায় ভেজা চোখ মুছে নিয়ে মিতা তাড়াতাড়ি বলল, কিছু তো ন

না, তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস, বল্ কি হয়েছে?

কি আবার হবে?

মিতার পাশে সোফার উপরে গিয়ে বসলাম।

কিছুই যদি হয়নি তো চোখে জল কেন তোর?

চোখে কি যেন একটা পড়েছিল!

বুঝতে পারি মিতা মিথ্যা বলেছ, কিন্তু মিতা তো কোনদিনই এমনটি ছিল

হাসি, আনন্দ ও সরলতায় চিরদিন মনটি ওর দেখে এসেছি শিশুর মত। হঠাৎ যেন কিছুদিন থেকেই মনে হয় সেই হাসি ও আনন্দের মধ্যে কোথায় একটি চিড ধরেছে।

মিতা যেন ঠিক সেই মিতা আর নেই।

এ যেন চিরদিনের সেই চেনা মিতা আর নেই।

নারী-মন নিয়ে কখনো কোন কারবার করিনি। তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা- কোমল অথচ তীব্র অনুভূতিগুলোর সঙ্গে কখনো পরিচয় ঘটেনি। ঘটবার অব হয়নি।

তাই মনে হয়, বোন হলেও এবং চিরকালটা পাশাপাশি থাকলেও হয়ে সত্য পরিচয়টা কোন দিনই পাইনি।

তাই হয়তো আজ মনে হচ্ছে, মিতা অনেক—অনেক দূরের।

সহসা মিতার ডাকে যেন চমকে উঠি।

দাদা!

কি রে?

কি হয়েছে তোমার সত্যি করে বল তো?

অবাক হয়ে মিতার মুখের দিকে তাকালাম, কেন?

কেন? নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখ তো! ভাল করে খা রাত্রে ঘুমোও না—ভাল করে একটা কথা পর্যন্ত বল না।

মৃদু হাসি প্রত্যুত্তরে।

হাসছ? কিন্তু সত্যিই দাদা, তুমি যেন আর সেই তুমি নেই!

ও তোর ভুল ধারণা।

হতে পারে হয়তো। কিন্তু কি যে তুমি সর্বক্ষণ চিন্তা কর—বুঝি না সত্যি
সেরই বা তোমার এত চিন্তা! দিবারাত্র আজকাল দেখি বাইরে বাইরে থাক!

কাজের চাপ পড়েছে—

কাজ? কি এত কাজ? এদিকে তো শুনি আজকাল রোগীদেরও তেমন ভাল
র মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা কর না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, ভাল লাগে না!

ভাল লাগে না?

না, না—ঠিক তা নয়। মানে ঐ আর কি—, কি বলব ঠিক বুঝতে না পেরে
মে যাই।

মিতা যা বলছে তা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু কেন—কেন?

আজ এত দেরি হল, কোথায় গিয়েছিলে?

লিলি কটেজে।

লিলি কটেজে! হঠাৎ আবার সেখানে কেন?

না, ঐ কিরীটীবাবু আর মিঃ পাণ্ডে টেনে নিয়ে গেলেন!

একটা কথার জবাব দেবে দাদা?

কি?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার নিয়ে তোমারই বা এত মাথা ঘামানো কেন?

এ তুই কি বলছিস মিতা! ভদ্রলোক আমাদের পরিচিত ছিলেন!

কিন্তু বড়লোক বলে বরাবর তো তাঁকে দেখেছি ঘৃণাই করে এসেছে!

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে—

না, সত্যি নিজের উপরই যেন নিজের রাগ হয়। কি যে হয়েছে? ভাল করে
কটা কথা পর্যন্ত যেন গুছিয়ে বলতে পারি না!

তবে মিতাও মিথ্যা বলেনি। সত্যিই তো, সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে
ামার এত মাথা ঘামানোই বা কেন?

সূর্যপ্রসাদ মরলেন কি বাঁচলেন তাতে করে আমার কিই বা এসে গেল?

চিন্তাটাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লাম।

না, কি এসব চিন্তা করছি ? পাগল হয়ে যাব নাকি ?

কিন্তু মিতা কাঁদছিল।

কথাটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর শয্যায় চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে মিতার কথা ভাব ভাবতে, একসময় কখন যে সমরের কথা ভাবতে শুরু করেছি খেয়ালই নেই।

তবে কি সমরের কথা ভেবেই চোখ দিয়ে মিতার জল পড়ছিল ?

বেচারী মিতা! সমরকে যে বাঁচানো যাবে না. এই সত্যি কথাটা ওকে কে করে বলি ?

থাক্ গিয়ে, বলে কি হবে!

নিষ্ঠুর সত্যকে তো একদিন ও জানতে পারবেই।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং—

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম, হ্যালো! কে মিঃ রায়, কি খব থানা থেকে বলছেন ?

আজ আবার রাত্রে সকলের সঙ্গে 'লিলি কটেজে' মিলিত হয়ে আলোচনা ক চান ? বেশ তো! আপনিই মিঃ পাণ্ডের সাহায্যে সব ব্যবস্থা করেছেন ? নিশ —নিশ্চয়ই যাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রেখে দিলাম ফোনটা।

॥ তেইশ ॥

আবার ঐদিন রাত্রে কিরীটীর ইচ্ছামত 'লিলিকটেজে' সকলে আমরা একত্রিত হয়েছি

আমি, রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর দুই ছেলে বিমলবাবু ও সুবলবাবু, বলদেব সিং মেজর কৃষ্ণস্বামী, অমলেন্দুবাবুর ঘরের মধ্যে বসেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে আব্দুল।

একমাত্র কিরীটীই এখনও এসে পৌঁছয়নি 'লিলি কটেজে'।

সকলেই চুপচাপ বসে, কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কিন্তু কেউই যে একটা স্বস্তিবোধ করছি না, পরস্পর পরস্পরের মুখের দি তাকালেই বোঝা যায়।

সকলেই যেন কি চিন্তা করছেন।

আজও শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেস জ্বলছে।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন।

সহসা মৃদু একটা পদশব্দে সাত জোড়া ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি যেন দরজার উপর যে পড়ল একই সময়ে।

দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল কিরীটী রায়।

Good evening !

কিরীটী এগিয়ে এসে তার জন্য রক্ষিত শূন্য চেয়ারটি অধিকার করে বসল।

কেউ কোন কথা বলে না।

সবাই যেন আমরা বোবা।

একসময় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই সবপ্রথম কথা বললে, আজ ইচ্ছা করেই মাদের এই ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে মিঃ পাণ্ডেকে ডাকিনি। কারণ—

কিরীটী বলতে বলতে থামল।

সাত জোড়া চোখের দৃষ্টি শুধু নিঃশব্দে কিরীটীর প্রতি স্থির হয়ে আছে একটিমাত্র জ্ঞাসায় যেন, বল, বল, থামলে কেন ?…

মিঃ রায় আবার বলতে শুরু করে, আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রসাদের হত্যার রাত্রেও এইখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে রছেন, সেই কারণেই সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে আপনারা যাঁরা এই মুহূর্তে এই র আছেন, প্রত্যেকেই সন্দেহের তালিকায় পড়েন।

সকলে নিস্তব্ধ।

কিরীটী আবার বলতে থাকে, অতএব আপনাদের মধ্যেই যে একজন কেউ রাত্রে সূর্যপ্রাসাদকে হত্যা করেছেন সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী বরফের মতই ঠাণ্ডা স্তব্ধতা।

আবার কিরীটী বলতে লাগল, আজ আপনাদের এখানে এইভাবে ডেকে আনবার রণই হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে থেকে হত্যাকারীকে আপনাদের স্বীকৃতির দ্বারাই মি সর্বসমক্ষে চিহ্নিত করে দিতে—

সকলেই চুপ করে রইলেন, কিন্তু আমি পারলাম না চুপ করে থাকতে, মৃদুকণ্ঠে ললাম, তা হলে মিঃ রায়, আপনার স্থির ধারণা যে আজ আমরা যারা এখানে এই র্তে উপস্থিত আছি, তাদের মধ্যে একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী ?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আপনাদের মধ্যেই একজন !

চকিতের জন্য বোধ হয় নিজ নিজ অজ্ঞাতসারেই পরস্পর পরস্পরের দিকে সকলেই

আমরা নিঃশব্দে একবার তাকালাম। এবং মুখে আমরা কেউ প্রকাশ না করলে একটি প্রশ্নই যে আমাদের সকলের মনে ঐ মুহূর্তে জেগেছিল, সেও বোধ হয় ঠিক।

কে? কে? কে?

কি যেন আমি বলতে উদ্যত হলাম, কিন্তু বাধা দিলে আমাকে মিঃ রায়। বলে কিরীটী রায়ের কথায় এখনও আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না ডাক্ত সেন, তাই না?

না, মানে বলছিলাম—

বলুন, থামলেন কেন ডাক্তার সেন?

আপনার কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে বলব একজন ঐ একই সন্দেহে তালিকাভুক্ত—কিন্তু এখনও অনুপস্থিত এখানে—

কে ডাক্তার সেন? আপনি কার কথা বলছেন?

সমর!

সমরবাবু কিন্তু এ সময়ে এখানে অনুপস্থিত থাকলেও, আমি জানি তিনি কোথায়

আপনি জানেন?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আমি জানি।

কোথায় সে?

ঐ যে, চেয়ে দেখুন দরজার সামনেই তো সমরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন!

সঙ্গে সঙ্গে সকলে আমরা দরজার দিকে তাকাতেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সত্যিই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমর।

আসুন সমরবাবু, ঐ সোফাটায় এসে বসুন!

কিরীটীর আহ্বানে সমর এসে নির্দিষ্ট শূন্য সোফাটি নিঃশব্দে অধিকার করে বসল

এবারে তো সকলেই এখানে উপস্থিত ডাক্তার সেন?

আমি কোন সাড়া দিলাম না।

সমরের দিকে যে তাকাব তাও যেন পারছি না।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই আবার বলতে শুরু করলে, তা হলে সকলেই আজ যখ আপনারা এখানে উপস্থিত এবং আপনাদের মধ্যেই যখন একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকার রূপে চিহ্নিত, অথচ সেই দুঃসাহসিক স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় যখন হত্যাকারীর কাছ থেকে পাবা আশা নেই, আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সমগ্র দুর্ঘটনাটা আপনাদের সকলের সাম আলোচনা করছি। শুনুন, বিমলবাবুর বিশেষ অনুরোধে সূর্যপ্রসাদবাবুর রহস্যজন হত্যার মীমাংসার ভার নিয়ে এ বাড়িতে আসবার পর এবং আপনাদের যাঁরা সেই দু

রাত্রে এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জবানবন্দি বা বক্তব্য থেকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি ও সেই সঙ্গে এখানকার কয়েকটি ব্যাপার যা আমার দৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে, সেগুলোই একে একে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলছি, আপনারা সকলেই মন দিয়ে শুনুন।

ঐ পর্যন্ত বলে কিরীটী মুহূর্তের জন্য থামল।

সকলেই আমরা নির্বাক।

কিরীটী বলতে লাগল, এক নম্বর হচ্ছে—এ বাড়ির পশ্চাতের বাগানে মালীর ঘরের পাশে যে ঘরটি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল অব্যবহার্য পড়ে আছে, সেটা প্রথম যেদিন বাগানে যাই সেইদিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু-নম্বর—ঐ ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমতঃ আমি দেখতে পাই, ঘরের মেঝেতে ধুলোয় কতকগুলো জুতার ছাপ ও গোল গোল ছোট ছোট কয়েকটা চিহ্ন এবং কুড়িয়ে পাই একটি নস্যির কালো কৌটো বা ডিবে। যে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আপনাদের আমি বলেছি বা আপনারা জানতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, ওই দুটি ব্যাপার থেকে আমি সিদ্ধান্ত করি, মাত্র কয়েক দিন আগে নিশ্চয়ই ঐ ঘরের মধ্যে কেউ গিয়েছিল। এবং আপনাদের মধ্যে সেই ঘরে কে যেতে পারে, আপনাদের সকলের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়—বিমলবাবু ও সুবলবাবুরই কেবলমাত্র ঐ ঘরে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছি, সুবলবাবু ও রাধিকাবাবুই দুর্ঘটনার দিন রাত্রে কমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ঐ ঘরে গিয়েছিলেন। আরো জেনেছি, ঐ রাত্রেই সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেজর স্বামী কাউকে বাগানপথে ঐদিকে যেতে দেখেছিলেন। কথা হচ্ছে এখন, তা হলে কে অত রাত্রে ঐ দিকে যেতে পারে? পরে অবিশ্যি আমি অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে গোপনে কথা বলে জানতে পেরেছি, সেরাত্রে ঐ সময় ঐ ঘরে বিমলবাবুকেই নাকি যেতে দেখেছিলেন!

বিমলবাবু? বললেন মেজর স্বামী।

হ্যাঁ মেজর, বিমলবাবুই।

কিন্তু অত রাত্রে!

হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ঐ ঘরে। তাই না সমরবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নোত্তরে মৃদুভাবে মাথা হেলিয়ে সমর্থন জানালেন সমর।

বিমলবাবু, সত্যি নিশ্চয়ই কথাটা?

হ্যাঁ মিঃ রায়, গিয়েছিলাম সমরের সঙ্গে দেখা করতে। বিমলবাবুও বললেন।

তাহলেই বোঝা যাচ্ছে ঐ ব্যাপার থেকে যে, সমরবাবু ও বিমলবাবুর মধ্যে দুজনের কেউ দুর্গাপ্রসাদের হত্যাকারী নয়! বললে কিরীটী।

কিন্তু তাই যদি হয় তো সেরাত্রে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ কার সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট ঘরে বসে কথা বলছিলেন ? প্রশ্ন করলেন এবারে মেজর স্বামীই।

আপনার সেই প্রশ্নের জবাবেই এবারে তিন নম্বর পয়েন্টে আমি আসছি। কিরীটী বলতে লাগল, এই তিন নম্বর পয়েন্টটি এই রহস্যপূর্ণ হত্যার বাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কি রকম ? প্রশ্ন করলেন আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই।

একটা কথা হয়তো আপনাদের কারও মনেই উদয় হয়নি মেজর. সূর্যপ্রসাদের রহস্যজনক ভাবে নিহত হবার মাত্র কযেকদিন আগে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ! তাই না অমলেন্দুবাবু ?

হ্যাঁ, একটা ডিক্‌টাফোনের ব্যাপারে।

Exactly ! কিন্তু আপনি জানেন যে শেষ পর্যন্ত সূর্যপ্রসাদ ডিক্‌টাফোনটি কেনেন নি। আসলে তা নয়, আপনার সংবাদটা ভুল। আমি নিজে হাজরা ট্রেডিং কোম্পানীতে খোঁজ নিযে জেনেছি, সূর্যপ্রসাদ ঐ দুর্ঘটনার মাত্র দিন-দুই পূর্বেই একটি ডিক্‌টাফোন মেশিন ক্রয করেছিলেন ক্রেডিট্ ভাউচারে ও তার দাম দেবার জন্যই তিনি আপনাকে দিযে মৃত্যুর দিন ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিলেন, কারণ পরের দিন সকালেই তাঁর টাকাটা দোকানে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল।

আশ্চর্য। এটা কিছুতেই আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ একটি ডিক্‌টাফোন কিনতেই বা যাবে কেন ? বললেন এবারে মেজর স্বামীই।

সেটা অবিশ্যি এখন আর জানবার উপায় নেই, তবে তিনি যে ডিক্‌টাফোন কিনেছিলেন একটা, সেটা ক্রেডিট্ ভাউচারে তাঁর সই-ই প্রমাণ দেবে এখনো। কিরীটী বলতে লাগল, সে যা হোক, ঐ ডিক্‌টাফোনেই সূর্যপ্রসাদের গলার আওয়াজের পুনরাবৃত্তি শুনে মেজর স্বামীর সেরাত্রে মনে হয়েছিল, বুঝি তিনি ঐ সময় কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ? তবে কি—

হ্যাঁ মেজর, যদিও সেটা আপনি সূর্যপ্রসাদেরই কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তথাপি সেটা জীবিত সূর্যপ্রসাদের নয়, তাঁর recorded voice-এরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এবং সে-সময় তিনি জীবিত ছিলেন না।

কি ভয়ানক কথা ! যেন স্বগতোক্তি করলেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

যাক সেকথা, এবারে আমি আমার চার নম্বর পয়েন্টে আসব। সেটা হচ্ছে, সমরবাবুর ব্যাপার। সমরবাবু আদৌ নিরুদ্দেশ হননি বা আত্মগোপন করেননি স্বেচ্ছায়। তিনি কিছুদিনের জন্য তাঁর জীবনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার সেনেরই

রামর্শে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন মাত্র, পাছে পুলিস তাঁকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে
লে। হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর যে পলিক্লিনিক আছে, সেখানেই ডাক্তার
সনের পেসেণ্ট হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন সমরবাবু।

How interesting! বললেন মেজর।

Interesting-ই বটে। মৃদু কণ্ঠে মিঃ রায় বললেন।

But how could you guess it? পুনরায় মেজর প্রশ্ন করলেন।

সেই কথাতেই আসছি এবারে মেজর। কিরীটী বলতে লাগল, ডাক্তার সেনের
সই রাত্রের ও পরের দিন প্রত্যুষের গতিবিধিই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে
র্বপ্রথম। কারণ স্পষ্টই তাঁর কথাবার্তা শুনে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি সমরবাবু
ম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন যা আমার কাছে গোপন করছেন। তাই গোপনে গোপনে
আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ডাক্তার সেনের সর্বপ্রকার গতিবিধি সম্পর্কে। এবং তাতে
রেই জানতে পারি, ডাক্তার সেনের হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর পলিক্লিনিকে রীতি-
ত যাতায়াত তো আছেই, তিনি ওই ক্লিনিকের একজন অন্যতম পেট্রনও বটে।
া হোক, অনুসন্ধানে সেইখানেই একটি নতুন রোগীর সন্ধান পাই যাকে a case of
arly T. B. বলে diagnosis করে, ঠিক যে রাত্রে সূর্যপ্রসাদ রহস্যজনকভাবে নিহত
ন তারই পরের দিন প্রত্যুষে ভর্তি করে নেওয়া হয়, ডাক্তার সেনেরই সুপারিশে।
াম বীরেন্দ্র ভদ্র। ব্যাপারটা বুঝতে এখন আর বোধ হয় আপনাদের কারোরই
ষ্ট হচ্ছে না, এই বীরেন্দ্রই আমাদের ডাক্তার সেনের পরামর্শানুযায়ী, ছদ্মনামধারী
আত্মগোপনকারী সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সমরেন্দ্রবাবু!

সত্যি, আশ্চর্য লোক মশাই মিঃ রায় আপনি। মৃদু হেসে আমি বলি, এত কাণ্ড
রেছেন? আশ্চর্য, আশ্চর্য!

আশ্চর্য, তাই না? কিন্তু যাক, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ডাক্তার সেন,
কিরীটীর কাছে অজ্ঞাত কিছুই ছিল না সেদিন! ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে কথাগুলো
লে পুনরায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ রায়
ললেন, যাক সেকথা, সব কথাই আপনাদের বললাম এবং কাল প্রত্যুষেই মিঃ পাণ্ডেকেও
ব কথাই আমি বলব। কিন্তু তার পূর্বে আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন,
তাঁদের সকলকেই শেষবারের মতই আবার বলছি, সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে আমি
নেছি, খুনী কে আমি জানি! অতএব তিনি যতই চেষ্টা করুন, আইন তাঁকে নিষ্কৃতি
বে না।

কিরীটীবাবু থামলো।

ঘরের মধ্যে একটা হিম-কঠিন স্তব্ধতা।

কারও মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই।

এমন সময় বাইরে একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সকলেই আমরা দরজার দিকে তাকালাম। কিরীটী বললে, লোকটিকে ভিতরে আসতে দাও আব্দুল!

পরক্ষণেই সাধারণ ধুতি ও চাদর গায়ে একটি লোক ঘরে এসে ঢুকল।

কি খবর রমেশ?

এই চিঠিটা—

কিরীটী নিঃশব্দে রমেশের হাত থেকে খামটা নিয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, ঠিক আছে, তুমি যেতে পার।

রমেশ বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ডাক্তার সেন, বাড়ি যাবেন নাকি?

হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

॥ চব্বিশ ॥

রাত খুব বেশী হয়নি তখনও?

মাত্র দশটা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, মাত্র পনেরো দিন আগে ঠিক এমনি এক রাত্রে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছিলেন সূর্যপ্রসাদ এবং আজ রাত্রে সেই হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল।

কিন্তু সত্যিই খুনী কে?

সত্যিসত্যিই কি কিরীটী রায় সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছে?

নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজনে আমারই গাড়িতে বসে চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমিই।

মিঃ রায়? মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম।

ইয়েস, ডাক্তার সেন!

রাত তো এমন কিছু বেশী হয়নি, যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না আমার

ম্বারে, এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন !

বেশ তো, চলুন ।

গাড়ি চেম্বারের দিকেই চালালাম।

চেম্বারে পৌঁছে নিজের হাতেই দু কাপ কফি তৈরী করে, এক কাপ দিলাম মিঃ কে, এক কাপ নিলাম আমি ।

দুজনে দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছি, সামনেই টেবিলের উপরে নিঃশেষিত দুটি কর কাপ ।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে ধৃত পাইপ !

টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলো কিরীটীর মুখের উপর এসে ড়ছে । বোঝা যায় গভীর চিন্তায় যেন অন্যমনস্ক ঐ লোকটি ঐ মুহূর্তটিতে।

সহসা ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিঃ রায়ই একসময় মৃদু কণ্ঠে বললে, আজকের লোচনাটা কেমন লাগল আপনার ডাক্তার সেন ?

Rather exciting !

কিন্তু আপনাকে যেন একটু বিশেষ চিন্তিত বলে হঠাৎ মনে হচ্ছে ডাক্তার ?

না চিন্তা কি—তবে—

বলুন, থামলেন কেন ?

সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আপনার কথাটা যেন সত্যিই এখনো আমার ছ প্রহেলিকার মতই মনে হচ্ছে !

কোন্ কথাটা ডাক্তার ? খুনীর পরিচিতি সম্পর্কে কি ?

হ্যাঁ, মানে—এখনও আমি বুঝতে পারছি না, সত্যিই যদি আপনি জানতে পেরে ন যে হত্যাকারী কে, তবে তাকে এই মুহূর্তে মিঃ পাণ্ডের হাতে না তুলে দিয়ে াখুলি ভাবে, এইভাবে আলোচনা করবার পরও আগামী প্রত্যূষ পর্যন্ত—

তাকে সময় দিলাম কেন, তাই না ?

হ্যাঁ, মানে ধরুন—যদি সে পালায় ?

আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে বৈকি ডাক্তার ! বিনা উদ্দেশ্যে কিছুই আমি করি

উদ্দেশ্য ?

হ্যাঁ, কিন্তু যাক সে কথা, you need not worry ! আমি জানি সে পালাতে রে না । ধরা তাকে দিতেই হবে।

তা হলে আমাদের মধ্যেই একজন সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেছে আপনার স্থির বিশ্বা

হ্যাঁ।

কিন্তু কে?

তা হলে সবই আপনাকে খুলে বলি ডাক্তার, বুঝতেই তো পারছেন আমার ক

পূর্বের আলোচনা থেকে যে সমর বা বিমলবাবু হত্যাকারী নন!

তা হয়তো নয়—

তা হলে বাকি যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কে হত্যাকারী হতে পা
এই তো?

হ্যাঁ।

বেশ, তা হলে গোড়া থেকেই শুরু করি। প্রথমেই ধরুন, টেলিফোনে সেরা
আপনার সূর্যপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদটা পাওয়া। প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে যে 'ি
কটেজ' থেকে কেউই আপনাকে ফোন করেনি, ফোনটা এসেছিল অন্য জায়গা থে
কেমন কিনা?

হ্যাঁ—

তাই যদি হয়, তবে ফোনটা করা হয়েছিল কেন? একমাত্র হতে পা
হত্যাকারী চেয়েছিল সেই রাত্রেই ঐভাবে ফোন মারফৎই হত্যার ব্যাপারটা সক
গোচরীভূত করে দিতে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন তার সেই রাত্রেই ব্যাপারটা সকলের গোচরী
করবারই বা এমন কি প্রয়োজন ছিল, পরের দিনই তো সকলে জানতে পার
তা নিশ্চয়ই পারত। তবে এক্ষেত্রে খুনীর ইচ্ছাই ছিল যে ঐরাত্রেই খুনের ব্যাপা
সকলের গোচরীভূত যাতে হয়ে যায়।

কেন?

কেন? ভেবে দেখেছি, তার কারণও ছিল বৈকি। হত্যাকারী চেয়েছিল মনে
এমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ হত্যার ব্যাপারটা প্রকাশিত হোক, পুলিসের গোচরী
হবার পূর্বেই, যাতে করে তার হাতে এমন খানিকটা সময়ের সুযোগ থাকে, যে সম
মধ্যে বা পরে ঐ সুযোগ নিয়ে সে অনায়াসেই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবার অবকাশ
আশা করি আমি যা বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারছেন ডাক্তার সেন!

বলুন?

কিরীটী আবার বলতে লাগল, টেলিফোনের ব্যাপারটার পর তা হলে আসা

ব্যাক্-রেস্ট-দেওয়া চেয়ারটার কথায়।

চেয়ার!

হ্যাঁ, যেটা সম্পর্কে বহুবার ইতিপূর্বে তুচ্ছতম একটা ব্যাপার বলে আপনি আমাকে ত করেছেন। আপনি যে তদন্তের ব্যাপারটা আপনার ডাইরীতে ধারাবাহিক ব লিখেছেন তাতে সেই ঘরের, মানে অকুস্থানের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে কার একটা স্কেচ দিয়েছেন। সেটা যদি একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে বেন, আপনারও বুঝতে কষ্ট হবে না যে আব্দুলের কথামত যদি চেয়ারটা সত্যিই নো হয়ে থাকে তা হলে চেয়ারটা এমন ভাবে এমন জায়গায় ঠেলে দেওয়া ছিল যাতে করে চেয়ারটা ঠিক ঘরের বাইরে যাবার দরজা ও ঘরের একটি জানলার মাঝামাঝি position নেয়।

জানলার?

হ্যাঁ, জানলা-দরজার সঙ্গে ঠিক একই লাইনে ঐ চেয়ারটা ইচ্ছা করেই অর্থাৎ ন মতই রাখা হয়েছিল। আর তাতেই আমার মনে হয়েছিল আব্দুল মিথ্যা নি।

কিন্তু—

কিন্তু কেন? তাই তো, শুনুন ডাক্তার সেন, চেয়ারটার original position ন্য পরিবর্তন করা হয়েছিল যাতে করে ঐ positionএ চেয়ারটা সরিয়ে রাখলে াপথে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে চেয়ারটা উঁচু ব্যাক্-রেস্টের জন্য সহসা কারোই রের পশ্চাতের জানলাটা নজরে পড়বে না। কিন্তু একটু ভাল করে নজর করে লেই বোঝা যায়, চেয়ারের ব্যাক্-রেস্টটা এত বেশী উঁচু নয় যে সেটা দরজাপথে প্রবেশ করলে তার দৃষ্টিপথ থেকে সম্পূর্ণভাবে জানলাটা ঢাকা পড়তে পারে। হ্যা একটা কথা, and which was more important—ঐ চেয়ার-লার মধ্যস্থলে অর্থাৎ চেয়ারটার ঠিক পশ্চাতেই ছিল একটা নীচু গোল টেবিল এবং ে চেয়ারের original position চেঞ্জ করার দরুন জানলাটা সম্পূর্ণভাবে থের অগোচর না থাকলেও টেবিলটাকে দৃষ্টির অগোচর করতে কিন্তু পুরোমাত্রায়ই ষ্য করেছিল, অর্থাৎ হত্যাকারী চেয়ারটার position ঐভাবে সরিয়ে দিয়ে চেয়ে-তার পশ্চাতে রক্ষিত টেবিলটা যেন ঘরে ঢুকলেই কারো সহসা নজরে না আসে।

কিন্তু কেন, কেন?

এ তো সময়ের কথা ডাক্তার সেন, সেই টেবিলটার উপরে এমন কোন বস্তু হয়তো যেটা ... জায়নি যে ঘরে ঢুকে কেউ দেখতে পাক। এবং যে মুহূর্তে ঐ সম্ভাবনাটি

আমার অনুসন্ধিৎসু মনে পরের দিন প্রত্যুষে সেই ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উ
দিয়েছে সেই মুহূর্তেই সত্যি কথা বলতে কি আমি যেন সত্যের ছায়া দেখতে পেলা
আর সেই মুহূর্ত থেকেই একটা চিন্তা কেবলই মনের মধ্যে আমার ঘোরাফেরা কর
লাগল, সেটা কি, কি হতে পারে! কি হওয়া সম্ভব! প্রথমটায় অবিশ্যি কোন সূ
খুঁজে পাইনি। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তারপর অনুসন্ধান করতে করতে এ
কয়েকটি বিষয় আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে যাতে করে ক্রমশঃ সত্যটা একটু এ
করে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, ক্রমশঃ এইটাই বুঝলাম, হত্যাকারী হয়তো হত্যা করবার পর ঘর ছেড়ে চ
যাবার সময় ঐ টেবিলের উপরে এমন কোন জিনিস ছিল যেটা সে সময় তার প
নিয়ে যাওয়া সুবিধা হয়নি বা হবে না জেনেই পরে তাকে টেলিফোন-কল
সহায়তা নিতে হয়েছিল। এবারে বুঝতে আশা করি নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না আ
কথাগুলো ডাক্তার সেন অর্থাৎ সেটা এমন কিছু মারাত্মক যেটা পরে অন্যের নজ
পড়লে হত্যাকারীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, সেইজন্যই সে ঐ টেলিফোন-কলের সুযোগে সকলের সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্র
করে সেই গোলমালের ও সকলের অন্যমনস্কতার মধ্যে সেই মারাত্মক বস্তুটি সরি
নেবার সুযোগ পেয়েছিল।

এখন পুলিস সেখানে পৌছবার আগে কারা কারা সে ঘরে গিয়েছিল—আ
আব্দুল, মেজর, বলদেববাবু, রাধিকাপ্রসাদবাবু ও বিমলবাবু! প্রথম ধরা যাক আব্দু
সে-ই যদি হবে তবে চেয়ারের কথা সে কোনমতেই বলত না। একমাত্র এই কা
আমি আব্দুল যে নির্দোষ সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত। তারপর মেজর, বিমলবাবু ও রা
প্রসাদবাবু! তাদের প্রতি একটু সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে জিনিসটা
আমি মেজরের কাছে খোঁজ নিয়ে শুনেছি, সূর্যপ্রসাদের কথাবার্তা যা সেরাত্রে
শুনতে পেয়েছিলেন, সেটা বেশ একটু অস্বাভাবিক রকম জোরে জোরে।
মানুষই বিশেষ করে প্রাইভেট কথাবার্তা অত জোরে বলতে পারে না।

কিরীটী বলতে লাগল।

যে মুহূর্তে আমি হাজরা কোম্পানি থেকে জানতে পারি সূর্য ... দ মৃত্যুর দ
আগে মাত্র একটা ডিক্টাফোন ক্রয় করেছেন, তখনই ডিক্টাফোনাজ ... রটা
মনে গেঁথে যায়। আমি চিন্তা করতে শুরু করি। হঠাৎ একসঙ্গী চ ... হলে ... া, সূর্য

ক্টাফোনটা ক্রয় করেছেন, সেটা কোথায়? বহু পরিশ্রম করে খোঁজাখুঁজি আমি বা ও-বাড়ির কেউ সেটা পাননি।

ামি কিন্তু এ কথাটা একবারও ভাবিনি মিঃ রায়।

াভাবিক। যাক তখন আমার মনে হল, এমনও তো হতে পারে ঐ ডিক্টাফোনটাই েব উপরে ছিল এবং সেটাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে! কিন্তু খুনী যদি সেটা ফেলেই থাকে তবে সকলের সামনে অজ্ঞাতে কী ভাবে সেটা সরিয়ে ফেললে? ই এমন কোন কিছু খুনী সঙ্গে এনেছিল যার সাহায্যে সেটা অনায়াসেই অলক্ষ্যে ফেলেছে। বুঝতে পারছেন এখন ডাক্তার সেন, খুনী আমাদের চোখের া অল্পে অল্পে আকার নিচ্ছে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, কেন খুনী ল ফোন করে সেই রাত্রেই খুনের কথা সকলকে জানিয়ে ডিক্টাফোনটা নিয়ে পড়েছিল? যাতে করে পরের দিন সকালে তার কোন কাজকর্মের বা সূত্রের র্যন্ত না থাকে! কিন্তু সকালে হলেই বা ক্ষতি ছিল কী? ছিল, ডিক্টাফোন যাবার সময় সকলের চোখে ধরা পড়ত।

ামি বাধা দিলাম, কিন্তু ডিক্টাফোনটা সরানোর কী এমন প্রয়োজন ছিল?

পনি জানেন, সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়ও তাঁর ঘর থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি ডিক্টাফোনের মাউথপিসে এখন কিছু এবং কিছু সময় পরে মেসিন চালালেই আবার সে কথাটা শোনা যেতে পারে! াৎ—

, অর্থাৎ আমি বলতে চাই, রাত্রি এগারোটার ঢের আগেই স্যার সূর্যপ্রসাদকে া হয়েছিল। রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর গলা ডিক্টাফোনে শোনা ল, তার কারণ খুনী খুন করে চলে যাবার আগেই মেসিনটা চালিয়ে দিয়ে ল অন্যকে ধোঁকা দিতে। এই সব থেকেই বোঝা যায় খুনী সূর্যপ্রসাদের যথেষ্ট ে ও জানত যে সূর্যপ্রসাদ ডিক্টাফোন কিনেছেন। তারপরে আসা যাক, র গায়ে পায়ের ছাপে। পায়ের ছাপ দেখে এবং তাজ হোটেলে সমরের কাদামাখা দেখে মনে হয়—জানলার পায়ের ছাপ সমরের হতে পারে; কিন্তু খোঁজ নিয়ে ই, সেরাত্রে সমরের পায়ে যে জুতো ছিল সেটা তাজ হোটেলে পাওয়া জুতোর ই প্যাটার্নের রবার সোল দেওয়া জুতো। কিন্তু হাসপাতালে সমরের পায়ের তো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি সে জুতোয় এতটুকুও কাদার দাগ ছিল অথচ সমরের ঘরে কাদামাখা জুতো পাওয়া গেল। কোন লোকই একই র্নের তিন জোড়া জুতো কিনতে পারে না। তা ছাড়া প্রমাণিত হয়েছে, সমর

সে সময় হোটেলের জুয়াঘরে জুয়া খেলায় মত্ত ছিল। এবং সমরকেই আপনি দিয়েছিলেন যে সে হাজারিবাগ যাচ্ছে সেকথা যেন সেই রাত্রেই ফোনে আপ জানায়। এতে মনে হয়, নিশ্চয়ই কেউ সমরের জুতো পায়ে দিয়ে সূর্যপ্রসাদকে খুন জুতো আবার তার ঘরে অন্যের অলক্ষ্যে রেখে এসেছে, তার ঘাড়ে খুনের চাপানোর জন্য। এ থেকে এও প্রমাণিত হয়, খুনী সমরকেও বেশ ভালভাবেই ও তার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এই সব কারণ থেকেই বোঝা যায়, খুনী এমন লোক যে জানত ম্যাক্সিকান ছোরাটা কোথায় আছে এবং যে স্যার সূর্যপ্রস পরিচিত ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল। যে সূর্যপ্রসাদের সংসারের অনেক সংবাদই জ যে ডিক্টাফোনের সংবাদই নয় তার ব্যবহারও বেশ ভালভাবেই জানত এবং যার ডিক্টাফোনটাকে লুকিয়ে নিয়ে যাবার মত বাক্স বা তেমন কিছু ছিল। তা বুঝুন খুনী কে! শুনুন ডাক্তার সেন, গোখরো সাপ নিয়ে খেলা করার চাইতে ভয়ঙ্কর কিরীটী রায়কে নিয়ে খেলা করা। এখন বুঝে দেখুন, এই সব কিছুর সঙ্গে যাচ্ছে কে? আপনি! হ্যাঁ আপনি, ডাক্তার সেনই—সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

॥ পঁচিশ ॥

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, কী বলছেন পাগলের মত মিঃ রায়? শেষ এই ধারণা হল আপনার যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী আমি! হাঃ হাঃ হাঃ!

শুনুন ডাক্তার সেন, পাগল আমি নই। আপনার জবানবন্দির মধ্যে একটা সময়ের হেরফেরই সমস্ত রহস্য আমার কাছে দিনের আলোর মত পরি করে দিয়েছে। আমি অনেক দিনই আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম, শুধু প্রমাণের জন্যই এবং আজকের রাতটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

সময়ের হেরফের!

হ্যাঁ। আপনি আপনার জবানবন্দিতে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেছেন, সাড়ে দশটায় সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে আপনি বিদায় নেন অথচ গেটের কাছে ব সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, তখন রাত্রি এগারোটা বাজল গির্জার ঘড়িতে। থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে আসতে পাঁচ-ছ মিনিটের কারও লাগতেই পারে না, অথচ আপনার আধ ঘণ্টা লাগল। কেন? কি করা এই আধ ঘণ্টা সময়? কোথায় ছিলেন? তা ছাড়া সূর্যপ্রসাদের নিহত হবার

ন পেয়ে কালো রঙের ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়েই বা সেরাত্রে 'লিলি কটেজে' ছিলেন কেন ? মৃত ব্যক্তিকে ইন্‌জেকশন দিতে বুঝি ? ডাক্তার, নিজের জালে ; জড়িয়েছেন ! ব্যাগটা না নিয়ে গেলে যে ডিক্‌টাফোনটা আনতে পারতেন বং ঘরে ঢুকেই চেয়ারটা সরিয়ে রেখেছিলেন পাছে কারও নজরে পড়ে।

দবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র মিঃ রায়।

কল্পনা নয় ডাক্তার, আপনি মস্ত বড একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ঘরের কথাবার্তার মেজর পরে আমাকে বলেছিলেন তিনি নাকি আপনার কণ্ঠস্বরই শুনেছিলেন, ই বোঝা যায় আপনি ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ওই ঘরে ঢোকেনি বা ওই ছিল না।

জরের কথাই যে অভ্রান্ত সত্য তারই বা প্রমাণ কি ? বললাম আমি।

য তা জানি। আর সেই কারণেই ডিক্‌টাফোনটা কৌশলে পরে আপনার থেকে আমাকে সরিয়ে সেফ্‌ কাস্টোডিতে রেখে দিতে হয়েছে। যাক সেকথা t me finish ! সেরাত্রে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জানলা টপকিয়ে নীচে নেমে াড়ি তাজ হোটেলে গিয়ে সমরের জুতোটা সেখানে রেখে সাইকেলে চেপে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগে না। তারপর সেই রাত্রে তাজ লে গিয়ে সমরকে ভয় দেখিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলাতেও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় ছন।' কিন্তু হায়, এত করেও সব দিক বাঁচাতে পারলেন না। নিজের তেই ধরা দিলেন। দোষীর বিচার ভগবান এমন করে তাকে দিয়েই করান। আসি। Good night ! পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে করে শুধু াই বাড়বে। তা ছাড়া ঘুমিয়ে নেই, সজাগ হয়েই আছেন মিঃ পাণ্ডে !

কবীটী অতঃপর ধীর মন্থর পদে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

াইরীটা শেষ করে যাওয়া দরকার।

ার কারও জন্য না হোক, অন্ততঃ মিতা—মিতার জন্যও শেষ করে যাওয়া দরকার।

ন্ধকার ! শুধুই অন্ধকার !

ন—সব আজ স্বীকার করে যাব।

াভের বশবর্তী হয়ে যে মহাপাপ করেছি, নিজের মুখে স্বীকৃতি না রেখে গেলে ক্তি নেই আমার।

! হ্যাঁ, মুক্তি—

ভর আগুনে পুড়ে মরছি। জগৎজীবনকে টিবারকুলীন ইন্‌জেকশান দিয়ে তাঁর

পুরাতন টি. বি. রোগকে flare up করে তাঁকে হত্যা করেছি, পুলকজীবন-ভাইয়েরই পরামর্শে দশ হাজার টাকার লোভে। আর সমরই পুলকজীবনের আমার যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। কিন্তু অর্থের নেশা আর পাপের নেশা যে ভয়াবহ পথ ধরে চলে তখন তো তা বুঝিনি। তাই সেই নগদ দশ হা টাকাপ্রাপ্তির পরও যখন দুর্দান্ত লোভের বশবর্তী হয়ে পুলকজীবনকে blackmai করতে শুরু করলাম এবং শেষ পর্যন্ত যখন বুঝলাম দোহন আর সহ্য না করতে সে বেঁকে দাঁড়াবার উপক্রম করছে তখন তাকেও পথ থেকে সরাতে বাধ্য হলাম, একই উপায়ে। তারও টি. বি. রোগ ছিল ; তাকেও টিবারকুলীন ইন্‌জেকশান শেষ পর্যন্ত হত্যা করলাম। তারপর ধরলাম সমরকে। সমরের সাহায্যে a দিয়ে slow poisoning করতে শুরু করলাম সূর্যপ্রসাদকে।

কিন্তু হায়, তখন তো বুঝিনি, পাপ চিরদিন চাপা থাকে না! আর তাই হয় মৃত্যুর পূর্বে পুলকজীবন তার বন্ধুকে সব জানিয়ে গেল একটা চিঠিতে এবং বন্ধু চিঠি লিখে সব গোচরীভূত করল সূর্যপ্রসাদের।

পুলকজীবন সম্পর্কে কিরীটীর অনুসন্ধিৎসা দেখেই কেমন যেন আমার হয়েছিল এবং সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হল সূর্যপ্রসাদের আমন্ত্রণ পেয়ে।

তাই প্রস্তুত হয়েই সূর্যপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেরাত্রে। যাবার পূর্বেই সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘর থেকে চন্দনকাঠের বাক্সটা খুলে ছো নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে লুকিয়ে এবং সূর্যপ্রসাদের চিঠি পড়া শুরু হতেই বুঝ অনুমান আমার মিথ্যা নয়। সব এবারে জানাজানি হয়ে যাবে।

আর রক্ষা নেই।

অনন্যোপায় হয়েই তাই সূর্যপ্রসাদকে সেরাত্রে হত্যা করেছি।

কিন্তু হত্যা তো উত্তেজনার বশে অকস্মাৎ করে বসলাম, তারপর এদিক তাকাচ্ছি, সহসা পাশেই টেবিলের উপর নজরে পড়ল সূর্যপ্রসাদের স ডিক্‌টাফোনটা। দেখলাম সেটা নিঃশব্দে তখনও চলছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মাথায় এসে গেল—মেসিনটাকে থামিয়ে আবার গোড়া থেকে চালিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ, আমিই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

কিন্তু সমর—সমর দোষী নয় মিতা। তাকে তুমি যেন ভুল বুঝো না তুমি গ্রহণ করো।

মিতা, ক্ষমা করিস ভাই তোর এই পথভ্রান্ত হতভাগ্য দাদাকে।

হ্যাঁ, ওই যে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট দেওয়াল-আলমারিতে সাজানো সারি সারি 'বিষ' লেখা ওষুধের শিশিগুলো।

বেলেডোনা, টিনচার ওপিয়াই, টিনচার হায়োসায়মাস, বারবিটোন, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, লুমিনল, সেকোনল সোডিয়াম, ভেরোনল—

হ্যাঁ ঠিক, ভেরোনলই সব চাইতে ভাল। অনেক রাত ঘুমোইনি। একটু—একটু ঘুমোতে চাই। ঘুমোব, হ্যাঁ—ওই ভেরোনলই দেবে আমাকে ঘুম।

আঃ, ঘুম!

ঘুম—সত্যিই কি ঘুম আসছে!

কলঙ্ককথা

॥ এক ॥

ছি ছি ছি!

একটানা একটা ছি ছি যেন ওর দু'কান ভরে বাজতে লাগল।

কেউ বলেনি, কেউ উচ্চারণ করেনি কথাটা—তবু যেন ওর মনে হল সবাই ওকে ছি ছি করছে।

সবাই যেন আঙুল তুলে ওর দিকে তাকিয়ে একই স্বরে বলে যাচ্ছে, ছি ছি ছি!

মুখ তুলেও একবার তাকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

মাথাটা যেন লোহার মত ভারি হয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সুদর্শন ওর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন।

কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে ও সুশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

ঘরে আর তখন কেউ নেই।

কেবল ওরা দুটি প্রাণী।

একটা কুৎসিত খণ্ড-বিপর্যয়ের পর সব যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছে।

ঝড় থেমে গিয়েছে।

কিন্তু ফের ঝড়! কী সে কাহিনী?

কাহিনী মাত্রেরই একটা পটভূমিকা থাকে, নচেৎ কাহিনী গড়ে উঠতে পারে না।

হয়তো কখনো সেই পটভূমিকা স্পষ্ট হয়েই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, কখনো হয়তো অলক্ষ্যে অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে থাকে।

যে কাহিনী বর্ণনা করতে চলেছি, তারও ছিল অলক্ষ্যে একটা পটভূমিকা।

তাই মূল কাহিনীতে আসার আগে পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

অবিশ্যি প্রথমটায় কাহিনীর সত্যিকারের পটভূমিকাটা সুদর্শনের নজরে পড়েনি।

মোটা রেখায় যে পটভূমিকাটা প্রথমে সুদর্শনের মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল, কাহিনীর গতি অনুসরণ করতে করতে সে দেখতে পেল সেটা বাইরের একটা আবরণ মাত্র—আসল পটভূমিকাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যে পটভূমিকায় সবার অলক্ষ্যে বর্তমান কাহিনীর বীজ সুপ্ত ছিল এবং যেখান থেকে আসল কাহিনীর সূত্রপাত।

তাই সুদর্শন যখন বলেছিল, ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ আমার একবারও মনে হয়নি দাদা!

জবাব পেয়েছিল, কোন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দিয়েই মানুষের অঙ্কটা মেলানো যায় না ভায়া। কষতে কষতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখবে—সব ভুল হয়ে গিয়েছে, সব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

মোটা রেখার পটভূমিকা থেকেই শুরু করা যাক।

১৯৭০ সনের কলকাতা শহর।

অশান্ত—অস্থির—বিক্ষুব্ধ। একটা বিশৃঙ্খলতায় সোচ্চার।

আগের দিন একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ক্লাস ভেঙে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে বের হয়ে এসেছিল থার্ড ইয়ারের ক্লাস থেকে।

দেখতে দেখতে সেই গোলমাল সারাটা কলেজে ক্লাসে ক্লাসে ছড়িয়ে পড়ল—সব ক্লাস একে একে বন্ধ হয়ে গেল।

প্রফেসাররা একে একে প্রফেসার্স কমন-রুমে গিয়ে ঢুকলেন।

তার কিছুক্ষণ পরে অধ্যক্ষ প্রশান্ত সেনের কক্ষে অধ্যাপকদের ডাক পড়ল।

সকলকে নিয়ে মিটিং করে প্রশান্ত সেন আপাততঃ কিছুদিনের জন্য কলেজ বন্ধ রাখাই স্থির করলেন।

ছেলের দল তখনো কলেজ-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ও বাইরে গেটের সামনে ছোট ছোট দলে হৈ-হল্লা করছে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে কলেজ বোর্ডে নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হল—পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ রইল।

তারপরও কিছুক্ষণ ছাত্ররা হৈ-হল্লা করেছিল। তারপর একে একে সব চলে গেল। ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

সুশান্ত গতকাল কলেজে যায়নি।

ছাত্র সংসদের অন্যতম পাণ্ডা, ফোর্থ ইয়ার ম্যাথমেটিকস্ অনার্সের ছাত্র।

শরীরটা অসুস্থ ছিল বলে কলেজে যেতে পারেনি সুশান্ত।

তাহলেও সংবাদটা তার কাছে দলের একজন, রবীন পৌঁছে দিয়েছিল গতকাল বিকেলেই।

প্রিন্সিপাল কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে নোটিশ দিয়ে।

রবীনের মুখে সংবাদটা শুনে সুশান্ত বলেছিল, কত দিনের জন্য ?

অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

Issueটা তাহলে—

হ্যা, যা ছিল তাই, তুই তো জানিস—সব জানিস সুশান্ত, প্রফেসার ডাঃ কে. ড-কে কলেজ থেকে সরাতে হবে—ছাত্র সংসদের দাবি।

প্রফেসার কে. ডি. মানে ক্ষিতীশ দত্ত। ম্যাথমেটিকসের প্রফেসার।

অত্যন্ত শান্ত নিরীহ গোবেচারা ধরনের মানুষটি। বেঁটেখাটো রোগা পাতলা। অনেকদিন ঐ কলেজে অধ্যাপনা করছেন। একজন গুণী ব্যক্তি হিসাবে দেশ-বিদেশে তাঁর নামও আছে।

সুশান্ত রবীনের মুখে কথাটা শুনে চুপ করে ছিল।

সুশান্তকে চুপ করে থাকতে দেখে রবীন অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, কি রে, তুই যে চুপ করে আছিস সুশান্ত, কিছু বলছিস না ?

কী বলব ?

কেন, কিছু বলবার নেই ?

কী আর বলব, কেবল এইটুকুই বলতে পারি—ব্যাপারটা ভাল হল না। এর ফল [illegible]াল হবে না—হতে পারে না—

কিন্তু—

আরো মিটিং করে ব্যাপারটা সম্পর্কে আরো বিবেচনা করে তারপর 'ডিসিশন' নেওয়া বোধ হয় উচিত ছিল। মৃদু গলায় সুশান্ত অতঃপর জবাব দেয়।

কেন গত শনিবারের মিটিংয়েই তো আমাদের একপ্রকার ডিসিশন নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে কথা তোকে জানিয়েও গিয়েছিলাম আমি। রবীন বললে।

সুশান্ত চুপ করে রইল।

কিছুটা যেন অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছে তখন সে।

বোধ হয় অধ্যাপক কে. ডি.র শান্ত-সৌম্য মুখখানাই বার বার তার মানসপটে ভেসে উঠছিল।

আরো ভাবছিল সে—কে. ডি. ব্যাপারটা যখন জানতে পারবেন কি ভাববেন !

সে তার একজন অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র—তার জন্য কে. ডি. যেমন গর্ববোধ করেন, তেমনি ওকে স্নেহও করেন।

তিনি নিশ্চয়ই জানতে পারবেন—ছাত্র সংসদের সভাপতি, সে-ই—

সত্যিই সুশান্ত আগের মিটিংয়েও যেমন উপস্থিত হতে পারেনি—গতকালের মিটিংয়েও থাকতে পারেনি শরীরের অসুস্থতার জন্য, সেই কারণেই সে একটা অনুরোধ করে পাঠিয়েছিল, মিটিং যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ছাত্র সংসদের সেক্রেটারী তা পিছিয়ে দেয়নি।

গতকালই মিটিং হয়ে গিয়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবও পাস হয়ে গিয়েছে।

কলেজ ছাত্র-সংসদের সে সভাপতি, তার অনুপস্থিতিতে কোন মিটিংয়ে কোন বিশেষ বিষয়ে যে কোন ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় সেকথাটা সুশান্ত রবীনকে কিন্তু বলল না, রবীন আরো কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গিয়েছিল।

সকালবেলা নিজের পড়ার ঘরে বসে গতকালের কথাটাই ভাবছিল সুশান্ত।

চৈত্রের মাঝামাঝি এখন, এর মধ্যেই শহরে রীতিমত গরম পড়ে গিয়েছে।

দুপুরের দিকে রীতিমত 'লু'র মতই একটা অগ্নুত্তপ্ত হাওয়া হু-হু করে বয়। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় সে আগুন-হাওয়া।

এবার যেন গরমটা খুব তাড়াতাড়ি এসে গেল।

আজ সকাল থেকেই গরম যেন বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মাথার উপরে ঘূর্ণ্যমান পাখাটা হঠাৎ ধীরে ধীরে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন অলস দৃষ্টিতে সুশান্ত মাথার উপরে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকাল।

পাশের ঘরে বাবা অ্যাডভোকেট রসময়বাবু তাঁর মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর গলা শোনা গেল, গেল—কারেণ্ট বোধ হয় অফ্ হয়ে গেল! জ্বালাতন!

সত্যি! এই এক বিদিকিচ্ছি ব্যাপার আজকাল এই শহরে শুরু হয়েছে।

যখন-তখন কারেণ্ট অফ্। লোড শেডিং। কখনো আধ ঘণ্টা—কখনো কখনো বা আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত কারেণ্ট বন্ধ হয়ে থাকে শহরের এক এক অংশে।

এই গরমের মধ্যে এটা যে কি অসহ্য ব্যাপার!

কেবল কারেণ্ট কেন? সব কিছুতেই তো অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা!

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাটাই যেন কেমন ক্রমশঃ এলোমেলো পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে।

সুশান্ত!

কে, প্রমীলা? এস, এস!

প্রমীলা দত্ত এসে ঘরে ঢুকল।

একসময় সহপাঠিনী ছিল। এখন অবশ্য নয়, প্রমীলা বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী।

বছরখানেক ওদের সঙ্গে সায়েন্স পড়েছিল, তারপরই মেডিক্যাল কলেজে প্রি-ইউনিভারসিটি পাস করে চলে যায়।

তাহলেও দেখাসাক্ষাৎ দুজনের মধ্যে প্রায়ই হয়।

প্রমীলার আরো একটা পরিচয় আছে। ওদের কলেজের ম্যাথমেটিকসের প্রফেসর

ঃ কে. ডি-র মেয়ে।

কেবল একসময় যে প্রমীলা সুশান্তর সহপাঠিনীই ছিল তাই নয়, ওদের ওই ড়াতেই ডাঃ দত্ত অনেকদিন বাস করেছেন।

দুখানা বাড়ির পরেই ছিল ডাঃ কে. ডি-র বাসা। সেই সময়ই আলাপ দুজনের।

তারপর স্কুল-ফাইনাল দেবার সময় প্রমীলা আসত ওর সঙ্গে একত্রে পড়তে। জনেরই সায়েন্স ছিল আর সুশান্ত বরাবর ক্লাসের ছিল সেরা ছাত্র।

কি খবর, হঠাৎ সক্কালবেলা। সুশান্ত প্রমীলার মুখের দিকে তাকাল, তোমাদের লেজ নেই?

না।

কেন?

স্ট্রাইক চলেছে। প্রমীলা বললে।

তোমাদেরও স্ট্রাইক চলেছে?

হ্যাঁ।

কবে থেকে? সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে।

আজ চারদিন হল। তা বাবার মুখে শুনলাম—

কি?

তোমাদের কলেজও তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য গতকাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে!

আমি তো আজ দিন-পাঁচেক কলেজে যাইনি—তবে শুনেছি—

তুমি জান না কিছু?

মিটিংয়ে আমি অনুপস্থিত ছিলাম।

প্রমীলা অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে, তোমাকে বাবা একবার দেখা করতে বলেছেন।

আমার?

হ্যাঁ।

বাবাকে বলো আমি আজ সন্ধ্যায় যাব।

সুশান্তর মনে হচ্ছিল প্রমীলা যেন আরো কিছু বলতে চায়, আরো কিছু যেন তার বলবার আছে, কিন্তু প্রমীলা একটু পরেই উঠে দাঁড়াল।

চললে? সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে।

হ্যা যাই—আজ একবার কলেজে যেতে হবে।

কলেজে তো স্ট্রাইক চলছে বললে।

হ্যাঁ, মার পেটের ব্যথাটা কিছুতেই যাচ্ছে না—তাই ভাবছিলাম ডাঃ সাহাকে দিয়ে আমাদের হাসপাতালে একবার মাকে পরীক্ষা করাবো।

কিসের ব্যথা মাসীমার পেটে ?

কত চিকিৎসাই তো হল—এক-একজন এক এক রকম বলে। আচ্ছা চলি—এরপর গেলে আউটডোরে হয়তো ডাঃ সাহাকে পাওয়া যাবে না।

প্রমীলা যাবার জন্য পা বাড়াল।

হঠাৎ ঐ সময় সুশান্ত মৃদু গলায় ডাকল, প্রমীলা !

ঘুরে দাঁড়াল প্রমীলা। তাকাল সুশান্তর মুখের দিকে।

সুশান্তর মুখটা যেন কেমন শুকনো শুকনো।

প্রমীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু বলছিলে ?

তুমি আমাদের একেবারে বর্জন করেছ। সুশান্ত বললে।

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে, হঠাৎ ও কথাটা তোমার মনে হল কেন ?

সুশান্ত বললে, কথাটা কি মিথ্যে ?

তাই। প্রমীলা বললে।

পড়াশুনা করছ না ? সুশান্ত আবার প্রশ্ন করে।

না। প্রমীলা বললে।

তবে ?

কি তবে ?

আস না কেন ?

ভাল লাগে না।

কেন ?

কি জান সুশান্ত, আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়—

কি ?

এই যে ব্যাপার, প্রতি স্কুল-কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে চলেছে প্রত্যহ—এতে আমাদের কি লাভ হচ্ছে ? ভেবে দেখ আজ ছ-সাত মাস হয়ে গেল সব কলেজে স্কুলে পড়াশুনা একপ্রকার বন্ধ বললেই হয়—কিন্তু এতে করে এই বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে সব এলোমেলো করে দিয়ে ক্ষতিটা হচ্ছে কার ?

সুশান্ত কোন জবাব দেয় না প্রমীলার কথার। চুপ করে থাকে।

প্রমীলা বলতে থাকে,সবাই তোমরা বলছ পুরনো সব নিয়ম-কানুন ভেঙে দিয়ে বা পাল্টে, শিক্ষাপদ্ধতি পাল্টে নতুন করে সবগড়তে হবে। কিন্তু গড়াটা কি এতই সহজ

া সহজ সুশান্ত, কিন্তু গড়া সহজ নয়। তুমি হয়তো আমার কথায় ব্যথা পাচ্ছ
ান্ত, ভাবছ আমি বিট্রে করছি—

না না—তা কেন ভাবব? সবারই স্বাধীন ভাবনার অধিকার আছে। সুশান্ত
ন্ন গলায় বললে।

প্রমীলা বললে, ক্লাস টাস তো হচ্ছে না—তাই নিজে নিজে বাড়িতেই বসে বসে
টা পারি পড়ছি। যাক চলি—

এস।

রাগ করোনি তো সুশান্ত কথাগুলো বললাম বলে?

না, না।

প্রমীলা কেন যেন সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

সুশান্ত চেয়ে চেয়ে দেখছিল প্রমীলাকে। রোগা পাতলা ছোটখাটো গড়ন
মীলার। গায়ের রঙটা কালোই। কিন্তু কালো হলেও প্রমীলার চমৎ
শ্রী ছিল।

মাথায় বোধ হয় কোনদিনই তেল দেয় না প্রমীলা, রুক্ষ মাথা
কাল সচরাচর অত চুল মেয়েদের বড় একটা দেখা যায় না।

রুক্ষ কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল গালের দু'পাশে লতিয়ে নেমেছে।

তাতে করে প্রমীলাকে যেন আরো সুন্দর মনে হয়।

বেশভূষার প্রতি কোনদিনই প্রমীলার কোন আকর্ষণ নেই। সাধার
ন্ব শাড়ি সাধারণ ভাবে পরা।

বা হাতে দু'গাছি সোনার চুড়ি—ডান হাতে ছোট একটি রিস্টওয়াচ্।

কি দেখছ মুখের দিকে চেয়ে? প্রমীলা জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ।

কিছু না।

চলি তাহলে—

এসো।

প্রমীলা চলে গেল।

সুশান্ত চেয়ারের পিছনে পিঠটা ছেড়ে দিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল সুশান্তর। হঠাৎ গরমটা বেশী পড়ায় শহরে জ্বরজারি
হয়েছে, ঘরে-ঘরেই জ্বরজারি।

বেশী টেম্পারেচার ওঠেনি, তবু শরীরে যেন বিশ্রী একটা ক্লান্তি।

সুশান্ত খোলা জানলাপথে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকাল।

বেলা বাড়ছে—রোদের তাপও একটু একটু করে বাড়ছে। আরো যত বে
বাড়বে, তাপও বৃদ্ধি পাবে।

কারেন্ট এখনো এল না। এখন বেশ গরম বোধ হচ্ছে। গেঞ্জির তলায় ঘ
জমতে শুরু করেছে।

সুশান্ত ভাবছিল প্রমীলার কথাই।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পর আজকাল আর তেমন বড় একটা উভ
দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কতদিন পরে প্রমীলার সঙ্গে দেখা হল। সুশান্ত মনে ম
হিসাব করে।—

সুশান্তর মুখটা যেনাস তো হবেই।

প্রমীলা ওর মুখেবল—গোটাচারেক নতুন কবিতা লিখেছে সুশান্ত, কবিতা
তুমি শানানো হল না।

প্রমীলা তাকে দেখা করতে বলেছেন একবার। কিন্তু কেন? কলেজের ব্যাপারেই
সুশান্ত বললে, ভদ্র ধীর-স্থির মানুষটি! মনে মনে সুশান্ত কে. ডি.কে ভাববার
তাই। প্রমীল,

পড়াশুনা করছ না—হতে যে দু-চারজন পুরনো স্টাফ—ডাঃ কে. ডি. তাঁদের অন্য
না। প্রমীলা শ বছর হয়ে গেল ওঁর ঐ কলেজে বোধ হয়।

তবে? ার কয়েক ইউরোপ ঘুরে এসেছেন কনফারেন্সে।

কি তবে? ,টো রোগা মানুষটি।

আস না কে. ডি.র চেহারাটা ভাসতে থাকে যেন চোখের সামনে সুশান্তর।

॥ দুই ॥

প্রমীলা চলে গেল।

সুশান্তর যেন কিছুই ভাল লাগে না। সে চেয়ারটার উপর গা ছেড়ে দিয়ে
বসেছিল তেমনই বসে রইল।

উপরের দিকে একবার অন্যমনস্কভাবে তাকাল।

কারেন্ট এখনো আসেনি।

আরো কতক্ষণ বন্ধ থাকবে কে জানে? এর মধ্যেই গরম হাওয়া বইতে
করেছে!

একবার মনে হল সুশান্তর উঠে জানলাটা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হবে না, খোলা জানলাপথে তাকাল।

ওর ঐ জানলা বরাবর ঠিক রাস্তার উল্টোদিকে সমরেশদের বাড়ি।

একই ইয়ারে একই কলেজে ওরা পড়ে দুজনে।

তবে ও বি. এস-সি আর সমরেশ পড়ে বি. এ.।

সমরেশের সঙ্গে ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরে ওর কথাবার্তা বন্ধ।

কেন যে মাস-দুয়েক আগে চটাচটি করে সমরেশ ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করল, আজও শান্ত তা বুঝতে পারেনি।

দেখা হলে পথে বা কলেজে সমরেশ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নিক মুখ ফিরিয়ে, সমরেশ যদি কথা বন্ধ করে থাকে ওরই

এক পাড়ায় সামনাসামনি থেকেও কথা বন্ধ।

বোন মিতা এসে ঘরে ঢুকল।

দাদাভাই!

কি রে?

মা জিজ্ঞাসা করছে, কি খাবে আজ?

কি আবার, ভাতই খাব।

ডাঃ চক্রবর্তীকে ফোন করে একবার জিজ্ঞাসা করে নিলে পারতে।

যা তো তুই, বেশী পাকামি করতে হবে না।

কালও তো তোমার গা গরম ছিল—ভাত খাবে? মিতা বললে।

হ্যা খাব, যা তুই।

মিতা চলে গেল।

সারাটা দুপুর বসে বসে একটা কবিতা লিখেছে সুশান্ত। বার বার কাটাকুটি করে শেষটায় যে কবিতাটা দাঁড়িয়েছে, সেটাও তেমন মনঃপূত হয়নি সুশান্তর।

বোধ হয় তেমন মুড গড়ে ওঠেনি।

বিকেলের দিকে গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে স্যাণ্ডেলজোড়া পায়ে গলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল সুশান্ত—প্রমীলাদের বাড়িতে যেতে হবে।

আগে প্রমীলারা তাদের এই পাড়াতেই দুখানা বাড়ির পরের বাড়িটায—দোতলা বাড়িটায় ভাড়া ছিল।

বছর দুই হল মানিকতলার দিকে উঠে গেছেন স্যার।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা পুরনো বাড়ি কিনে মেরামত করে উঠে গিয়েছেন।

হাঁটতে হাঁটতে চলে সুশান্ত।

শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা আর কতদূর? রোদের তেজও নেই।

প্রমীলাদের বাড়িতে যখন গিয়ে পৌঁছল, সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে

খবর দিতেই চাকরকে দিয়ে কে. ডি. ওকে দোতলায় ডেকে পাঠালেন ত পড়ার ঘরে।

ছোট ঘরটা।

চেয়ারের উপব চুপটি করে বসেছিলেন কে. ডি.। অন্ধকার ঘর। বোধ সুশান্তর মুখটা যেন

প্রমীলা ওর মুখের পায়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলেন কে. ডি.।

তুমি পানানে, লুঙ্গি—তার উপরে একটা ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি।

প্রমীলা লেন্সের চশমার ভিতর থেকে তাকালেন কে. ডি.। বললেন, এসো সুশান্ত

গলার স্বরটা যেন কেমন নিস্তেজ—ক্লান্ত।

আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?

হ্যাঁ, বসো।

সুশান্ত একটা চেয়ারে বসল।

বসতে বলে সুশান্তকে কে. ডি. জানলাপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুশান্ত।

আজ্ঞে? সুশান্ত কে. ডি.র মুখের দিকে তাকাল।

তোমাদের ছাত্র সংসদের তুমিই তো সভাপতি, তাদের জানিয়ে দিও—আ আজ কলেজ অথরিটির কাছে আমার রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি—

রেজিগনেশন দিয়েছেন!

বিস্ময়ে প্রশ্নটা যেন সুশান্তর গলায় আটকে যায়।

হ্যাঁ, আমাকে নিয়েই তো গোলমাল, তোমাদের ছাত্র সংসদও তাই চেয়েছিল তাছাড়া অনেক বছর হয়ে গেল আমার ঐ কলেজে, তাই আরও ভেবে দেখলাম is high time, I must leave the chair—let some new blood come

আপনি সত্যি-সত্যিই—

হ্যাঁ, সুশান্ত। তারপর একটু থেমে যেন কেমন ক্লান্ত গলায় বললেন, জান সু তোমাদের মত আমিও ঐ কলেজেরই একদিন ছাত্র ছিলাম। এম. এ. পাস করা ঐ কলেজেই—প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন রাধারমণ পাল, আমায় খুব ভালবাসতেন—

।ব সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে লেকচারারশিপ একটা দিলেন। তখনও তোমরা
া ওনি। তাঁরপর ক্রমশঃ হেড্ অফ দি ডিপার্টমেণ্ট—

কিন্তু স্যার—

কে. ডি. বলতে লাগলেন, হয়তো তোমরা তোমাদের ভালই চাও, তাই হয়তো
ন শিক্ষাপদ্ধতির কথা ভাবছ—অবশ্যই সেটা প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডের ধর্ম, কিন্তু
াবে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যাঘাতের পর ব্যাঘাত সৃষ্টি করে মনে হয় আমার
মরা দুর্বলই হয়ে পড়ছ—this is not the way, they should think—
লে they should think—পড়াশুনা চালিয়ে যেতে যেতেই আমাদের খুঁজে
: করতে হবে কোথায় কোন্ পরিবর্তন আবশ্যক। পরিবর্তন আন‍ ‍ ‍বলেই স
চু ‍ন্ধ করে দিলেও তা হবে না। সমস্যার যদি সৃষ্টি হযেই থা
তে চলতে কাজ করতে করতেই করতে হবে। করাও ত
ছু ভেঙেচুরে ফেললেই মীমাংসায় পৌঁছনো যায় না।

সুশান্ত চুপ করে শুনতে থাকে।

অধ্যাপক কে. ডি.র গলার স্বরে যেন একটা চাপা বেদনার সুর।

কেমন যেন বিষণ্ণতায় ক্লান্ত গলার স্বর।

আজকালকার ছেলে হলেও সুশান্ত ঠিক উগ্র অস্থির প্রকৃতির নয়। ছাত্র সংসদের
সভাপতি এবং অনেকের মত সেও বিশ্বাস করে, বর্তমানের এই শিক্ষাপদ্ধতি
াবে চলেছে শিক্ষাদানে তা হয়তো ঠিক নয়।

এর পরিবর্তনের একটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাই বলে সে হাতুড়ির ঘা
বে সব কিছু ভেঙেচুরে ফেলতে চায় না ঠিক মনে মনে।

তাছাড়া বরাবর অধ্যাপক কে. ডি. কে সে শ্রদ্ধা করে এসেছে—ভালবেসে এসেছে—
নের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকলে হয়তো সে গত পরশুর ব্যাপারটা রোধ করতে পারত।

স্যার!

বল?

আপনি রেজিগনেশন উইথড্র করে নিন।

মৃদু হাসলেন কে. ডি.। বললেন, তা আর হয় না।

কে. ডি.র গলার স্বরে কেমন যেন একটা স্থির সংকল্পের সুর ছিল।

মানুষটি এমনিতে স্বল্পভাষী ও শান্ত নিরীহ হলে কি হবে, কোথায় যেন একটা
মনীয় দৃঢ়তা রয়েছে—বরাবরই লক্ষ্য করেছে সুশান্ত মানুষটির চরিত্রের মধ্যে।

তাই আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানাতে সাহস পেল না।

অন্ধকারের মুখোমুখি কিছুক্ষণ ছাত্র আর অধ্যাপক বসে থাকে। অন্ধকারে কে কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

সুশান্তর যেন নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছিল। যতই যাই হোক, ছাত্র সংসদে সভাপতি সে-ই। ছাত্র সংসদের রেজোলিউশনে তার মত থাক্ বা না থাক্— শেষ মিটিংয়ে উপস্থিত থাক্ বা না থাক্, স্যার না ভাবলেও প্রমীলা হয়তো ধরেই নে তার ব্যাপারটায় পরোক্ষ সম্মতি ছিলই।

একসময় সুশান্ত উঠে দাঁড়াল, আমি তাহলে যাই স্যার।

এস। কে. ডি বললেন।

সুশান্তর মুখটা যেন হাত দিয়ে প্রণাম করে বের হয়ে এল।

প্রমীলা ওর মুখের সামনেই প্রমীলার সঙ্গে সুশান্তর দেখা হয়ে গেল।

তুমি এখানে দেখা করতে এসেছিলে? প্রমীলা জিজ্ঞাসা করল ওর মুখের দিকে প্রমীলা

হ্যাঁ, স্যার কলেজে রেজিগনেশন দিয়েছেন।

জানি।

জান—তুমি তাহলে ব্যাপারটা জানতে প্রমীলা! কথাটা বলে একটু যেন বিস্ময়ে সঙ্গেই তাকাল সুশান্ত প্রমীলার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, আমিই তো তোমার ওখান থেকে আজ সকালে কলেজ যাবার পথে তোমাদের প্রিন্সিপ্যালের হাতে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

মানে, তুমি সকালে যখন আমার ওখানে গিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে সেই চিঠি ছিল?

বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে সুশান্ত আবার।

ছিল।

অথচ তুমি আমাকে বলোনি কথাটা?

বললে কি হত? শুধাল প্রমীলা।

কি হত মানে? সোজা স্যারের কাছে চলে এসে—

কোন ফল হত না।

হত না বলছ?

হ্যাঁ, বাবাকে তো তুমি জান—

সুশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, ওদের আমি স্যারের কাছে পাঠাব—কেন বল তো?

ওদের দিয়ে স্যারের কাছে ক্ষমা চাওয়াব।

প্রমীলা হাসল।

কিন্তু প্যাসেজের সামান্য আলোয় প্রমীলার সে হাসিটা সুশান্তর চোখে পড়ল না।

সুশান্ত আবার বললে, ক্ষমা ওদের চাইতেই হবে।

যদি ক্ষমা না চায়? হঠাৎ প্রমীলা বললে।

চাইতেই হবে। সুশান্তর গলার স্বরটা যেন দৃঢ়তায় ঋজু শোনাল।

আমি বলছিলাম কি সুশান্ত—

কি?

ওসবে কাজ নেই। ক্ষমা চাইলেও বাবা আর কলেজে ফিরে ‥ না।

যাবেন না তা আমিও জানি প্রমী, তবে ক্ষমা ওদের চাইতে‥

‥ন্ত আর দাঁড়াল না। সোজা দরজা দিয়ে গিয়ে রাস্তায় নাম‥

বাড়ি গেল না সুশান্ত—বেলেঘাটায় কল্যাণ আর সুদীপ্ত থাকে, ‥ই অনুসরণ

‥ বিশেষ দুটি পাণ্ডা। সুশান্ত মানিকতলার মোড়ে এসে শিয়ালদহগা‥

‥স কোনমতে উঠে পড়ল।

বাসে প্রচণ্ড ভিড়।

সায়েন্স কলেজের কাছ থেকে উঠল দিব্যেন্দু—ওদেরই এক সহপাঠী। ছাত্র‥

‥দের আর এক পাণ্ডা।

সুশান্ত, কোথায় চলেছিস? দিব্যেন্দু শুধাল।

কল্যাণদের ওখানে।

আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি। শুনেছিস বোধ হয়—a great news?

কি?

শালা শেষ পর্যন্ত রেজিগনেশন দিয়েছে—আমাদের কে. ডি.!

ছি দিব্যেন্দু, তোর না মাস্টার মশাই! প্রতিবাদ জানায় সুশান্ত।

মাস্টার হয়েছে তো কি, মাথাটা কিনে নিয়েছে নাকি? ঐ শালা গেল, এবারে

‥বি সব smooth হয়ে যাবে।

সুশান্ত আর তর্ক করে না। তর্ক করার ইচ্ছে করছিল না আর।

করার প্রবৃত্তিই হয় না তার।

বেলেঘাটায় সি. আই. টি. রোডের উপরেই বলতে গেলে কল্যাণদের বাড়ি।

কল্যাণের বাবা জ্যোতিষবাবু ভারত সরকারের একজন মোটা মাইনের পদস্থ

অফিসার। কিছুদিন হল ঐ অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ি করেছেন।

তিনি নিজে কলকাতায় থাকেন না।

চাকরির ব্যাপারেই থাকা হয় না। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার অসুবিধা হবে ব বাড়ি করেছেন কলকাতায়। তাঁর স্ত্রী তিন মেয়ে ও এক ছেলে কল্যাণকে নি কলকাতায় থাকেন।

সুশান্ত ও দিব্যেন্দু যখন কল্যাণদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, প্রচণ্ড হল্লা চলে তখন ওদের বাইরের ঘরে।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে কল্যাণ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, জব্বর খবর আছে সুশান্ত

চারজন ছিল ঘরে সে-সময়। কল্যাণ সুদীপ্ত শ্যামল ও সমরেশ।

সুশা ওর মুখটা যেন .কবল একই কলেজের ছাত্র তাই নয়—কলেজের অ্যাথলেটি

প্রমীলা ওর মুখের বারে যাকে বলে হরিহরআত্মা।

তুমি খানানে ত্র সর্বদা ঘোরে। এবং লেখাপড়ায় কেউই তেমন সুবিধার নয়।

প্রমীলা ধ্য কল্যাণ আবার শুধু অ্যাথলেটই নয়, রেগুলার ব্যায়াম করে ক

টা রীতিমত পেশল ও বলিষ্ঠ করে তুলেছে।

একটু গোঁয়ারগোবিন্দ টাইপেরও।

গত বছর বি. এস-সি-তে ফেল করেছে।

বস্ বস্ সুশান্ত, ভাবছিলাম রাত্রেই সুসংবাদটা দিতে তোর ওখানে যাব—

দিব্যেন্দুই ঐ সময় বলে ওঠে, সুশান্ত জানে—

জানে? সত্যি? শুনেছিস তুই সুশান্ত? কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ।

শান্ত গলায় জবাব দিল সুশান্ত।

॥ তিন ॥

সুশান্তর জবাব—গলার স্বরটা যেন কল্যাণের কাছে কেমন একটু বেসুরোই লাগে।

কল্যাণ সুশান্তর মুখের দিকে তাকায়, কোথায় শুনলি রে?

স্যারের কাছেই শুনলাম—

মানে কে. ডি. নিজে বলেছেন তোকে? কল্যাণ প্রশ্ন করে। গলার স্বর কল্যাণের যেন একটু বাঁকা।

হ্যাঁ। শান্ত গলায় জবাব দিল সুশান্ত।

তা কি বললে ?

একটা কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত ছিল কল্যাণ-- সুশান্ত বললে।

কি শুনি ?

সংসদের সভাপতি আমি, কোন রেজোলিউশন আমার সম্মতি ছাড়া পাস হতে র না।

সভাপতি তো হয়েছে কি ! দিব্যেন্দু বললে, ২—২০ ভোটে রেজোলিউশন পাস হয়েছে।

শোন কল্যাণ, দিব্যেন্দুর কথায় কান না দিয়ে সুশান্ত বললে, কাল্‌… আবার মি ,
we must think over it again !

ডাকতে পার, কিন্তু জেনো ভোট তুমি একটাও পাবে না স্ব
য় জবাব দিল।

কিন্তু এটা অন্যায় কল্যাণ—সুশান্ত বললে।

অন্যায় ?

হ্যাঁ।

অন্যায়টা কিসে শুনি ? রুখে ওঠে কল্যাণ যেন এবারে।

কি তোমাদের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে শুনি ?

অভিযোগ কি একটা, হাজারটা ! বলে ওঠে দিব্যেন্দু।

শান্ত গলায় জবাব দিল সুশান্ত দিব্যেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে, হাজারটা না লেও একটা জানি—সেটা হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষার সময় তোমাকে আর কল্যাণকে ক্ষার হলে টোকাটুকির জন্য ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন কে. ডি.—

ওয়ার্নিং নয়—হলঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন ! সমরেশ অন্য দিকে তাকিয়ে টা বললে।

ওয়ার্নিং দেবার পরও দ্বিতীয়বার টুকতে দেখে—পূর্ববৎ শান্ত গলায় কথাগুলো ল সুশান্ত।

কল্যাণ বলে ওঠে, বেশ করব টুকব—ও শালার কি —

ছি কল্যাণ ! সুশান্ত বলে ওঠে।

থাম্ থাম্—আর সাধুগিরি ফলাস নে সুশান্ত। ভেংচে ওঠে দিব্যেন্দু।

He has done his duty—সুশান্ত আবার বললে।

Duty ! শালার বাপে কোন্ dutyর অধিকার ? কল্যাণ বললে।

শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর ' ফোড়ন কাটে সমরেশ।

কল্যাণ, এ হতে পারে না, এ অন্যায—আমরা অন্যায কবেছি—সুশান্ত আবা বলবার চেষ্টা করে।

ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে সুশান্তকে একপ্রকাব থামিযে দিযেই বলে ওঠে কল্যাণ, তা আমাদে এখন কি করতে হবে শুনি ?

ক্ষমা চাইতে হবে আমাদের কে. ডি ব কাছে।

থাম্ থাম্—মুখ ভেংচে ওঠে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায একই সঙ্গে কল্যাণ ও দিব্যেন্দু।

সুশান্তর চোযালটা শক্ত হযে ওঠে। ঋজু কঠিন গলায সুশান্ত বলে ওঠে, ক্ষ

সুশান্তব মুখটা যেন বে।

প্রমীলা ওব মুখের াযে ধর্ গে তোব হবু শ্বশুরেব —কল্যাণ আবার ভেংচে ও

তুমি ানানে'

প্রমীল' ্ব্য সকলেই হো হো কবে হেসে ওঠে।

ল্যাণ। চাপা গলায গজন কবে ওঠে সুশান্ত।

কল্যাণ বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ যা, নইলে প্রেয়সীর আবার গোঁসা হবে।

ভদ্রভাবে কথা বল্ কল্যাণ—শান্ত শক্ত গলায বললে সুশান্ত।

যা যা, ওরে আমার ভদ্দব বে। জানি না বুঝি, ক্ষমা চাওযাবাব জন্যে কেন তু ছুটে এসেছিস—বুকের কোথায তোব জ্বালা ধরেছে। কল্যাণ আবারও বলে, যা, দেরি হযে যাচ্ছে—প্রেযসী হযতো পথ চেযে দাঁডিযে আছে—

দিব্যেন্দু বলে ওঠে, হ্যাঁ, অভিসারেব লগ্ন বযে যাচ্ছে।

কল্যাণ যোগ দেয়, আহা জানলার পাশে বসিযা প্রমীলা সুন্দরী—

Shut up—you ইতর। গর্জে ওঠে সহসা সুশান্ত।

সমরেশ বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে বলে, ওরে কল্যাণ, সাপের গর্ত দেখ্—ইল্লী বে-

সমরেশ, মুখ সামলে কথা বল্। সুশান্ত চাপা গর্জন করে ওঠে রুদ্ধ আক্রোশে।

কল্যাণও সঙ্গে যোগ দেয, এবারে কেটে পড়—

মনে রেখো কল্যাণ—এর জবাবদিহি একদিন তোমাদের করতে হবে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, যা—অমন অনেক সুশান্ত রায়কেই আমার দেখা আছে। চাঁদু আমা এবারে এস তো, আর বেশী তড়্পালে ও মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেব যাদু—প্রেয়সী প্রমীলা নামটাও আর তখন ডাকা চলবে না।

সকলে আবার হেসে ওঠে।

ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে সুশান্ত নিঃশব্দে ঘর
ক বের হয়ে এল।

দু'পাশে চওড়া বাঁধানো পীচের রাস্তা, কোথাও কোথাও একটাই চওড়া রাস্তা—
পাশে আলোরও ব্যবস্থা আছে, বাড়ি অনেক উঠেছে এবং এখনও অনেক উঠছে ঐ
াকায়, তবু এখনও ফাঁকা বেশ—বেশ দূরে-দূরেই দোতলা তিনতলা চারতলা
ড়গুলো।

বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে।

রাত তেমন কিছু বেশী হয়নি।

মাত্র পৌনে নটা—সুশান্ত তার হাতঘড়িতে দেখল। গ্রীষ্মের
বসতি নেই, মানুষজনের যাতায়াতও তেমন নেই বলেই হয়ত
টা বাস আসে। যাত্রীদের অনেকক্ষণ বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থ ...বই অনুসরণ

সুশান্তর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ বিরক্তিই বোধ হয়।

বুঝতে পারে না সুশান্ত যে মনের মধ্যে ঐ সময় যে ক্ষুব্ধ বেদনাটা তো ...া
হচ্ছিল—অস্থিরতাটা বিরক্তিটা তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সুশান্ত যেন চুল চিরে নিজেকে বিচার করছিল—ডাক্তার যেমন মৃতদেহে তার
না তদন্তের ছুরি চালায় কোন রকম অনুভূতির বালাই না রেখে। সুশান্তরও যেন
েমনিই মনের মধ্যে চিরে চিরে চলছিল ছুরি।

এই মুহূর্তে যে কল্যাণ ও দিব্যেন্দুকে সে দেখে এল, এরাই কি তার সহপাঠী—
র্ঘদিনের পরিচিত? কেতাদুরস্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে যেন কুৎসিত একটা
তা চাপা পড়ে ছিল—লুকিয়ে ছিল—হঠাৎ কুৎসিত ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

ঐভাবে ঠায় অমন করে দাঁড়িয়েথাকতে সত্যিই সুশান্তর আর ভাল লাগছিল না।

সুশান্তর মনের মধ্যে যেন একটা ক্ষোভ আর লজ্জা তখন অস্থির অশান্ত করে
লছিল।

মনের মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে কল্যাণের ওখানে এসেছিল। কে. ডি.র
াছে একটা ক্ষমা চাওয়াতেই হবে ওদের দিয়ে—কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সুশান্ত
টার কোন রকম আশাই আর নেই।

ওরা দলে ভারী।

কে. ডি.র ব্যাপারে ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আর কে. ডি. যখন রেজিগনেশন একবার দিয়েছেন, আর তিনি কাজে জয়েন
াবেন না।

এবং প্রতিমুহূর্তে অতঃপর ওরা হয়ত ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসবে।

হঠাৎ—হঠাৎই মনে হয় সুশান্তর, ঐ কলেজে আর সে পড়বে না। অন্য কো কলেজে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাবে। তাতে করে ওদের বিরুদ্ধে ওর একটা প্রতিবাদ জানানো হবে।

হ্যাঁ, কলেজ থেকে সে ট্রান্সফারই নেবে।

চলতে চলতে সুশান্ত ঐ কথাগুলোই ভাবছিল।

অনেকটা হাঁটবার পর গন্তব্য দিকের বাস এল। সুশান্ত কোনমতে বাসে উঠে পড়ে

বাড়িতে এসে যখন সুশান্ত পৌঁছল, সারা মুখ ও গা থেকে যেন কেমন একটা

প বেরু

সুশান্তর মুখটা যেন বুঝি জ্বর এল।

প্রমীলা ওর মুখের সোয়া দশটা।

তুমি খানানে মিতা এসে ঘরে ঢুকল, এত রাত হল দাদা, কোথায় গিয়েছিলে

প্রমীলা হল অসুস্থ শরীর নিয়ে আজ কি না বেরুলেই চলছিল না!

চৌবাচ্চায় জল আছে নাকি রে মিতা?

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে সুশান্ত ছোট বোনকে শুধায়।

থাকবে না কেন—চৌবাচ্চায় জল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

স্নান করব।

এই এত রাত্রে?

আমি তো রাত দশটার পরেই বরাবর স্নান করি।

কিন্তু কালও তো তোমার জ্বর ছিল না!

সুশান্ত ছোট বোনের কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘামে ভেজা শার্ট ও গেঞ্জি গা থেকে খুলে, চেয়ারের পাশ থেকে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে দেয়।

প্রমীলাদি এতক্ষণ বসে বসে চলে গেল—মিতা বললে।

প্রমীলা এসেছিল?

হ্যাঁ, প্রায় দু'ঘণ্টা বসেছিল—

কিছু বলে গিয়েছে?

না তো।

সুশান্ত আর কোন কথা বললে না। কলতলার দিকে চলে গেল।

আরও দু'দিন পরে।

কলেজের স্ট্রাইক মিটে গিয়েছে পরের দিন থেকেই। কে. ডি. আর কলেজে
াসেননি—সুশান্তও কলেজে যায়নি।

ব্যাপারটা যেন মনে হচ্ছিল তারই নিদারুণ একটা পরাজয়।

মন স্থির করে ফেলেছিল সুশান্ত। ঐ কলেজ থেকে সে ট্রান্সফারই নেবে।

তৃতীয় দিন সুশান্ত সেই কারণেই একটা দরখাস্ত নিয়ে কলেজে গিয়েছিল।

কলেজ অফিসের সামনে করিডরে কল্যাণ দিব্যেন্দু সমরেশ সুদীপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে
দখা। তারা ঐ সময় করিডরে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল।

চাপা গুঞ্জন একটা ওঠে ওদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসি হেসে ওঠে সক
কে দেখতে পেয়ে।

সুশান্ত দাঁড়িয়ে গেল।

কল্যাণ! সুশান্ত ডাকল।

কল্যাণ ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে বললে, কি রে, হবু শ্বশুরের পদ।
বে তুইও resignation—

কল্যাণের কথাটা শেষ হল না, সহসা বাঘের মতই কল্যাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
চণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করল সুশান্ত কল্যাণের ঠিক চোয়ালে।

কল্যাণ অতর্কিত আক্রমণে টাল ঠিক সামলাতে না পেরে পাশের রেলিংয়ের উপরে
ল পড়ে গেল।

একটা চেঁচামেচি গোলমালে প্রিন্সিপাল ও দুজন অধ্যাপক তাড়াতাড়ি তাঁদের ঘর
থকে বের হয়ে এলেন। গোলমালটা আর বেশীদূর গড়ায় না। তাঁরাই বিবদমান
পক্ষকে নিবৃত্ত করলেন।

কল্যাণ তখনও ফুঁসছে। সে চাপা আক্রোশভরা গলায় শাসাল, দেখে নেব—
ালা তোর রক্ত না দেখি তো আমার নাম কল্যাণ দত্ত নয়!

প্রচণ্ড ঘুঁষিতে ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছিল কল্যাণের মুখ থেকে। সে হাতের চেটো
য় রক্ত মুছতে মুছতে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

সুশান্ত অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছিল।

হঠাৎ রাগে যেন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কল্যাণের কথায়।

সে যেন আর কারও দিকে তাকাতেও পারছিল না।

সে সোজা গিয়ে প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকল।

ভাল ছেলে বলে প্রিন্সিপাল ওকে বরাবরই ভালবাসেন। তিনি বললেন, তোমার
ছে এটা আমি আশা করিনি সুশান্ত—

আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার।

That's alright my boy—

পকেট থেকে দরখাস্তটা বের করে প্রিন্সিপালের সামনে টেবিলের উপরে রাখ সুশান্ত।

কি এটা?

আমি আর এ কলেজে পড়ব না স্যার।

পড়বে না?

না, একটা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাই।

সুশান্তর মুখটা যেন বলবার আগেই সুশান্ত একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বের হয়ে এ প্রমীলা ওর মুখের হয়ে সোজা মাথা নীচু করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তুমি জানালে গে সে যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল! এমন হঠাৎ কখনও সে তো রে প্রমীলা।

বাড়িতে ফিরে এসে সুশান্ত একটা চেয়ারের ওপরে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে ব রইল।

সারাটা দুপুর কোথায়ও বের হল না সুশান্ত।

সেদিনটা তো বেরই হল না কোথাও সুশান্ত, পরের দিনও বাড়িথেকেবের হল ন

একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

নিজের ঘরে অন্ধকারে একটা চেয়ারের উপরে চুপচাপ বসেছিল সুশান্ত।

আজও প্রচণ্ড গরম।

এতটুকু হাওয়া নেই বাইরে।

সুশান্ত!

কে? প্রমী?

প্রমীলা অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কি ব্যাপার, আলো জ্বালোনি? অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছ?

বসো প্রমী।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ দুটো চেয়ারে বসে থাকে অন্ধকারে। তারপর এক প্রমীলা চেয়ার থেকে উঠে উপবিষ্ট সুশান্তর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল। কাঁধে একটা হাত রাখল।

মারামারি করেছিলে? প্রমীলা প্রশ্ন করে।

কোথায় শুনলে?

তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল বাবার কাছে এসেছিলেন—তিনিই বাবাকে বলছিলেন। হঠাৎ মারামারি কি নিয়ে হল আবার?

কল্যাণটা যে এত নোংরা—এত ছোট মন ওর—জানতাম না প্রমী। সুশান্ত বলে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তাছাড়া হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গেল—,

কি হয়েছিল কি?

সুশান্ত চুপ করে থাকে।

তুমি নাকি ঐ কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য আ

হ্যাঁ।

কেন?

যেখানে স্যার নেই, সেখানে আমিও পড়ব না।

স্বৰ্ই অনুসরণ

বাবা তো বছর দুই বাদে রিটায়ার করতেনই—

সেটা এক ব্যাপার, আর রেজিগনেশান অন্য ব্যাপার। একটা ঘোরতর অ

া হয়েছে তাঁর প্রতি। ছি ছি, ভাবতেও আমার লজ্জা করে।

না তুমি কি করবে বল?

ভুলো না ছাত্র সংসদের আমি সভাপতি।

কিন্তু হঠাৎ রেগে গিয়েছিলে কেন? প্রমীলা প্রশ্ন করে।

সুশান্ত কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

প্রমীলা আবার ডাকে, সুশান্ত!

ওসব কথা থাক্ প্রমী।

বলতে না চাও সে অন্য কথা—প্রমীলা বললে।

ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা প্রমী—

প্রমীলা অন্ধকারেই হাসল।

হাসছ?

কিছুটা শুনেছি আমি—

কার কাছে শুনলে?

বনানীর কাছে—সেও ঐ সময় ওখানে উপস্থিত ছিল করিডরে।

তুমি জান না প্রমী, ওরা তোমাকে আর আমাকে নিয়ে—

তাতে কি হয়েছে?

কী বলছ !

ঠিকই বলছি—ওরা যে যা বলে বলুক না, তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের ?

॥ চার ॥

শেষ পর্যন্ত সুশান্ত প্রমীলাকে সব কথা না বলে পারে না।

দুদিন আগে দুপুরে কলেজে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার আনুপূর্বিক বিবরণ

সুশান্তর মুখটা যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

প্রমীলা ওর মুখের ই তার কাঁধের ওপরে যে হাতটা প্রমীলা রেখেছিল সেটা

তুমি আনানে

প্রমীলা

বল ?

আমি বুঝেছি পরে, হঠাৎ অমন রেগে ওঠা আমার উচিত হয়নি—কিন্তু তোমা

জড়িয়ে—

এক ফোঁটা গরম জল সুশান্তর কাঁধে পড়ল।

প্রমী !

উঁ ?

তুমি কাঁদছ ?

কই, না।

দেখি। সুশান্ত অন্ধকারেই উঠে দাঁড়াল। প্রমীলার কাঁধের উপরে একটা হ

রাখল।

আমি যাই সুশান্ত—

বাইরে মিতার গলা শোনা গেল।

মিতা আসছে—ছাড়। প্রমীলা বলে, আলোটা জ্বেলে দাও ঘরের।

সুশান্ত হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

ব্যাপারটা পরের দিন ভোররাত্রেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ কলে

ঘটনার তিনদিন পরেই।

বাড়ির ভৃত্য রামচরণেরই প্রথমে নজর পড়ে, সদরদরজাটা হা-হা করছে খো

এগারটার পর রসময়বাবুর শেষ মক্কেলটি চলে যাবার পর নিজেই সে সদরে খিল তুলে বন্ধ করে শুতে গিয়েছে।

এত ভোরে কে দরজা খুলল? নিশ্চয়ই দাদাবাবু। দাদাবাবুই হয়তো কোথাও বের হয়েছে।

কন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রামচরণের, দাদাবাবু বের হলে ভোরে নিশ্চয়ই তাকে দরজা বন্ধ করতে বলতেন। তাছাড়া আজ দুদিন ধরে তো দাদাবাবু বাড়ি থেকে হচ্ছেন না!

তবে কে খুলল সদর দরজা?

কত্তাবাবু তো এখনো ওঠেনইনি!

জগজ করতে করতে রামচরণ সুশান্তরই ঘরের দিকে পা ব

দিনের ভৃত্য সে।

একতলায় কত্তাবাবুর বসার ঘরের পাশের ঘরেই থাকে সুশান্ত। ঐ ঘরেই রামচরণ ঐ ঘরেই শোয়।

তারপরের ঘরটা কত্তাবাবুর বাবা বুড়ো কত্তা থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর টা দুই ঘরটা খালিই পড়ে আছে—তালা দেওয়াই থাকে।

ঘরটা এখনো তেমনি সাজানো।

তার পাশের ঘরে ঠাকুর-চাকর থাকে। সামনে চিলতে মত একটা উঠোন—তার কে কলঘর ও বাথরুম, দোতলায়ও বাথরুম আছে—অন্যদিকে রান্নাঘর।

দোতলায় গিন্নীমা, মিতা ও কত্তাবাবু থাকেন।

দরজাটা ভেজানোই ছিল সুশান্তর ঘরের।

দরজাটা ঠেলে দাদাবাবু বলে ডেকে ঘরে পা দিয়েই রামচরণ থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

মাথাটাও বুঝি ঐ সঙ্গে বোঁ করে ঘুরে ওঠে রামচরণের।

ঘরের মধ্যে তখনো টেবিলের ওপরে একটা বই খোলা—টেবিল-ল্যাম্পটা তখনো ই টেবিলের ওপরে, চেয়ারটা ওল্টানো।

আর চেয়ারের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে আছে সুশান্ত।

ঘাড়ের কাছে গভীর একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। রক্তে পরিধেয় গেঞ্জি লাল হয়ে ছে—চারপাশে মেঝেতে থকথকে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

প্রথমটায় কেমন যেন বোবা বনে গিয়েছিল। তারপর অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে আতঙ্কে—কত্তাবাবু—

ঊঠি কি পড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে একপ্রকার দৌড়তে দৌড়তেই রামচরণ ছুটে

দোতলায় যায়।

সুশান্তর মা তখন উঠেছেন—ঠাকুরঘরে, রসময়বাবুরও ঘুম ভেঙেছে—কিন্তু শয্যা করেননি।

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে যেন একেবারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে রামচরণ একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার করে—কত্তাবাবু!

কি হয়েছে? প্রশ্নটা করে রসময়বাবু ভৃত্যের মুখের দিকে তাকালেন।

সর্বনাশ হয়েছে কত্তাবাবু! দাদাবাবু—

দাদাবাবু! কি হয়েছে খোকার?

শীগ্‌গি[illegible] নীচে চলুন—

সুশান্তর মুখটা যেন[illegible] য়েছে বলবি তো? কি হয়েছে?

প্রমীলা ওর মুখের ক্ষণে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। কাপড়ের কষিটা ও

তুমি শান্[illegible]কে ওঠেন।

প্রমী[illegible]লুন—নীচে চলুন শীগগিরি!

র[illegible]সময়বাবু তাড়াতাড়ি নীচে ছুটলেন।

সুশান্তর ঘরে ঢুকে তিনিও চিৎকার করে উঠলেন, খোকা—গিন্নী—মমতা—

পূজো তখনো শেষ হয়নি সুশান্তর মা মমতার। স্বামীর চিৎকার শুনে তাড় পূজো ফেলেই তিনি নীচে ছুটে এলেন।

ঘরে ঢুকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, ওগো, এ কি সর্বনাশ হল গো! খোব আছড়ে পড়লেন মমতা ছেলের ওপর।

মিতাও এসেছিল চেঁচামেচি শুনে—সে-ই তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে পরিচিত ডাক্তার পাড়ার হরপ্রসন্নকে ফোন করে দিল।

পনের মিনিটের মধ্যেই ডাঃ হরপ্রসন্ন চক্রবর্তী এসে গেলেন।

পরীক্ষা করে বললেন, অনেকক্ষণ মারা গিয়েছে। পিছন থেকে কেউ মনে হয় কিছু দিয়ে ঘাড়ে মেরেছে—হয়তো সেটা কেবল ভারীই নয়, ধারালোও ছিল। ও নীচের মাথার খুলি একেবারে থেঁতলে গিয়েছে। স্বাভাবিক নয়—আনন্যা ডেথ্‌—থানায় একটা ফোন করা দরকার এখুনি।

কিন্তু যাকে বলা হল কথাগুলো—সেই রসময়বাবু তখনো কেমন যেন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না তাঁর।

ডাঃ চক্রবর্তীই তখন ফোন করে দিলেন নিকটবর্তী থানায় শ্যামপুকুরে।

ধ ঘণ্টা পরে থানা-অফিসার মিঃ সুদর্শন মল্লিক জীপে করে এসে হাজির হলেন।
স বেশী না। অত্যন্ত স্মার্ট।

র্শন মল্লিক মাত্র কিছুদিন হল ঐ থানায় বদলি হয়ে এসেছেন অফিসার-ইন-চার্জ
লবাজার থেকে।

রের ঘরে বসেছিলেন একটা চেয়ারের ওপরে প্রস্তরমূর্তির মত রসময়বাবু—
বাবা।

তা দেবীর জ্ঞান তখনো ফেরেনি। তাকে উপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
করে—ডাঃ চক্রবর্তীই ব্যবস্থা করেছেন।

চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন ঐ ঘরে। সুদর্শন ঘরে ঢুকে বললে, ডেড বডি

প্রসন্ন বললেন, আসুন আমার সঙ্গে—

র্শন একবার রসময়ের দিকে তাকাল, তারপর হরপ্রসন্ন ডাক্তারকে অনুসরণ

র্শন হরপ্রসন্নর পিছনে পিছনে এসে সুশান্তর ঘরে ঢুকল।

নকার যেটি ঠিক তখনো তেমনিই রয়েছে। টেবিল-আলোটা তেমনিই জ্বলছে
জানলাপথে প্রখর সূর্যালোক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে ইতিমধ্যে।

র্শন দোরগোড়াতেই দাঁড়াল।

র চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। ঘরের আসবাবপত্র—মৃতদেহের
সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল—

র হরপ্রসন্নর দিকে তাকাল, আপনি—

ডির ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান ডাঃ হরপ্রসন্ন চক্রবর্তী। হরপ্রসন্ন ডাক্তার বললেন,
আত্মীয়ের মতও বলতে পারেন।

নিই থানায় ফোন করেছিলেন? সুদর্শন বললে।

—দেখলেন তো ওঁর অবস্থা—

র ঘরে যিনি—

অ্যাডভোকেট রসময় রায়—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করেন—দুঁদে অ্যাডভোকেট
একমাত্র ছেলে সুশান্ত—ভারী ইনটেলিজেণ্ট—ভারী প্রতিভাসম্পন্ন ছেলে ছিল
ট্রিকে জেনারেল স্কলার—

নের তখন আর বোধ হয় হরপ্রসন্ন ডাক্তারের কথার দিকে মন ছিল না। তার
মেঝেয় পতিত মৃতদেহের ওপরে।

ঘরের মধ্যে আশেপাশে কোন অস্ত্রশস্ত্র চোখে পড়ছে না যদিও, তথাপি দেখে পরীক্ষা তখনও ভাল করেই না করে সুদর্শনের মনে হয়, ক্ষতস্থান ঠিক অকসিপিটাল বোনের নীচে। এবং সুদর্শনের এ-ও মনে হল কোন ভারী ধারালো দিয়ে আঘাত করা হয়েছে—যার ফলে আঘাতটা এত মারাত্মক হয়েছিল যে (মাথার খুলির) নিম্নাংশ একেবারে গুঁড়িয়ে ঘাড়ের পেশী থেঁতলে গিয়েছে হয়ত ঐ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে।

বাঁ হাতটা দেহের তলায় চাপা পড়েছে—ডান হাতটা আড়াআড়ি ভাবে উপরে প্রসারিত।

মাথাটাও বাঁ দিকে কাত হয়ে আছে।

বাঁ পা-টা সামান্য ভাঁজ করা।

গায়ে একটা গেঞ্জি—পরনে লুঙ্গি। গেঞ্জিটা রক্তে লাল। ঠিক লাল ন শুকিয়ে কেমন যেন কালচে হয়ে গিয়েছে মনে হয়।

ঘরের একপাশে টেবিল—টেবিলের ওপরে একটা বই খোলা।

এগিয়ে গিয়ে সুদর্শন দেখল—ম্যাথেমেটিক্সের একখানা মোটা বই। আরও ই ও খাতাপত্র টেবিলের উপর রয়েছে—বেশ সাজানো-গোছানো।

একটা ঝর্ণা কলম মুখ-বন্ধ—একটা রেড-ব্লু পেনসিল। পাইলট কালির দোয়াত। একটা রিস্টওয়াচ তার পাশে।

বেলা সকাল আটটা ঘোষণা করছে রিস্টওয়াচ।

টেবিলের পাশেই একটা বুক-সেল্ফ্—মোটা মোটা বই—তারই পাশে একটি বেডে শয্যা বিস্তৃত।

শয্যা দেখে বোঝা যায় শয্যাটি গতরাত্রে স্পর্শিত হয়নি আদৌ। নিটোল।

শিয়রের ধারেই একটি জানালা।

জানালাটা খোলা। খোলা জানালাপথে সকালের রৌদ্রালোক ঘরে এসে পর্দাটা একপাশে জানালার সরানো।

আরও একটু দূরে একটি অনুরূপ জানালা। সে জানালাটাও খোলা, ত টানা।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সুদর্শন।

সামনেই কুড়ি ফুট রাস্তা। রাস্তার দু'ধারেই বাড়ি। ঠিক উল্টো দিকে বাড়ি। এ ঘরের জানালার মুখোমুখি সে বাড়িরও একটা জানালা সুদর্শনের নজ

ানালার পাল্লা দুটি বন্ধ।

াৎ নজরে পড়ল সুদর্শনের, ঐ উল্টো দিকের বাড়ির দোতলায় আধভেজানো
াপথে একটি তরুণের মুখ। আর তার দুটি চক্ষুর সাগ্রহ দৃষ্টি। এই বাড়ির
নিবদ্ধ ছিল চক্ষু দুটি বোধ হয়। কিন্তু সুদর্শনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে
টি চট করে অপসৃত হল।

খখানা সরে গেল জানালার সামনে থেকে।

ঙ্গে সঙ্গে জানালাও বন্ধ হয়ে গেল।

দর্শন কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ফিরে এল মৃতদেহের সামনে।

ঁচু হয়ে মৃতদেহের সামনে বসে হাঁটু ভেঙে বসল। ঘাড়ের ক্ষতস্থানটা আবার
র ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল। আঘাতটা সত্যিই মারাত্মক হয়েছিল—
নটা দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

াতে কোন অসুবিধা হয় না।

ন হয় প্রথম তিনটে স্পাইনের ভাটিব্রা ও সেই সঙ্গে অকসিপিটাল বোনেরও একটা
একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

্যাসেরেটড ডিপ উণ্ড একটা।

ব সম্ভবতঃ—সুদর্শনের মনে হয়—কেউ অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক থেকে ছেলেটিকে
করেছিল কোন মারাত্মক অথচ ভারি ও ধারালো কিছু দিয়ে। এবং হত্যা করার
আঘাত হেনেছিল।

ারও একটা কথা সুদর্শন মল্লিকের মনে হয়। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মৃত্যু

ন্তু দাঁড়ানো অবস্থায় যদি আঘাত করে থাকে কেউ, তাহলে হয়তো ছেলেটি মুখ
পড়ে গিয়েছিল!

ন্তু চিবুকে বা মুখে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই।

তদেহে রাইগার মর্টিস্ এখনো সেট-ইন করেনি—পরীক্ষা করে বুঝল সুদর্শন।

াতে করে আপাততঃ মনে হচ্ছে, গত রাত্রে রাত বারোটার পর কোন এক সময়
টা ঘটেছে।

॥ পাঁচ ॥

ডান হাতের অনামিকায় একটি রুবির সোনার আংটি।

ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগে নিকোটিনের দাগ রয়েছে—ছেলেটি
করত।

সমস্ত দেহ আবার পরীক্ষা করল সুদর্শন, কিন্তু অন্য কোথায়ও মানে শরীরে
কোথায়ও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! হঠাৎই যেন নজরে পড়ে ব্যাপারটা সুদর্শনের—দু'পায়েই
হাওয়াই চপ্পল তখনও রয়েছে।

তাহলে?

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুদর্শন। দাঁড়ানো অবস্থায় হয়ত নয়—বসা অবস্থাতেই হয়ত
করেছিল আততায়ী—নচেৎ আঘাতের পর পড়ে গেলে মুখের কোথায়ও আঘাত
থাকত। এবং পশ্চাৎ দিক থেকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঝের চারিদিক ও আশপাশ দেখতে লাগল সুদর্শন—
চেয়ারটা উল্টে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন স্ট্রাগলেরই চিহ্ন কোথায়ও
পড়ল না।

কোন রকম স্ট্রাগল হয়তও হয়নি—অতর্কিতেই বেচারা আক্রান্ত হয়েছে আত
দ্বারা পশ্চাৎ দিক থেকে।

আর একটা কথা বুঝতে পারে না সুদর্শন, চেয়ারটা উল্টে পড়ে আছেই বা কেন

ঘরের লাল সিমেন্টের ঝকঝকে মেঝেতে অস্পষ্ট চোখ পড়ল সুদর্শনের এলে
কয়েকটা জুতোর ছাপ। তাও জায়গায় জায়গায় মুছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অনেক লোক ইতিমধ্যে ঘরে আসা-যাওয়া করেছে হয়তো, দাগগুলো মুছে গি
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মৃতদেহের সামনে থেকে উঠে অতঃপর সুদর্শন টেবিলটার
এসে দাঁড়াল।

টেবিলের ওপরে যে খোলা বইটা পড়েছিল, সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল।

বইয়ের পাতা অন্যমনস্ক ভাবে উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ একটা ফোটো বে
এল—একটি তরুণীর ফটো। ফটোর পিছনে লেখা একটা তারিখ ইংরেজীতে
আষ্টেক আগেকার তারিখ।

ডাঃ চক্রবর্তী!

আজ্ঞে ? সুদর্শনের ডাকে তাকালেন হরপ্রসন্ন ওর মুখের দিকে।

এই ফটোটা কার বলতে পারেন ? চেনেন কিনা দেখুন তো মেয়েটিকে !

ফটো ?

হ্যাঁ, এই যে দেখুন।

ডাঃ চক্রবর্তীর হাতে সুদর্শন ফটোটা দিল।

ডাক্তার চক্রবর্তী ফটোটা দেখলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না। বললেন, না—জানি মেয়েটিকে। চিনতে পারছি না তো।

আপনি তো এ বাড়ির ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান—কখনও দেখেছেন এ বাড়িতে এই টিকে ?

না তো !

সুদর্শন ফটোটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিল।

চলুন একবার পাশের ঘরে, রসময়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই—

চলুন।

দুজনে পাশের ঘরে এল। একজন কনেস্টেবল সুশান্তর ঘরের দরজায় প্রহরায়

রসময় তখনও তেমনি স্তব্ধ হয়ে প্রস্তরমূর্তির মতই যেন চেয়ারটার ওপরে ছিলেন।

হরপ্রসন্ন মৃদু কণ্ঠে ডাকল, রসময়বাবু।

রসময় হরপ্রসন্ন ডাক্তারের ডাকে মুখ তুলে তাকালেন। বোবা চোখের দৃষ্টি।

সি. মিঃ মল্লিক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সময় একবার হরপ্রসন্ন ডাক্তারের মুখের এবং একবার সুদর্শন মল্লিকের মুখের দিকে লেন। করুণ বিষণ্ন দৃষ্টি।

সময়বাবু! আবার হরপ্রসন্ন ডাক্তার ডাকলেন।

বার ক্লান্ত কণ্ঠে রসময় বললেন, কিছু বলবেন ডাক্তারবাবু ?

ঃ মল্লিক বোধ হয় আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান।

আমাকে ?

হ্যাঁ। তারপর সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হরপ্রসন্ন ডাকলেন, মিঃ মল্লিক !

কিছু বলছেন ডাক্তারবাবু ? সুদর্শন বললে।

হ্যাঁ, এবারে আমাকে যদি অনুমতি দেন তো—বুঝতেই পারছেন সেই কখন এসেছি—মুখ ধোয়াও হয়নি।

ঠিক আছে আপনি যান—দরকার হলে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

বিধান সরণীর উপরেই আমার চেম্বার, হাতীবাগান মার্কেটের একটু পরে। হরপ্রসন্ন ডাক্তার বললেন।

হরপ্রসন্ন ডাক্তার চলে গেলেন।

রসময়বাবু, কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার—সুদর্শন বললে।

রসময় পূর্ববৎ ফ্যালফ্যাল করে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুদর্শনের দিকে।

সুদর্শন বুঝতে পারে, আকস্মিক অচিন্তনীয় এক নিদারুণ আঘাতের ধাকাটা লোককে একেবারে বিমূঢ়-স্তব্ধ করে দিয়েছে।

একটু ইতস্ততঃ করে সুদর্শন তারপর আবার মৃদু কণ্ঠে ডাকে, রসময়বাবু, বু পারছি এ সময়কার আপনার মনে অবস্থা—এ সময় আপনাকে বিরক্ত করতেও অ সংকোচ হচ্ছে—কিন্তু—

রসময় বললেন, আমি এখনও ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা দারোগাবাবু—

জানি—স্বাভাবিক। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

বলুন?

আজকাল স্কুল-কলেজের ছেলেদের যা হয়েছে—নানা দলে মিশে—বুঝতে পা বোধ হয় আমি কি জানতে চাই! মানে সেরকম কোন দলে—মানে পলি পার্টিতে—

জানি না—ঠিক বলতে পারব না।

আচ্ছা ওর বন্ধুদের—মানে ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুদের নাম আপনি জানেন?

না—তবে—

তবে?

কলেজের সহপাঠী দু-একজনকে মধ্যে মধ্যে ওর কাছে আসতে দেখেছি—আমা মিতা হয়ত বলতে পারবে।

ঠিক আছে, ওকেই না হয় জিজ্ঞাসা করব। আচ্ছা ও বাইরে খুব বেরুত, না ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত?

বলতে পারব না—মিতাকে জিজ্ঞাসা করবেন। মিতাকে ও খুব ভালবাসত।

লেখাপড়ায় কেমন ছিল?

ভাল। স্কুল-ফাইন্যালে জেনারেল স্কলারশিপ পেয়েছিল—তবে—

তবে?

একটা কথা বোধ হয় আপনাকে জানানো দরকার—আমাকে গতকাল সকালে ছিল যে-কলেজে পড়ছে সেখানে আর পড়বে না—ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোন কলেজে হবে।

কেন কিছু বলেনি ?

না।

আপনি জিজ্ঞাসা করেননি ?

না।

ঠিক আছে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

দারোগাবাবু !

বলুন ?

যতদূর আমি জানি সুশান্তর চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। ওকে আর ফিরে পাব তাও আমি জানি, তবু যদি জানতে পারতাম ওকে এমন করে নিষ্ঠুর ভাবে কে হত্যা ল—

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব—

রসময় আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন।

পাশের ঘরে গিয়ে সুদর্শন মিতাকে ডেকে পাঠাল ভৃত্য রামচরণকে দিয়ে। মিতা এসে প্রবেশ করল।

কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

মিতা দেবী, আমার কিছু জানবার আছে আপনার কাছে !

কি জানতে চান ?

আপনার দাদার হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ?

কাকে সন্দেহ করব !

আপনার দাদার বন্ধু-বান্ধবদের আপনি চেনেন ?

সকলকে চিনি না তো—কাউকে কাউকে চিনি—

নাম বলতে পারেন ?

কল্যাণ—দিব্যেন্দু—রবীন ও সমরেশ—যে ঐ আমাদের সামনের বাড়িতে থাকে।

আর কেউ ? আর কাউকে চেনেন না ?

হ্যাঁ, সুদীপ্ত আর শ্যামল। ওরাই মধ্যে মধ্যে দাদার কাছে আসত—দাদার সঙ্গে এক লজে পড়ত—

ওদের মধ্যে খুব বেশী ভাব আপনার দাদার কার সঙ্গে ছিল ? সুদর্শন এবার

প্রশ্ন করে।

বোধ হয় কল্যাণদা আর দিব্যেন্দুদার সঙ্গেই—

সমরেশের সঙ্গে ছিল না?

না— একটু যেন ইতস্তত: করেই কথাটা বললে মিতা।

ঠিক আছে, ওদের বাকি খবর আমি কলেজ থেকেই সংগ্রহ করতে পারব—ব
পকেট থেকে প্রমীলার ফটোটা বের করে সুদর্শন, এই ফটোটা কার বলতে পারে
চেনেন একে? দেখুন তো?

ফটোটার দিকে তাকিয়েই মিতা বললে, চিনি। কোথায় পেলেন এ ফটো?

আপনার দাদার বইয়ের মধ্যে। কে এ মেয়েটি?

প্রমীলাদি—। বলতে বলতে মিতার চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে মনে
যেন সুদর্শনের।

প্রমীলাদি! সুদর্শন প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, দাদাদের কলেজের অঙ্কের প্রফেসার ডাঃ দত্তর মেয়ে। একসময় আমা
এই পাড়াতেই ছিল—দাদার সঙ্গে পড়ত।

এখন কি করে?

মেডিকেল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে।

কোথায় থাকে?

মিতা ঠিকানাটা বলে দিল।

প্রমীলা এখানে মধ্যে মধ্যে আসত, তাই না?

প্রায়ই আসত দাদার কাছে—মিতা বললে।

আপনার মার সঙ্গে একবার দেখা করব ভাবছিলাম—

মার তো এখনও জ্ঞানই ফেরেনি—মিতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে।

সুদর্শন বললে, ঠিক আছে, তাহলে তাঁকে আর এখন বিরক্ত করব না। অন্য
সময় আসা যাবে—

মিতা চুপ করে রইল।

সুদর্শন বুঝতে পারছিল, ভাই ও বোনের মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা ছিল।

সুদর্শন বললে, দাদাকে আপনি খুব ভালবাসতেন, তাই না?

মিতা কোন জবাব দেয় না—তার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে

সুদর্শনের ইচ্ছা ছিল মিতাকে আরও কিছু প্রশ্ন করে, কিন্তু তা সে করল না
—কারণ বুঝতে পারছিল মেয়েটি তার ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে খুবই আ

পরেছে এবং বিচলিত হয়ে পড়েছে।

যান—আপনাকে আর আটকাব না। আপনি আপনার মার কাছে যান।

দারোগাবাবু!

সুদর্শন মিতার ডাকে ওর মুখের দিকে তাকাল, কিছু বলছিলেন?

আপনি কি কিছুই বুঝতে পারছেনা না!

কি?

কে এ কাজ করল?

জানতে পারবই আশা করছি—

পারবেন?

চেষ্টা তো করবই।

মিতা আর কোন কথা বললে না।

মৃতদেহ অতঃপর মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে সুদর্শন ওখান থেকে বের হয়ে এল।

সুদর্শন ফিরে এল থানায়।

সুশান্তর হত্যা-ব্যাপারের রিপোর্টের একটা মোটামুটি খসড়া মনে মনে ভেবে নিয়েছিল ...র্শন—থানায় ফিরে সেটাই লিখতে বসল।

কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না সুদর্শন, সুশান্তর হত্যার পিছনে কি রহস্য থাকতে পারে! কতই বা বয়স হবে সুশান্তর, তেইশ-চব্বিশের মধ্যে। স্বাস্থ্যবান মেধাবী ছাত্র!

কিন্তু হত্যা-রহস্যের কোন মীমাংসায় না পৌঁছতে পারলেও কয়েকটি প্রশ্ন তার মনের ...ধ্য উদয় হয়েছিল। সেগুলো একটা আলাদা কাগজে লিখতে শুরু করে রিপোর্টটা ...ষ করল সুদর্শন।

১। মধ্যবিত্ত সম্পন্ন ঘরের ছেলে—স্বাস্থ্যবান—মেধাবী—

২। প্রমীলা একসময় ক্লাস-মেট ও প্রতিবেশী ছিল। তার সঙ্গে মনে হয় সুশান্তর ...ষ্ঠই হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল—অন্ততঃ সুশান্তর বোন মিতার কথায় তাই মনে ...।

৩। মৃতদেহে ক্ষতস্থান দেখে মনে হয় অতর্কিতে তাকে পিছন থেকে ঘাড়ের ...ছে কোন ভারী ও ধারালো কিছুর সাহায্যে আঘাত করা হয়েছে। যার ফলে হয়ত ... সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে, আর তাইতেই মনে হয় বোধ হয় সে আততায়ীকে দেখতে ...য়নি।

৪। আততায়ী কোন অপরিচিত ব্যক্তি, না তারই বিশেষ পরিচিত কেউ!

৫। হত্যার মোটিভ বা উদ্দেশ্য কি এবং কখন তাকে হত্যা করা হয়েছে? রাত্রি

তখন কটা হতে পারে ?

৬। হঠাৎ আক্রান্ত হলে নিশ্চয়ই সে আঘাতের পর চিৎকার করে উঠেছিল—অথচ বাড়ির মধ্যে কেউই—বাড়িরই একটা ঘরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও কো চিৎকার বা চেঁচামেচি শুনতে পায়নি।

৭। কথাটা কি মিথ্যা? কেউ শুনেও কি চিৎকারটা ইচ্ছা করেই চুপ কর আছে ?

৮। আজকালকার কলেজে-পড়া ছেলে। ইদানীং যে সব স্ট্রাইক-ফ্রাইক চলেছে-দলাদলি খুনোখুনি চলেছে, সেরকম কিছুর সঙ্গে কি সুশান্ত জড়িত ছিল ?

ঐ পযন্ত লিখে কলমটা তুলে ভাবতে থাকে সুদর্শন। আর কোন পয়েন্টই আপাত তার মনে আসছে না।

কিন্তু একটা কথা মনে হয় সুদর্শনের। যে কলেজে সুশান্ত পড়ত, সেই কলে তারই দুজন সহপাঠী—বন্ধু কল্যাণ ও দিব্যেন্দুর সঙ্গে তাকে একবার দেখা করতে হবে আর দেখা করতে হবে অধ্যাপক কে. ডি.র কন্যা প্রমীলার সঙ্গে।

একজন সিপাহী এসে ঘরে ঢুকল, হুজুর !

কেয়া হ্যায় কৈলাসপ্রসাদ ?

মাইজী উপর থেকে বলে পাঠিয়েছেন, আপনি কি চা খেতে উপরে যাবেন—না নীচে পাঠিয়ে দেবেন মাইজী ?

সুদর্শন ঘড়ির দিকে তাকাল।

বেলা সাড়ে দশটা।

ঐ সময় সে একবার চা-পান করে থানায় থাকলে। এখনও উপরে যায়নি তাই সাবিত্রী খবর নিতে পাঠিয়েছে।

না, না—পাঠাতে হবে না। আমিই যাচ্ছি—*

সুদর্শন খাতা-কলম রেখে উঠে পড়ল। থানার দোতলায়ই ও. সি.র কোয়ার্টার।

দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডাকল সুদর্শন স্ত্রীকে, সাবিত্রী !

রান্নাঘর থেকে সাড়া এল, বসো, আমি চা আনছি।

শোবার ঘরে না ঢুকে সুদর্শন বসবার ঘরেই ঢুকে একটা চেয়ারে বসল। ব্রেকফাস্ট

* বর্তমান কাহিনী আমার 'নিরালা প্রহর' উপন্যাসের আগের কাহিনী, 'নিরা প্রহর' ও 'প্রজাপতির রঙ' দুটি উপন্যাসে সুদর্শন মল্লিকের প্রথম দিককার কথা আছে।

—লেখ

রার সময় হয়নি সুদর্শনের।

সকাল বেলাতেই হরপ্রসন্ন ডাক্তারের ফোন পেয়ে চলে গিয়েছিল সুদর্শন। একটা
ট ও চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল সাবিত্রী।

অনেকক্ষণ তো ফিরেছো, এতক্ষণ কি করছিলে?

এসো, প্লেটে কি?

মাংসের কচুরি—তাডাতাড়ি তখন ব্রেকফাস্ট না করেই বের হয়ে গেলে!

প্লেটটা হাতে নিয়ে একটা গরম কচুরি তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে সুদর্শন বললে,
:, চমৎকার হয়েছে!

সত্যি?

হ্যা—একদিন দাদাকে তোমার হাতের কচুরি খাইয়ো—

আমাদের এই নতুন বাসায় দাদা একদিন মাত্র এসেছেন। সাবিত্রী বললে।

দেখি—একদিন এর মধ্যে যাব দাদার ওখানে। সুদর্শন চায়ের কাপে চুমুক
ত দিতে বললে।

॥ ছয় ॥

দিনই সন্ধ্যায় হাতের কাজগুলো সেরে ডাঃ কে. ডি'র বাড়ির উদ্দেশে বের হয়ে পড়ল
র্শন।

বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমা হচ্ছিল—মনে হয়েছিল হয়ত একটা ঝড়বৃষ্টি
—কিন্তু শেষ পর্যন্ত খানিকটা জোরে হাওয়া ধুলো-বালি উড়িয়ে মেঘটা কেটে
য়েছিল।

তাহলেও একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ছিল বাতাসে।

ডাঃ কে. ডি'র বাড়িটা ঠিক আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে নয়—বড় রাস্তা থেকে এক সরু
বের হয়েছে—সেই গলির মধ্যেই দ্বিতীয় বাড়িটা ডাঃ কে. ডি'র।

বড় রাস্তার উপর জীপ থেকে নেমে মোহন সিং ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে
র দিকে এগিয়ে গেল সুদর্শন।

গলির মধ্যে আলোটা খুব পর্যাপ্ত নয়। একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। টর্চের
লায় নম্বরটা খুঁজে বের করল সুদর্শন। দরজার গায়ে ছোট নেম-প্লেটে—ডাঃ কে. দত্ত।
দরজা বন্ধ ছিল—বেল বাজাতেই একটু পরে এক ভৃত্য দরজা খুলে দিল, কাকে চাই।

প্রফেসার দত্ত আছেন ?

কোথা থেকে আসছেন ? ভৃত্য শুধালো।

প্রফেসার দত্ত কি আছেন ? পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নটার সুদর্শন।

সুদর্শন ইউনিফর্ম পরে আসেনি। এসেছিল সাদা জীনের ট্রাউজার ও একটা হাওয়াই শার্ট গায়ে চাপিয়ে।

ভৃত্য বললে, আছেন।

তাঁকে একটু খবর দাও—বল একজন ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন।

ভৃত্য বাইরের দরজাটা খুলে আলো জেলে দিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে বসালে।

বসুন—বাবুকে খবর দিচ্ছি।

ছোট সাইজের একটি ঘর, কিন্তু ঘরটি ছিমছাম।

খানচারেক চেয়ার—একটি চৌকি—তার উপর পরিষ্কার ফরাস পাতা। একদিকে দুটি কাচের আলমারি ভর্তি নানা বই।

দেওয়ালে কয়েকজন মনীষীর ছবি টাঙানো।

সুদর্শন একটি চেয়ারে উপবেশন করল।

গুনগুন একটা গানের শব্দ, তার পরই একটি তরুণী এসে ঘরে ঢুকল, হাতে একটা খাতা।

প্রমীলা ঐ সবেমাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে।

সুদর্শন প্রমীলার দিকে তাকাল। মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হল তার।

প্রমীলা শুধায়, বাবার কাছে এসেছেন ?

হ্যাঁ।

জনার্দন বাবাকে খবর দিয়েছে ? বাবা বোধ হয় পুজোয় বসেছেন ! দিতে গেছে।

প্রমীলা আর কোন প্রশ্ন না করে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল—সুদর্শন ডাকে, শুনছেন ?

প্রমীলা ঘুরে দাঁড়াল, কিছু বলছেন আমাকে ?

সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল—এই সেই মেয়েটি—যার ফটো সে সকালে সুশান্তর বইয়ের মধ্যে পেয়েছে।

হ্যাঁ। কিছু যদি মনে না করেন, আপনারই নাম বোধ হয় প্রমীলা দেবী ?

হ্যাঁ—প্রমীলা দত্ত—কথাটা বলে যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকাল প্রমীলা সুদর্শ

দিকে, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? আপনাকে কখনো দেখেছি বলে

া, দেখেননি—সুদর্শন মৃদু হাসল।

াপনি মনে হচ্ছে আমাকে চেনেন! প্রমীলা বললে।

চনি বললে ভুল হবে, কারণ ইতিপূর্বে আমাদের কোন দেখাসাক্ষাৎ বা পরিচয়ও

।

বে? প্রমীলা বললে।

াহলেও কেমন করে আপনার নামটা জানলাম, তাই না? সুদর্শন বললে।

্যাঁ।

ানতাম না—আজ সকালেই জেনেছি।

াপনার কথাগুলো ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। আপনি—আপনি আমার নাম-

া জানলেন কি করে?

দর্শন আবার মৃদু হাসল। ঐ সময় জনার্দন এসে বললে, একটু বসুন—বাবু

া বসেছেন—

াবার পুজো হয়ে গেলেই বাবাকে খবরটা দিস। প্রমীলা বললে।

াথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে জনার্দন চলে গেল।

সুন না প্রমীলা দেবী—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

কটু বিস্ময়ই বোধ করে প্রমীলা, কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না। বললে, আমার সঙ্গে

কি কথা বলুন তো?

া—বলছিলেন না এইমাত্র, আপনার নামটা জানলাম কি করে? আজই সকালে

ি আপনার নাম—

াথায় জানলেন?

তার কাছে।

তা!

া, সুশান্তবাবুর বোন।

ক আপনি চেনেন? প্রমীলা শুধায়।

গ চিনতাম না—আজই ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আর সেইখানেই

াপনার একটা ফটো দেখি—

া! আমার? প্রমীলার যেন বিস্ময়ের অবধি নেই।

–দেখুন তো, এটা আপনার ফটো না? বলতে বলতে সুদর্শন সকালে সুশান্তর

বইয়ের মধ্যে পাওয়া ফটোটা পকেট থেকে বের করে প্রমীলার সামনে ধরে।

হ্যাঁ—আমারই। কিন্তু এটা আপনি—

পেলাম কোথায়, তাই না? একটু আগেই তো বললাম সুশান্তবাবুদের ওখানে

সুশান্ত আপনাকে এটা দিয়েছে?

না।

তবে এটা—

সে কথা পরে বলব। তার আগে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? প্রমীলা শুধালো।

শ্যামপুকুর থানার অফিসার আমি।

প্রমীলা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সব কিছু তার কাছে যেন কেমন গোলমেলে ঠেকে।

বসুন না প্রমীলা দেবী—দাঁড়িয়ে কেন?

প্রমীলা বসল না। বললে, কি কথা আছে আমাব সঙ্গে আপনার?

আপনি তো মেডিকেল কলেজে পড়েন?

হ্যাঁ।

আগে আপনারা পাল স্ট্রীটে শ্যামবাজারে থাকতেন?

হ্যাঁ।

রসময়বাবুর ছেলে সুশান্তকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই—বেশ আলাপও আছে, না?

হ্যাঁ। মৃদু স্বরে কথাটা বললেও সুদর্শনের মনে হল যেন প্রমীলার মুখটা রক্তি হয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

কি রকম আলাপ? প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সুদর্শন প্রমীলার মুখের দি

অনেক দিনের পরিচয় আমাদের—এক পাড়ায় পাশাপাপি বাড়িতে থাকতাম- স্কুলে ও এক কলেজেও কিছুদিন পড়েছি।

অর্থাৎ একটু ঘনিষ্ঠতাই আছে, তাই না?

প্রমীলা চুপ করে থাকে।

সুদর্শনের বুঝতে অসুবিধা হয় না—তার অনুমান মিথ্যা নয়। সুশান্ত ও প্র পরস্পরের মধ্যে একটা বেশ ঘনিষ্ঠতাই গড়ে উঠেছিল।

হঠাৎ প্রমীলা প্রশ্ন করল, সুশান্তকে আপনি চেনেন?

না।

র্শনের সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, আসল প্রসঙ্গটা ঐ মুহূর্তে টেনে আনতে। কারণ বুঝতে ছল মেয়েটি এখনো সংবাদটা পায়নি, তাই হয়তো সংবাদটা শুনলে খুবই আঘাত নে, কিন্তু একজন পুলিস অফিসারের কর্তব্য বড় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে সময় সময়।

মীলা দেবী!

লুন?

কটা সংবাদ বোধ হয় আপনি এখনো জানেন না সুশান্তবাবু সম্পর্কে—

—কি হয়েছে সুশান্তর? উৎকণ্ঠা ও আকুতিতে যেন ভেঙে পড়ে প্রমীলার গলা।

মারা গেছে।

কি! না, না—আর্ত চিৎকারের মতই কথাগুলো যেন প্রমীলার গলা দিয়ে বের ল।

কে খুন করা হয়েছে।

! কখন? কোথায়?

গল রাত্রে কোন এক সময়।

য়েকটা মুহূর্ত অতঃপর যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে প্রমীলা। তার সমস্ত মুখ ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে।

প্রমীলা দেবী, জানি সংবাদটা আপনাকে খুব আঘাত দিয়েছে—

প্রমীলা নিঃশব্দে সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল। প্রমীলার দুটি চোখ জলে ভরে ছ—ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে।

বসুন আপনি।

—আপনি কি করে জানলেন? কথাটা বলতে বলতে সুদর্শন লক্ষ্য করল টা জল প্রমীলার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কটু আগেই তো আপনাকে বললাম—আমি ওখানকার থানার ও. সি.—সকালে টা পেয়ে investigationয়ে রসময়বাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। Somebody bed him to death!

কোন ভারী ধারালো কিছুর সাহায্যে তাকে ঘাড়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে—

ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে!

উণ্ড্ দেখে তাই মনে হয়, তবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক মৃত্যুর টা বোঝা যাবে না। সে কথা যাক—আপনি তো তার বিশেষ পরিচিত একজন —তার সম্পর্কে অনেক কথাই হয়তো আপনি জানেন, তাই বিশেষ করে আপনার দেখা করবার জন্য আমি এসেছি—অবিশ্যি আপনার বাবার সঙ্গেও—

সিঁড়িতে ঐ সময় চটিজুতোর শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা নীচের দিকেই নামছে

প্রমীলা বললে, বাবা আসছেন।

আপনার সঙ্গে কথাগুলো—

বাবার সঙ্গে দেখা করুন, পরে আমি—

ডাঃ কে. ডি. ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, গায়ে একটা গেরুয়া সিল্কের পাতলা জড়ানো। বোধ হয় সোজা পূজোর ঘর থেকেই আসছেন সংবাদ পেয়ে।

নমস্কার ডাঃ দত্ত—সুদর্শন বললে হাত তুলে।

নমস্কার—আপনি ?

আমি থানা থেকে আসছি—

থানা!

হ্যাঁ, শ্যামপুকুর থানার ও. সি.—আমার নাম সুদর্শন মল্লিক।

কি ব্যাপার বলুন তো ? কে. ডি. প্রশ্ন করলেন। কে. ডি.র গলার স্বর কেমন কেঁপে ওঠে।

বসুন ডঃ দত্ত, বলছি।

প্রমীলা যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত—শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বাবা যদি শোনেন দুঃসংবাদ অত্যন্ত আঘাত পাবেন।

বাবা—

মেয়ের ডাকে কে. ডি. ওর দিকে ফিরে তাকালেন।

তোমার চা-জলখাবার খাওয়া হয়েছে ? প্রমীলা প্রশ্ন করে বাপের মুখে তাকিয়ে।

না—কেন বল্ তো ?

আগে চা-জলখাবার খেয়ে নিলে পারতে—

না না, উনি এসেছেন ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিই—তুমি বরং যাও—

প্রমীলা চলে গেল না ঘর থেকে। সে দাঁড়িয়েই রইল এক পাশে।

তারপর মিঃ মল্লিক, কি ব্যাপার বলুন তো ? কে. ডি. প্রশ্নটা করে সুদর্শনের দিকে তাকালেন।

সুদর্শন তখন সংক্ষেপে সকালবেলার ঘটনাটা বলে গেল।

ডাঃ কে. ডি. যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছেন। সুশান্ত তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাকে কেউ হত্যা করেছে! ব্যাপারটা যেন এখনো ভাবতেই পারছেন না। কে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, সুশান্ত খুন হয়েছে ?

হ্যা—সুদর্শন বললে, সে তো আপনারই ছাত্র ছিল—তার চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে আপনি জানেন যদি আমাকে বলেন ডঃ দত্ত।

কি বলব জানি না। কলেজের বাইরে তো তাকে জানবার আমার বিশেষ কোন গ-সুবিধা ছিল না—তবে ছেলেটি সত্যিই খুব intelligent ছিল—ব্যবহারও ভদ্র। চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু তার জানি কখনো কোন দুর্নাম শুনিনি। তবে—

তবে? প্রশ্নটা করে সুদর্শন ডঃ দত্তর মুখের দিকে তাকাল।

Recently কলেজে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল—যে কারণে আমি কলেজের ইস্তফা দিয়েছি পরশু—

কি হয়েছিল?

কে. ডি. সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে বললেন, ও ছিল কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি—resignation দিই ওর ইচ্ছা ছিল না, সেই ব্যাপার নিয়ে বোধ হয় ওদের দের মধ্যে একটা গোলমালও হয়েছিল—আমি ঠিক জানি না ভাল করে ব্যাপারটা, সকালে প্রমী বলছিল—

পাশেই দণ্ডায়মান প্রমীলার দিকে তাকাল সুদর্শন এবারে। প্রস্তরমূর্তির মতই যেন য় ছিল প্রমীলা। দুজনের চোখাচোখি হল।

আপনি যা জানেন আমাকে যদি বলেন, মিস্ দত্ত!

বিশেষ কিছুই আমি জানি না, তবে গতরাত্রে সুশান্তর বাড়িতে গিয়ে যা শুনে-

আপনি গতরাত্রে সুশান্তবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কত রাত হবে তখন?

প্রায় সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটা হবে—

কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?

ঘণ্টা দেড়েক হবে—

কথা হয়েছিল কাল সন্ধ্যায় সুশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার?

প্রমীলা অতঃপর কল্যাণদের বাড়ির ঘটনা ও তার পরের পরদিন কলেজের ঘটনা যা ছিল গত সন্ধ্যারাত্রে সুশান্তর মুখে বলে গেল।

সুদর্শনের মনে হয় সে যেন এতক্ষণে অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পাচ্ছে।

কাল থেকে সে অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছিল—এখন সেই অন্ধকারে বুঝি একটা আলোর রশ্মি চোখে পড়ে।

দুটি নাম তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়—

কল্যাণ ও দিব্যেন্দু।

আমি এবারে উঠি ডঃ দত্ত। কর্তব্যের খাতিরেই এসে আপনাদের বিরক্ত ক
হল। বলতে বলতে সুদর্শন উঠে দাঁড়াল।

নমস্কার ডঃ দত্ত।

নমস্কার।

সুদর্শন বের হয়ে এল কে. ডি.'র বাড়ি থেকে।

গলিটা পার হয়ে এসে বড় রাস্তায় পার্ক-করা জীপটায় উঠে বসল।

কিধার যায়গা সাব্? মোহন সিং শুধায়।

থানায় চল।

জীপ থানার দিকেই চলল।

॥ সাত ॥

পরের দিন দুপুরে সুদর্শন কলেজে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা কর
অফিসে।

প্রৌঢ় প্রিন্সিপ্যাল হরিসাধন বোস দীর্ঘদিন ঐ কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত।
সুদর্শনের পরিচয় পেয়ে কেমন যেন একটু নার্ভাসই হয়ে পড়েন।

হরিসাধনবাবু ঐদিন সকালেই সুশান্তর মৃত্যুসংবাদটা পেয়েছিলেন।

আমি কতকগুলো ইনফরমেশানের জন্য এসেছি মিঃ বোস আপনার কাছে।

ইনফরমেশান।

হ্যাঁ, আপনি জানেন কিনা জানি না—আপনার কলেজের সুশান্ত রায়—

জানি—

জানেন?

হ্যাঁ আজই শুনেছি—সে খুন হয়েছে পরশু রাত্রে।

যেদিন ও খুন হয় তার দুদিন আগে দুপুরে কলেজে কি সব গোলমাল হ
শুনছিলাম—

হ্যাঁ—কল্যাণ সমরেশ দিব্যেন্দু—ওদের সঙ্গেই মারামারি হয়েছিল। সুশান্ত কা
খুব মেরেছিল—আমরা মাঝখানে পড়ে কোনমতে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিই।

তারপর ?

সুশান্ত কলেজ থেকে ট্রান্সফার নেওয়ার জন্য আমার হাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যায়।

কি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল জানেন কিছু ?

না।

আচ্ছা হরিসাধনবাবু—

বলুন ?

আপনার এদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ হয় ?

সন্দেহ !

হ্যা, সুশান্তকে যে হত্যা করতে পারে—

কেমন করে বলব বলুন ? তবে—

কিন্তু হরিসাধন বোসের আর বলা হল না—অন্য এক অধ্যাপকের ইশারা পেয়ে কে সামলে নিলেন।

বলুন—থামলেন কেন ?

দেখুন ওদের বাইরের activities সম্পর্কে তো আমি কিছু জানি না—কি বলব

হুঁ। আচ্ছা যাদের নাম করলেন—

কাদের কথা বলছেন ?

কল্যাণ সুদীপ্ত সমরেশ দিব্যেন্দু ইত্যাদি—এদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

ভালই তো মনে হয়।

কিন্তু ওরা স্ট্রাইক করেছিল না ?

হ্যা—ও তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। নতুন কিছু তো নয়।

তা বটে। আমি কয়েকজনের ঠিকানা চাই—

কাদের ঠিকানা ?

কল্যাণ সুদীপ্ত দিব্যেন্দু শ্যামল সমরেশ—

অফিস-ক্লার্ককে ডেকে হরিসাধনবাবু ওদের ঠিকানা বলে দিলেন।

অতঃপর সুদর্শন বিদায় নিল।

কলেজ থেকে বের হয়ে সুদর্শন নীচে এসে গেটের সামনে জীপে উঠে বসল।

মোহন সিং জিজ্ঞাসা করে, থানায় যাব ?

না—গড়িয়াহাট চল।

সকাল থেকেই সুদর্শনের মনে হচ্ছিল, কিরীটীর সঙ্গে একবার ও দেখা করবে।

সুশান্তর হত্যার ব্যাপারে যেন ও কোন একটা সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিল না। কি কোন্ দিক থেকে তদন্ত শুরু করবে কিছুতেই যেন বুঝে উঠতে পারছিল না।

হয়তো কিরীটী তাকে কোন একটা পথ ধরিয়ে দিতে পারে।

বেলা চারটে নাগাদ সুদর্শন কিরীটীর ওখানে পৌঁছল। কিরীটী তার দেড় ঘরেই ছিল।

সোফা-কাম-বেডটার ওপরে শুয়ে কিরীটী একটা বই পড়ছিল দেড়তলার ঘরে, জা দরজা সব বন্ধ। এয়ার-কণ্ডিশন চলছে।

কাচের দরজা ঠেলে সুদর্শনকে ঘরে ঢুকতে দেখে কিরীটী ওর মুখের দিকে তা সুদর্শন যে—কি খবর—এ সময়।

একটা সোফার উপরে বসতে বসতে বললে সুদর্শন, কেন দাদা, আসতে নেই?

আসবে না কেন—হাজারবার আসবে—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

কিরীটী উঠে বসে বইটা মুড়ে তারপর বললে, বল তারপর—কোথায় কে খুন হল।

আপনি বুঝি আজকাল আর সংবাদপত্র পড়েন না দাদা?

পড়ি তবে ঐ সব তোমাদের খুন-খারাপি আর পড়তে ভাল লাগে না।

কেন?

কেন কি। এতদিন যে সব খুন-খারাপি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি—interest করেছি, এখনকার—মানে ইদানীংকার ব্যাপারগুলো তো সেরকম আর নয়। সব ঘটছে আজকাল কলেজ-স্কুলের ছেলেছোকরাদের মধ্যে—এ যেন এক নিষ্ঠুরতা—

সত্যি দাদা।

কিন্তু যারা ঐসব সুকুমারমতি ছেলেদের মধ্যে খুনের নেশা জাগাচ্ছে তারা পারছে না—এর একটা অন্য দিকও আছে এবং সেটা সাংঘাতিক। নিজের তৈরি ফ্রাংকেনস্টিনই একদিন তাদের দিকে ধ্বংসের রক্তাক্ত হাত বাড়াবে। সর্বনেশে খেলা সুদর্শন!

আমরাও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি দাদা।

উপায় কি বল! শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যে তোমাদের হাতে—

কিন্তু সে দায়িত্ব পালন যে কি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে—

জানি ভাই—বুঝতে কি আর পারছি না, ভাল কথা—আমিই তোমার

হ যাব ভাবছিলাম!

সাবিত্রীও আপনার কথা বলছিল।

তুমি এসে গেলে ভালই হল—তোমার এলাকাতেই দিন-দুই আগে একটা হত্যাকাণ্ড ছে।

কোন্ ঘটনার কথা বলছেন ?

অ্যাডভোকেট রসময় রায়ের ছেলে সুশান্ত রায়—

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি শুনলেন কোথা থেকে ?

শুনিনি—বলতে পার শুনিয়ে গিয়েছে—

কে বলুন তো ?

রসময়বাবু। ভদ্রলোক আমার পূর্ব-পরিচিত—

রসময়বাবু এসেছিলেন আপনার কাছে ?

হ্যাঁ—আজ সকালেই এসেছিলেন।

কি বললেন তিনি ?

একমাত্র ছেলের ঐ ধরনের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেয়েছেন মনে হল—তাঁর ই শুনলাম তুমি এনকোয়ারীতে গিয়েছিলে। যাক, সে-কথা আমাকে তুমি যতটুকু খুলে বল তো।

ঐ ব্যাপারে একটা পরামর্শের জন্যই আপনার কাছে এসেছি দাদা, কারণ—

কি বল তো ?

মনে হচ্ছে বেশ জটিল ব্যাপারটা এক দিক দিয়ে, আবার অন্য দিক দিয়ে একটা কার্য-ণও যেন খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

কি রকম ?

সুদর্শন হত্যা সংঘটিত হবার পর অকুস্থলে সংবাদ পেয়ে তদন্ত গিয়ে যা সে ছে—যা তার মনে হয়েছে—পরে ডঃ কে. ডি.'র সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রমীলার তার কথাবার্তা ও সর্বশেষে কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষ হরিসাধনবাবুর সঙ্গে তার যা যা লাচনা হয়েছিল সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে গেল।

কিরীটী নিঃশব্দে শুনে গেল।

সব শোনার পর একটি চুরোটে অগ্নিসংযোগ করলে কিরীটী, তারপর কয়েকটা মুহূর্ত ান করবার পর বললে, তোমার দৃষ্টিশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হয়েছে র্শন—

কিন্তু দাদা, সত্যি কথা বলতে কি, এখনো আমি বুঝতে পারছি না—

কি? কি বুঝতে পারছ না সুদর্শন?

ঠিক কোন্‌খান থেকে আমার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করব!

কেন, তুমি নিজেই তো মনে মনে একটা ছক কেটে ফেলেছ ইতিমধ্যেই—পথেই এগিয়ে যাও।

ছক। কোন্ ছকের কথা বলছেন দাদা?

তুমি কাগজে যে আটটি পয়েন্ট লিখেছ—তারাই দেবে তোমাকে পথের সন্ধ কেবল ওর সঙ্গে একটি পয়েন্ট যোগ করলে ভাল হয়—

কি, বলুন?

কল্যাণ সুদীপ্ত দিব্যেন্দু শ্যামল সমরেশ ও রবীন—এদের এই ছয়জনের সং তোমাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে। এদের সুশান্তর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, আর—আর একজনকেও বাদ দিও না—

কার কথা বলছেন?

প্রমীলা দত্ত।

প্রমীলা!

হ্যাঁ।

কিন্তু প্রমীলা সত্যিই সুশান্তকে ভালবাসত দাদা—

জানি—অন্ততঃ তোমার কথায় তাই মনে হয়। কিন্তু ভুলে যেও না—সপ্তরথীর আমি মৃত সুশান্তকেও ধরছি—ঐ একটিমাত্র নারীই ছিল।

আপনি কি বলতে চান দাদা, ব্যাপারটা—

কিছুই আমি আপাততঃ বলতে চাই না সুদর্শন, কেবল বলতে চাই এইটুকু প্রমীলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিও না। নেওয়া বোধ হয় উচিত হবে না।

কিন্তু দাদা—

সুদর্শন, মনে মনে তুমি কাহিনীর যে পটভূমিকা রচনা করেছ—সেটাকে নস্যাৎ করে দিতে চাই না। তবে এও বলব—চোখে যা তোমার পড়েছে স্পষ্ট—অলক্ষ্যেও তো কিছু থাকতে পারে, অস্পষ্ট—ঝাপসা মানে কোন পটভূমিকা কাহিনীর পশ্চাতে! আর সেটা হয়তো তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঐ ছ'জ স্টাডি করতে পারলে।

দাদা!

বল?

আপনি একবার স্বচক্ষে অকুস্থানটা দেখবেন না?

দেখব বৈকি। বিশেষ করে রসময়বাবুকে যখন একপ্রকার আমি কথা দিয়েছি—
সাধ্য আমি চেষ্টা করব তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-রহস্যের একটা কিনারা করবার।

কবে আপনি যাবেন?

রসময়বাবুকে বলেছি আজই সন্ধ্যায় যাব। তারপরই একটু থেমে কিরীটী বললে,
ল কথা, একটা কাজ করতে পার?

কি বলুন?

ঐ ছ'জনকে পৃথক পৃথক ভাবে তুমি তোমার থানায় ডেকে আনাতে পার?

কেন পারব না—ওদের ঠিকানা তো আমি সংগ্রহ করে এনেছি। কিন্তু সকলকে
সঙ্গে একদিনেই ডাকলে তো ভাল হত।

না। আলাদা আলাদা ভাবে ডাকবে—যেন ওরা কেউ না জানতে পারে তুমি
লকে ডেকেছ!

দাদা?

বল।

আপনি কি ওদেরই কাউকে সন্দেহ করছেন?

অবশ্যই। হত্যাকারী ওদেরই মধ্যে একজন।

প্রমীলাকেও ডাকব তো?

হঁ্যা—কিন্তু সবার শেষে।

বছর দশেক আগে একটা খুনের মামলার রহস্যোদ্ঘাটন করতে হয়েছিল কিরীটীকে—
লাটা তখন আদালতে চলেছে।

হত্যাকারীর বিচার চলেছে আদালতে।

পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল এক সৌম্যমূর্তি ক্রিশ্চান ধর্মযাজক। বয়েস চল্লিশ
ক বিয়াল্লিশের মধ্যে।

একটি ক্রিশ্চান মিশনারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ফাদার জোন্স। মিশনারীর মধ্যে
বাস ছিল—তারই দেখাশোনা করত ফাদার জোন্স।

ধর্মযাজক হলে কি হবে—ফাদার জোন্সের একটি দোষ ছিল—প্রচণ্ড রগচটা। হঠাৎ
উঠত।

ছাত্রাবাসের কেউই সেই কারণে জোন্সকে ভাল চোখে দেখত না।

ঐ ছাত্রাবাসেরই একটি ছেলে নিহত হয়।

না প্রমাণাদিসহ পুলিস ফাদার জোন্সকে গ্রেপ্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাপরাধে

তার বিচার শুরু হয় আদালতে।

আসামী পক্ষের অ্যাডভোকেট ছিলেন রসময় রায়।

মিশনারীর অধ্যক্ষ ফাদার রিচার্ডসন—বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি—তাঁর বি ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়নি। তিনি বলেছিলেন, ফাদার জোন্স রগচটা এবং ছেলে মারধোর করতেন ঠিকই—কিন্তু একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলেকে হত্যার নিষ্ঠুরতা ত চরিত্রে থাকতে পারে না।

কিন্তু পুলিস তাঁর কথায় কান দেয়নি।

ফাদার রিচার্ডসনের এক বন্ধু ছিলেন—এক ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যাপক—মিঃ ম্যা তাঁর সঙ্গে ছিল কিরীটীর পরিচয়—তিনিই রিচার্ডসনকে কিরীটীর কাছে নিয়ে যান।

কিরীটী ওঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়—কারণ সব শুনে তারও যেন মনে হয়েছিল ফা জোন্স ছেলেটিকে হত্যা করেনি।

শেষ পর্যন্ত কিরীটী অনুসন্ধানের দ্বারা এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ করে ফাদার জোন্স নির্দোষ আদালতে সেটা প্রমাণ করেছিল।

সেই মামলার সূত্রেই রসময় রায়ের সঙ্গে কিরীটীর আলাপ।

॥ আট ॥

রসময় রায় লোকটি চাপা ও শান্ত প্রকৃতির, যদিও আদালতে একজন নাম অ্যাডভোকেট।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুটা তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। দুটো দিন তিনি থেকে কোথাও বের হননি। গুম হয়ে ছিলেন। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

কারও সঙ্গে বাড়ির কথা পর্যন্ত বলেননি। কেবল মধ্যে মধ্যে দেখা গেছে তাঁকে বসবার ঘরে, না-হয় শোবার ঘরে পায়চারি করতে। স্ত্রী মমতা তো সর্বক্ষণই আছেন আর কান্নাকাটি করছেন।

ছেলে সুশান্ত সাধারণ ছেলেদের মত ছিল না যে রসময় তা জানতেন।

বরাবর লেখাপড়ায় ভাল। মিষ্টভাষী সদালাপী—কেউ কখনো তাঁর ছেলের প্র ছাড়া অপ্রশংসা করেনি।

রসময় অবিশ্যি সুদর্শনের প্রশ্নোত্তরে স্বীকার করেননি যে তাঁর ছেলে সুশান্তও ই ঐ সব হুজুগে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে এবং দলে ভিড়েছিল।

কিন্তু ইদানীং বছরখানেক ধরেই লক্ষ্য করছিলেন—ছেলে যেন কেমন অস্থির অশান্ত তিব হয়ে উঠছে। কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর ছেলে লেখাপড়ায় ভাল। যাই করুক শুনায় অবহেলা করে না। তাই বোধ হয় রসময় ব্যাপারটা জেনেও বিশেষ বিচলিত নি প্রথমটায়। তাছাড়া নিজের আদালত ও নথিপত্র নিয়ে সর্বদা এত ব্যস্ত থাকতেন দিকে তেমন নজর দেবার অবকাশও পাননি।

কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কখন আসে বাড়ি এবং কখন বাড়ি থেকে বের হয়ে —অনেক সময় তিনি জানতেও পারতেন না।

কিন্তু ক্রমশঃ ছেলে সুশান্ত সম্পর্কে রসময়কে যেন চিন্তিতই করে তুলছিল।

তাছাড়া আর একটা জিনিস যেটা শহরের জনজীবনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল উগ্রপন্থী দলের বেপরোয়া কার্যকলাপ বেশ কিছুদিন ধরে—সেটাই হয়েছিল তাঁর বিশেষ ার কারণ।

বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে যে ব্যাপার শুরু হয়েছিল—কথায় কথায় কলেজে স্ট্রাইক পরীক্ষা না দেওয়া—পরীক্ষা ভণ্ডুল করা—কোশ্চেন পেপার নিয়ে চেঁচামেচি এবং াপরি সব কিছু ভেঙে তছনছ করা—সব পুরাতন সেকেলে বলে দেওয়ালে দেওয়ালে ন—আর সেই সঙ্গে খুনোখুনি রক্তারক্তি করা প্রকাশ্য দিবালোকেই!

রসময়বাবু মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

উদ্বিগ্ন হবার তাঁর আরও বেশী কারণ ছিল—তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর ছেলে ন্তও ঐ দলে ভিড়েছে বলে। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বোয়াস্তি—অথচ বুঝতে ছিলেন না কি করবেন! অবশেষে একদিন ছেলেকে ডেকে বলেছিলেনও ঐ দুর্ঘটনার দিন আগে, সুশান্ত পড়াশুনা ঠিকমত হচ্ছে তো?

কথাটা ঐভাবেই শুরু করেছিলেন রসময়বাবু।

সুশান্ত বলেছিল, হ্যাঁ।

কলেজে-টলেজে ক্লাস হয়?

হবে না কেন?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি, যা সব শুনছি—চারিদিকে দেখছি—খবরের কাগজে ছি—তাতে তো মনে হয় পড়াশুনার পাট ছাত্ররা তুলেই দিয়েছে।

যাদের পড়বার ঠিকই পড়ছে বাবা। সুশান্ত জবাব দিয়েছিল।

দেখ, একটা কথা মনে রেখো। সব কিছু ভেঙে তছনছ করে তাণ্ডব নৃত্য করা ই বিপ্লব নয় বা সংস্কার নয়—ধীরে ধীরে একটু একটু করে ক্রমশঃ যে আমূল বর্তন আসে—

সুশান্তকে বরাবরই দেখেছেন রসময় বিনয়ী ও মিতভাষী, কিন্তু সেদিন বাপের কথ মাঝখানেই বলে উঠেছিল—আপনাদের ঐ থিয়োরি সেকেলে—পচা বাবা।

তাই নাকি! হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়েই কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন ছেে মুখের দিকে তাকিয়ে।

নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন বাবা, বৃহৎ কর্মের প্রস্তুতিও বৃহৎ। আগুন লাগলে চোখ ঝলসে যায়ই—বড আগুনের এইটাই ধর্ম। আর তা অনেক কি পোড়ায়ও—

কিন্তু সব পুডে গেলে সেই আগুনে তোমাদের যে পোডা মাটির ওপরে এসে দাঁডা হবে!

তাই তো আমরা চাই—সেই পোডা মাটিতেই নতুনের বীজ আমরা পুঁতব। পুর যা কিছু—এতকাল ধরে যেটা আমরা শুধুমাত্র একটা অন্ধ-বিশ্বাসেই আঁকডে আছি—সে যদি আজ পুড়ে যায়ই—যাক না পুডে—

থিয়োরি আর প্র্যাকটিক্যাল এক জিনিস নয় সুশান্ত!

কিন্তু থিয়োরির ওপরেই প্র্যাকটিক্যাল গডে ওঠে বাবা।

তাই নাকি!

নিশ্চয়ই। সবার আগে থিয়োরি—তার পরেই তো থিয়োরি প্র্যাকটিক্যাল রূপ নে

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে রসময় কেমন যেন মনে ম বেশ একটু ভীতই হয়ে উঠেছিলেন। যেটা ছিল কিছুটা অস্পষ্ট, সেটা যেন বেশ স্প হয়ে উঠেছিল অতঃপর।

মনে হয়েছিল তাঁর—তাহলে বাইরের আগুন তাঁর ঘর পর্যন্ত এসেছে।

আর বিশেষ কোন কথা হয় নি ছেলের সঙ্গে। তবে ভিতরে ভিতরে সর্বদা তার থেকে তিনি সত্যি বলতে কি একটু যেন সর্বদা ভীত ও চিন্তিত হয়েই থাকতেন।

কিন্তু সেই শঙ্কাটাই যে এমন মর্মান্তিক ভাবে সত্যে পরিণত হবে এবং এত বড় এ চরম আঘাত হানবে এত তাড়িতাডি সেটাই বুঝতে পারেননি।

কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে এসে রসময় সেই কথাটাই বলেছিলেন। কেঁদে ব ছিলেন, কিরীটীবাবু দোষ হয়ত সুশান্তরও ছিল—কিন্তু তবু যদি আমি জানতে পার সে দোষ কতখানি—যার জন্য তাকে অমন করে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হল! জ জেনেও আজ আর কোন লাভ হবে না—তাকে আর ফিরে পাব না, তবু জানতে এই কারণে যে সে কি তার হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্তই করল—না অন্য কিছু!

কিরীটী কোন কথা বলেনি। চুপ করে এক হতভাগ্য পিতার করুণ আক্ষেপ শুনছি

রসময় বলতে লাগলেন, আমি শুধু জানতে চাই—যদি অবিশ্যি সম্ভব হয়, কার এ
প্রশিচত্ত—ওব না আমার ?

আপনার কি মনে হয় রসময়বাবু, তাকে অন্যায়ভাবে কেউ হত্যা করেছে !

তাই। আর সেই কারণেই আমি জানতে চাই—কি সে অন্যায় যার জন্য তাকে এত মাসুল দিতে হল ?

ঠিক আছে রসময়বাবু, আপনি যান। সুদর্শন মল্লিক আপনাদের ঐ এলাকার থানা অফিসার—আমার বিশেষ পরিচিত—সে-ই তো investigation করছে, আমি তার কাছ থেকে আগে ব্যাপারটা জানি, তারপর দেখি কতদূর কি করতে পারি !

সুদর্শন চলে যাবার পর কিরীটী সুশান্তর নিহত হবার কথাটাই ভাবছিল।

সুদর্শনের কাছে তার বিবৃতি থেকে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিল কিরীটী, যেটা রসময়বাবু তাকে জানাতে পারেননি।

মুখে কিরীটী ভদ্রতার খাতিরে রসময়কে বলেছিল বটে সুশান্তর মৃত্যুর ব্যাপারটার মধ্যে যে রহস্য আছে তার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মনের মধ্যে যেন কোন সাড়া পাচ্ছিল না তেমন।

ভাল লাগে না আজকাল আর কিরীটীর ঐ সব খুন জখম চুরি জালিয়াতির পিছনে ছোটাছুটি করতে।

জীবনে অনেক রহস্যের মীমাংসাই সে করেছে। একদিন ছিল নেশা আর উত্তেজনা কিন্তু আজ যেন সেই নেশা আর উত্তেজনা ঝিমিয়ে এসেছে।

কর্তব্যের খাতিরে দশজনের পীড়াপীড়িতে অনেক সময় আজও তাকে ঐ ধরনের সব ব্যাপারে মাথা গলাতে হয়, ছোটাছুটিও করতে হয়—কিন্তু সে যেন নিছক খানিকটা কর্তব্য পালনই।

বয়স তো হয়েছে।

আর কতদিন একদা যৌবনের যে নেশাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল তার পিছনে ছুটোছুটি করে বেড়ানো যায় ?

কিন্তু সুদর্শন এসে যেন সেই নেশাকেই খানিকটা খুঁচিয়ে দিয়ে গেল।

তাছাড়া সেদিনকার রসময়বাবুর বেদনাবিক্ষুব্ধ মুখের চেহারাটাও যেন মনের ওপরে বার বার ভেসে উঠেছিল নতুন করে !

সন্ধ্যার কিছু পরে কিরীটী বের হল।

আজ বিকেলের দিকে মেঘ করেছিল কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। খানিকটা বাতাস উঠল মেঘ কেটে গেল।

কিরীটী যখন রসময়ের গৃহে গিয়ে পৌঁছল—সন্ধ্যারাত্রি তখন, প্রায় সোয়া সাত রসময় তাঁর বাইরের ঘরেই একাকী বসে ছিলেন।

তুজন মক্কেল এসেছিল কিন্তু তাদের তিনি বিদায় করে দিয়েছিলেন। তাদের প দিনই মামলার শুনানী ছিল কিন্তু তিনি তাদের বলে দিয়েছিলেন, মকদ্দমার তারিখ নে তিনি।

রামচরণ গড়গড়ায় তামাক সেজে দিয়ে গিয়েছিল। গোটা তুই টান দিয়ে গড়গড় নলটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই বসে ছিলেন।

এই কদিনেই যেন রসময়ের অনেকখানি বয়স বেড়ে গিয়েছে।

কলিং বেল টিপতেই রামচরণ এসে দরজা খুলে দিল, কাকে চান?

রসময়বাবু আছেন?

আছেন কিন্তু আপনি কি মক্কেল?

না। তোমার বাবুকে বল গে কিরীটীবাবু এসেছেন।

রামচরণ ভিতরে গিয়ে খবর দিতেই রসময় নিজেই বের হয়ে এলেন, আসুন—আ কিরীটীবাবু!

রসময় কিরীটীকে নিয়ে এসে বসবার ঘরে ঢুকলেন। বললেন, বসুন—

কিরীটী কিন্তু বসল না। বললে, বুঝতে পারছি রসময়বাবু, আপনি খুবই ভে পড়েছেন—

রসময় বললেন, মৃত্যু যখন যার আছে ঠিক সেই মুহূর্তেই আসবে—আর আসেও কিন্তু এমন ভাবে ছেলেটি মরবে—মরতে পারে এ যে এখনও ভাবতে পারছি না রায়। হয়ত মনে হচ্ছে এখন দোষ আমারই—

না, না—সে কথা কেন ভাবছেন রসময়বাবু!

ভাবছি এই কারণে, হয়ত ওদিকটায় একটু নজর দিলে এমনটা ঘটত না। ছেলে অঙ্কে খুব মাথা ছিল—অথচ নিজের জীবনের অঙ্কটাতেই এত বড় একটা ভুল করে শেষ পর্যন্ত—

কিরীটী কি বলবে বুঝতে পারে না। হতভাগ্য এক পিতাকে কি সান্ত্বনা দেবে বু পারে না।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিঃ রায়, বসুন!

বসবার আগে চলুন কোন্ ঘরে ব্যাপারটা ঘটেছিল—ঘরটা একবার দেখব।

চলুন—পাশের ঘরেই।

ঘরটায় তালা দেওয়া ছিল—রসময়বাবু রামচরণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরটা তালাবন্ধ রাখতে। রামচরণকে বললেন রসময়বাবু তালাটা খুলে দিতে। রামচরণ চাবি এনে তালাটা খুলে দিলে।

আলোটা জ্বেলে দে ঘরের রামচরণ। কিরীটীবাবু, আপনি ঘরটা দেখে আসুন—বসবার ঘরে আছি।

রসময় আর দাঁড়ালেন না। বসবার ঘরে অর্থাৎ পাশের ঘরে ফিরে গেলেন।

রামচরণ ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেবার পর কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকল।

প্রথমেই নজরে পড়ল দেওয়ালে সুশান্তের একটি ফটো। সুদর্শন ঐদিন সকালে র যেমন বর্ণনা দিয়েছিল—ঘরটা ঠিক তেমনই—আসবাবপত্রও ঠিক তেমনই।

কেবল জানালাগুলো বন্ধ ছিল ঘরের। রামচরণকে কিরীটী জানালাগুলো ঘরের খুলে বলল।

উত্তরমুখী পর পর দুটো জানালা। কিরীটী উঁকি দিয়ে দেখল—জানালার নীচেই। রাস্তার ওপাশে সব বাড়ি পাশাপাশি—সবই পুরাতন স্ট্রাকচারের। রাস্তাটা ফুটের বেশী প্রশস্ত হবে না খুব বেশী হলে।

জানালার নীচে রাস্তায় খানিকটা আলো-আঁধারি, কারণ রাস্তার আলো বেশ কিছু সুদর্শন যে জানালাপথে সেদিন একটি মুখ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চকিতে অপসারিত হতে ছিল তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই—সে বাড়ির জানালাটা বন্ধ।

জানালার সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে, রাস্তায় যারা চলাচল করছে চট করে আলো-রির জন্য নজরে না পড়াই সম্ভব।

একটা জানালা তো একেবারে পড়ার টেবিলটার মুখোমুখি—আর সেই জানালা থেকেই দিকের বাড়ির জানালাপথে সুদর্শনের সেই চকিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল।

রামচরণ—কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল, তোমার নাম রামচরণ, তাই না?

আজ্ঞে।

কতদিন এ বাড়িতে আছ?

তা বাবু আজ্ঞে বছর আষ্টেক তো হবেই।

। তোমরা তো এই ঘরটার পরের পরের ঘরটাতেই থাক?

আজ্ঞে।

কে কে থাক ঘরে?

আজ্ঞে আমি আর ঠাকুর নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ এ বাড়িতে কতদিন কাজ করছে?

সে বাবু আমারও আগে থাকতে এখানে আছে।

তার দেশ কোথায়?

আমাদের একই জায়গায় বাড়ি—মেদিনীপুর জিলা।

নিত্যানন্দ আছে?

আজ্ঞে। রান্না করছে ওপরে!

রান্নাঘর কি ওপরে?

আজ্ঞে নীচের তলায়।

হুঁ। আচ্ছা রামচরণ, তোমরা সাধারণতঃ কখন শুতে যাও—মানে বাড়ির ক কখন শেষ হয়?

রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই সব পাট চুকে যায়—আমাদের শুতে শুতে এগারটা—

সেরাত্রে কখন শুয়েছিলে?

এগারটার কিছু পর—দাদাবাবু খাননি তাই বসে ছিলাম।

সেরাত্রে দাদাবাবু খাননি?

না।

আচ্ছা তোমাদের দাদাবাবু সাধারণতঃ কখন বাড়িতে ফিরতেন?

তার কি কিছু ঠিক ছিল আজ্ঞে! কদাচিৎ কখনো সন্ধ্যার পরে, তবে বে রাত দশটা সোয়া দশটার আগে ইদানীং ফিরতেন না।

সেদিন কখন ফিরেছিলেন?

কয়েকদিন আগে জর হয়েছিল, তাই বোধ হয় সেদিন রাত সাড়ে সা বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

কিরীটী কয়েকটা কথা বলেই বুঝতে পারে রামচরণ লোকটি বেশ চালাক

রামচরণ, তোমার আর নিত্যানন্দের নেশাটেশার অভ্যাস আছে?

আজ্ঞে না না—সে-সব কিছু নেই—তবে সিদ্ধিটা-আসটা মধ্যে মধ্যে—

খেয়ে থাক।

আজ্ঞে।

সেরাত্রে খেয়েছিলে?

সত্যি কথা বলব আজ্ঞে—দুজনে দুগ্লাস খেয়েছিলাম—শনিবার—পরের,

৷ণতঃ কখন শুতে য৷ও—মানে ব৷

ট চুকে যায়—আমাদের শুতে শুতে

৷ননি তাই বসে ছিলাম।

রণতঃ কখন বাড়িতে ফিরতেন ?

বদাচিৎ কখনো সন্ধ্যার পরে

ফিরতেন না।

, বুঝতে পারলেন ?

এইটুকু বুঝেছি—সে রাত্রে যদি পরিচিত কেউ এসে—মানে আপনার ছেলে

স এসে হত্যা করে থাকে, সে তাহলে সদর দিয়েই এসেছিল এবং আপ

খুলে 'দিয়েছিল—কিংবা সে সদর দিয়ে না এসে অন্য পথ দি

আপনার ছেলের অপরিচিতও হতে পারে—

য়ে ? কি বলছেন আপনি ?

ছাত দিয়ে।

া যতীনবাবু থাকেন। রাত্রে তাঁর বাড়ির ছাতে উঠে অ

ু যতীনবাবুর বাড়িতে কোন ছেলে বে নেই।

তাঁর দুটি মেয়ে আছে না ?

ক নাম তাদের ?

প্রতিভা আর সুষমা।

জে পড়ে ?

যা বলছিলাম—হত্যাকারী সে রাত্রে আপনার সদর

লেই হয়ত দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে।

তবে কি সুশান্তরই কোন বন্ধু—

বিচিত্র নয়—সে হয়তো এসেছিল, তারপর হত্যা কে

আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে কিরীটীবাবু—

রসময়ের কথা শেষ হল না, দরজার গোড়ায় মিতাব

কে ?

আমি মিতা—আমাকে ডেকেছেন ?

কিরীটী বলে ওঠে, এস মা—আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি

এস।

মিতা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অপরিচিত কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল মিতা একবার, তারপরই রস

তাকাল। মনের মধ্যে মিতার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে, কে এই ভদ্রলো

াসেছেন ?

রামচরণ মিতাকে কেবল ডেকেই দিয়েছিল, কিছু বলেনি। তাব তখন
—রান্নাঘরে বসে নিত্যানন্দর সঙ্গে ঐ বাবুটি সম্পর্কে কথা বলার জন্য।

বস মা, দাঁড়িয়ে কেন ? তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

মিতা নীরবে পুনরায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। রসময় বললেন, উনি তো
াদাভাইয়ের ব্যাপারটা ইনভেসটিগেট করতে এসেছেন খুকী। উনি যা জানতে চা

বিশেষ কিছুই না—আমি কেবল কয়েকটা কথা তোমার কাছে জানতে চাই

মিতা এবারেও কোন জবাব দিল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে

কিরীটী বললে, এ পাড়ায় তোমার দাদার এক বন্ধু—সমরেশ থাকে না ?

হ্যাঁ—সমরেশ চৌধুরী—আমাদের সামনে হলদে চারতলা বাড়িটায় থাকে
াবুর ছেলে। কিন্তু—

বল ? থামলে কেন

সমরেশের সঙ্গে দাদাভাইয়ের পরিচয় ছিল—একই কলেজে পড়ে, কিন্তু দাদা
াধ হয় ওকে তেমন লাইক করত না।

কেমন করে জানলে ?

মাস আষ্টেক আগে, ঠিক জানি না কি ব্যাপার নিয়ে—দাদাভাইয়ের সঙ্গে
ারামারি হয়ে গিয়েছিল—সেই থেকে দাদাভাই ওর সঙ্গে মিশত না জানি

কি ব্যাপার নিয়ে মারামারি হয়েছিল জান তুমি ?

না।

কিরীটী লক্ষ্য করে মিতার গলার স্বরে যেন একটা দ্বিধা।

ঐ সময় রসময় বললেন, সমরেশ ছেলেটা একটা নচ্ছার টাইপের ছেলে। বার দুই
। করেছে, কেবল গুণ্ডামি করে বেড়ায়—বিনয়বাবুর প্রচুর পয়সা আছে—শেয়ারের কি
বিজনেস করেন—

কিরীটী আর সমরেশ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করল না। সে এবারে মিতার দিকে
কিয়ে প্রশ্ন করলে, যতীনবাবুর মেয়েদের তুমি চেন ?

চিনি। প্রতিভাদি আর সুষমাদি—ওরা বেথুনে একজন, প্রতিভাদি পড়ে বি-এ—
াভাইয়ের সঙ্গেই পাস করেছিল—আর সুষমাদি বার দুই হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করে
ারে পাস করে কলেজে ঢুকেছে—আমার সঙ্গেই পড়ে।

তারা তোমাদের বাড়িতে আসে না ?

া মধ্যে আসে।

না ?

.তোমার দাদাভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওদের আলাপ ছিল ?

ছিল—খুব যেন ক্ষীণ কণ্ঠে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই শব্দটি উচ্চারিত হল।

ওদের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার দাদাভাইয়ের বেশী আলাপ ছিল ?

'ষমাদি। ঘন ঘন দাদাভাইয়ের কাছে আসত, কিন্তু—

?

তাই ওকে কখনো পাত্তা দেয়নি, বড্ড গায়ে পড়ে—

আবার- সুষমাদি—

.মীলাকে তুমি তো চেন ?

হ্যা।

সে আসত না ?

মধ্যে—

র দাদাভাই প্রমীলাকে ভালবাসত, তাই না ?

যা বলে তাহলে কথাটা ?

না লেই

সুষমা জানত না ?

জানত।

তা সত্ত্বেও সে তোমার দাদাভাইয়ের কাছে—

সুষমাদির কথা ছেড়ে দিন—ও ঐ টাইপের মেয়ে। এ পাড়ায় কত ছেলের সঙ্গে ওর ভাব—

সমরেশের সঙ্গেও আছে নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করব মিতা—সে রাত্রে, মানে গত শনিবার তুমি কখন ও গিয়েছিলে ?

রাত সাড়ে এগারটার পর—

অত রাত্রে ?

সামনে আমার প্রি-ইউ পরীক্ষা—

ওঃ! তারপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

হ্যাঁ—শোবার আগে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম।

আচ্ছা ঐ সময় কোন শব্দ—এই দরজা খোলার শব্দ কিছু পাওনি—মানে ঘুমোবার
া পর্যন্ত?

না না—আবার মিতার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা, মনে হল যেন কিরীটীর।

োমার ঘরের ওপরেই তো ছাত?

হ্যাঁ—ছাতের একাংশে আগে রান্নাঘর ছিল আর তার পাশে পূজোর ঘর—মানে
ঘর—বছরখানেক হল রান্নাঘর মা নীচে করে দিয়েছেন। এখন সে ঘরটা খালিই
থাকে—বাকিটা খোলা ছাত—ছাতই বেশী।

রসময়বাবু— ' স্বরটা

বলুন? কিরীটীর ডাকে রসময় ওর মুখের দিকে তাকালেন।

আপনার ছাতটা একবার আমি দেখতে চাই—

বেশ তো—খুকী, ওঁকে নিয়ে যা ছাতে।

চলুন।

কিরীটী মিতাকে নিয়ে ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়িটা
র বাঁক নিয়েছে।

প্রথম বাঁকের মুখে দোতলা—সেখানে একটি কোলাপসিব্‌ল্ গেট। গেটটা
লাই ছিল।

কিরীটী হঠাৎ মিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, মিতা, রাত্রে এই গেটটা কি
থাকে?

না। খোলাই থাকে।

দোতলায় একটা চওড়া বারান্দা—বারান্দায় পর পর চারখানি ঘর—বারান্দায়
লো জ্বলছিল।

বারান্দা থেকেই সিঁড়ি তিনতলায় উঠে গিয়েছে—আর একটা বাঁক নিয়ে—তিনতলায়
প্রথমেই একটা সরু প্যাসেজ—প্যাসেজের সামনে পাশাপাশি দুটো ঘর—একটায়
গ রান্না হত—এখন খালি, তালা দেওয়া—অন্যটা পাশেই, পূজোর ঘর। তার
ই প্রশস্ত একটি খোলা ছাত।

ছাতে দুধারে টবে নানা ধরনের ফুলের গাছ। কোন টবে বোধ হয় বেলফুল ফুটেছে
বাতাসে তার গন্ধ যেন ম-ম করছে। চারপাশেই প্রাচীর কিন্তু খুব উঁচু নয়।

প্রমাণ প্রাচীর।

পাশাপাশি দুটো ছাতের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিরীটী। রাম মিথ্যে বলেনি, সত্যিই সে প্রাচীর অনায়াসেই টপকে এক ছাত থেকে অন্য ছাতে য যেতে পারে। আদৌ কষ্টসাধ্য নয়।

॥ দশ ॥

কিরীটী বুঝতে পারে, একই ভিতের উপরে কমন ওয়াল দুটো বাড়ির।

আগেকার দিনে কলকাতা শহরে কমন ওয়াল বাড়ির এমন অনেক হত।

কিরীটী ছাতের উপর থেকেই নীচের রাস্তাটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল। ামনের বাড়িটা চারতলা—রাস্তার উলটো দিকে—ঐটাই বোধ হয় বিনয় চৌধু াড়ি।

মিতা, ঐ সামনের চারতলা বাড়িটাই বিনয় চৌধুরীর বোধ হয়?

হ্যাঁ।

বাড়িতে কোন আলো দেখছি না, কেউ নেই বাড়িতে?

প্রত্যেকবারই গ্রীষ্মের সময় বিনয়বাবু পাহাড়ে বেড়াতে যান—এবারেও হয় গিয়েছেন।

কেউ নেই?

আছে। চাকরবাকর, ড্রাইভার আর—

আর কে?

সমরেশ আছে। সে বোধ হয় ওর বাবা-মার সঙ্গে এবারে যায়নি।

সে একাই বাড়িতে থাকে?

না—বিনয়বাবুর এক বিধবা দিদি আছেন। সমরেশের পিসিমা।

ঠিক আছে। চল এবারে নীচে যাওয়া যাক। তোমার ঘরটা একবার দেখব চলুন।

দোতলায় একেবারে সর্বশেষ দক্ষিণের ঘরটাই মিতার ঘর।

ঘরটা মাঝারি—একধারে একটা সিঙ্গল বেড—তার পাশেই বড় আয়না বসানে ড্রেসিং টেবিল—টেবিলের ওপরে কিছু কসমেটিকস্ সাজানো সুন্দরভাবে।

অত রাত্রে? ...ড়ার টেবিল—তার পাশেই একটা কাবার্ড। কাবার্ডের মাথায় এক কোণের প্রি-হুড

ানন্দ বুদ্ধমূর্তি।

তার পাশে একটি ধূপাধার ও একটি কাচের ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা শুকনো রজনী-গ্ধার স্টিক। মনে হয় ঘরে যে বাস করে তার অমনোযোগিতার দরুনই ফুলগুলো লানো হয়নি।

উপরের যে খোলা ছাত—তার নীচেই ঐ ঘরটা—কিরীটী অনুমানে বুঝতে পারে।

মিতা!

কিছু বলছেন? কিরীটীর ডাকে মিতা মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাল।

তুমি নিশ্চয়ই চাও—যে তোমার দাদাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে সে ধরা ড়ুক—তার শাস্তি হোক—

নিশ্চয়ই চাই। দাদাভাই—আর বলতে পারে না মিতা—কান্নায় যেন গলার স্বরটা জে এল। চোখ দুটি অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

আমি তাকেই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি—

আপনি?

হ্যাঁ।

আপনি কি পুলিসের লোক?

না। আমার নাম তুমি শুনেছ কি না জানি না—

আচ্ছা আপনিই কি কিরীটী রায়?

হ্যাঁ। চিনলে কি করে?

কিরীটীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে করতে শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে মিতা বললে, প্রথম ই আপনাকে সন্দেহ হয়েছিল—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে—

কোথায় দেখেছ?

ছবিতে—সংবাদপত্রে—তারপরই একটু থেমে বললে মিতা, আপনি ঠিক পারবেন কে ধরতে

তোমার স আসা ও যাও য়?

সন্দেহ। মনে হয়।

তোমার পথ দুটো কি? ান্ধবকে?

শ্যামল প করে থাকে। হয়।

কেন ব্যাপার তুমি বোধ তো এক পার্টিরই লোক ছিল—তোমার দাদা, শ্যামল—

ছি

বলুন তো?

"বাবুর বাড়ির ছাতে গি

দাদাভাই বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না—তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম—

কি বুঝতে পেরেছিলে?

প্রতিভাদির ওপরে শ্যামলদার লোভ ছিল—দাদাভাই বুঝতে পারত না—কিন্তু দাদ প্রতি শ্যামলদার হিংসার কারণ সেটাই—শ্যামলদারাও একসময় এই পাড়াতেই থাকত· পরে বেনেপুকুরে চলে যায়।

হুঁ। চল, নীচে যাওয়া যাক।

মিতা কিরীটীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে নীচে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

রসময় তেমনিই বসে ছিলেন।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তাকালেন ওদের দিকে।

রসময়বাবু, দেখলাম যা দেখবার ছিল, এবারে আমি যাব—কিরীটী বললে।

যাবেন?

হ্যাঁ—আমাকে থানায় ঘুরে যেতে হবে।

কিরীটী আর দাঁড়াল না। নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাত বেশী হয়নি তখন—বোধ করি নটা।

কিরীটী রাস্তাটা অতিক্রম করে বড় রাস্তায়—বিধান সরণীতে এসে পড়ল। ফুটপ ঘেঁষেই তার গাড়িটা পার্ক করা ছিল।

কিরীটীকে আসতে দেখে হীরা সিং গাড়ির দরজা খুলে দিল নেমে।

কিধার জায়গা সাব—কোঠি?

না—চল একবার শ্যামপুকুর থানায়—

হীরা সিং গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

সুদর্শন নীচের অফিস ঘরেই ছিল। একটা এনকোয়ারি রিপোর্ট বসে বা· লিখছিল।

সুদর্শন! । পিসিমা।

দাদা? আসুন—আসুন— ার ঘরটা একবার ে

চল—ওপরে যাওয়া যাক।

দুজনে ওপরে এল সুদর্শনের কোয়ার্টারে। সাবিত্রী ৱ। গোড়া এগিয়ে এসে প্রণাম করল, দাদা আমাদের ভুলেই গিয়েছেন। শেই বড় আয়না বস

না ভাই ভুলিনি। কিরীটী হাসতে হাসতে বললে। া সুন্দরভাবে।

সাবিত্রী বললে, কতদিন আসেননি বলুন তো? ার্ড। কাবার্ডের মাথায়

ভাল লাগে না বাড়ি থেকে বেরুতে। দাদার বয়স তো হল—না কি ?

কি এমন বয়স হয়েছে—

তা ঠিক। এক কাপ চা খাওয়াও তো।

সাবিত্রী দ্রুতপদে কিচেনের দিকে চলে গেল।

বসুন দাদা—

কিরীটী একটা সোফায় বসতে বসতে বললে, পাল স্ট্রীটে রসময়বাবুর বাড়িতে ঘুরে

ম সুদর্শন।

তাই নাকি ?

হাঁ—একটা ধাঁধার নিরসন হল।

কি ধাঁধা ?

আততায়ী সে-রাত্রে রসময়বাবুর গৃহে যে পথেই প্রবেশ করুক—পরের দিন যখন সদর

টা সকালে বন্ধ ছিল তখন নিশ্চয়ই সেই দরজা দিয়ে সে যায়নি—অন্য কোন পথে

লে গিয়েছিল।

স তাই তো দাদা, কথাটা তো একবারও আমার মনে হয়নি। ঘরের দরজাটা খোলা

বলে সদরের বন্ধ দরজাটার কথা আমার মনেই পড়েনি।

উচিত ছিল মনে হওয়া কথাটা তোমার—কারণ ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব

। অর্থাৎ আততায়ী কোন্ পথেই বা এসেছিল আর কোন্ পথেই বা সে সেখান

বের হয়ে গিয়েছিল!

আপনি কি বলতে চান দাদা ?

বলতে চাই সে যেমন—মানে আততায়ী সে রাত্রে সুশান্তদের বাড়িতে প্রবেশ করে-

তেমনি কাজ শেষ করে বের হয়েও গিয়েছিল অন্যের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে, কেমন

হাঁ।

তাহলে সে আসা ও যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই একই পথ নেয়নি—

তাই তো মনে হয়।

তবে সে পথ দুটো কি ?

সুদর্শন চুপ করে থাকে।

একটা ব্যাপার তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি, সুদর্শন।

বলুন তো ?

...বাবুর বাড়ির ছাতে গিয়েছিলে ?

টার মধ্যে।

রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা?

হ্যাঁ।

কিরীটী চুপ করে থাকে। সুদর্শনের মনে হয় সে যেন কি ভাবছে।

কি ভাবছেন দাদা? জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

ভাবছি একবার প্রমীলা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করব। ইতিমধ্যে আমি যা বলে তোমাকে—কল্যাণ দিব্যেন্দু সুদীপ্ত সমরেশ ও রবীনের সঙ্গে দেখা করে—মানে আলাদা আলাদা ভাবে থানায় ডেকে এনে ক্রস করে যতটা পার জেনে নিতে—

এখনও সময় করে উঠতে পারিনি দাদা। তাছাড়া—

কি?

জানেন তো—ওরা হচ্ছে আজকালকার ছেলে—angry generation—মুখ না সহজে।

তাহলেও চেষ্টা কর—কারণ ওদের কাছ থেকে আমার মনে হয় তুমি কিছু পারবে—যা তোমার investigation-এ হয়ত কাজে লাগবে—

করব চেষ্টা, তবে কতটা সফল হব জানি না।

সহজে হয়তো কেউই মুখ খুলবে না। তবে একটা কাজ করতে যদি পার—

কি, বলুন?

প্রতিভা আর সুষমার কাছ থেকে যদি কায়দা করে কিছু জানতে পার।

কেমন করে?

ওদের সঙ্গে আলাপ করে।

পুলিস অফিসার শুনলে তো ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে যাবে।

কিন্তু জেন ভায়া, ওদের মুখ খোলাতে হলে ঐ দুটি মেয়ের কাছ থেকেই যা প্র জানবার তোমার জানতে হবে।

আপনার কি ধারণা দাদা—

একটা কথা মনে রেখ সুদর্শন—যেখানে প্রেম ভালবাসা—সেখানেই ঈর্ষা—সে সন্দেহ, আর যেখানে এ দুটি বস্তু আছে, সেখানে কিছু-না-কিছু গোলমালও থাকে

পায়ে চপ্পল।

সুদর্শন মুহূর্তকাল সুষমার দিকে

।। ১১ ।।

। শ্যামপুকুর থানা থেকে আসছি
সুদর্শনের দৃষ্টি এড়াল না—ক

র ব্যাপারে ঐ পাড়াতেই ব্যস্ত ছিল। বেরুতেই

-আই-টি স্কিমে কল্যাণদের বাড়ি এক সন্ধ্যায়।
পায় যে কদিন সন্ধ্যার দিকে কল্যাণ বাড়ি থেকে

কেন বলুন তো! আমার কাছে
সহজ গলাতেই প্রশ্নটা করল।

সুদর্শন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বেশ সাজানো। সোফা
চবল ব ...বি—

মার সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল সুদর্শনের।

ষম... নাকি বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল—সেও কটা দিন তাদের বাড়ি থেকে
রে বের হয়নি।

শান্তর মৃত্যু...তারপরই ওদের বাড়িতে কদিন ঘন ঘন পুলিসের আগমন—একই ব্যাপারে
বাড়ি ...দের, কাজেই পুলিস হয়তো তাদের বাড়িতেও হানা দেবে ভেবেছিল।
কান উৎকর্ণ হয়ে থাকত—কখন পুলিস এসে দরজার কলিংবেল টেপে।

বু ত ... , কিরীটী যেদিন সুশান্তদের বাড়িতে আসে—তার কিছুক্ষণ পরেই সুষমা
এসেছিল... কিরীটী বা মিতা তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু সুষমা তাদের শেষের
র্তা ছাতে ... কিছু শুনেছিল।

লাকটা কে বুঝতে পারেনি ছাতের প্রাচীরের মাথা দিয়ে একবার উঁকি দিয়েও, তবে
হয়েছিল সুষমার, নিশ্চয়ই লোকটা প্লেন ড্রেসে কোন পুলিস অফিসার।

ন তিনেক পরে আবারও এক সন্ধ্যায় সুষমা কিরীটীকে রসময়ের গৃহে আসতে
হল।

থাটা সমরেশ আর কল্যাণকে জানাবার জন্য সুষমা ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিল
ন্তু সমরেশ তাদের পাড়াতে থাকলেও, খবর পেয়েছিল সুশান্তর মৃত্যুর পরদিনই
কলকাতা ছেড়ে [illegible] কোথায় যেন।

মরেশকে সংবাদটা দিলে সে কল্যাণকে সংবাদটা পৌঁছে দিতে পারত, কিন্তু তারও
ছিল না।

দশেক পরে [illegible] না পেরে সন্ধ্যার দিকে বের হয়ে পড়ল কল্যাণের
উদ্দেশে।

ল্যাণ বাড়িতেই ছিল। [illegible] দেখে সে বললে, সুষমা, কি খবর?

দরজাটা বন্ধ করে দিন কল্যাণবাবু, কথা আছে।

কল্যাণ উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। সুষমার ম…

উদ্বিগ্ন হয়েছে।

খবর আদৌ ভাল নয় কল্যাণবাবু। সুষমা বললেন কি ভাবছে।

কেন? কি হয়েছে? কল্যাণের গলার স্বরে উ…

একজন প্লেন ড্রেস পুলিস অফিসার—মানে হয় খু। ইতিমধ্যে আমি যা বলে…

বাড়িতে এসেছে, অনেকক্ষণ ছিল। নর সঙ্গে দেখা করে—মানে

তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল নাকি? কল্যাণটা পার জেনে নিতে—

না। কি… আমার বড্ড ভয় করছে কল্যাণবাবু—

তোমা… …বার ভয়টা কিসের। কথাটা কল্যা…

সহজ স্বরে …চা…রিত হয়নি।

জানেন… নরেশ কলকাতায় নেই—… …দ ওরা জানতে পারে তাহলে …দের কি সা…

…তাঁর ওপরে—

সুষমার কথাটা শেষ হল না—বাইরের দরজায় কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

বস, দেখি কে এল। কথাটা বলে কল্যাণ উঠে দরজাটা খুলে দিল।

সুদর্শন প্লেন ড্রেসে এসেছিল—সে-ই দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, কে আপনি?

আমি কল্যাণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমিই কল্যাণ দত্ত—আসুন ভিতরে।

সুদর্শন ঘরে ঢুকে সুষমাকে দেখতে পেল। বছর উনিশ-কুড়ির মধ্যেই বয়স হয়।

পাতলা ছিপছিপে গড়ন—গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর—চোখ মুখ ও দেহের গঠন … সঙ্গে মিলিয়ে সত্যিই সুন্দর।

সুষমা সত্যিই যাকে বলে সুন্দরী।

পরনে ড্রেস করে পরা হালকা বাসন্তী রঙের ভয়েলের শাড়ি।

শাড়িটা বেশ দামী, মাথার চুল বেণীর আকারে পৃষ্ঠের ওপরে লম্বমান, গায়ে আঁ… বগলকাটা ব্লাউজ নাইলনের।

গাত্রাবরণের তলা থেকে পরিপূর্ণ যৌবন যেন উদ্ধত হয়ে আছে।

বাঁ হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি। ডান হাতের কব্জিতে একটি চওড়া ব্যাণ্ডে সো… ঘড়ি।

পায়ে চপ্পল।

সুদর্শন মুহূর্তকাল সুষমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণের দিকে ফিরে তাকাল। বললে,

ম শ্যামপুকুর থানা থেকে আসছি।

সুদর্শনের দৃষ্টি এড়াল না—কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সুষমা যেন একট চমকে

।।

কেন বলুন তো! আমার কাছে কি আপনার কিছু দরকার আছে অফিসার? কল্যাণ

সহজ গলাতেই প্রশ্নটা করল। তারপর বললে, বসুন না।

দর্শন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

রটি বেশ সাজানো। সোফা সেট—সেণ্টার টেবিল—একধারে পাশাপাশি তুটি

র আলমারি—

দর্শন একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার সুষমার দিকে তাকাল।

ষমা যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে আছে।

উনি কে? আপনার বোন? সুষমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল সুদর্শন

ণকে।

না। কল্যাণ বললে।

তবে?

আমার বান্ধবী—বলতে পারেন—

I see!

ষমা বস না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন। কল্যাণ সুষমাকে বললে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কল্যাণের দিকে সুদর্শন, বলল, সুষমা! সুষমা

কি?

ল স্ট্রীটে যে যতীন চক্রবর্তী থাকেন, তাঁরই মেয়ে আপনি? সুদর্শন আবার প্রশ্ন

ল্যাণ বললে, হ্যাঁ—আপনি ওকে চেনেন নাকি?

—নাম শুনেছি।

ম শুনেছেন! কোথায়? কল্যাণ আবার প্রশ্ন করল।

দর্শন কল্যাণের সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, কল্যাণবাবু—সুশান্তবাবু, যাকে

দিন আগে এক সকালে মৃত অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া যায় তার তো আপনি বন্ধু

?

না।

বন্ধু ছিলেন না? তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না?

পরিচয় ছিল—তবে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু ছিল না।

এক কলেজেই তো পড়তেন আপনারা?

তা পড়তাম—

আপনাদের কলেজের ছাত্র-সংসদের সে সেক্রেটারী ছিল শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন।

অথচ বন্ধুত্ব ছিল না?

না। সংসদের সেক্রেটারী হলেই যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, তার কি মানে অ

তা বটে। আচ্ছা, তার বন্ধুদের দু-একজনের নাম করতে পারেন?

তার তো অনেক বন্ধুই ছিল—

যেমন সমরেশ চৌধুরী—সুদীপ্ত সান্যাল—দিব্যেন্দু পালিত—শ্যামল ঘোষাল—দে—একটানা নামগুলো উচ্চারণ করে গেল সুদর্শন—তাই না?

হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তার—তবে বন্ধুত্ব ছিল কি না জানি না।

তবে বন্ধু কে ছিল? কেউ বন্ধু ছিল না তার?

ছিল। বোধ হয় রজত বোস—দেবপ্রসাদ মল্লিক—

তার মানে আপনি ঠিক জানেন না। কথাটা বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সু কল্যাণের মুখের দিকে।

আমি ঠিক জানব কি করে বলুন অফিসার—কে কে সুশান্তর বন্ধু ছিল!

তা বটে। আচ্ছা আপনাদের এক অধ্যাপক কে. ডি'র ব্যাপার নিয়ে আপনা সুশান্তবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, তাই না? সুদর্শন এবার প্রশ্ন করল।

ঝগড়া ঠিক নয়।

তবে?

খানিকটা মতদ্বৈধতা হয়েছিল—বলতে পারেন ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ান—

ঝগড়া হয়নি তাহলে?

না তো, ঝগড়া হবে কেন?

কিন্তু আমি শুনেছি—

কি শুনেছেন?

রীতিমত একটা ঝগড়া হয়েছিল সুশান্তবাবুর সঙ্গে আপনাদের—বিশেষ করে আপ

কার কাছে শুনলেন?

াব কাছেই শুনে থাকি না কেন, কথাটা মিথ্যা আপনি বলতে চান ?

মিথ্যাই বলব ! আপনি ঠিক শোনেননি।

ঠিক শুনিনি !

না।

কল্যাণের গলার স্বর স্পষ্ট, দ্বিধাহীন।

তবে যে শুনেছি—

কি শুনেছেন ?

আপনি তাকে শাসিয়ে ছিলেন !

বাজে কথা।

াসাননি ?

।।

হ বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় সুশান্তবাবু এলে তাকে আপনি শাসাননি কথায় কথায় ?

কে শাসানো বলে না !

। তারপর সেদিন কলেজের ব্যাপারটা ? সেদিন মারামারির সময় আপনি মাব সুশান্তবাবুকে শাসাননি ?

।

লেননি আপনি—'শালা তোর রক্ত না দেখি তো আমাব নাম কল্যাণ দত্ত নয়' ?

কথাটা বলতে বলতে সুদর্শন একবার আড়চোখে অদূরে দণ্ডায়মান সুষমার দিকে ল। তার চোখেমুখে একটা যেন ভয়-মাখানো বিস্ময়ের চিহ্ন।

না।

লেননি ?

না—অমন কথা তাকে আমি বলিনি। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো ব। আপনি কি আমাকেই সুশান্তর হত্যাকারী ঠাউরেছেন নাকি ?

আমি কি ঠাউরেছি না-ঠাউরেছি সে জেনে আপনার কোন লাভ নেই কল্যাণবাবু। বলুন—সেই দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে য ছিলেন ?

কোথায় আবার থাকব—বলতে বলতে আড়চোখে কল্যাণ একবার সুষমার দিকে ল, তারপর কথাটা শেষ করল, বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলাম—

কিতে সুদর্শন সুষমার দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, সুষমা দেবী, আপনি ?

আমি ! সুষমা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

হ্যাঁ—আপনি। আপনি কি করছিলেন ?

অত রাত্রে মানুষ কি করে মশাই—ঘুমোয়—ও-ও ঘুমোচ্ছিল নিশ্চয়ই—জবাবটা কল্যাণই।

প্রশ্নটা আপনাকে করিনি কল্যাণবাবু। যাঁকে করেছি তাঁকেই জবাবটা দিতে

সুদর্শন একটু কড়া গলাতেই বললে।

দেখুন অফিসার, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন। কল্যাণ বললে।

কি বললেন ?

আমার কথাটা না বোঝবার মত বয়েস আপনার নয় !

আজকালকার ছেলে—অ্যাংগ্রি জেনারেশন ! ওদের মতিগতি সম্পর্কে সুদ বেশ ভাল পরিচয়ই হয়েছিল। তাই ঐ মুহূর্তে তার যে ইচ্ছা হয়েছিল, প্রচণ্ড একটা দেয় ছোকরাকে—সেটা সে আর দিল না। ইচ্ছাটা দমন করেই নিল।

আর কিছু আপনার কথা আছে ? কল্যাণ আবার প্রশ্ন করল।

না।

তাহলে আসুন।

সুদর্শনের মনে হল কে যেন তার দু গালে সশব্দে দুটো চড় বসিয়ে দিল।

সুদর্শন কল্যাণদের বাড়ি থেকে বের হয়ে এল।

জীপটা বেশ কিছু দূরেই পার্ক করা ছিল।

জীপে উঠে বসে সুদর্শন মোহন সিংকে বললে, পাল স্ট্রীটে যেতে শ্যামবাজারে

মোহন সিং নির্দেশমতই জীপ চালাতে লাগল।

কল্যাণের সব কথাবার্তাই যেন কেমন সন্দেহের উদ্রেক করে সুদর্শনের মনের মা

তারপর সুষমা মেয়েটির ওখানে উপস্থিতি।

যতীন চক্রবর্তীর মেয়ে সুষমা। যতীন চক্রবর্তীর বাড়িটা একেবারে পাশেরই সুশান্তদের। দুই বাড়ির মধ্যে কমন ওয়াল। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির অনায়াসেই যাতায়াত করা যায়।

দুই বাড়ির মধ্যে হৃদ্যতা থাকা তো অস্বাভাবিক নয়—এমন কি আত্মীয় কিরীটীর সেদিনকার রাত্রের কথাগুলো যেন আবার নতুন করে মনে পড়ে সুদর্শ আর তাই সুদর্শন ড্রাইভার মোহন সিংকে শ্যামবাজারে পাল স্ট্রীটে যেতে বলেছিল।

রাত পৌনে নটা নাগাদ যতীন চক্রবর্তীর গৃহের সদরে দাঁড়িয়ে কলিং বেলটা সুদর্শন।

একটু পরেই দরজা খুলে দিল একজন ঝি। প্রৌঢ়া।

কে! কাকে চান?

যতীনবাবু আছেন?

বাবু তো এখনো দোকান থেকে আসেননি!

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে ঐ সময় সাড়া এল—কে রে দামিনী?

মেয়েটির গলার স্বরটা যেন কেমন পাতলা, রিনরিনে—যেন কাঁপতে কাঁপতে থেমে
।

সুদর্শন অন্দরের খোলা দরজাটার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

কি রে—সাড়া দিচ্ছিস না কেন? কে ভদ্রলোক? কি নাম? কোথা থেকে
াছে? আবার প্রশ্ন ভেসে এল।

দামিনী এবার সাড়া দিল, বাইরে এসেই দেখ না গো!

কে ভদ্রলোক—বলতে বলতে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হবে একটি তরুণী বাইরের
এসে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু মেয়েটি সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সুদর্শনের দিকে চেয়ে রইল।

সুদর্শন চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।

সুদর্শনও চেয়ে ছিল তখনও মেয়েটির দিকে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেয়েটি।

দেহের গড়নটা সুষমার মত পাতলা নয়, তবে অত্যন্ত সুগঠিত দেহ।

মেয়েটির পরনে একটি দামী তাঁতের শাড়ি।

বগলকাটা ব্লাউজ।

ঘরোয়া ভাব হলেও বেশ যেন ড্রেস করে শাড়িটা পড়েছে মেয়েটি।

মাথার চুল বেণীর আকারে বুকের বাঁ পাশে ঝুলছে।

মেয়েটির গাত্রবর্ণ ঈষৎ চাপা।

চোখ-মুখ মন্দ নয়—তবে দেহের যৌবন যেন উদ্ধত—সুস্পষ্ট।

কে আপনি? কাকে চান? সহজ স্বাভাবিক গলাতেই প্রশ্ন করল মেয়েটি।

সুদর্শনও এতক্ষণে কথা বলল। হাত তুলে নমস্কার করল।

নমস্কার—আপনি বোধ হয় প্রতিভা দেবী?

হ্যাঁ।

কথাটা বলে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল প্রতিভা সুদর্শনের দিকে।

মুহূর্তকাল অতঃপর পরস্পর পরস্পরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল।

আপনাকে তো চিনতে পারলাম না! কোথা থেকে আসছেন? প্রতিভ
করলে সুদর্শনকে।

॥ ১২ ॥

শান্ত গলায় সুদর্শন জবাব দিল, থানা থেকে।

থানা থেকে?

প্রতিভার গলার স্বরের অতর্কিত বিস্ময় ও চমকটা কিন্তু সুদর্শনের শ্রবণেন্দ্রি
এড়িয়ে যায় না।

মেয়েটির গলার স্বরে তখন আব কোন যেন বিস্ময় বা আকস্মিকতা নেই
ধীর। বললে, কেন?

শ্যামপুকুর থানার ও. সি. আমি। সুদর্শন প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কথ
পুনরাবৃত্তি করল।

কিন্তু বাবা তো বাড়িতে নেই!

শুনলাম এইমাত্র। আপনাদের দু বোনের সঙ্গেও আমাব কিছু কথা আছে

আমাদের দু বোনের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কি কথা?

পাশের বাড়ির যে ছেলেটি সেদিন রাত্রে খুন হয়েছে—সেই সুশান্তবাবুকে আপ
তো চিনতেন?

চিনতাম বইকি।

সুদর্শন ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছিল—ঘরটা বোধ হয় বসবারই ঘর বাইরের।
ভাবে সোফা, সেণ্টার টেবিল দিয়ে সাজানো।

সুদর্শন একটা সোফার উপর বসতে বসতে বললে, বসুন না প্রতিভা দেবী।

প্রতিভা বসল। তারপর ঝির দিকে তাকিয়ে বললে, শম্ভুকে একবার দো
পাঠা—বাবাকে একটা খবর দেবে এখুনি আসবার জন্য।

দামিনী ভিতরে চলে গেল।

প্রতিভা আবার সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললে, কি কথা বলুন তো?

প্রতিভা দেবী!

বলুন ?

এ পাড়ার সমরেশ চৌধুরীকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন ?

পরিচয় আছে।

আপনাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে বেশ, তাই না ?

হ্যাঁ—মানে—আমার ছোট বোন সুষমার সঙ্গে তার আলাপ আছে।

আপনার সঙ্গে নেই ?

থাকবে না কেন ? তবে সুষমার সঙ্গেই বেশী আলাপ।

হঠাৎ দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোর প্রতি অঙ্গুলি তুলে সুদর্শন শুধাল, ঐ দেওয়ালে ফটোটা কার ?

ফটোর মধ্যে একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে—হাতে একটা হকি ষ্টিক্—পাশে একটি টেবলের ওপরে দুটো শীল্ড ও চার-পাঁচটি কাপ সাজানো।

প্রতিভা বললে, আমার—

আপনি বেশ উৎসাহী খেলাধুলার ব্যাপারে মনে হচ্ছে!

একসময় হকি খেলতাম—স্কুল-কলেজের অনেক টিমে খেলেছি। অনেক কাপ মেডল শীল্ড পেয়েছি।

মৃদু হেসে প্রতিভা বললে।

খেলতেন বলছেন কেন ? এখন আর—

না, এখন আর খেলি না।

কেন ?

ভাল লাগে না। প্রতিভা বললে।

কবে থেকে ছাড়লেন ?

বাঁ পায়ে একবার চোট লাগবার পর খেলা ছেড়ে দিয়েছি—বছর দুই আগে।

প্রতিভা ইতিমধ্যে কথায়বার্তায় বেশ যেন সহজ হয়ে এসেছিল। তার প্রথম দিকের সেই সচকিত ভাবটা যেন আর অবশিষ্টমাত্রও ছিল না।

আচ্ছা মিস চক্রবর্তী—আপনাদের তো পাশের বাড়ি—সুশান্ত ছেলেটি কেমন ছিল জানেন তো ?

লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলে একটু দাম্ভিক প্রকৃতির ছিল।

পার্টি করে বেড়াত না ?

হ্যাঁ—শুনেছি সেই রকম—কলেজে ছাত্র সংসদের তো সুশান্ত একজন পাণ্ডা ছিল।

আচ্ছা মিস চক্রবর্তী—কল্যাণ দত্তকে চেনেন ?

হঠাৎ যেন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সুদর্শন প্রতিভার দিকে।

কে, কল্যাণ?

প্রশ্নটা করে সুদর্শন প্রতিভার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সুদর্শনের মনে হয়, ঠিক ঐ মুহূর্তে বুঝি প্রতিভা সুদর্শনের ঐ প্রশ্নটার জন্য প্র
ছিল না।

সহজ গলায় 'কে বললে?' কথাটা বললেও, সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না প্র
তাকে সুদর্শনের পরবর্তী প্রশ্নের জন্য যেন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে।

কল্যাণ দত্ত—বেলেঘাটায় সি. আই. টিতে বাড়ি—সুশান্তবাবুদেব সঙ্গে
কলেজে পড়ে—চেনেন না তাঁকে?

না—ঠিক মনে পডছে না তো।

মনে পডছে না?

না—ঠিক—

কল্যাণ দত্তকে মনে পডছে না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলেন?

আপনাদের পবস্পরের মধ্যে বেশ জানাশোনাই আছে।

প্রতিভা চুপ করে থাকে।

তাছাডা—

কি?

আপনার বোন সুষমা দেবীর সঙ্গে যখন বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে কল্যাণবাবুব,
আপনার সে অপরিচিত নয়—

ও হ্যাঁ, এবারে মনে পডেছে,—প্রতিভা বললে।

মনে পড়েছে?

হ্যাঁ—তাকে দেখেছি বোধ হয় দু-একবার—

হুঁ। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

স্কটিশে—ফোর্থ ইয়ার।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন প্রতিভা দেবী, কল্যাণবাবুরা যে পার্টির লোক—আপ
বোনও সেই পার্টির—

তা হবে—

তার মানে আপনি বলতে চান যে ঠিক ব্যাপারটা জানেন না! সুদর্শন বল

সত্যিই আমি কিছু জানি না—সুষি কোন পার্টিতে আছে কিনা।

হঠাৎ এবারে প্রশ্ন করল সুদর্শন—আপনার কোন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ নেই ?

না—আমি কোন পার্টিতে নেই—

ঠিক এ সময় একটা ট্যাক্সি এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল।

প্রতিভা এগিয়ে গিয়ে জানালাপথে উঁকি দিয়ে বলল, বাবা এসে গেছেন।

বলতে বলতেই কতকটা যেন হন্তদন্ত হয়ে যতীন চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।

বয়স সামান্য পঞ্চাশোর্ধ্ব বলেই মনে হয়। বেশ ভারিক্কী নাদুসনুদুস চেহারা।

র সামনের দিকে চকচকে একটি টাক।

রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে।

চোখে সোনার ফ্রেমে সৌখিন চশমা।

খুকী—বলে ঘরে ঢুকেই সুদর্শনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়ালেন যতীন বর্তী।

আসুন যতীনবাবু—আমি থানা থেকে আসছি—

কি ব্যাপার স্যার ?

যতীন চক্রবর্তীর কণ্ঠ থেকে যেন রীতিমত উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল।

পাশের বাড়িতে রসময়বাবুর ছেলেটি খুন হয়েছে কয়েকদিন আগে, জানেন নিশ্চয় ?

হ্যা—কিন্তু আমরা তো তার কিছু জানি না।

জানেন না নিশ্চয়ই—জানলে কি আর কিছু থানায় সেটা জানাতেন না ? সে কথা

তবে ?

আচ্ছা রসময়বাবু আর আপনার বাড়ির কমন দেওয়াল—তাই না!

হ্যা। রসময়ের ঠাকুর্দা আর আমার ঠাকুর্দা একই জমিতে পাশাপাশি বাড়ি ছিলেন।

আত্মীয়তা ছিল বুঝি পরস্পরের সঙ্গে ?

া—মামাত পিসতুত ভাই ছিলেন তাঁরা। অতীতে একসময় একই সঙ্গে এখানে ভাগ্যান্বেষণে আসেন—তারপর একই জমিতে বাড়ি করেন। আর ঐ কমন থাকার দরুনই বাড়িটা বিক্রি করতে পারলাম না—নচেৎ কবে বিক্রি করে থেকে চলে যেতাম।

কছু মনে করবেন না যতীনবাবু, আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে কি তেমন হৃদ্যতা নেই ?

লাকটা মশাই অতিশয় চামার—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ—কেন আলাপ হয়নি আপনার সঙ্গে ?

হয়েছে, তবে আপনার সম্পর্কে কিছু বলেননি।

আমার সম্পর্কে বলবার কিছু থাকলে তো বলবে !

আপনাদের বোধ হয় একের অন্যের বাড়িতে যাতায়াতও নেই ?

পারতপক্ষে ওর মুখের দিকেই আমি তাকাই না।

উনি ?

ওর কথা জানি না। জানবার কোন প্রয়োজনও মনে করি না।

ঐ সময় সুদর্শন একবার আড়চোখে অদূরে দণ্ডায়মান প্রতিভার মুখের দিকে তাক

যতীন চক্রবর্তীর আক্রোশটা রসময়ের উপরে তার পরবর্তী কথায় যেন আরও হয়ে ওঠে। বললেন, ওর ছেলেটার যে অমন অপঘাতেই মৃত্যু হবে একদিন জানতাম স্যার—বুঝলেন না !

জানতেন ? প্রশ্নটা করে সুদর্শন তাকাল যতীন চক্রবর্তীর দিকে।

জানতাম না ? নিশ্চয়ই জানতাম—

প্রতিভা ঐ সময় বলে ওঠে, বাবা—থাক না, পরের কথায়—

তুই থাম্ তো। মেয়েকে থামিয়ে দিলেন যতীন চক্রবর্তী। প্রতিভা চুপ গেল।

যতীন চক্রবর্তী বললেন, অথচ কি জানেন মশায়, ছেলেটা লেখাপড়ায় ভা ছিল। কিন্তু হলে কি হবে—যত সব উগ্রপন্থী দলের সঙ্গে মিশে যা কাণ্ডকারখ শুরু করেছিল—

কি রকম ? সুদর্শন প্রশ্ন করল।

কেন—আজকাল প্রত্যহ কি ঘটছে দেখছেন না। দেওয়ালে দেওয়ালে ? তাই লিখছে—বাস পোড়াচ্ছে—স্কুল তছনছ করছে—খুনোখুনি রক্তারক্তি নিত্য রয়েছে—

আপনি তাহলে জানতেন সুশান্তও ঐ দলে ছিল ?

নিশ্চয়ই—মুখ-দেখাদেখি ও কথাবার্তা না থাকলে কি হবে সবই তো জানি আ

হঠাৎ সুদর্শন উঠে দাঁড়াল। বললে, আচ্ছা যতীনবাবু চলি—

কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন তা তো বললেন না ?

আপনার মেয়ের মুখেই সব শুনেছি—

শুনেছেন ? কি শুনেছেন ওর মুখে ?

যা আমার জানবার ছিল। আচ্ছা, নমস্কার—

সুদর্শন বের হয়ে গেল।

এবং বেরিয়ে যেতেই ওর কানে এল বাপ ও মেয়ের শেষ কথাগুলো।

তুই আবার কি বললি রে প্রতি ?

কি আবার বলব !

আগড়ুম-বাগড়ুম কিছু বলিসনি তো ?

থাম তো তুমি—

সুদর্শন আর দাঁড়াল না।

জীপে উঠে সুদর্শন মোহন সিংকে বললে বালীগঞ্জ গড়িয়াহাটা যেতে—

মোহন সিং নির্দেশমত গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল সুদর্শন—রাত দশটা।

একবার মনে হল সুদর্শনের এই সময় কিরীটীর ওখানে গিয়ে তাকে বিরক্ত করাটা কি হবে, না বরং যা বলবার টেলিফোনেই বলবে ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এসব লোচনা ফোনে না করাই ভাল। আজকাল যে ফোনের অবস্থা হয়েছে !

এক নম্বর ডায়েল করলে অন্য জায়গায় রিং তো হামেশাই হয়—তার উপর ক্রস-নকশন।

তাছাড়া গ্রীষ্মকাল—রাত দশটা এমন কি !

যদিও কলকাতা শহরে তখন যত্রতত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্ট্রাইক, লক আউট, স্কুল কলেজ নচ করা, পরীক্ষা ভণ্ডুল করা ও সেই সঙ্গে নির্মম ভাবে যত্রতত্র খুনোখুনি চলেছে। লে বাড়ি থেকে যে বের হয়, আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না সে র ফিরবে কি না—তবু কলকাতা শহরের জীবনযাত্রা কাজকর্ম যেমনই চলে তেমনিই ছে। সত্যিই বিচিত্র এই শহর এক কলকাতা। এখানে একপাশে চলেছে কেনা—একপাশে বক্তৃতা—কিংবা রাজ্য জুড়ে প্রশেসন—অন্য পাশে চলেছে রাতের কারে তো বটেই দিন-দুপুরেও হানাহানি খুনোখুনি, রেস্তোরাঁয় ক্যাবারেতে মদ্যপান ও অর্কেস্ট্রার সঙ্গে নৃত্যগীতের হুল্লোড়। একবার মনে হয় এখানকার মানুষরা বুঝি তোভয়, বেপরোয়া—আর একবার মনে হয় এ সব কিছু যেন এদের পাথর করে ছে।

সত্যিই দেখা গেল ঐ সময় রাস্তায় তখনও যানবাহন ও লোক চলাচল যথেষ্টই ছে।

জনগণ তাদের পুলিসকেও দোষ কম দিচ্ছে না। তারা ভালমত ডিউটি করছে না কলে ঠিক সময় তাদের পাওয়া যায় না—

কথাগুলো মনে মনে ভাবতে ভাবতে সুদর্শন আপন মনেই হাসে।

তাদের পুলিসেরও তো কম লোক কয়েক মাসের মধ্যে উগ্রপন্থীদের হাতে প্র
দেয়নি!

এই তো মাত্র কিছুদিন আগে তাদের একজন অত্যুৎসাহী কর্মঠ থানার তরুণ অফিস
াকে মর্মান্তিক ভাবেই না উগ্রপন্থীদের বোমার আঘাতে ঘটনাস্থল তদন্ত করতে গি
প্রাণ দিল।

সাবিত্রীর সর্বদা ভয়।

বলে, তুমি ওদের বেশী ঘাঁটিও না। আমার বড় ভয় করে—

তাই বলে কর্তব্য করব না! সুদর্শন বলেছিল জবাবে।

তারপরই সাবিত্রী বিচিত্র একটা প্রশ্ন করেছিল, আজকালকার ছেলেগুলো অমন হ
উঠেছে কেন বল তো?

ওদের কি ধারণা জান সাবিত্রী?

কি?

ওদেব কথা কেউ শুনছে না, ভাবছে না।

সে আবার কি?

তাছাড়া ওরা আজ অবিশ্যি সবাই নয়, কিছু কিছু, দেশের সব কিছুর সংস্কার
নিজের হাতে তুলে নিতে চায়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ—নতুন করে সব গড়তে চায় ওরা, সব নাকি পুরনো পচা সেকেলে হয়ে গিয়ে
—অন্য দেশের বিপ্লবকে নিজেদের দেশে এনে সব কিছুর সংস্কার করতে চায় ওরা—অ
মজা হচ্ছে ওরা বোঝে না—বোঝবার চেষ্টাও করে না—এক দেশের পদ্ধতিকে—যা
সমাজব্যবস্থা কৃষ্টি শাসনব্যবস্থা সব আলাদা সেটা জোর করে অন্য দেশের ঘাড়ে চা
দেবার চেষ্টা করলে একটা বিশৃঙ্খলতারই সৃষ্টি হয়—কাজের কাজ কিছু হয় না।

তবে কি হবে।

অতশত বুঝি না সাবিত্রী। পথ আমিও জানি না। তবে এটা বুঝি, এদে
সংস্কার সাধন করতে হলে এ দেশেরই সব কিছুর ভেতর থেকে সেই সংস্কারের বল মু
বল পথটি খুঁজে বের করতে হবে।

সুদর্শনের চমক ভাঙল।

কিরীটীর বাড়ির সামনে এসে জীপ দাঁড়িয়েছে।

॥ ১৩ ॥

াপ থেকে নেমে কলিং বেল বাজাতেই জংলী এসে সদর খুলে দিল।

দাদা আছেন?

হ্যা—ওপরে—দেড়তলার ঘরে। জংলী বললে।

সুদর্শন সোজা সিঁড়ি বেয়ে দেড়তলার মেজনিন ফ্লোরের ঘরে গিয়ে ঢুকল কাচের জা ঠেলে।

ঘরে ঢুকতেই একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা যেন চোখেমুখে একটা আরামের পরশ লয়ে দেয়।

কিরীটী আর কৃষ্ণা দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করছিল।

আরে সুদর্শন যে, কি খবর—এস এস!

অসময়ে বোধ হয় বিরক্ত করতে এলাম দাদা!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এসে যখন পড়েছই কি আর হবে! বস, কি খবর বল?

সুদর্শন একটা খালি সোফায় উপবেশন করল।

উ:, কি গরম পড়েছে! সুদর্শন বললে।

হ্যা, প্রচণ্ড তাপ চলেছে কটা দিন। তারপর তোমার সুশান্ত হত্যাপর্বের কিছু নতুন সংগ্রহ করলে?

আজ কল্যাণ দত্ত, আর রসময়বাবুর পাশের বাড়ি যতীন চক্রবর্তীর ওখানে গিয়েম। সুদর্শন বললে।

প্রতিভা আর সুষমার সঙ্গে দেখা হল? কিরীটি শুধায়।

হয়েছে। শুধু তাদের সঙ্গেই নয়—কল্যাণ দত্ত ও যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গেও াপ হল। বলে ঐদিনকার সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত ঘটনা সুদর্শন আনুপূর্বিক বিবৃত গেল।

কিরীটি পাইপটা মুখে দিয়ে সব শুনে গেল।

সুদর্শন প্রশ্ন করে, কিছু বলছেন না যে দাদা?

একটা কথা ভাবছি সুদর্শন,—কিরীটি বললে।

কি?

রসময়বাবুর আর যতীন চক্রবর্তীর বিদ্বেষের কারণটা কি?

বিদ্বেষ!

কেন তাঁর কথাব ভাবে বুঝতে পারনি—যে কারণেই হোক দুজনের মধ্যে প্রী
সম্পর্কটা অন্তত নেই।

সেটা অবিশ্যি বুঝেছি। সে তো অনেক কারণেই হতে পাবে—

তা পাবে। তবে দুজনের মধ্যে কিছু আত্মীয়তাও তো আছে—

সে আর এমন কি—বিশেষ কবে আজকালকার দিনে।

তা বলতে পাব।

দাদা—

বল?

আমার কি মনে হয় জানেন দাদা?

কি মনে হয় ভায়া?

ঐ কল্যাণ আব সুষমা অনেক কিছুই জানে।

হুঁ। বহ্নিপতঙ্গ। মৃদু কণ্ঠে কিবীটি বললে।

কাব কথা বলছেন?

শ্রীমতী সুষমা হচ্ছে বহ্নি, আব পতঙ্গ—পতঙ্গ তো বহ্নিব চারপাশে থাকবেই—
আর বিচিত্র কি, কিন্তু আমি আবো একটা কথা ভাবছি—

কি দাদা? প্রশ্নটা করে সুদর্শন কিরীটীব মুখের দিকে তাকাল।

ঐ তোমাব সুষমাব গৃহে কার কার বেশী যাতায়াত ছিল। ভাল কথা—রজত
আর প্রসাদ মল্লিকের ঠিকানা দুটো কল্যাণবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছ তো?

না—হঠাৎ এমন তিরিক্ষে হয়ে উঠলো—

কৃষ্ণা ঐ সময় বললে, বেশ কবেছ সুদর্শন—ওদেব বেশী না ঘাঁটানোই
আজকালকার ছেলে—

যা বলেছেন বৌদি—যেন একপ্রকাব গলাধাক্কা দিয়েই বেব কবে দিল।

কিবীটী মৃদু মৃদু হাসে।

কৃষ্ণা বললে, তুমি হাসছো। আজকালকাব কিছু ছেলে এমন হয়ে উঠেছে—

কেবল ওদেরই দোষ দিলে হবে কেন কৃষ্ণা? দোষ আমাদেরও আছে। ওদের
অসহিষ্ণুতা—উচ্ছৃঙ্খলতা—অস্থিরতা—উগ্র মেজাজের কারণটা কি আমরাই কেউ খুঁ
দেখবাব চেষ্টা কবি বা সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি? কেবল ওদেব
দিয়েই চলেছি—কেবল বলছি ওরা ঠিক করছে না—ভুল পথে চলেছে। সত্যি
ঠিক পথে যাচ্ছে না বা কেন ভুল পথে চলেছে, সেটা কি আমরাই ঠিক জানি। না
—ব্যাপারটা অত সহজ ভাবে নিলে হবে না—

কৃষ্ণা বলল, সে তুমি যাই বল—উচ্ছৃঙ্খলতা চিরদিনই উচ্ছৃঙ্খলতা।

কিন্তু ওরা যদি বলে—এটা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়—

সে তো ওরা বলছেই—কৃষ্ণা বললে।

কিন্তু এটা তো তুমি মানবে কৃষ্ণা, কয়েক বছর আগেও এমন ছিল না।

ছিলই তো না।

কিন্তু কেন—যা ছিল না তা আজই বা হল কেন?

নিশ্চয়ই আজকের সমাজব্যবস্থা—শিক্ষাপদ্ধতি—প্রশাসন নীতির মধ্যে কোন গলদ দেখা দিয়েছে, যার জন্য ওদের প্রতিবাদ এমন সোচ্চার হয়ে উঠেছে—

থাম তো তুমি! কৃষ্ণা বললে।

আমি থামলেও ওদের তুমি থামাতে পারবে না কৃষ্ণা।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

তারপর একটু থেমে কিরীটী আবার বললে, থাক, ও প্রসঙ্গ থাক। ভাল কথা সুদর্শন, ইতিমধ্যে আমি তোমার প্রমীলা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

তাই নাকি!

হ্যা।

নতুন কিছু জানতে পারলেন?

কিরীটি বললে, সে সময় তেমন কিছু জানতে না পারলেও গতকাল সন্ধ্যায় আবার বাবুর ওখানে গিয়ে মিতার সঙ্গে কথা বলে ও আজ তোমার সব কথা শুনে একটা যেন মনে হচ্ছে।

কি দাদা? সাগ্রহে প্রশ্নটা করে সুদর্শন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী জবাবে বললে, সুশান্তর হত্যার ব্যাপারটা হঠাৎ বা আকস্মিক কারও আক্রোশ ক্রোধের বশে সংঘটিত হয়নি। ব্যাপারটার পিছনে একটা কাযকারণ ছিল—বা তার পটভূমিকা ছিল সুশান্তর হত্যাকাহিনীর—তবে সেটা কতদিনের তা এখনও পারছি না, শুধু তাই নয়—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো, ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে ছিল sexual hunger বা বলতে পার অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার একটা আক্রোশ বা ঘৃণা। কোন নরনারীর ঐ বিশেষ রিপুটি যখন দিনের পর দিন ভিতরে অবদমিত হতে থাকে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে যে কি ভয়ংকর পরিণতি আনতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ—সুশান্তর মৃত্যু।

আপনি কার কথা বলছেন দাদা?

আমি বলছি হত্যাকারীর কথা। শান্ত গলায় কিরীটী প্রত্যুত্তর দিল।

হত্যাকারী ?

হ্যাঁ।

আপনি তাহলে ধরতে পেরেছেন দাদা হত্যাকারী কে ?

একটু আগেই তো তোমায় বললাম অনুমান করেছি মাত্র। ধোঁয়াটে ঝাপসা দৃষ্টি যেটুকু আপাততঃ চোখে পড়ছে সেটুকুই তোমাকে বললাম।

কে দাদা ? কাকে ওদের মধ্যে আপনি সন্দেহ করছেন ? সুদর্শনের গলায় এ আগ্রহের স্বর যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তুমি পুলিসের একজন অফিসার—সরকারের প্রতিনিধি—তোমাদের চাই প্রমাণ যার দ্বারা তোমরা অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারবে—তাকে আদালতের কাঠগ টেনে নিয়ে যেতে পারবে। সেই প্রমাণ এখনো যথোপযুক্ত পাইনি—তাছাড়া পরেও কিছু আছে—

কি ?

মোটিভ—উদ্দেশ্য—সেটাও প্রমাণসাপেক্ষ—

সুদর্শন বুঝতে পারে কিরীটী যতটুকু বলেছে তার বেশী এখন মুখ খুলবে না কিরীটীকে সে যথেষ্ট চিনেছিল।

কিরীটি মৃদু হাসে।

আপনি হাসছেন দাদা ? আমি যে কি অবস্থায় আছি—

কেন মার্ডার কেস জটিল হলেই তো অনুসন্ধান করে আনন্দ—

আনন্দ !

নয় ?

তা বটে। এমন আনন্দ যে রাতে চোখে ঘুম নেই—

কেন, তোমার কর্তারা কিছু বলেছেন ?

তাদের তো ভারী মাথাব্যথা—রোজ যেখানে আটটা-দশটা খুন হচ্ছে সেখানে এক সুশান্ত রায় খুন হল সেটা তাদের কাছে কোন একটা সংবাদই নয়—কোন ফ হল তো হল নচেৎ ঐ ডায়েরীর পাতাতেই কতকগুলো কালির আঁচড়ে ইতি হয়ে

কৃষ্ণা বললে, তা তুমিও হাত গুটিয়ে নাও না ভাই—

সে তো ও পারবে না কৃষ্ণা, কিরীটী বললে, ওর এখন নেশা ধরে গিয়েছে—ত এমন নেশা যে একটা সমাধানে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওকে টেনে নিয়ে যাবেই—

যাক দাদা—ওসব কথা থাক—এখন আমাকে একটা পরামর্শ দিন। সুদর্শন ব

কিসের পরামর্শ ?

এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি—যে অতঃপর কোন্ পথে এগুব বুঝতে পারছি না।

কল্যাণের ব্যাপারটায় হাত গুটিয়ে বসে থেকো না।

কল্যাণ!

হ্যা—আর সমরেশ-না কি ছেলেটির নাম—তারও একটু খোঁজখবর কর—

আর কেউ?

হ্যা—প্রতিভা আর সুষমা—

করীটী একটু থেমে হাতের নিবন্ত চুরোটটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে বার-দুই দিয়ে বলতে লাগল, হত্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার সময় সর্বদা কয়েকটি কথা াব দাদার মনে রেখো সুদর্শন। আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বলে, কোন টি হত্যা-ব্যাপার যেখানে সংঘটিত হয়—তার আশেপাশের সকলকেই সন্দেহের ে দেখতে হয়।

সকলকে বলতে আমি বলছি হত্যার আগে বা পরে অকুস্থানের আশেপাশে যারা -যাওয়া করেছে বা করতে পাবে বা করা সম্ভব যাদের পক্ষে এমন কি তাদেরও।

সুদর্শন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিরীটীর কথাগুলো শুনতে থাকে।

কিরীটী বলে চলে, আপাতদৃষ্টিতে অতি নির্দোষ বা নিরীহ ব্যক্তিও যেন তোমার কি না এড়ায়; তারপর আমি বহুক্ষেত্রে দেখেছি premeditated বা পূর্ব-পরিকল্পিত যেখানেই ঘটেছে সেখানে হত্যাকারীর মনের মধ্যে সহজেই একটা আত্মম্ভরিতা অজ্ঞাতেই দেখা দেয়—যার ফলে হত্যার পরে হত্যাকারী একবার না একবার ানে আসেই।

অনেক সময় তার শমনই যেন তাকে তার অজ্ঞাতেই সেখানে ঠেলে নিয়ে আসে। সে যেন দৃষ্টিকানা হয়ে যায়। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সেখানে সে এসে পা ফেলে।

কাজেই তোমার ফাঁদ অকুস্থানে সর্বদাই পেতে রাখতে হবে, যাতে করে তোমার ফাঁদে সে এসে পা দেয়—কোন-না-কোন সময়ে।

দু-একটি হত্যাব্যাপার ছাড়া বেশীর ভাগ হত্যাই জেনো হত্যাকারীকে হত্যার কাণ্ডটি করবার পর অল্পবিস্তর নার্ভাস করে দেয়। হত্যাকারীর সেই দুর্বলতাটুকু তোমার নয় বুঝে নিতে যেন না কষ্ট হয়। এগুলো হচ্ছে মোটা দিক—সূক্ষ্ম দিক হচ্ছে—কোন্ সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং সে-সময় সেখানে কারা উপস্থিত ছিল দের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব। এবং তাদের মধ্যে হত্যাকারীর সঙ্গে কার কার ছিল—

আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝেছি দাদা। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না—

অনেক রাত হল। এবারে আমি উঠি। কিন্তু দাদা, আর একটা কথা—

বল ?

আমার ঘাড়ে সব দাযিত্ব চাপিয়ে দিয়ে আপনি বসে থাকবেন না কিন্তু—

না হে না—রসময়বাবুকে আমি কথা দিয়েছি ভুলে যেও না। তাছাড়া মিতা আ ওপরে অনেকখানি ভরসা করে বসে আছে। মেয়েটা সত্যিই তার দাদাকে ভালবাসত। হ্যাঁ, ভাল কথা—সুশান্তর বন্ধু শ্যামল ঘোষালের একটা খোঁজ ক তো—৩/১, বেনেপুকুরে থাকে।

বৌদি চলি। খোঁজ নেব শ্যামলের—কিরীটীর দিকে ফিরে কথাটা শেষ ক সুদর্শন।

এস ভাই।

সুদর্শন বাইরে এসে নীচে অপেক্ষমান জীপে উঠে বসল, মোহন সিং থানায় চল

মোহন সিং জীপে স্টার্ট দিল।

॥ ১৪ ॥

বেলা ন'টা নাগাদ পরের দিন সুদর্শন জীপ নিয়ে বেরুল—উদ্দেশ্য বেনেপুকুরে শ ঘোষালের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যই।

শ্যামলের বাবা একটা বেসরকারী মার্চেন্ট অফিসে মোটা মাইনেরই চাকরি ক শ্যামল বাড়িতেই ছিল।

সুদর্শন গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে শ্যামলই এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই ?

শ্যামলবাবু বাড়িতে আছেন ?

আমিই শ্যামল। কি দরকার বলুন ? কোথা থেকে আসছেন ?

আমি শ্যামপুকুর থানা থেকে আসছি—

থানা থেকে !

হ্যাঁ—চলুন ভেতরে, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

শ্যামল যেন কেমন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে প্রথমটায়, তারপর বললে, আ

সুদর্শন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরটি ড্রয়িংরুম বলেই মনে হয়। বেশ প্রশস্ত এবং সোফা চেয়ার দিয়ে সুন্দর

লা।

ন। শ্যামল বললে।

পনিও বসুন শ্যামলবাবু। সুদর্শন বললে।

জনে দুটো মুখোমুখি সোফায় বসল।

মার কাছে কি দরকার বলুন তো? শ্যামল আবার প্রশ্ন করল।

দর্শন শ্যামলের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

মল ঘোষালের বয়স বছর বাইশ-তেইশের বেশী হবে না। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। ব্যায়াম করা অভ্যাস আছে শ্যামলের। পরনে একটা পায়জামা—তার উপরে রঙের একটা পাঞ্জাবি। পায়ে ববাবের চপ্পল। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ও। অর্ধেক গাল পর্যন্ত মোটা জুলপি। গোঁফ সরু করে কামানো।

লো দেহের বর্ণ হলেও সারা দেহে বেশ একটা পুরুষোচিত সৌন্দর্য আছে। দুটি চোখ।

মলবাবু—আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিছুদিন আগে আপনাদের এক সহপাঠী য় অদৃশ্য এক আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন?

ন।

ই কলেজে আপনারা পড়তেন?

—একই সঙ্গে পড়তাম।

কিছুদিন এক পাড়াতেও ছিলেন, তাই না?

। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

আপনার বন্ধু ছিল—

শাই।

পনাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না?

আর কিছু জানতে চান?

লা দত্তকে চেনেন?

লা!

—ঐ পাড়াতেই তো সে ছিল—আপনাদের কলেজের অধ্যাপক ডঃ কে. ডি-র চেনেন না তাকে?

টুকু চেনেন?

টুকু আর—এক পাড়ায় একসময় থাকতাম—তাই যা পরিচয়—

তার বেশী কিছু নয় ?

না।

আপনার সঙ্গে কখনও কোন ঘনিষ্ঠতা প্রমীলার গড়ে ওঠেনি ?

না।

শুধু মাত্র আলাপ ?

তাই।

হুঁ। আচ্ছা প্রমীলা বা সুশান্তবাবু পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসত কিনা বলতে পারেন ?

ঠিক জানি না—তবে শুনেছি—

কি শুনেছেন ?

ওদের মধ্যে বোধ হয় ভালবাসাবাসি ছিল।

মানে, ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসত ?

বোধ হয়—

ঠিক জানেন না কিছু ?

না মশাই—অন্যের অ্যাফেয়ারে আমি কখনও মাথা গলাই না।

হুঁ। আচ্ছা শ্যামলবাবু—পাল স্ট্রীটের সমরেশ চৌধুরীকে জানেন ?

জানি। সুশান্তদের সামনের বাড়িতেই তো থাকে, বিনয় চৌধুরির ছেলে।

হ্যাঁ। সে কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন ?

কোথায় আবার যাবে ? আমি তো জানি এবারে সে তার বাবা-মার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যায়নি—

না—যায়নি বটে—তবে সে কলকাতায় নেই।

নেই ?

না। আমরা জানতে পেরেছি সুশান্তবাবু যে রাত্রে খুন হন তার পরদিনই কলকাতা ছেড়ে কোথায় যেন গিয়েছেন।

কোথায় ? শ্যামল ঘোষাল সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল।

আপনি জানেন না ? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল।

না মশাই।

তার সঙ্গে তো আপনার বন্ধুত্ব আছে !

হ্যাঁ—তা আছে—

শেষ তার সঙ্গে কবে আপনার দেখা হয়েছিল ?

তা তো ঠিক বলতে পারছি না—তবে সুশান্ত যেদিন মারা যায় তার পরদিন বিকেলে -ই এসে আমাকে খবরটা দেয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি বলেছিলেন সমরেশবাবু?

এসে বললে, শুনেছিস—সুশান্ত খুন হয়েছে—

তার আগে সংবাদটা আপনি জানতেন না?

না।

আচ্ছা সমরেশবাবুর সুশান্তবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল না?

একেকালে তো খুব গভীর বন্ধুত্বই ছিল জানি—তারপর ইদানীং জানি না কেন ছিলাম মুখ দেখাদেখিও নাকি বন্ধ।

আচ্ছা শ্যামলবাবু, আপনার সঙ্গে সুশান্তবাবুর কখনও কোন ব্যাপার নিয়ে মালিন্য হয়েছে?

না।

আমি কিন্তু শুনেছি—

কি শুনেছেন?

ওদের দুজনায় মারামারি হয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়।

বলতে পারব না—

পারবেন না— না বলবেন না বা বলতে চান না বলুন!

শ্যামল কোন জবাব দেয় না সুদর্শনের কথায়। চুপ করে থাকে।

শ্যামলবাবু!

বলুন?

সুশান্তবাবু যে রাত্রে মারা যান—মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার সেটা ছিল শনিবার?

হ্যাঁ।

তার আগের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ শুক্রবার সুশান্তবাবু কল্যাণবাবুদের সি. আই-টির ডতে যখন যান তখন তো আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

তা ছিলাম।

পরের দিন যখন কলেজে গোলমাল হয় তখন আপনি কলেজে উপস্থিত ছিলেন না?

ছিলাম।

কল্যাণবাবু সুশান্তবাবুর হাতে নক আউট খেয়ে তাকে শাসিয়েছিলেন না?

হ্যাঁ।

এবারে বলুন তো শ্যামলবাবু, সে রাত্রে সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটা—দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন ?

কেন, বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলাম—

শ্যামল ঘোষালের সঙ্গে যখন সুদর্শন কথা বলছিল, ঠিক সেই সময় আমহার্স্ট স্ট্রীটে দিব্যেন্দুর বাড়িতে তাদের বাইরের ঘরে দিব্যেন্দুর দাদা অমলেন্দুর সামনে কিরীটী দিব্যেন্দুকে প্রশ্ন করছিল।

প্রমীলার মুখেই শুনেছিল কিরীটী, দিব্যেন্দু তাদের ঐ পাড়াতেই থাকে এবং সুশান্তর সহপাঠী। আরও শুনেছিল কিরীটী প্রমীলার মুখে, কল্যাণদের বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় যে ব্যাপারটা ঘটেছিল ডঃ কে. ডি.র ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সুশান্ত ও অন্যান্য সংঘের মেম্বারদের মধ্যে তখুনি সে স্থির করে দিব্যেন্দু ও শ্যামলের সঙ্গে দেখা করবে।

এবং সেই কারণেই শ্যামলের খোঁজ নিতে সুদর্শনকে সে গত রাত্রে বলেছিল।

এককালে সুব্রতরা আমহার্স্ট স্ট্রীটে যে বাড়িতে ছিল তার পাশের বাড়িতেই থাকত অমলেন্দু পালিত—সেই সময়ই কিরীটীদের সঙ্গে অমলেন্দুর আলাপ হয়েছিল।

অমলেন্দু তখন ইউনিভার্সিটিতে এম. এ পড়ে।

পরে বি. এল. পাস করে ওকালতি শুরু করে।

ঠিকানানুযায়ী দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে এসে অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা হলো কিরীটীর।

কিরীটীবাবু আপনি—আসুন, আসুন—অমলেন্দু সাদর আহ্বান জানান।

বেঁটেখাটো মানুষটি।

বিবাহাদি করেননি—আমুদে ও রহস্যপ্রিয়।

উঃ, কতকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা! অবিশ্যি দেখা না হলেও আপনার সংবাদই পাই।

কিরীটী তখন যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। দিব্যেন্দু যে অমলেন্দুরই কেউ বুঝতে পেরে বোধ হয় কিরীটী অতঃপর কি ভাবে কথাটা উত্থাপন করবে বুঝতে পারছে না।

তারপর কি সংবাদ বলুন ? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে অমলেন্দু পালিত।

আচ্ছা, এই বাড়িতে দিব্যেন্দু বলে—

আরে সে তো আমারই সবার ছোট ভাই। বলেই হঠাৎ অমলেন্দু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান।

বলেন, কি ব্যাপার বলুন তো কিরীটীবাবু? তাকে আপনি চিনলেন কি করে?

চিনি না—তাছাড়া ব্যাপারও এমন বিশেষ কিছু না। তার কাছে কয়েকটা কথা জানতে চাই—

কি ব্যাপার?

কিরীটী রায় এসেছে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে—অমলেন্দুর মনের মধ্যে সন্দেহ ঘন মেঘ সৃষ্টি করেছে।

আছেন নাকি বাড়িতে তিনি?

আছে।

একবার ডাকুন না?

ডাকব তো নিশ্চয়ই—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হচ্ছেন অমলেন্দুবাবু। ব্যাপারটা এমন কিছুই না।

তবু—

ওদের এক সহপাঠী বন্ধু সুশান্ত কিছুদিন আগে—

জানি, খুন হয়েছে।

তারই সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই দিব্যেন্দুবাবুকে। শুনেছি ওঁদের নাকি পরস্পরের জানাশোনা ছিল, একই কলেজে পড়তেন।

অমলেন্দু তখুনি দিব্যেন্দুকে ডেকে পাঠালেন, একটু পরে দিব্যেন্দু ঘরে এসে ঢুকল।

রোগা পাতলা চেহারা। একমাথা চুল—লম্বা জুলপি, পরনে ড্রেনপাইপ প্যান্ট ও আমেরিকান বুশসার্ট—বর্তমানে বেশীর ভাগ তরুণদের যা পোশাক।

দিবু—ইনি আমার পরিচিত—নাম শুনে থাকবে এঁর—কিরীটী রায়—

সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দু দাদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিরীটীর দিকে তাকাল।

নামটা আদৌ তার অপরিচিত নয়, বিশেষভাবেই পরিচিত।

এবং মাত্র গতকালই ঐ নামটা সে আবার শুনেছে প্রমীলার মুখে। প্রমীলাদের বাড়িতে দুদিন এসেছিলেন উনি সুশান্তর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করতে।

অমলেন্দু বললেন, উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। যা জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন ওকে কিরীটীবাবু। কোন কথা গোপন করো না দিবু। যা জান সবই বলবে—কথাগুলো বলে কিরীটীর দিকে ফিরে তাকাল।

বসুন দিব্যেন্দুবাবু—কিরীটী বললে।

দিব্যেন্দু কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এমন বিশেষ কিছু না দিব্যেন্দুবাবু—সুশান্তবাবু তো আপনাদেরই সহপাঠী ছিলেন—আপনার পরিচিত—তাঁরই সম্পর্কে কয়েকটা কথা।

এক কলেজে পড়তাম—সহপাঠী সে ঠিকই আমার ছিল, তবে তার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমার কোনদিনই, মৌখিক পরিচয় ছাড়া।

ছিল না?

না।

আচ্ছা, সুশান্তর কল্যাণবাবু সমরেশবাবু ও শ্যামলবাবুর সঙ্গে কেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল? ওরাও তো সবাই আপনার সহপাঠী?

সমরেশ আর শ্যামলের সঙ্গে সুশান্তর বেশ ভাবই এককালে ছিল যতদূর জানি, কারণ ওরা এক পাড়াতেই থাকত।

এককালে ছিল বলছেন কেন?

ইদানীং বোধ হয় তেমন মাখামাখি ছিল না ওদের পরস্পরের মধ্যে।

আপনি ঐ পাড়ায় যেতেন না?

তা মাঝে মাঝে যেতাম—

কোথায়?

সমরেশের ওখানে।

প্রতিভা ও সুষমা চক্রবর্তীকে আপনি চেনেন না? ঐ পাড়াতেই তো তারা থাকে?

চিনি। সুষমা সমরেশের বন্ধু—সেই সূত্রেই ওদের দুই বোনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একদিন—

আচ্ছা বলতে পারেন, শ্যামলবাবু ওপাড়া ছাড়ার পর ওপাড়ায় যান কিনা?

যাবে না কেন—প্রতিভাদের বাসায় তো প্রায়ই যায় জানি।

প্রতিভার সঙ্গে বুঝি শ্যামলবাবুর যথেষ্ট পরিচয় আছে?

দিব্যেন্দু মৃদু হাসল প্রত্যুত্তরে।

আচ্ছা দিব্যেন্দুবাবু, দুর্ঘটনার দিন রাত্রে—মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার, সেটা একটা শনিবার ছিল?

হ্যাঁ।

তার আগের সন্ধ্যায়—অর্থাৎ শুক্রবার রাত্রে আপনি তো সুশান্তবাবুর সঙ্গে কল্যাণবাবুদের সি. আই. টি-র বাড়িতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। বাসে দেখা হয়েছিল—তারপর একসঙ্গে যাই কল্যাণদেব বাড়িতে।

সেখানে আপনার সমরেশবাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল। সে তখন সেখানেই ছিল।

শ্যামলবাবুও তো সেখানে ছিলেন?

ছিল।

সে রাত্রের পর, মানে ঐ কল্যাণবাবুদের বাড়িতে দেখা হবার পর শ্যামলবাবু আর মরেশবাবুর সঙ্গে আপনার কবে প্রথম দেখা হয়?

কেন, পরের দিন কলেজেই তো দেখা হয়েছে—

তারপর?

তারপর—হ্যাঁ, শনিবার রাত্রেও তো দেখা হয়েছে রক্সিতে, ওরা নাইট শো দেখতে গেছিল।

ওরা মানে—কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?

প্রতিভা আর শ্যামলের সঙ্গে।

সমরেশের সঙ্গে?

না—তারপর আর দেখা হয়নি।

স রাত্রে আপনিও বুঝি নাইট শোতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

প্রতিভা দেবীদের বাড়িতে আপনি যাননি কখনও?

কয়েকবার গিয়েছি।

শেষ কবে গেছেন?

প্রশান্তর মরার খবর পাবার পরদিন।

কখন? সকালে না বিকেলে?

সন্ধ্যায়।

সমরেশবাবুর সঙ্গে সে-সময় দেখা হয়নি?

হয়েছিল।

যতীনবাবুর বাসাতেই বোধ হয়?

না—পথে।

পথে দেখা হয়েছিল। দিব্যেন্দু বললে।

পথে মানে?

মানে যখন প্রতিভাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে বড রাস্তায় আসছি—বড রাস্তার পান-সিগারেটের দোকানটা আছে তার সামনে। সমরেশ বোধ হয় সিগারেট কিনছিল

কোন কথাবার্তা হয়নি আপনার সঙ্গে তার? মানে সুশান্তর মৃত্যু সম্পর্কে?

না।

তবে কি কথাবার্তা হয়েছিল?

ও এমনি আমাদের পার্টি সম্পর্কে।

হঠাৎ অতঃপর কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি সেদিন প্রতিভাদের ওখানে গিয়েছিলে কেন? সুশান্তর মৃত্যু সম্পর্কে জানতেই বোধ হয় ভাল করে?

হ্যাঁ।

তা আপনার বন্ধু সমরেশবাবু তো সামনের বাড়িতেই ছিলেন, তাঁর কাছে না গি প্রতিভাদের ওখানে গেলেন কেন? একেবারে পাশের বাড়ি বলেই, তাই না?

দিব্যেন্দু, মনে হল কিরীটীর, ঐ প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছে। কোন জবা দেয় না। কিরীটী দিব্যেন্দুকে চিন্তার অবকাশ না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল।

দিব্যেন্দুবাবু, আপনি নিশ্চয়ই প্রতিভাদের বাড়ির ছাতে গিয়েছেন?

ছাতে!

হ্যাঁ—যাননি কখনও?

না।

আচ্ছা, এবারে বলুন তো, সুশান্তর সঙ্গে প্রতিভা আর সুসমার কি রকম আলা ছিল?

আলাপ ছিল তবে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে আমি কিছু জানি না।

আর প্রমীলার সঙ্গে?

প্রমীলা সুশান্তকে ভালবাসত।

খুব ভালবাসত, তাই না?

বোধ হয়—

আপনি কথাটা বলতে চাইছেন না দিব্যেন্দুবাবু, আপনি জানতেন ভাল করে

কথাটা—তাই নয় কি ?

যা বললাম তার বেশী আমি জানি না—

আপনার সঙ্গে তো প্রমীলার আলাপ আছে ?

আছে।

হ্যা—সে তো এই পাড়াতেই থাকে ?

আগে সুশান্তদের পাড়াতেই থাকত—

আচ্ছা সুশান্তবাবু জানতেন যে, আপনার সঙ্গে প্রমীলার আলাপ আছে ?

জানবে না কেন ? ব্যাপারটা তো এমন কিছু গর্হিত নয় !

তা তো নয়ই।

কথাটা বলেই কিরীটী, দিব্যেন্দুর দু-চোখের দিকে নিজের দুটি চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করে প্রশ্ন করল, প্রমীলাকে আপনার কেমন লাগে দিব্যেন্দুবাবু ? মানে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ হার—কি রকম টাইপের মেয়ে সে ?

সত্যি জানতে চান ?

নিশ্চয়ই। বলুন না।

রীতিমত খেলুড়ে-টাইপের মেয়ে একটি।

মানে ফ্ল্যার্টিং টাইপ ?

যা বোঝেন।

বেচারী দিব্যেন্দু তখনও বুঝতে পারেনি, ময়াল সাপ যেমন শিকারকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেলে পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে একেবারে কুক্ষিগত করে ফেলে, কিরীটী ঠিক তাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে শনৈঃ শনৈঃ—কিন্তু দিব্যেন্দু বুঝতে না পারলেও তাঁদ উকিল অমলেন্দু কিছুটা বোধ হয় আন্দাজ করেই শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন ক্রমশঃ।

কিরীটি দিব্যেন্দুর শেষের কথায় হেসে ফেললে, তার পরই অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললে, অমলেন্দুবাবু, আপনার ভাইকে যা জিজ্ঞাসা করবার হয়ে গেছে—অনেকক্ষণ বকবক করেছি, একটু চা পেলে মন্দ হত না—

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—এখুনি আনছি—অমলেন্দু অন্দরের দরজার দিকে অগ্রসর হন।

শুধু চা—অমলেন্দুবাবু, কিরীটী আবার বললে, অন্য কিছু না কিন্তু—

অমলেন্দু বেচারী উকিল হলেও কিরীটীর চায়ের পিপাসার কথাটা হঠাৎ শুনে বুঝতে পারেননি—নচেৎ তাড়াতাড়ি অমন করে চা আনতে অন্দরে ছুটতেন না। এবং অমলেন্দুবাবু দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অতর্কিত তীক্ষ্ণ শরের মতই যেন কিরীটীর প্রশ্নটা দিব্যেন্দুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হল, যদিও হাসতে হাসতেই—

দিব্যেন্দুবাবু, আপনি প্রমীলাকে ভালবাসেন, তাই না ?

চমকে তাকাল দিব্যেন্দু কিরীটীর মুখের দিকে—

প্রমীলাকে আ—আমি—কথাগুলো বলতে বলতে যেন কেমন থতিয়ে যায় দিব্যেন্দু

ভালবাসার মধ্যে তো পাপ বা অন্যায় বলে কিছু নেই দিব্যেন্দুবাবু, তাছাড়া প্রমীলা দেখতেও সুন্দর—কিরীটী বললে।

না। মানে আমি প্রমীলাকে—

বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে আপনার বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি জানি—

কি জানেন ?

প্রমীলাকে আপনি মনে মনে ভালবাসেন। তাকে চান—

না, না—

মুখে কথাটা আপনি অস্বীকার করলেও, আপনার চোখ-মুখ সব কিছু বলছে প্রমীলাকে আপনি ভালবাসেন। তাছাড়া সুশান্ত প্রমীলাকে ভালবাসত বলে আপনি যে তাকে ভালবাসতে পারবেন না এমন তো কোন কথা নেই।

বেচারী দিব্যেন্দু ধরা পড়ে চুপ করে থাকে।

যে কথাটা কখনও ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে এতদিন প্রকাশ করেনি সেই কথা কিরীটী রায় জানতে পারল কি করে সেটাই ভাবতে থাকে দিব্যেন্দু।

তাছাড়া দিব্যেন্দু ভাল করেই জানত—প্রমীলাকে সুশান্ত ভালবাসে—ও প্রমীলাকে সে কোন দিনই পাবে না—

দিব্যেন্দুবাবু !

দিব্যেন্দু কিরীটীর ডাকে ওর মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা বোধ হয় আপনি জানেন না !

কি ?

প্রমীলাও আপনাকে ভালবাসে।

কি বলছেন ?

যা বলছি তা মিথ্যে নয়—

কিরীটীর কথায় দিব্যেন্দু যেন হঠাৎ কেমন একটু থমকে যায়।

প্রমীলা ! প্রমীলা তাকে ভালবাসে ! এও বিশ্বাস্য ?

না, ভদ্রলোক স্রেফ তাকে বোকা বানাতে চাইছেন !

সন্দেহযুক্ত দৃষ্টিতে তাকায় দিব্যেন্দু কিরীটীর মুখের দিকে।

বিশ্বাস করতে পারছেন না আমার কথাটা তাই না দিব্যেন্দুবাবু।

দিবোন্দু হাসল। তার পর শান্ত গলায় বললে, কিরীটীবাবু, সত্যি কী জানতে চান আমার কাছ থেকে বলুন তো ?

জানবার যা ছিল তা তো আমার জানা হয়ে গিয়েছে দিব্যেন্দুবাবু। কিরীটি স্মিত হাস্যে বললে।

না—আপনি মনে হচ্ছে আরও কিছু আমার কাছ থেকে জানতে চান।

না। বিশ্বাস করুন আমার আর কিছুই জানবার নেই। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি—

কি বলুন তো ?

প্রমীলা যে আপনাকে ভালবাসে এই সহজ কথাটা আপনি এখনও জানতে পারলেন না কেন ?

ও কথা থাক কিরীটীবাবু। দিব্যেন্দু বললে।

সত্যিকারের ভালবাসা কখনও সোচ্চার উচ্ছ্বাসে নিজেকে ব্যক্ত করে না দিব্যেন্দুবাবু, আপনি অন্ধ না হলে বুঝতে পারতেন আপনার প্রতি প্রমীলার ভালবাসাটা কত কুণ্ঠিত এবং কত নিঃশব্দ ফল্গুর মত—

আপনি—

বলুন—থামলেন কেন ?

এ অদ্ভুত ধারণাটা আপনার কোথা থেকে কেমন করে হল ?

যদি বলি সে কথাটা আমার কাছে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছে—

কি বলছেন ! আর যেন নিজেকে রোধ করতে পারে না দিব্যেন্দু।

হ্যাঁ—সে স্বীকার করেছে আমার কাছে, সুশান্তর চাইতে সে আপনাকেই বেশী ভালবাসত।

বলেছে প্রমীলা আপনাকে এ কথা ?

বলেছে বইকি, আপনি অন্ধ, বুঝতে পারেননি—মেয়েদের মন সত্যিই বিচিত্র দিব্যেন্দুবাবু, অনেক সময় তারা যে ধরা দিয়েও ধরা দেয় না—তার কারণ জানবেন অন্য কারণ নয়, মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জা আর তাই ঐ দ্বিধা।

অমলেন্দু ফিরে এলেন ঐ সময়।

সত্যিই আমি দুঃখিত কিরীটীবাবু, আমারই আপনাকে চায়ের কথা বলা উচিত ছিল—

তাতে কি হয়েছে—আপনার কাছ থেকে কি চা আমি চেয়ে খেতে পারি না—দিব্যেন্দু-বাবু, এখনও আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না। মনটা নিশ্চয়ই আপনার খুশি হয়েছে ?

অমলেন্দু তাকালেন ভাইয়ের মুখের দিকে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

দিব্যেন্দু কিন্তু বসে না।

একটু পরেই চা এল।

চা পানের পর কিরীটী বিদায় নিল ওদের কাছ থেকে।

ডঃ কে. ডি'র বাড়ি ওখান থেকে বেশী দূর নয়—কিরীটি গাড়িতে উঠে হীরা সিংকে কে. ডি'র বাড়ির দিকেই যেতে বলল।

কিরীটীর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল।

দিব্যেন্দু ছেলেটি বুদ্ধিমান—তাই সে সহজে কিরীটীর কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি এবং এখনো হয়ত তার মনে দ্বিধা রয়েছে।

কারণ কিরীটী যতই বলুক, প্রমীলা তাকে ভালবাসেনি দিব্যেন্দুর মত ছেলের বুঝতে পারবে না সেটা কিছুটা অস্বাভাবিকই।

কিন্তু বিশ্বাস করুক বা নাই করুক এটা ঠিকই বুঝেছিল কিরীটী—দিব্যেন্দুর মনের দুর্বলতম স্থানে অতর্কিতে আঘাত হেনে তাকে সে দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার মধ্যে ফেলে এসেছে।

যতই সে যুক্তিতর্ক খাড়া করুক না কেন, কথাটা একেবারে মন থেকে দূর করে দিতে সে পারবে না। আর তাতেই কিরীটির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

কিরীটী সেইটুকুই চায়, তার বেশী কিছু নয়—কিন্তু বাকি এখনো আর একটু কাজ

সে কাজটুকু প্রমীলাকে দিয়ে করাতে হবে—তাহলেই সে যা চায় তাই হবে।

এখন প্রমীলা রাজী হলেই হয়।

প্রমীলা রাজী হবেই—কিরীটীর ধারণা—কারণ সত্যি-সত্যিই সে সুশান্তর মৃত্যু-রহস্যের শেষ জটটুকু হয়ত খুলে ফেলতে পারবে।

সূত্র সে পেয়েছে।

এবং ঐ জট খোলা সূত্রটিকে অবলম্বন করেই তাকে এবারে সেই দুর্ঘটনার শনিবারের রাত্রে পৌঁছতে হবে—রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

যে সময়টা ময়না তদন্তের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। যে সময়ে সুশান্তকে হত্যা করা হয়েছিল।

একটা প্রশ্ন করা হল না—ওরা সে-রাত্রে হিন্দী না ইংরিজী বই দেখতে গিয়েছিল তবে 'রক্সি' যখন তখন হিন্দী বই-ই হবে।

রাত্রের শোটা কখন ভাঙে সেটা ফোন করে জেনে নিলেই হবে।

প্রমীলা বাড়িতেই ছিল এবং ঐ সময় কলেজে বেরুচ্ছিল।

কিরীটীকে দেখে বললে, কিরীটীবাবু, আপনি!

বেরুচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ, কলেজে যাচ্ছি।

চলুন—নামিয়ে দিয়ে যাব—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

প্রমীলা কিরীটির মুখের দিকে ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বললে, চলুন।

প্রমীলা বড় রাস্তায় এসে কিরীটীর গাড়িতে উঠে বসল।

হীরা সিং, মেডিকেল কলেজ—কিরীটী বললে।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

প্রমীলা দেবী, শ্যামল ঘোষালকে আপনি তো ভাল করেই চেনেন?

চিনি।

স আপনাকে ভালবাসে, তাই না?

ওটা একটা ইডিয়ট্‌—

জানি। বলেই, বললে, আপনি নিশ্চয়ই চান সুশান্তর হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

মনপ্রাণ দিয়ে চাই কিরীটীবাবু—বলতে বলতে প্রমীলার কণ্ঠস্বর যেন অশ্রুতে আসে।

জানতাম আমি। তাই আপনার সাহায্য আমি চাই।

আমার সাহায্য!

হ্যাঁ—পারবেন সাহায্য করতে?

কি রকম সাহায্য?

আপনাদের বাড়িতে তো ফোন আছে—দিব্যেন্দুর বাড়িতেও ফোন আছে—

আছে নাকি?

আছে। তাকে আপনাকে একটা ফোন করতে হবে—

না না—

please, শুনুন—তাকে ফোন করে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—

কি বলছেন আপনি?

যা বলি শুনুন। অমত করবেন না। আজ যে কোন সময় ফোন করে কাল সন্ধ্যা টা থেকে সাড়ে সাতটা আপনাদের বাড়ির সামনে যে পার্ক আছে সেখানে দেখা তে বলবেন তাকে আপনার সঙ্গে।

কিন্তু—

যা বলছি করবেন—

তারপর ?

জানি কষ্ট হবে আপনার তবু তাকে যেন আপনি ভালবাসেন এই ভাবে কথাবার্তার মধ্যে সামান্য ইঙ্গিত দেবেন—

না—আমি পারব না।

পারবেন। সামান্য ঐ অভিনয়টুকু করতে পারবেন না ?

কিন্তু ওকে আপনি জানেন না—

জানি। ভয় নেই আপনার—আমি আশেপাশেই থাকব। আর শুনুন, কথায় কথায় জানবার চেষ্টা করবেন সে-রাত্রে—মানে দুর্ঘটনার রাত্রে—সিনেমা শো ভাঙার পর ওরা কি সোজা যে যার বাড়িতেই গিয়েছিল না অন্য কোথায়ও গিয়েছিল ?

বেশ।

গাড়ি ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের সামনে এসে গিয়েছিল। কিরীটী প্রমীলাকে গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে হীরা সিংকে বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে বলল। চলন্ত গাড়ি থেকেই কিরীটী লক্ষ্য করল প্রমীলা কলেজের মেন বিল্ডিংয়ের দিকে হেঁটে চলেছে।

যাক। প্রমীলা যে শেষ পর্যন্ত তার প্রস্তাবে রাজী হয়েছে—তাকে সে রাজী করাতে পেরেছে এতেই কিরীটী খুশী। আজ কিরীটীর মনের মধ্যে সুশান্তর হত্যার পটভূমিকা আর আবছা অস্পষ্ট রইল না।

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কথাটা তার প্রথম দিকেই একবার মনে হয়েছিল সুদর্শনের মুখে সব কথা শুনে ও মিত্রার সঙ্গে কথা বলে—

কিন্তু তখনও মনের মধ্যে খানিকটা দ্বিধা ছিল।

কিন্তু আজ দিব্যেন্দুর সঙ্গে কথা বলে আর সে দ্বিধাটুকু ছিল না।

এখন সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে—সুশান্তর হত্যার কারণ হোক বা না হোক প্রমীলাকে ঘিরে সুশান্ত শ্যামল ও দিব্যেন্দুর মধ্যে একটা জট পাকিয়ে উঠেছিল।

এখন কথা হচ্ছে সেটাই গৌণ, না আরও কোন ব্যাপার ওর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল—যা থেকে হয়ত একদিন হত্যার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে !

হঠাৎ কিরীটীর আরও দুজনের কথা মনে হয়—সুষমা আর প্রতিভা।

ওরা একেবারে যাকে বলে মৃত সুশান্তর প্রতিবেশিনী।

ওদের দুজনের কারও কোন দুর্বলতা সুশান্তর উপর বা সুশান্তর ওদের ওপরে ছিল কিনা তো ! সেটা থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়। বরং থাকাটাই স্বাভাবিক।

কিরীটী বসবার ঘরে ঢুকে দেখে সুদর্শন বসে আছে।

সুদর্শন যে! কতক্ষণ?

কিরীটী সোফার উপর বসতে বসতে বললে।

তা প্রায় মিনিট কুড়ি হবে দাদা। সুদর্শন জবাব দেয়।

তোমার বৌদি কোথায়?

বৌদি বাজারে গিয়েছেন।

চা পেয়েছ?

হুঁ—জংলী তৈরী করছে বোধ হয়।

কিরীটী অতঃপর বসতে বসতে বললে, তারপর নতুন কি সংবাদ বল?

শ্যামলের ওখান থেকেই আসছি দাদা—

তাই না কি!

হুঁ—বলে আনুপূর্বিক সে সব কথা শ্যামলের সঙ্গে এদিন সকালে হয়েছে সুদর্শন বলে কিরীটীকে।

ইতিমধ্যে জংলী চা দিয়ে গিয়েছিল।

কথার মধ্যেই চা শেষ হয়।

কিরীটী সব কিছু শোনার পরও চুপ করে থাকে—তাকে যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয় সুদর্শনের।

সুদর্শন বললে, মনে হচ্ছে দাদা আপনি যেন কি ভাবছেন!

একটা কথা ভাবছি সুদর্শন।

কি দাদা?

হত্যার পটভূমিকাই হয়ত একটি ত্রিভূজের ব্যাপার—

কি রকম?

কিন্তু তাহলে তোমার পটভূমিকাটা খাপ খাচ্ছে না ভায়া।

একটু স্পষ্ট করে বলুন দাদা।

প্রেম করে তো বিয়ে করেছ—প্রেম কি রকম স্বার্থপর হয় জান না?

সুদর্শনের চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

সে মাথা নীচু করে।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললে, প্রেম যেমন অকাতরে নিঃস্ব হয়ে দিতে পারে তেমনি প্রচণ্ডতম নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিতে পারে। যাক সে কথা—একটা কথা আমার জানা দরকার—

কি বলুন তো ?

শ্যামল ঘোষাল একটা মারাত্মক মিথ্যা বলেছে তোমার কাছে।

মারাত্মক মিথ্যা ! সুদর্শন প্রশ্নটা করে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—সে-রাত্রে সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে আদৌ সে শয্যায় নিদ্রা যায়নি—

তাই নাকি। কিন্তু জানলেন কি করে ?

জেনেছি।

কোথায় ছিল ?

রাত নটা থেকে পৌনে বারোটা পযন্ত বোধ হয় ঐ সময়টা তারা রক্সি সিনেমায় নাইট শো দেখছিল।

তারা মানে ?

শ্যামল ঘোষাল প্রতিভা চক্রবর্তী আর দিব্যেন্দু পালিত।

বলেন কি !

হ্যাঁ। এখন কথা হচ্ছে, তারপর তারা কোথায় যায় ?

সম্ভবতঃ যে যার বাড়িতেই ফিরে গেছে—

অসম্ভব নয়—তবে বর্তমানে যা সময় চলেছে—চারদিকে খুনজখম—প্রতিভাকে শ্যামল নিশ্চয়ই একা ছেড়ে দেয়নি—

কিরীটীর ইঙ্গিতটা বুঝতে সুদর্শনের কষ্ট হয় না। সুদর্শন যেন চমকে ওঠে।

কিরীটী আপন মনেই বলে, সময়টা রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা—important সময়, তাই না সুদর্শন ?

হ্যাঁ—

তুমি পরশু একবার সকালে এস ভায়া।

সকালে ?

হ্যাঁ—যদি প্রয়োজন হয় আগেই খবর দেব।

আগেই খবর দেবেন ! বলে সুদর্শন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ ভায়া—যে ফাঁদ পেতেছি—

ফাঁদ পেতেছেন।

হ্যাঁ—একটা ফাঁদ পেতেছি, আর আমার বিশ্বাস—চিড়িয়া সে ফাঁদে ধরা দেবে মানে তোমার অচীন পাখীটি।

বলতে বলতে কিরীটী হাসল।

কিন্তু দাদা—

এসব ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো করতে হয় না সুদর্শন। শনৈঃ শনৈঃ এগুতে হয়—

সুদর্শন বুঝতে পারে কিরীটী রহস্যের মীমাংসার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে—এখন সে বেশী কথা বলবে না।

তাকে ওঠারই ইঙ্গিত দিয়েছে একপ্রকার।

॥ ১৬ ॥

ন বের হয়ে যাবার পর কিরীটী টেলিফোন তুলে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার ও. সি. মল চক্রবর্তীর সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললে।

তারপর যেন কিছুটা ক্লান্ত হয়েই সোফা-কাম-বেডটার উপরে এসে টান টান হয়ে পড়ল।

সমরেশকে এখনও পাওয়া যায়নি।

সমরেশ গা-ঢাকা দিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কতখানি জড়িত সে ন্তব হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে?

কিরীটী মনে মনেই ব্যাপারটা নানাভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে।

সুশান্ত, দিবেন্দু, শ্যামল, সমরেশ ও কল্যাণ—পাঁচটি তরুণ। আর তিনটি তরুণী— লা. প্রতিভা আর সুষমা।

সকলের সঙ্গেই সকলের পরিচয় ছিল।

এদের মধ্যে সুশান্ত আর সমরেশ এবং প্রতিভা ও সুষমা এক পাড়াতেই থাকত। লা অবিশ্যি এখন অন্যত্র থাকে। প্রতিভা ও সুষমা ছিল সুশান্তর প্রতিবেশীই নয়, বারে পাশের বাড়ির। দুই বাড়ির মধ্যে একটা াদের পূর্ব-পুরুষের সৌহার্দ্য ছিল, ফলে সুশান্ত ও প্রতিভা-সুষমাদের বাড়ির মাঝখানে কমন ওয়াল।

ছাত দিয়ে অনায়াসেই এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াত করা যায়।

সুশান্ত এদের মধ্যে নিহত।

তাকে হত্যা করা হয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে কোন ধারালো ভারী কিছুর সাহায্যে। সম্ভবতঃ অতর্কিতে আঘাত হেনে। সুশান্তদের বাড়িতে উপরের তলায় তার মা বোন—

দুর্ঘটনার রাত্রে নীচের তলায় ভৃত্য ও ঠাকুর থাকা সত্ত্বেও হত্যার রাত্রে কেউ কোন

চিৎকার বা গোলমাল শোনেনি।

হয়ত আঘাতটা এমনই প্রচণ্ড ও মারাত্মক হয়েছিল, যে কারণে সুশান্তর কণ্ঠ হ
একটা অস্ফুট জোর মরণ-আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই বের হয়নি।

এবং হয়ত সেই জন্যই বাড়ির কেউ সে আর্তনাদ শুনতে পায়নি সুশান্তর।

কিংবা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিল সুশান্ত—আর্ত
করবার সময় পায়নি।

মোট কথা কেউ কিছু শোনেনি সে-রাত্রে বাড়িতে যারা ছিল।

জিনিসটা কি হতে পারে—ভারী কাটারি কিংবা ধারালো কোন লো
ডাণ্ডার মত কিছু—আততায়ী যা দিয়ে অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক থেকে তার ঘাড়ে আ
হেনেছিল।

আঘাতটা এমনই মারাত্মক হয়েছিল—যার ফলে ঘাড়ের হাড় ভেঙে সঙ্গে
সুশান্তর মৃত্যু হয়েছিল।

তারপর সুশান্তদের বাড়ির সদর দরাজাটা বন্ধই ছিল (অন্ততঃ ভৃত্য রামচরণের
যদি বিশ্বাস করতে হয়) এবং তার দ্বারা দুটো জিনিস সম্ভবতঃ মনে হয়।

এক, হত্যাকারী হয় সদর দিয়েই সে-রাত্রে গৃহে প্রবেশ করেছিল এবং দরজাটা
দিয়েছিল হয়ত সে-রাত্রে সুশান্তই।

অর্থাৎ সুশান্ত অজ্ঞাতেই তার হত্যাকারীকে দরজা খুলে গৃহে প্রবেশের সু
দিয়েছিল—যেটা একমাত্র সম্ভব—হত্যাকারী সুশান্তের রীতিমত পরিচিত জন কেউ
—যাকে সে অত রাত্রেও দরজা খুলে দিতে পারে—তারপর হত্যাকারী কাজ শেষ
ছাতের পথেই পালিয়ে গেছে।

অথবা দুই, হত্যাকারী তার অজ্ঞাতেই পাশের বাড়ি থেকে দুই বাড়ির ম
ছাতের দেওয়াল ডিঙিয়ে সুশান্তর গৃহে এসে প্রবেশ করেছিল, এবং সেও সুশান্তর ব
সব কিছু সংস্থান ভাল করেই জানত।

তখনও হয়ত সুশান্ত জেগে চেয়ারে বসে লেখাপড়া করছিল, জানতে পারেনি
কারণেই কেউ তার ঘরে এসে ঢুকলেও।

তারপর হত্যা করে ঐ ছাতের পথেই চলে গিয়েছে হত্যাকারী। এবং সে
একটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায়—সুশান্ত কি আক্রান্ত হবার পূর্বে তার আগমন
পেয়েছিল!

অবশ্যই একটা ব্যাপার মৃতের দেহের ক্ষত থেকে মনে হয়—হত্যাকারী তাকে
দিক থেকেই আক্রমণ করেছিল।

এবং হয়ত অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে বিস্ময়বিমূঢ় সুশান্তর কণ্ঠ হতে শেষ যে চিৎকারটা বের হয়েছিল সেটা হয়ত ক্ষীণই ছিল, তাই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত বাড়ির কেব কারো কানেই পৌঁছয়নি। তারপর হত্যাকারী নিঃশব্দে সরে পড়েছে ঐ ছাতের ীব ডিঙিয়েই!

সে যাই হোক, হত্যাকারী হয় আসবার ও যাবার পথে না হয় যাবার পথে কোন সময় সুনিশ্চিত ভাবে দুই বাড়ির মধ্যবর্তী ছাতটার প্রাচীরটার সাহায্য নিয়েছে।

তাতে করেই মনে হয়—সুশান্তদের বাড়ির মধ্যে হত্যাকারীর আগমন ও প্রস্থান কেউ জানতে পারলেও যতীন চক্রবর্তীর বাড়ির কেউ-না-কেউ জানতই।

কিন্তু সে কে বা কার পক্ষে সেটা জানা সম্ভব!

প্রতিভা ও সুষমা দুই বোনের পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব।

তাই যদি হয়ে থাকে তো তাদের মধ্যে একজনেরই জ্ঞাতসারে ব্যাপারটা ঘটেছে, না উভয়ের জ্ঞাতসারেই ঘটেছে।

এসব ক্ষেত্রে একজনের পক্ষেই জানার সম্ভাবনা বেশী।

সেই একজন কে?

প্রতিভা না সুষমা?

সুশান্তর পরিচিতজনের মধ্যে সংবাদ নিয়ে যতদূর জানতে পারা গিয়েছে দিব্যেন্দু, ল, সমরেশ ও কল্যাণেরই প্রতিভাদের বাড়িতে যাতাযাত ছিল এবং সুশান্তর ও যাতায়াত ছিল (তা ওরা যতই অস্বীকার করুক না কেন)।

সুশান্ত প্রমীলাকে ভালবাসত এবং মিতার কথামত সে নিজেও দিব্যেন্দুর সঙ্গে বার্তা বলে স্থিরনিশ্চিত যে প্রমীলাকে দিব্যেন্দুও ভালবাসত।

কল্যাণের সঙ্গে সুষমার ঘনিষ্ঠতা আছে।

আবার শ্যামলও সম্ভবতঃ প্রতিভাকে ভালবাসত, নচেৎ অত ঘনিষ্ঠতা থাকতে র না—রাত্রের শোতে দুজনে একসঙ্গে সিনেমায় যাবার মত।

প্রতিভা আর সুষমা ছিল সুশান্তর প্রতিবেশিনী।

সেক্ষেত্রে সুষমা বা প্রতিভার কারও সুশান্তর প্রতি দুর্বলতা থাকাটাও খুব একটা ত্র ব্যাপার নয়।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা আলোর শিখা যেন কিরীটীর মনের পাতায় ঝিলিক হেনে

তবে কি—

কি গো, কখন ফিরলে?

কৃষ্ণার ডাকে কিরীটির চমক ভাঙল, কে, কৃষ্ণা!

হ্যাঁ—কৃষ্ণার হাতে দু কাপ চা, কখন ফিরলে?

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা কৃষ্ণার হাত থেকে নিতে নিতে কিরীটী বললে, কিছুক্ষণ—তারপর তোমার মার্কেটিং হল?

হ্যাঁ—দেখো, কাল রাত্রে একটা কথা শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম—ঐ সুশান্তর ব্যাপা

কি বল তো?

কিরীটী প্রশ্নটা করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। কৃষ্ণা অনেক ক্ষেত্রে ইতি হত্যারহস্যের ব্যাপারে এমন যুক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছে যে কিরীটী চমকিত হয়েছে।

ভাবছিলাম—তোমার প্রতিভা ও সুষমা মেয়ে দুটির কথা।

তাই নাকি? তা—

তোমাদের প্রতিভাও হয়ত সুশান্তকে মনে মনে ভালবাসত বা চাইত—

তোমার তাই মনে হয়?

হয়। কারণ ভেবে দেখ ছোটবেলা থেকে ওরা পাশাপাশি বাড়িতে মানুষ— উপর ছাতের ব্যাপারটা—

আমিও এইমাত্র তাই ভাবছিলাম—তবে—

কি তবে? কৃষ্ণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

প্রতিভা না হয়ে সুষমাও হতে পারে।

তাও পারে—কিন্তু প্রমীলাই সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে—

কেন?

সুশান্ত আর প্রমীলার মধ্যে যে সত্যিকারের ভালবাসা ছিল—

এমনও হতে পারে কৃষ্ণা, সেই ভালবাসাই হয়েছিল আর এক নারীর জীবনে এক কাঁটা! যাক গে ওসব কথা—মনে হচ্ছে বাকি যে অন্ধকারটুকু ছিল তাও হয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ—বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা বলা হল না, ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল, কিরীটী রায়—

দাদা আমি সুদর্শন—

কি সংবাদ?

সমরেশকে ধরে নিয়ে এসেছি থানায়।

কখন ধরলে ?

আমার লোক তো ছিল ওর বাড়ির আশেপাশে—ওকে চোরের মত এদিক ওদিক
াতে তাকাতে একটা ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ি ঢুকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও
নিয়ে এসেছে থানায়। মনে আছে দাদা আপনাকে বলেছিলাম—দুর্ঘটনার পরের
সকালে যখন বসময়বাবুর বাড়ি সরেজমিন তদন্তে গিয়ে সুশান্তব ঘরটি পরীক্ষা
ছিলাম—

কিরীটি বললে, হ্যাঁ—সে সময় ঠিক সামনের বাড়ির নীচের তলার জানলাপথে দুটি
দৃষ্টির সঙ্গে তোমার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় ও সঙ্গে সঙ্গে জানলাপথে সে দুটি চক্ষুব
দবণ ঘটেছিল।

হ্যাঁ—সে ছিল সমরেশই এখন পবিষ্কাব বুঝতে পারছি—আপনি একবার আসবেন

তুমি সমরেশ চৌধুবীকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ কবেছ নাকি ?

মামুলী দু-চারটে প্রশ্ন—

আমি একটা ফোন-কল এক্সপেক্ট করছিলাম—ঠিক আছে আমি আসছি—বলে যাচ্ছি
াকে ফোনটা যদি আসে তো আমাকে যেন তোমার ওখানেই কনটাক্ট করে—

করীটী রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

বেরুচ্ছ ? কৃষ্ণা শুধাল।

বেরুব বলেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা থেকে সুবিমল যদি ফোন
তো—তাকে শ্যামপুকুর থানায় সুদর্শনের ওখানে কনটাক্ট করতে বলো—আমি ওর
নেই যাচ্ছি—

কিরীটী বের হয়ে পড়ল।

বেলা সোয়া তিনটে নাগাদ কিরীটী সুদর্শনের অফিসে পৌছল।

থানার অফিস-ঘরেই সুদর্শন বসেছিল।

এই যে দাদা আসুন !

তোমার সমরেশ চৌধুরীটি কোথায় ?

হাজত-ঘরে আছে—আনাচ্ছি, রীতিমত হার্ড নাট—

তাই নাকি !

হ্যাঁ—দেখুন না। কথা বললেই বুঝতে পারবেন। ও নাকি মালদায় ওর বড বোনের

ওখানে গিয়েছিল—

হঠাৎ ?

বলেছিলাম। বললে, কেন, হঠাৎ যেতে নেই নাকি কোথাও ? আরও বললে জানেন ?

কি ?

ও নাকি দুর্ঘটনার পরদিন সকালেই গিয়েছে মালদা—বাসে করে—

মিথ্যা কথা বলেছে—ডাকাও তাকে।

একজন কনেস্টবলকে সুদর্শন বললে সমরেশ চৌধুরীকে অফিস-ঘরে নিয়ে আস জন্য।

একটু পরেই কনেস্টবলের সঙ্গে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি তরুণ এসে ঘরে ঢুব চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ ও গাঁট্টাগোঁট্টা।

একমাথা ঝাঁকড়া চুল—সযত্ন-বিন্যস্ত, গোঁফদাড়ি বোধ হয় কদিন সেভ্ করা হয়নি গালের অর্ধেক জুলপি। পরনে ক্রীম রংয়ের একটা ড্রেন-প্যান্ট—গায়ে একটা হাও শার্ট। পায়ে চপ্পল।

বাঁ হাতে সোনার রিস্টওয়াচ—চোখে কালো সেলুলয়েডের মোটা ফ্রেমের চশমা।

বসুন সমরেশবাবু—সুদর্শন বললে।

না, আমি বসব না। উদ্ধত গলায় রুক্ষ ভাবে জবাব দিল সমরেশ, আগে ব এভাবে বাড়ির কাছ থেকে আমায় ধরে নিয়ে এসেছেন কেন ?

বসুন না সমরেশবাবু, কথা বললে এবার কিরীটী, কয়েকটা কথা আমরা জান চাই আপনার কাছে—জবাব দিলেই আপনাকে যেতে দেব—

কি কথা ?

আগে বসুন—আবার মৃদু হেসে কথাটা বললে কিরীটী।

॥ ১৭ ॥

কি জানি কি ভাবল সমরেশ।

পর্যায়ক্রমে সুদর্শন ও কিরীটীর মুখের দিকে একবার তাকাল—তারপর চেয়া টেনে বসে পড়ল।

বলুন—শুনি কি কথা আছে আপনাদের।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? চা খাবেন সমরেশবাবু? কিরীটী শুধায়।

না। ধন্যবাদ—

সিগারেট?

ধন্যবাদ, না। কি কথা জিজ্ঞেস করতে চান তাই করুন।

আজ থেকে দিন পনের আগে এক শনিবার রাত্রে আপনাদের বাড়ির ঠিক সামনের ঘর সুশান্ত রায় খুন হয়েছেন, আপনি জানেন তো? কিরীটী বললে।

জানি।

সে আপনার সহপাঠী ও বন্ধু ছিল—

এক কলেজে পড়তাম—আমি বি এ.—সে বি. এস-সি.—আর তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই ছিল না।

তা ঠিক, আজকালকার দিনে বন্ধুত্ব ব্যাপারটাই বিরল। কিন্তু বন্ধুত্ব না থাক জানা-শোনা নিশ্চয়ই ছিল?

তার সঙ্গে আমি কথা বলতাম না।

কেন?

That is my personal affair—

ঝগড়া ছিল কি?

না।

হুঁ। তা কতদিন আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ ছিল?

অনেক দিন—

কবে?

এক বছর প্রায়—

তার আগে বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না?

কিছুটা হয়ত ছিল—

তা হঠাৎ সেটায় চিড় ধরল কেন? কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই?

থাকলেও বলব না।

বেশ, বলবেন না। কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর একটু থেমে বললে, প্রতিভা আর তাকে চেনেন নিশ্চয়ই?

চিনি। জবাবটা দিয়ে যেন কিরীটীর মনে হল সমরেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারেক ওর মুখের দিকে তাকাল।

চেনেন—ঘনিষ্ঠতা নেই?

অবান্তর প্রশ্ন—

সুদর্শন ঐ সময় বলে উঠল, কোন্‌টা অবান্তর—কোন্‌টা নয় সেটা আপনার বিবেচ নয় সমরেশবাবু। থানায় আনা হয়েছে আপনাকে, যা প্রশ্ন উনি করছেন তার জবাব দিন—

যদি না দিই? উদ্ধত ভঙ্গি সমরেশের।

তাহলে জানবেন সব কিছু আপনার বিরুদ্ধেই যাবে।

কি বলতে চান আপনি?

বলতে চাই সুশান্তবাবুর হত্যার ব্যাপারে আপনাকে—

সন্দেহ করেন। আপনাদের ধারণা তাহলে সুশান্তকে আমিই হত্যা করেছি! বা চমৎকার!

করেছেন কি করেননি সেটা আদালত বুঝবে—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার জবাব দেবেন কি না তাই বলুন। সুষমা ও প্রতিভার সঙ্গে আপনার কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা বলুন?

আলাপ-পরিচয় আছে।

কিরীটীই এবারে প্রশ্ন করল, তাদের বাড়িতে যেতেন প্রায়ই, তাই না?

যেতাম।

কার কাছে? প্রতিভার কাছে, না সুষমার কাছে?

দুজনের কাছেই—

কিরীটী মৃদু হাসল।

আর কিছু আপনাদের জিজ্ঞাস্য আছে? সমরেশ এবারে যেন বেশ একটু কড়া সুরেই প্রশ্নটা করল।

আপনি শুনলাম মালদায় গিয়েছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ—বাসে—দিদির কাছে—

কবে গিয়েছিলেন?

বলেছি তো ওঁকে। সমরেশ সুদর্শনকে দেখিয়ে কথাটা বললে।

মানে যে রাত্রে সুশান্তবাবু খুন হন—অর্থাৎ শনিবার—আপনি রবিবার সকালে বাসে গেছেন তো?

হ্যাঁ।

তা হঠাৎ দিদির কাছে গেলেন? কিরীটী শুধাল।

হঠাৎ আবার কি—ইচ্ছে হল, গেলাম চলে।

এবারে সামারে আপনার বাবার সঙ্গে আপনি হিল স্টেশনে যাননি শুনলাম ?
কিরীটী আবার শুধাল।

না, যাইনি।

কেন ?

কেন আবার কি—ইচ্ছে হয়নি যাইনি—মালদায় ইচ্ছে হল যেতে তাই চলে গেলাম
দিদির কাছে—

রবিবার ?

হ্যা—একটু আগেই বলেছি তো—

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি সত্যি কথা বলছেন না ?

তার মানে ?

সমরেশ কিরীটীর মুখের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

তার মানে আপনি গেছেন হয় সোমবার সকালে, না-হয় রবিবার রাত্রে কোন এক
সময়—সকালে নয়—

না। আমি রবিবার সকালেই ভোরে বের হয়ে গিয়েছি—

বেশ—এবারে বলুন শনিবার রাত এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা ঐ সময় আপনি
কি করছিলেন ?

অত রাত্রে মানুষ কি করে ? ঘুমায়—

সিনেমায়ও তো রাত্রের শোতে যেতে পারে ?

সমরেশ যেন ঈষৎ চমকাল কিরীটীর কথায়।

সিনেমায় !

হ্যা।

না—সিনেমায় আমি যাইনি।

প্রতিভা দেবী আর শ্যামলবাবু কিন্তু গিয়েছিলেন সে-রাত্রে সিনেমায় নাইট শোতে—

যেতে পারে—

কেন, হিন্দী বই আপনি দেখেন না ?

না, আমি ইংলিশ বা বাংলা বই ছাড়া দেখি না।

সুষমা দেবীও তাই বলছিলেন।

সুষমা। কে সুষমা ?

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন নামটা। একটু আগেই তো বললেন সুষমা ও প্রতিভাদের
বাড়িতে আপনি যেতেন।

সমরেশ যেন আবার ক্ষণিকের জন্য থতিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, সুষমা কি বলেছে?

সুষমা দেবী একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন থানায়।

কি দিয়েছে?

স্টেটমেণ্ট—মানে জবানবন্দি—

দিয়েছে? সুষি!

হ্যাঁ।

কি বলেছে সুষি তার স্টেটমেণ্টে?

বলেছেন তাঁর জবানবন্দিতে এক জায়গায়, আপনি রবিবার সন্ধ্যায়ও কলকাতায় ছিলেন—

হঠাৎ যেমন সমরেশ থমকে যায়। মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে। তারপর কেমন যেন নিস্তেজ গলায় বলে, বলেছে সে! আ—আর কি সে বলেছে?

যা বলেছেন তিনি—সব আদালতেই জানতে পারবেন। ঠিক আছে, এবারে আপনি যেতে পারেন। সুদর্শন—ওকে যেতে দাও।

কিন্তু সমরেশের দিক থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবার যেন কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না।

খানিকক্ষণ যেন কেমন ঝিম মেরে বসে রইল।

কি হল? আপনি যেতে পারেন তো বললাম—কিরীটী বললে।

না। আমি জানতে চাই আর কি সে বলেছে?

কি তিনি বলেছেন সত্যিই আপনি শুনতে চান? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

বলতে পারি একটি শর্তে—

শর্তে!

হ্যাঁ।

কি শুনি?

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব—যদি সেগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দেন তবেই—

সমরেশ কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সামনের টেবিলটার উপর কি যেন আঁকিবুঁকি আঁকতে থাকে।

কিরীটীর বুঝতে অসুবিধা হয় না—যে তীর সে নিক্ষেপ করেছে তা যথাস্থানেই বিদ্ধ হয়েছে।

সমরেশবাবু!

কিরীটীর ডাকে সমরেশ ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বলুন এবার, সুশান্তবাবু যেদিন খুন হয় সেদিন রাত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন—কারণ আমি জানি সে রাত্রে আর যেখানেই ঐ সময় থাকুন না কেন—নিজের ঘরের শয্যায় শুয়ে ছিলেন না।

না। জেগেই ছিলাম। কেন—সুষি বলেনি—

বলেছেন। তবে আপনার মুখ থেকেও কথাটা শুনতে চাই।

সমরেশ চুপ করে থাকে।

বলুন কোথায় ছিলেন?

নীচের তলায় আমার বসবার ঘরেই—

কি করছিলেন?

লিখছিলাম।

কি লিখছিলেন?

উপন্যাস।

আপনি বুঝি লেখেন?

হ্যা।

কোন্ কোন্ কাগজে আপনার লেখা বের হয়েছে?

নব কল্লোলে—

আর কোথাও?

দু-একটা সিনেমার কাগজে মধ্যে মধ্যে লিখি।

কোন বই বের হয়নি আপনার?

না—তবে শীগ্‌গিরি একটা বেরুচ্ছে।

তাহলে সে রাত্রে সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা—ঐ এক ঘণ্টা সময় আপনি আপনাদের বাড়ির নীচের ঘরে জেগেই ছিলেন?

সমরেশ কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার বলা হল না—সমরেশের বাবা বিনয় চৌধুরী সে ঘরে ঢুকলেন। এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক।

পরনে দামী টেরিলিনের সুট—বেশ ভারিক্কী চেহারা,—এসেই বললেন, এ থানার ও. সি. কে?

সুদর্শন বললে, আমি—

আমি বিনয় চৌধুরী—সমরেশের বাবা, ওকে ছেড়ে দিন—

তা তো পারি না মিঃ চৌধুরী—শান্ত গলায় জবাব দিল সুদর্শন।

পারেন না !

না।

ওকে অ্যারেস্ট করবেন ?

প্রয়োজন হলে করতে হবে হয়ত—

ওর অপরাধ ?

আপনাদের পাড়ায় দিন পনের আগে রসময়বাবুর ছেলে সুশান্ত খুন হয়েছে—নিশ্চ আপনি জানেন ?

Absurd ! আপনি কি মনে করেন তাকে আমার ছেলে খুন করেছে ?

সুদর্শন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঐ সময় টেবিলের ওপরে ফোনটা বেজে উঠল।

সুদর্শন রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—ইয়েস স্যার—ও. সি. স্পিকিং—ইয়েস স্য —হাঁা এসেছেন—ছেড়ে দোব ? ঠিক আছে।

সুদর্শন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল, তারপর বিনয় চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে ঠিক আছে, নিয়ে যান আপনার ছেলেকে। যান সমরেশবাবু—

সমরেশকে নিয়ে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বিনয় চৌধুরী থানা থেকে বের হ গেলেন—সঙ্গের ভদ্রলোকটি তাঁকে অনুসরণ করলেন।

কিরীটী এতক্ষণ নিঃশব্দে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, একটি কথাও বলেনি ওর থানা থেকে বের হয়ে যেতেই সে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললে, কার ফো সুদর্শন ?

হোম মিনিস্টার—সুদর্শন বললে।

কিরীটী কিছুক্ষণ জবাবটা শুনে গুম হয়ে বসে রইল, তারপর মৃদু শান্ত গলায় বলে বিনয় চৌধুরী বোধ হয় ভুল করলেন—

কিন্তু দাদা—ছেলেটা প্রায় স্বীকারোক্তি দিতে যাচ্ছিল, এমন সময়—

যা জানবার জানা হয়ে গিয়েছে—নতুন কিছুই আর জানবার ছিল না। কিরী শান্ত গলায় বললে।

কিন্তু সত্যিই এ ধরনের মন্ত্রীদের interference অসহ্য—

কি করবে বল ভায়া—যস্মিন দেশে যদাচার—এখন তো নীতিভঙ্গেরই নীতি চলে সর্বত্র।

তাই বলে আইনের হাতও ঐভাবে ওরা মোচড়াবে ?

কোন ক্ষমতারই অপব্যবহার বেশীদিন চলে না। রিপার্কেশন আসতে খুব দে

মার দেরি নেই জেনো। যে পুলিসী ব্যবস্থাকে নিয়ে আজ ছেলেখেলা খেলছে ওরা, নজ নিজ স্বার্থে একদিন দেখবে সেই অব্যবস্থাই ওদের গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসেছে। াক, চল ওপরে যাওয়া যাক—একটু চা না হলে আর চলছে না—

আমি রেজিগনেশন দেব দাদা—

পাগল!

আপনিই বলুন এভাবে কাজ করা যায়? সুদর্শন উঠতে উঠতে বললে।

চল—ওপরে—মাথা গরম করো না।

এ কেসটা আর ইনভেস্টিগেট করে কি হবে?

চল চল—ওপরে চল।

কিরীটীর কথা যে কত সত্য সেটা পরের দিনই সকালে প্রমাণিত হল।

আগের দিন দুপুর থেকেই সমরেশের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। সকাল টটা-নটা নাগাদ একসময় সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়—কে একজন ডাকতে এসে- ল তারই সঙ্গে।

ব্যাপারটা ভৃত্যই জানায় তার মনিবকে, সে-ই সমরেশ চলে যাবার পর সদর বন্ধ র দেয়।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে দেশবন্ধু পার্কে সমরেশের মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হল।

একই ভাবে সমরেশও নিহত হয়েছে।

ঘাড়ে কোন ধারালো ভারী বস্তুর সাহায্যে আঘাত করা হয়েছে—যার ফলে হয়ত সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় ভার্টিব্রা চুরমার হয়ে মৃত্যু ঘটিয়েছে।

দেশবন্ধু পার্কে একটা বেঞ্চের সামনে পড়ে ছিল মৃতদেহটা।

এক প্রাতঃভ্রমণকারী বৃদ্ধ প্রথম মৃতদেহটা আবিষ্কার করেন, পরে লোকজন সেখানে া হয়ে যায়—একজন গিয়ে শ্যামপুকুর থানায় সংবাদটা দেয়।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিল সুদর্শন।

এবং গিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। উবুড় হয়ে পড়ে ছ মৃতদেহটা।

মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে।

সে মুখ সুদর্শন দেখবা মাত্রই চিনতে পেরেছিল। অর্ধস্ফুট একটা বিস্ময় তার কণ্ঠ হ বের হয়ে আসে।

সমরেশ চৌধুরী!

সুদর্শন সঙ্গের কনেস্টবলটিকে কিরীটীর ফোন নাম্বারটা দিয়ে বলে তখুনি থানায় f কিরীটীকে একটা ফোন করে দিতে, যেন সে অবিলম্বে চলে আসে দেশবন্ধু পার্কে—স্থা আসতে বলেছে।

অন্য একজন কনস্টেবলকে পাঠায় ফটোগ্রাফারকে সংবাদ দিতে।

সমরেশের পরনে একটা ড্রেন-পাইপ প্যান্ট—গায়ে টেরিলিনের চক্করবক্কর অ হাওয়াই শার্ট। হাতে রিস্টওয়াচ—পায়ে কোন স্যাণ্ডেল বা জুতো নেই।

হাতের কব্জিতে বাঁধা দামী রিস্টওয়াচটা তখনও টিক টিক করে চলেছে।

মৃতদেহের আশেপাশের জমিতে এমন কোন নিদর্শন সুদর্শনের চোখে পড়ল যার দ্বারা বোঝা যায় জায়গাটায় কোন ধস্তাধস্তি বা স্ট্রাগল হয়েছে। জমিতে কে রক্তচিহ্নও নেই।

ঘাড়ের ঐ ক্ষতচিহ্ন ছাড়া সমরেশের শরীরের আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, গায়ের জামাটায় পৃষ্ঠদেশে খানিকটা রক্ত কালো হয়ে শুকিয়ে আছে।

আশেপাশের মাটিতে কয়েকটা জুতোর ছাপ দেখা যায়।

সুদর্শনের মনে পড়ল কটা দিন অসহ্য গরমের পর গত সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর : বেশ একপশলা বৃষ্টি পড়েছিল।

তাইতেই জমিটা ভিজে ও নরম থাকায় বোধ হয় জুতোর ছাপগুলো স্পষ্ট।

কৌতূহলী কিছু মানুষ ক্রমশঃই আশেপাশে ভিড় জমাচ্ছিল—মহাবীর সি কনেস্টবল অতুলানন্দ তাদের দূরে সরিয়ে দেয়—হট যাও উধারসে—সরুন সরুন—এখ ভিড় করবেন না।

কিন্তু জনতা কি কথা শোনবার! তারা তবুও উঁকিঝুঁকি দিয়ে এগুবার চেষ্টা করে।

বেঞ্চটার অল্পদূরেই একটা গাছ—বেগুনী রংয়ের অজস্র ফুল ধরেছে—হঠাৎ গাছের কাছাকাছি জায়গায় একজোড়া জাপানী রবারের চপ্পল নজরে পড়ল সুদর্শনের।

কেউ যেন তাড়াহুড়ায় এলোমেলো ভাবে পা থেকে জাপানী চপ্পলজোড়া রেখেছিল ওখানে।

সুদর্শনের নির্দেশে অতুলানন্দ চপ্পলজোড়া তুলে এনে মৃতদেহের পাশে রেখে দিল

কিরীটী যখন অকুস্থানে এসে পৌছাল বেলা তখন প্রায় সাতটা চল্লিশ।

সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমে যে ঝড়বৃষ্টি এসেছিল তার চিহ্নমাত্রও নেই। ঝলমলে ঝকঝকে রোদ উঠেছে তখন।

পার্কের আশেপাশে আবও মানুষের ভিড় জমেছে ততক্ষণে এবং ভিড় ক্রমশঃ ...ছে।

...ক ব্যাপার সুদর্শন? বলতে বলতে এগিয়ে এসে ভূপতিত দেহটার প্রতি দৃষ্টি ...ই থমকে দাঁড়ায় কিরীটীও—এ কি, মৃতদেহ!

হ্যাঁ, আসুন দাদা, আর একটু এগিয়ে মুখটা দেখুন—

সুদর্শনের কথায় আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই এবং মৃতের মুখের প্রতি নজর ...ই দ্বিতীয়বার বিস্ময়সূচক শব্দ বের হয়, সমরেশ চৌধুরী না!

হুঁ।

কখন ব্যাপারটা জানতে পারলে?

ঘন্টা-দেড়েক আগে।

বোধহয় এ দুর্ঘটনা এখন মনে হচ্ছে ঘটত না, যদি সেদিন বিনয় চৌধুরী অমন করে ...থানায় উদয় হয়ে মন্ত্রী মশাইয়ের খুঁটির জোরে ওকে না অমন করে থানা থেকে ...য় নিয়ে যেতেন—কিরীটী বলতে লাগল, বেচারীর এইভাবেই বোধহয় অপঘাত কপালে লেখা ছিল, নচেৎ অমনটাই বা সেদিন হবে কেন?

আমার মনে হচ্ছে দাদা, সমরেশ বোধ করি যে বা যারা সে-রাত্রে সুশান্তকে হত্যা ...ল তাদের দলে ছিল। তাই হয়ত থানায় আমাদের কাছে কি সে বলে গিয়েছে বা ...ছে সেই সন্দেহে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কিরীটী সুদর্শনের কথার কোন জবাব দেয় না। মৃতদেহের ঘাড়ের কাছে ক্ষতস্থান-দিকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল।

সুদর্শন আবার বললে, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে দাদা—

কি? কিরীটী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হয়ত এটাও সুশান্তর হত্যাকারীরই কাজ।

হতে পারে—তবে আমার যেন মনে হচ্ছে—

কি দাদা?

সে-রাত্রে সুশান্তকে যখন হত্যা করা হয়, সামনের বাড়ির নীচের তলার ঘরে সমরেশ ...ছিল, সে হয়ত চিৎকার শুনতে পেয়েছিল—হয়ত হত্যাকারীকেও দেখে চিনতে ...ছিল—যাক গে—ঐ চপ্পলজোড়া কোথায় ছিল? মৃতদেহের নাকি?

সুদর্শন ব্যাপারটা বিবৃত করে বললে, মনে হয় না—ওর পায়ের সাইজ আর চপ্পলের

সাইজ এক মনে হচ্ছে না।

কিরীটী প্রথমে এক পাটি ও পরে অন্য পাটি চপ্পল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল কিছুক্ষণ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে—তারপরে আপন মনেই মৃদু কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য!

কি দাদা?

তোমার হত্যাকারীকে বোধহয় এবারে ধরা আর কষ্ট হবে না সুদর্শন—

ঐ চপ্পল থেকে কিছু পেলেন?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, এমন একটা বিচিত্র ব্যাপার এই স্যাণ্ডেলজোড়ায় জড়িয়ে আছে যে, যার মধ্যে হত্যাকারী বা হত্যাকারীর সহযোগী তার নিদর্শন নি অজ্ঞাতে রেখে গিয়েছে—

কি ব্যাপার বলুন তো! সুদর্শন ঝুঁকে পড়ল কিরীটীর হস্তধৃত চপ্পলের দিকে।

ভাল করে চেয়ে দেখো, কিরীটী চপ্পলের এক পাটি সুদর্শনের চোখের সামনে ধরে বললে, জাপানী রাবারের চপ্পল। আগে কলকাতায় খুব পাওয়া যেত কিন্তু এখানকার বাটা কোম্পানী এই ধরনের রাবারের চপ্পল বের করায় ক্রমশ জাপানী চপ্পল এখানকার মার্কেট থেকে উঠে গেছে। আগেও যা অবিশ্যি ত বেশীর ভাগই স্মাগল গুড্‌স্—কিন্তু এখন যে এদেশে ফরেন গুড্‌সয়ের স্মাগলিং চলে তুমি তো জানই—ঐ ধরনের চপ্পলও কিছু কিছু নিউ মার্কেটে পাওয়া এখনও, তবে খুঁজতে হয়। ব্যাপারটা আমি জানি কারণ আমি নিজে ঐ ধ চপ্পল ব্যবহার করি—

কিন্তু এ চপ্পলজোড়ার মধ্যে বিশেষত্ব কি পেলেন এমন দাদা যে কথাটা আ মনে হচ্ছে? প্রশ্ন করলে সুদর্শন।

প্রথম কথা কাদা-মাটিতে এ চপ্পল পরে ভাল করে হাঁটা যায় না—এখানকার ম এঁটেল—কাজেই যে এই চপ্পল ব্যবহার করেছিল কাল রাতে, সেও এটা ব্যে ব্যবহারের অসুবিধা দেখে খুলে রেখেছিল, পরে আর তাড়াহুড়োয় পায়ে দিয়ে ক কথা মনে নেই ফেরার সময় এবং এ ধরনের চপ্পল হামেশাই লোকে ব্যবহার করে। যাক এ দুটো সঙ্গে নাও। আর বৈশিষ্ট্য আছে চপ্পলজোড়ার মধ্যে।

কিরীটী চপ্পল প্রসঙ্গ আর বাড়াল না। মৃতদেহটা ও আশেপাশের জমি প করতে করতে বললে যে, ভাগ্যে তোমার গতরাত্রে একপশলা বৃষ্টি হয়েছি সেটাই দাঁড়াল হত্যাকারীর পক্ষে চরম এক দুর্ভাগ্য। একেই বলে বোধহয় বিধ মার, ভায়া!

দাদা—

জান ভায়া—death always leaves behind its footmarks—হত্যাকারী
র নিজের অজ্ঞাতেই তার পদচিহ্ন এঁকে রেখে যায় পশ্চাতে। আর এখানে অপেক্ষা
রে কি হবে—লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা কর—
আগে থানায় নিয়ে যাই—সেখান থেকে মর্গে পাঠাব। সুদর্শন বললে।

দুজনে থানায় ফিরে এসে চা খাচ্ছিল, এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে থানার সামনে
ড়াল।

সমরেশ চৌধুরীর বাপ সেই দাম্ভিক বিনয় চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।
সমরেশের ডেড্ বডি নাকি দেশবন্ধু পার্কে পাওয়া গিয়েছে ?
কিরীটী শুধাল, কার কাছে সংবাদ পেলেন ?
আগে বলুন—কথাটা সত্যি কিনা! উৎকণ্ঠায় বিনয় চৌধুরীর গলার স্বর যেন বুজে
স।
সুদর্শন বললে, আমিই জমাদারকে ওর বাড়িতে থানায় এসে ফোন করে দিতে
লছিলাম দাদা—
কিরীটী একবার সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল বিনয় চৌধুরীর
র দিকে। তারপর বললে শান্ত গলায়, যান, পাশের ঘরে ডেড্ বডি আছে—
বিনয় চৌধুরী পাশের ঘরে গেলেন এবং কয়েক মিনিট বাদেই টলতে টলতে ফিরে
লন।
সমস্ত মুখ রক্তশূন্য—দু চোখের দৃষ্টি বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত—
আপনার ছেলে সমরেশই তো ? কিরীটী শুধাল।
কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে বিনয় চৌধুরী তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।
বসুন বিনয়বাবু!
কিরীটী বলার আগেই খপ করে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েছিলেন বিনয়
ী। পরনে তখনো তাঁর নাইট ড্রেস—পায়জামা ও কোট—পায়ে চপ্পল।
মাথার চুল এলোমেলো।
বোধহয় সদ্য ঘুম থেকে উঠেছিলেন—থানা থেকেই ফোনটা পেয়েই যে অবস্থায়
ন সেই অবস্থাতেই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছেন।
বিনয়বাবু, সেদিন যদি মন্ত্রীকে ধরে হুট করে অমন করে থানায় এসে আপনার
কে না খালাস করিয়ে নিয়ে যেতেন, বোধহয় এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কিরীটী
গলায় বললে।

বিনয় চৌধুরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বোবা দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দি

গতকাল কখন আপনার ছেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় জানেন কিছু ? ব
পারেন ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

গতকাল সকালে—বেলা তখন বোধহয় সাড়ে আটটা কি নটা হবে—ভাঙা
গলায় বলতে লাগলেন বিনয় চৌধুরী—

বলুন !

আমার চাকর রাজেন বলছিল—ওর এক বন্ধু ওকে ডাকতে এসেছিল—তারই
বের হয়ে যায়।

তারপর ?

তারপর আর ফিরে আসেনি।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

আমি উপরে ছিলাম—অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। বিনয় চৌধুরী বলে

রাজেন বলতে পারেনি কে সে ?

না।

কতদিন আপনার বাড়িতে রাজেন চাকরি করছে ?

তা আজ প্রায় আট বছর হবে—

তবে তো পুরনো লোক—তার দাদাবাবুর বন্ধুদের সে চেনে না ? বলতে পার
কে সে ?

বলেছে তাকে সে আগে নাকি খোকার কাছে কখনও আসতে দেখেনি।

কি রকম দেখতে, কত বয়স হবে সে ছেলেটির ?

খোকারই বয়সী হবে বলছিল—সে এসে খোকাকে ডাকে—তারপরই খোক
হয়ে যায়—

বলতে পারেন ওর কোন্ কোন্ বন্ধুরা বেশী আসত ওর কাছে ?

না।

কাউকেই দেখেননি আপনি ?

দেখলেও ওদিকে কখনও নজর দিইনি।

আপনার সামনের বাড়ির অ্যাডভোকেট রসময়বাবুকে আপনি চেনেন আপন
পাড়ায় ?

চিনি—তাঁর ছেলেটি—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—যে সুশান্ত ছেলেটি কিছুদিন আগে খুন হয়েছে—তার সঙ্গে

ের বন্ধুত্ব ছিল না ?

বোধহয় ছিল।

াকে, মানে সুশান্তকে কখনও আসতে দেখেননি আপনাদের বাড়িতে ?

আগে দেখতাম মধ্যে মধ্যে, তবে ইদানীং কই বড় একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বিনয়বাবু, আপনার কি ঐ একটি মাত্রই ছেলে ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

বনয় চৌধুরীর চোখ দুটো এতক্ষণে জলে ভরে যায়।

প্রচণ্ড আকস্মিক শোকের যে মর্মান্তিক আঘাতটা তাঁকে বিমূঢ় বোবা করে দিয়েছিল র মধ্যে যেন প্রথম চিড় ধরল। বিনয় চৌধুরী মাথাটা নীচু করে রুদ্ধ স্বরে বললেন, কটিই ছেলে ও দুটি মেয়ে আমার—ওর ছোট—জানি না ক করে মিনতির সামনে দাঁড়াব। গতকাল থেকে সে এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেনি।

কিরীটী ভদ্রলোককে কি সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারে না।

আমি খবর পেয়েছিলাম ইদানীং কি সব পার্টি-ফার্টি করে বেড়াচ্ছিল সমু—কিন্তু ঝনই তো আজকালকার ছেলে—যেটা বারণ করা যাবে সেটাই করবে।

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বিনয় চৌধুরী, পোস্ট মর্টেম না হলে বোধহয় পাব না ?

না।

কখন পেতে পারি ?

কাল দুপুর নাগাদ।

আমি চলি—বিনয় চৌধুরী আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন শ্লথ লগ্ন পদবিক্ষেপে যেন।

সেদিনের সে ঔদ্ধত্য আর মেজাজের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

সুদর্শন বললে, Poor father !

কিরীটী কি যেন ভাবছিল অন্যমনে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতেই ধরা ।

দাদা ?

অ্যা !

কি ভাবছেন ?

একবার সুষমার সঙ্গে দেখা করা দরকার—কিরীটী বললে।

কখন দেখা করতে চান ?

আজ সন্ধ্যাতেই ব্যবস্থা কর না।

বেশ।

ঐ চপ্পলজোড়া দাও তো!

সুদর্শন, কাগজে জড়ানো চপ্পলজোড়া একপাশে পড়েছিল, সে দুটো কিরী সামনে এগিয়ে দিল।

কিরীটী আবার চপ্পলজোড়া—বিশেষ করে ডান পাটিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক পরে গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল।

কি দেখছেন দাদা?

জান সুদর্শন, পার্কে তখন তোমায় বলছিলাম না—death always leav behind its footsteps—মৃত্যু তার পদরেখা পশ্চাতে ফেলে রেখে যায়—এই চপ্প জোড়াই তার প্রমাণ।

আপনি কি—

হ্যাঁ সুদর্শন, ভগবানের কি সূক্ষ্মবিচার দেখ, এই চপ্পলজোড়া যদি হত্যাকারী তার সহকারী তাড়াহুড়োতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে ও কিছুটা এর ভয়াবহ পরিণতি না ভেবেই ওখানে পার্কের মধ্যে ফেলে না যেত—হয়ত তার চেহারাটা এত স্পষ্ট হ উঠত না। ভাগ্যে গত রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল তাই চপ্পল পরে এঁটেল মাটিতে হাঁট অসুবিধা হওয়ায় চপ্পলজোড়া সে খুলে ফেলেছিল পা থেকে।

সবার অলক্ষ্যে একজন যিনি বিচারের আসনে বসে আছেন, এ বলতে পার তাঁ ন্যায়দণ্ড—তার মাথায় এসে গতরাত্রে পড়েছিল। বিধাতার মার বড় বিচিত্র সুদর্শন। সেখানে কোন দয়া নেই—ক্ষমা নেই।

তাহলে আপনি হত্যাকারী সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হয়েছেন দাদা?

শুধু স্থিরনিশ্চিতই নয় ভায়া—হত্যাকারী তোমার সামনে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াবে

পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াবে!

হ্যাঁ—তাকে আসতেই হবে।

কিন্তু এখনও একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না দাদা, ঐ ধরনের চপ্পল অনেকেই ব্যবহার করতে পারে!

তা পারে—পারবে না কেন?

তবে?

তুমি হয়ত-জান না বা কখনো লক্ষ্য করোনি—জুতো চটি চপ্পল যারা ব্যবহার ক কিছুদিন ব্যবহারের পরই সেই জুতো চটি চপ্পলের ওপরে ও নীচে তার পায়ের বৈশি —তার চলার বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে অর্থাৎ তার পায়ের বিশিষ্টতা ও চলার বৈশিষ্ট্য—

গলে ছাপ ফেলেছে সেই বিশিষ্টতাই হবে আমাদের হাতে তুরুপের তাস। মোক্ষম র্থ প্রমাণ তার বিরুদ্ধে।

রপর একটু হেসে মৃদুকণ্ঠে বললে কিরীটী, হত্যাকারী কে অনুমান আমি গত কিছুটা করেছিলাম—কিন্তু তাহলেও তাকে ধরবার মত কোন নীরেট প্রমাণ হাতের কাছে ছিল না। কিন্তু দেখ বিধাতার কি বিচিত্র মার—সে আপনিই বারে সামনে দাঁড়াবে। আর নয়—এবারে উঠব। আর একটা খবরের কাগজে জোড়া জড়িয়ে দাও তো—

কিরীটী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। সুদর্শন একটা পুরাতন সংবাদপত্রে চপ্পলজোড়া কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

ড়িতে বসে কিরীটী বললে, প্রথমবার মৃতদেহটা আমার দেখবার সুযোগ হয়নি তাই উওের বিশিষ্টতাটা আমার চোখে পড়েনি—কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কি কসের সাহায্যে দু-দুটো হত্যা সংঘটিত হয়েছে।

ক ধরনের অস্ত্র? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল।

জ সন্ধ্যাতেই বোধ হয় সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

॥ ১৯ ॥

র পরামর্শ মত সুদর্শন আগেই যতীন চক্রবর্তীকে সংবাদ দিয়ে রেখেছিল তাঁর ন ফোনে, তারা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ পাল স্ট্রীটে তাঁর বাড়িতে যাবে। তিনি স্থিত থাকেন এবং তাঁর দুই মেয়ে প্রতিভা ও সুষমাও।

টা রবিবার। যতীন চক্রবর্তীর হাতীবাগান মার্কেটের দোকান তাই বন্ধই ছিল। পুলিসের নির্দেশে ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির বাইরের ঘরে বসেই সুদর্শনের আগমন করছিলেন।

রীটী আর সুদর্শন ঘরে ঢুকল।

রীটী ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিল, তার পরই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল র ফটোটার উপরে।

রীটী এগিয়ে গিয়ে ফটোটার সামনে দাঁড়াল।

ীন চক্রবর্তী ভিতরে ছিলেন—ভৃত্যের মুখে সংবাদ পেয়ে ঐ সময় এসে ঘরে ।

রীটী ও সুদর্শন দুজনেই যতীন চক্রবর্তীর দিকে তাকালেন।

আপনারা দাঁড়িয়ে কেন দারোগাবাবু বসুন!

গলাটা কথা বলতে গিয়ে যতীন চক্রবর্তীর যেন কেমন কেঁপে গেল।

কিরীটী বললে, আপনিও বসুন।

সকলেই বসল।

যতীন চক্রবর্তী ভিতরে ভিতরে নিদারুণ একটা উদ্বেগে বিশেষ অস্থির হ... এতক্ষণ—সেটাই তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়। বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো... আমার এবং আমার মেয়েদের সঙ্গে কি কথা বলতে চান?

সুদর্শন গম্ভীর ভাবে বললে, আপনার মেয়েরা আছেন তো?

আছে।

কিরীটী তখন বললে, আপনার ছোট মেয়ে সুষমা দেবীকে একবার ডাকুন।

যতীন চক্রবর্তীর ভৃত্য, যে একটু আগে সুদর্শনের দরজা খুলে দিয়েছিল তখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বললেন, রামচরণ, যা ছোট্‌দি... গিয়ে ডেকে আন্—

রামচরণ চলে গেল।

আমি কিছুই এখনও বুঝতে পারছি না—যতীন চক্রবর্তী আবার বললেন. ... মেয়েরা কি কিছু করেছে? আমি হলফ করে বলতে পারি মশাই—আমার মে... প্রকৃতির নয়, এ পাড়ার যে কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—

কিন্তু আপনার মেয়েদের যে সব ছেলে-বন্ধুরা আছে—যারা এখানে আস... করে—তাদের কথা কিছু জানেন? কিরীটী বললে।

ছেলে-বন্ধু! না, না—আমার মেয়েরা সে রকম নয়—

ঠিক এ সময় সুষমা এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী এই প্রথম সুষমাকে দেখল। সত্যিই সুন্দরী মেয়েটি। দৃষ্টি আক... মতই রূপ। কিরীটী লক্ষ্য করল, বেশভূষা মেয়েটির কিছুটা অগোছালো। মাথা... অবিন্যস্ত, মনে হয় শয্যায় শুয়েছিল, উঠে এসেছে।

চোখ দুটি ফোলা ফোলা। মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্রও নেই।

বসুন সুষমা দেবী, কিরীটী বললে।

সুষমা কিন্তু বসল না। দাঁড়িয়েই রইল।

কিরীটী এবারে যতীন চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বললে, চক্রবর্তী মশাই, আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হবে—

বাইরে যাব? একটু যেন কেমন থতমত খেয়েই প্রশ্নটা করলেন যতীন চক্র...

হ্যাঁ—ভেতরে যান, ওঁকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই—একা একা—রামচরণ, তুমিও যাও—

তারপরই সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললে, সুদর্শন, একজন সেপাইকে ঐ ভিতরের দরজার সামনে প্রহরা রাখ যেন কেউ আমাদের কথাবার্তা না শুনতে পায়—কেউ না এদিকে আসতে পারে।

সুদর্শন তখুনি উঠে বাইরে থেকে একজন সেপাইকে ডেকে এনে অন্দরে যাবার দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে সে তিনজন প্লেন-ড্রেস সেপাই কিরীটীর পরামর্শমতই নিয়ে এসেছিল।

যতীন চক্রবর্তী ও রামচরণ ভিতরে চলে গেল।

কিরীটী আবার সুষমার মুখের দিকে তাকাল, আমি বুঝতে পারছি সুষমা দেবী, মহেশবাবুর আকস্মিক মৃত্যুটা আপনাকে খুবই আঘাত দিয়েছে—

সুষমা নিঃশব্দে কিরীটীর দিকে মুখ তুলে তাকাল। দু চোখে কিছুটা বিস্ময় কিন্তু অশ্রু ভরো-ভরো।

আমি বুঝতে পারছি—আপনারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতেন।

হঠাৎ ঐ সময় সদরে একটা গোলমাল শোনা গেল। সদরে প্রহরারত সেপাই কাকে যেন ভিতরে আসতে দিতে চাইছে না—

সুদর্শন বলে ওঠে, কি ব্যাপার হল আবার বাইরে?

কিরীটী বললে, তোমার সেপাইকে ডেকে বল ওকে ভেতরে আসতে দিক—আমি মতাকে দিয়ে সুষমার নাম করে ওকে এ-সময় এখানে আসতে বলেছি ফোনে—

কে?

যাও না—বল না ওকে আসতে দিতে ঘরে—কিরীটী আবার বললে।

সুদর্শন বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই সে কল্যাণ দত্তকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কল্যাণবাবু, আসুন—আপনারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই কিরীটীর অভ্যর্থনায় যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় মুহূর্তের জন্য, কিন্তু পরক্ষণেই সুষমার দিকে তাকিয়ে বললে, কি ব্যাপার সুষি!

সুষমা সাড়াও দিল না—কল্যাণের দিকে তাকালও না ফিরে।

ব্যস্ত হবেন না কল্যাণবাবু, সুষমা দেবী ফোনে আপনাকে এ-সময় এখানে আসতে বলেননি।

সুষমা, তুমি ফোন করোনি? কল্যাণ বললে।

না।

আমিই একটি মেয়েকে দিয়ে ওর নাম করে আপনাকে ফোন করিয়েছিলাম, এই সময় এখানে আসবার জন্য।

আপনি!

হ্যাঁ।

কেন?

এসে পড়েছেন যখন সবই জানতে পারবেন।

কে আপনি?

সুদর্শনই জবাব দিল, উনি কিরীটী রায়—

কিরীটী রায়!

হ্যাঁ—মনে হচ্ছে আমার নামটা আপনার অপরিচিত নয়, তাই না কল্যাণবাবু? জবাব দিল কিরীটীই।

এসবের মানে কি?

বসুন না। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—সব মানেই এখুনি পরিষ্কার হয়ে যাবে। বসুন—বসুন—দাঁড়াতে আপনার বেশ কষ্টই হচ্ছে বুঝতে পারছি—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, আবার কার সঙ্গে যেন বাইরের দরজায় প্রহরারত সেপাইয়ের বাদানুবাদ ওদের কানে এল।

আবার কে এল! সুদর্শন বললে।

শ্যামল ঘোষাল—দেখ বোধহয় এল।

শ্যামল ঘোষাল! সুদর্শন যেন রীতিমত বিস্ময় অনুভব করে কিরীটীর কথায়।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসছে।

হ্যাঁ—যাও, ভদ্রলোককে এ ঘরে নিয়ে এস। ওকেও প্রতিভা দেবীর নাম করে মিতাকে দিয়ে আজ এই সময় এখানে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসতে বলেছিলাম।

সুদর্শন আর দ্বিরুক্তি করে না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কিরীটী দরজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটু পরেই প্রথমে সুদর্শন ও তার পশ্চাতে শ্যামল ঘোষাল ঘরে এসে ঢুকল।

কিরীটী চেয়ে আছে তার দিকে।

সুদর্শন-বর্ণিত সেই বেশ আজও শ্যামলের অঙ্গে—পায়জামা ও গেরুয়া রংয়ের উঁচু কলার দেওয়া ঢিলে পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

আসুন আসুন শ্যামলবাবু, দেখুন, আপনার বন্ধুটি আগেই এসে গিয়েছেন!

শ্যামল কিন্তু কিরীটীর দিকে তাকালও না, তার কথার কোন জবাবও দিল না

কে কেবল অদূরে দণ্ডায়মান কল্যাণের দিকে তাকিয়ে সুষমার দিকে তাকাল।

সুষমাকেই লক্ষ্য করে আবার বললে, কি ব্যাপার সুষমা?

ওকে প্রশ্ন করা বৃথা শ্যামলবাবু. কারণ ব্যাপারটা উনিও বিন্দুবিসর্গ জানেন না। নার বন্ধু কল্যাণবাবুও জানেন না—জানি কেবল একমাত্র আমিই। হ্যাঁ—আমি রীটী রায়—

নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শ্যামল চকিতে কিরীটীর মুখের দিকে কাল।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসছে তখনও।

আর একবার শ্যামল কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল সুদর্শনের দি। সুদর্শনও প্লেন ড্রেসেই এসেছিল।

সুদর্শনবাবুকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই শ্যামলবাবু—শ্যামপুকুর থানা অফিসার— সেদিন আপনি বলেছিলেন প্রশান্ত যে রাত্রে খুন হয় সে রাত্রে আপনি রাত ড় এগারটা থেকে রাত সাড়ে বারোটার সময় বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?

শ্যামল ব্যাপারটা ততক্ষণে কিছুটা অনুমান করে নিয়েছিল।

বুঝতে তাই পেরেছিল আজকের চক্রান্তটা পুলিসের এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় ক সে সেই চক্রান্তের মধ্যে এসে পা ফেলেছে।

শ্যামল বললে, হ্যাঁ, বলেছিলাম তো—

মিথ্যে বলেছিলেন কেন?

মানে। তির্যক দৃষ্টিতে ভ্রূ তুলে তাকাল শ্যামল ঘোষাল যেন কতকটা বিদ্রোহীর তই কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী তেমনি মৃদু মৃদু হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে, মিথ্যে বলেছিলেন তাই াম মিথ্যে।

মিথ্যে?

হ্যাঁ, একটা ইচ্ছাকৃত মিথ্যে।

না। আমি মিথ্যে বলিনি।

বলেছিলেন, এখনও মিথ্যে বলছেন। কারণ আমি জানি—

কি জানেন জানতে পারি কি?

আপনি সে রাত্রে ঐ সময়টা আদৌ বাড়িতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন না—

তবে কি মাঠে চরে বেড়াচ্ছিলাম?

মাঠে নয়, সিনেমায়—

সিনেমায় ? কে বলেছে আপনাকে ?

দিব্যেন্দু পালিত।

দিব্যেন্দু বলেছে ! এবারে শ্যামলের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ কেমন ঝিমিয়ে এল

আর একজন বলেছেন—যিনি সে রাত্রে একই সিনেমায় একই শোতে গিয়েছিলেন—আপনারই সঙ্গে—

কে—কে বলেছে ?

সবই জানতে পারবেন, ব্যস্ত কেন ? তাছাড়া—

কিন্তু কিরীটীকে এ সময় একপ্রকার থাবা দিয়েই থামিয়ে দিযে কল্যাণ শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললে, ওঁর কোন কথার জবাব দিস না শ্যামল।

কিরীটী এবার কল্যাণ দত্তর দিকে ঘুরে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বললে, কিন্তু রাত্রে ওঁর সঙ্গে কে গিয়েছিল সিনেমায় নাইট শোতে আপনারও জানা বোধ হয় দরকার কল্যাণবাবু, তাই নামটা জানাচ্ছি—তিনি প্রতিভা দেবী—

What ? কল্যাণের গলা দিয়ে যেন একটা অর্ধস্ফুট আর্তনাদ বের হয়ে এল

হ্যাঁ কল্যাণবাবু, বয়স আপনাদের অল্প তাই এখনও বুঝতে পারেননি বা জানতেপারেননি—নারীর আর এক নাম মোহিনী। মহাভারত পড়া আছে নিশ্চয়ই—আপনারা কোন্ ছার—স্বয়ং যোগীশ্বর মহাদেবও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি দেখে তাঁর পিছনে পা ছুটেছিলেন। কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, বিচিত্র নাটক, তাই না কল্যাণবাবু আপনি হয়তো এখনো জানেন না একটা কথা—তার পরই হঠাৎ ঘুরে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, এবারে প্রতিভা দেবীকে ডাক সুদর্শন !

প্রতিভাকে ডাকতে হল না—সে নিজেই ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকল নিঃশব্দে। এতক্ষণ পাশের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি ওই ঘরের মধ্যে যা ঘটছিল শুনছিল—তার নাম কানে যেতেই ঘর থেকে বের হয়ে সোজা এসে ঐ ঘরে ঢুকল।

আসুন আসুন প্রতিভা দেবী !

প্রতিভা তাকালও না কিরীটীর মুখের দিকে—তাকাবার অবকাশও পেল না, সে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণ ডাকে, প্রতিভা !

মিথ্যে ওঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা করছেন কল্যাণবাবু, জবাব পাবেন না—উনি দেবেন না—দিতে পারেন না—কিরীটী বললে, কারণ আপনারা দুজনেই ওঁর দ্বারা dupe প্রতারিত হয়েছেন—

প্রতিভা নির্বাক।

কিরীটী বললে, শ্যামলবাবু, কল্যাণবাবু—আপনাদের দুজনের কাউকেও উনি—প্রতিভা দেবী ভালবাসতেন না।

প্রতিভা যুগপৎ কল্যাণ ও শ্যামলের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে উঠল।

কিরীটী এবার সুষমার দিকে তাকাল, কি সুষমা দেবী, আমি যা বলছি—যদিও অনুমান, তাই ঠিক না?

সুষমা নির্বাক পাথর।

॥ ২০ ॥

ঘরের মধ্যে যেন ক্ষণকালের জন্য একটা পাষাণভার স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিরীটীই আবার, বুঝতে পারছি শ্যামলবাবু, কল্যাণবাবু—both of you are terribly shocked! আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু জানেন তো, truth is stranger than fiction! এবারে আসুন—let us have some frank discussion—বলুন আপনারা আঠারো দিন আগে ৩রা জুন শনিবার যে রাত্রে এই বাড়ির পাশের বাড়িতেই নীচের তলার একটা ঘরে আপনাদের দুজনেরই একদা অন্তরঙ্গ বন্ধু সুশান্তবাবু নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন সেই রাত্রির কথা।

বিহ্বল ভাব অনেকটা কেটে যায় যেন কিরীটীর ঐ কথায় শ্যামল ঘোষাল ও কল্যাণ দত্ত উভয়েরই। ওরা দুজনেই যুগপৎ একসঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কল্যাণবাবু, এবারে বলুন সত্যি কথাটা সেরাত্রে রাত সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন? আর শ্যামলবাবু, আপনি বলুন, গতকাল রাত্রে আপনি সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

কল্যাণ দত্তকে মনে হল যেন সে ঝিমিয়ে পড়েছে কিছুটা। সে শান্ত গলায় বললে, আমি বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম—

প্রতিভা দেবী, উনি কি সত্যি বলছেন? কিরীটী প্রতিভাকে প্রশ্নটা করল।

প্রতিভা নির্বাক।

জবাব দেবেন না—তাই না? আচ্ছা একটা চিঠি পড়ে শোনাই, যে চিঠিটা পড়লে হয়তো আপনার মত বদলাতেও পারে—বলতে বলতে কিরীটী তার পকেটে হাত চালিয়ে একটা চিঠি বের করল।

চিঠির ভাঁজ আলোর নীচে ধরে খুলতে খুলতে কিরীটী শান্ত গলায় বললে, এই চিঠিটা

—আপনাদের সবারই জানা দরকার—আমি পেয়েছি প্রমীলা দেবীর কাছে।

নির্বাক যেন পাথর ওরা।

কিরীটী বলতে লাগল, চিঠিটা কাকে লেখা জানেন! মৃত বা নিহত সুশান্তবাবুকে—আজ থেকে মাস দেড়েক আগে। অর্থাৎ দুর্ঘটনার ঠিক মাসখানেক আগে—

কিরীটী অনুচ্চ কণ্ঠে চিঠিটা পড়তে শুরু করল. তুমি যে আমার সঙ্গে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যা হোক, শেষ তোমাকে আমি শেষবারের মত বলছি, প্রমীলাকে তুমি মন থেকে মুছে ফেল। তোমার চিঠির জবাবের জন্য অপেক্ষা করব পনের দিন—I think that time would be quite sufficient for you—তারপর আমি—মানে আমাকে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা করতে হবে। মনে করো না এটা আমার একটা মিথ্যা আস্ফালন—ইতি—

শুনলেন চিঠিটা আপনারা—এবারে বোধ হয় জানতে চাইবেন কার চিঠি—কে লিখেছিল চিঠিটা সুশান্তবাবুকে!

কারও মুখেই কোন কথা নেই। সবাই যেন চিত্রার্পিতের মত যে যার জায়গায় দণ্ডায়মান—শ্যামল ঘোষাল—কল্যাণ দত্ত—প্রতিভা ও সুষমা।

আর সুদর্শন, যে আজকে কি ঘটতে চলেছে যতীন চক্রবর্তীর গৃহে কিছুই জানত না—সেও যেন স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সে বুঝতে পারছিল নাটকের শেষ অঙ্কে এসে তারা পৌঁচেছে।

ঘরের মধ্যে আবার নেমে এসেছে পাষাণভার স্তব্ধতা যেন।

কিরীটী সকলের মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর শান্ত গলায় বললে, তাহলে বলি শুনুন—নীচে নাম লেখা—ইতি প্রতিভা।

অকস্মাৎ যেন সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল। ক্রুদ্ধ একটা বাঘিনীর মতই সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিভা কিরীটীর উপর।

তবে কিরীটী অনুমান বোধ হয় করেছিল কি অতঃপর ঘটতে পারে—সে প্রস্তুত ছিল। সে মুহূর্তে সবল দুটো বাহু দিয়ে প্রতিভাকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু টাল সামলাতে পারে না—হেলে পড়ে।

You filthy creature! You dirty snape—I shall kill you—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা।

কিরীটীর হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু পারে না। তার আগেই সুদর্শন এগিয়ে এসে প্রতিভার একটা হাত শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে প্রতিভাকে সরিয়ে দেয়।

ক্রুদ্ধা কালনাগিনীর মত প্রতিভা যেন ফুঁসছে।

যতীন চক্রবর্তী ঐ সময় চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন, নীচের ঘরে সেপাইদের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও।

কি—কি এসব? কি ব্যাপার?

আপনি কেন এলেন যতীনবাবু এ সময় এ ঘরে? যান যান—বাইরে যান—কিরীটী বললে।

চিৎকার করে উঠল প্রতিভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, সুদর্শন তখনও তার হাত শক্ত করে ধরে আছে, বের করে দাও—এদের বের করে দাও বাবা এখান থেকে!

গম্ভীর গলায় এ সময় সুদর্শন বললে প্রতিভাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, মিস চক্রবর্তী. If you don't behave properly—আপনাকে arrest করতে আমি বাধ্য হব।

ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে—প্রতিভা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের ধৃত হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সুদর্শনের বলিষ্ঠ মুষ্টি হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

প্রতিভার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে তখন।

গায়ের কাপড় খুলে গিয়েছে।

দু'চোখে ঘৃণিত শাণিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

শ্যামল আর কল্যাণ স্তম্ভিত। তারা যেন দুজনেই বোবা। আর সুষমাও।

যতীন চক্রবর্তী কি করবেন—কি বলবেন যেন বুঝে উঠতে পারেন না এই মুহূর্তে।

সুদর্শন জোর করেই একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল প্রতিভাকে।

বসুন—একটু বেচাল দেখলেই আমি হাতে আপনার হাতকড়া লাগাব।

প্রতিভা হাঁপাতে থাকে আক্রোশে, ক্ষোভে।

যতীনবাবু, যান এ ঘর থেকে—এ নোংরামির মধ্যে আপনার থাকা উচিত হবে না হয়ে—আবার কিরীটী বললে।

মাথা নীচু করে যতীন চক্রবর্তী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যেন বেত্রাহত পশুর মতই।

শ্যামলবাবু, কল্যাণবাবু—এবারে বুঝতে পেরেছেন তো—প্রতিভা দেবীর মন আসলে কি খুঁটিতে বাঁধা ছিল! She played both of you fools—আপনাদের দুজনকেই উনি বোকার মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন মুখে প্রেমের অভিনয় করে—

কল্যাণ বললে, আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম—

পেরেছিলেন? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ—কিন্তু জানতাম না কে! তাই আমিও শেষের দিকে অভিনয় করে গিয়েছি—

বলে সে আড়চোখে সুষমার দিকে তাকাল।

শ্যামল একটা কথাও বলে না। অনড় পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু আবার আপনি—মানে দ্বিতীয়বারও আপনি ভুল করেছিলেন কল্যাণবাব কিরীটী বললে।

দ্বিতীয়বার ভুল করেছি ?

হ্যাঁ—সুষমা দেবীও আপনাকে ভালবাসতেন না—ভালবাসতেন আপনাদের সমরেশবাবুকে।

ঘরের মধ্যে যেন আবার বজ্রপাত হল!

কল্যাণ দণ্ড ফ্যালফ্যাল করে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুষমার দিকে—সু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিরীটী আবার মুখ খুলল, সামনাসামনি এই স্বীকারোক্তিটুকু আপনাদের সকল দিয়ে করাবার জন্যই আজকে কৌশলে আপনাদের দুই বন্ধুকে এইখানে ডেকে এনেছি কারণ এই বাড়িরই কোন কক্ষে দু-দুটি হত্যার সংকল্প দানা বেঁধে ওঠে। সুশান্ত রায় ও সমরেশ চৌধুরী দুটি নিষ্পাপ প্রাণ একজনের ভুলের খেসারত দিল—এবারে বলুন শ্যা বাবু—সে রাত্রে শেষ পর্যন্ত আপনারা সিনেমা দেখেছিলেন কি ? আর যদি দেখে থা তবে শো কটার সময় ভেঙেছিল ?

শ্যামল নির্বাক।

কল্যাণবাবু, আপনি বলুন আপনি তো সেরাত্রে এসেছিলেন সুষমার সঙ্গে করতে এ বাড়িতে ?

না না—কল্যাণ প্রতিবাদ জানায়, আসিনি আমি—আসিনি—

সুষমা দেবী, উনি কি ঠিক কথা বলছেন ?

সুষমা চুপ।

বলুন সুষমা দেবী, চুপ করে যাবেন না—আপনার—সমরেশের হত্যাকারীকে সত্যিই ধরিয়ে দিতে চান—সত্যিই যদি সমরেশকে আপনি ভালবেসে থাকে বলুন—চুপ করে অমন থাকবেন না। Speak out!

কল্যাণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুষমার মুখের দিকে।

সুষমা দেবী—মিস চক্রবর্তী—

খিলখিল করে হঠাৎ হেসে উঠল প্রতিভা ঐ সময়।

প্রতিভা হাসছে তো হাসছেই। গমকে গমকে হাসি যেন উছলে পড়ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে।

প্রতিভা দেবী—প্রতিভা দেবী—এগিয়ে এল কিরীটী।

প্রতিভা হাসছে আর হাসছে। হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে যাচ্ছে।

কিরীটী প্রতিভার দুই কাঁধে হাত রেখে প্রবল ঝাঁকি দেয়—প্রতিভা দেবী—প্রতিভা
—

প্রতিভা হাসছে—

সুষমাও এগিয়ে আসে। আকুল কণ্ঠে ডাকে, দিদি, দিদি—

কিন্তু প্রতিভা হেসেই চলেছে—

প্রায় মিনিট পনের একনাগাড়ে হাসতে হাসতে অবশেষে হঠাৎ কয়েকটা হেঁচকি প্রতিভা চেয়ারের ওপরে এলিয়ে পড়ল।

আর সাড়াশব্দ নেই।

সুষমা দেবী—একটু জল নিয়ে এসে ওঁর চোখেমুখে দিন।

ইতমধ্যে যতীন চক্রবর্তী ঘরে এসে ঢুকে পাথরের মতই এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

চিৎকার করে উঠলেন যতীন চক্রবর্তী, কি হল—প্রতিভা কি মরে গেল ?

ভয় পাবেন না যতীনবাবু—hystiric fit—ফিট হয়েছে—সুদর্শন—

দাদা!

প্রতিভা এখানেই থাক্—আপাততঃ শ্যামলবাবু আর কল্যাণবাবুকে নিয়ে চল আমরা যাই—দুজন সেপাই এখানে প্রহরায় রেখে যাও।

পুলিসের জীপ বড় রাস্তাতেই ছিল—কল্যাণ আর শ্যামলকে নিয়ে কিরীটী ও গিয়ে জীপে উঠে বসল।

মোহন সিং—থানা—

মোহন সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

॥ ২১ ॥

যখন ওরা এসে পৌঁছল তখন রাত্রি সাড়ে এগারটা প্রায়।

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছিল—বর্ষণ শুরু হল। বর্ষণ শুরু হল পথেই ; জীপে ওদের আসতে আসতে।

থানায় এসে পৌঁছাবার পর বর্ষণ প্রবল হয়ে এল।

কল্যাণ এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, শ্যামলও বলেনি। দুজনেই ঘটনার আকস্মিক-

তায় বুঝি কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই ওর সং কিরীটী ও সুদর্শন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে জীপে উঠে বসেছিল এবং থানায় এসে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল।

বাইরে ঝমৃঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

বসুন কল্যাণবাবু—শ্যামলবাবু বসুন—কিরীটী বললে।

কিন্তু ওরা কেউই বসল না। কল্যাণ বললে, কিন্তু আমাদের থানায় ধরে এলেন কেন কিরীটীবাবু?

গত ৩রা জুন শনিবার রাত্রে আপনাদের সহপাঠী সুশান্তবাবুকে কে বা কারা করেছিল—এবং পরে গত শনিবার কে আপনাদের বন্ধু সমরেশবাবুকে হত্যা করে যদিও আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে—

কে? কে হত্যা করেছে? কল্যাণ যেন উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে।

বলব—সবই বলব আপনাদের, কারণ আপনাদেরও তো জানা দরকার— দুজনকে অমন নিষ্ঠুর ভাবে প্রাণ দিতে হল—কিন্তু তার আগে আমি মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি তাই আপনাদের দুই বন্ধুকে শোনাতে চাই। অনেকটা আমার অনুমান, তাই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে—আশা করি আপনারা সে ত্রুটি আমার শুধরে নেবেন—

কল্যাণ ও শ্যামল চুপ করে থাকে।

কিরীটী বলতে থাকে, শ্যামলবাবু—কল্যাণবাবু—এককালে আপনাদের দুজনের সঙ্গেই সুশান্তবাবুর বন্ধুত্ব ছিল—উঁহু—অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। সে বন্ধুত্বে চিড় ধরল সেইদিনই যেদিন এক নারীকে নিয়ে আপনাদের দুজনের মনেই জাগল। অথচ মজা হচ্ছে, আপনারা শ্যামলবাবু—কল্যাণবাবু—আপনাদের একজনও কিন্তু সে কথা বুঝতে পারলেন না।

প্রতিভা হচ্ছে আসলে সেই টাইপের মেয়ে যাকে বলা হয় স্বৈরিণী, হয়ত আপনা সব কথা শোনার পর দুজনেরই মনে হতে পারে, এবং হয়ত এখনো ভাবছেন কিন্তু সত্যি সে টাইপের মেয়ে কিন্তু সে নয়।

আসলে প্রতিভা সত্যিকারের ভালবাসত সুশান্তকেই—কি দুজনেই চমকে উঠ তাই না—কিন্তু তাই—আপনাদের দুজনের একজনকেও সে কোনদিন এতটুকু ভা বাসেনি—এখন তো বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই—

অথচ আপনারা দুজনেই ভেবেছেন প্রতিভা বুঝি আপনাদেরই ভালবাসে। কি জানেন, সেটাই ছিল তার মূলধন—আপনাদের ভালবাসার বিশ্বাসের দুর্বলতাটুকু

টুকুই সে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল।

দুজনের কারও মুখে কথা নেই—দুজনেই যেন যাকে বলে বজ্রাহত।

কবীটীও বুঝতে পারে, প্রতিভার সত্যিকারের মনের কথাটা ঐ দুই বন্ধুকে ক স্মক কি মর্মান্তিক আঘাতই না হেনেছে।

কবীটী বললে, ব্যাপারটা হয়ত এক দিন আপনারা জানতেও পারতেন ভবিষ্যতে—জ হয়ত এমন করে আপনাদের আমার মুখ থেকে নিষ্ঠুর সত্যটা জানতে হত না—না সুশান্তকে হারাবার আশঙ্কায় প্রতিভা ভিতরে ভিতরে উন্মাদিনী না হয়ে ত—

থাক্—যা বলছিলাম।

কবীটী বলতে লাগল—

তিভা ভালবাসত সুশান্তকে, কিন্তু সুশান্ত ভালবাসত আসলে সত্যিকারের মীলাকে এবং সেটা যে প্রতিভা বুঝতে পারেনি তাও নয়। কিন্তু সুশান্তর প্রতি বাসায় প্রতিভা এমন উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল যে সে শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়েই ং সুশান্তর মনকে কিছুতেই না ফেরাতে পেরে ভয়ঙ্কর এক সংকল্প নিল।

হয়ত প্রতিভা ভেবেছিল—সে যখন পেল না—প্রমীলাকেও সে পেতে দেবে না ন্তকে।

অথচ আপনাদের দুজনের একজনও বুঝতে পারেননি তখনও যে প্রতিভা আপনাদের ছলছে। হঠাৎ কিরীটী থেমে বললে, শ্যামলবাবু, এবারে বলবেন কি সে রাত্রের ?

শ্যামল যেন মন্ত্রমুগ্ধ—বললে, কোন্ রাত্রের কথা ?

গত ৩রা জুন শনিবার রাত্রের কথা—যে রাত্রে সুশান্তবাবু নিহত হন ?

আমি—আমি কি জানি ?

জানেন আপনি অনেক কিছু—

আমি তো প্রতিভাকে নিয়ে নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিলাম। তারপর শো র পর—

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, শো ভাঙার পর কি হল ?

কেন, বাড়ি ফিরে গিয়েছি।

আবার মিথ্যা বলছেন ?

মিথ্যা !

হ্যাঁ—a deliberate lie।

না, না—

কিরীটী দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ মিথ্যা—শুনুন শ্যামলবাবু—আপনি এখনও জানে না—সে রাত্রে সমরেশবাবু স্বচক্ষে যা দেখেছিলেন তাঁর ঘর থেকে তার একটা স্টেটমেন্ট থানায় দিয়ে গিয়েছিলেন—

সমরেশ! কল্যাণ আর শ্যামল একসঙ্গেই বলে ওঠে।

হ্যাঁ—আপনারা স্বপ্নেও হয়ত ব্যাপারটা ভাবতে পাবেননি—তাই তাকেও সরে যেতে হল পৃথিবী থেকে। কিন্তু পাপ আর গরল এমনই একটা ব্যাপার—যে একটার পিছু আর একটা এসে যেমন ভিড করে, তেমনি পাপ আর গরল চাপাও থাকে না। বলুন সে রাত্রে কি ঘটেছিল—কেমন করে সুশান্তবাবু খুন হলেন?

কিন্তু শ্যামল আর কল্যাণ দুজনেই চুপ।

কিছুক্ষণ কিরীটীও চুপ করে রইল—তারপর বললে, বলবেন না, বেশ! আমি বলছি—সে রাত্রে—শ্যামলবাবু, আপনি নাইট শোব পর ফিরে যাননি—প্রতিভার সঙ্গে তাদের বাড়িতে এসেছিলেন—

শ্যামল একেবারে চুপ।

এসেছিলেন আমি জানি। রাত তখন গভীর—সবাই ঘুমিয়ে, কিন্তু দুঃ আপনাদের একজন জেগে ছিল—আপনাদের বন্ধু সমরেশবাবু, ঠিক সামনের বাড়িতে যিনি তাঁর ঘরের জানালাপথে সব দেখেছেন—

কিন্তু আমি—আমি সুশান্তকে হত্যা করিনি—শ্যামল চেঁচিয়ে উঠল

তবে কে করেছিল সুশান্তকে হত্যা?

প্রতিভা—ঐ প্রতিভা—

না—হত্যা করেছিলেন আপনিই—প্রতিভা অবশ্যই আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল—কিরীটী শান্ত গলায় বললে

না, না—বিশ্বাস করুন—

বিশ্বাস করা সম্ভব নয় শ্যামলবাবু—কারণ আপনিই প্রতিভার সাহায্যে বাড়ির ছাতের প্রাচীর ডিঙিয়ে—দুজনে তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন—

না—প্রতিবাদ জানায় কল্যাণ দত্ত।

তবে? কি হয়েছিল?

প্রতিভা গিয়ে সুশান্তকে ডাকে বাইরে থেকে—সুশান্ত দরজা খুলে দেয়—ওরা প্রবেশ করে, তারপর—

অসম্ভব কিছু নয়—হতেও পারে—তারপর?

ঐটুকুই আমি জানি—সমরেশ আমাকে বলেছিল, কল্যাণ বললে।

আর আপনি সে কথা শ্যামলবাবুকে বলেন, তাই না ?

হ্যা—কল্যাণ বললে।

আর কিছু বলেনি সমরেশ আপনাকে ?

হ্যা—সে সব ব্যাপারটা দেখেছিল, তাও বলেছিল।

বাঘের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যেন তাকাল শ্যামল কল্যাণের দিকে—

কিন্তু সুদর্শন ব্যাপারটা আঁচ করে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

কিরীটী বললে, বুঝলাম—শেষটুকু বুঝলাম—প্রতিভা যখন সুশান্তর সঙ্গে হয়ত কথা বলছিল—তখন অতর্কিতে সুশান্তর ঘাড়ে হকি স্টিক দিয়ে আঘাত করেছিলেন প্রতিভার নির্দেশমত, তাই না ? কিন্তু কেবলমাত্র হকি স্টিক দিয়ে আঘাত করলেই তো অমন ক্ষত উণ্ড ঘাড়ে হত না—নিশ্চয়ই হকি স্টিকের সঙ্গে কোন ছুরি জাতীয় কিছু বাঁধা ছিল—কিন্তু শ্যামলবাবু, তার দরকার ছিল না—আপনার হাতের সেই মোক্ষম আঘাতেই তার ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ভার্টিব্রা গুঁড়ো হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে—ঠিক তাই ঘটেছিল, আপনার বন্ধু সমরেশবাবু জীবিত থাকলে হয়ত সত্য ব্যাপারটা জানা যেত।

তবে যে আপনি বললেন সমরেশ জবানবন্দি দিয়েছে—কল্যাণ চেঁচিয়ে ওঠে।

ঐ সময় হঠাৎ শ্যামল চেঁচিয়ে ওঠে, আমি—আমি বলছি—হকি স্টিকে কোন ছুরি বা কিছু বাঁধা ছিল না—প্রতিভাই পিছন থেকে হকি স্টিক দিয়ে সুশান্তর ঘাড়ে আঘাত করে—সঙ্গে সঙ্গে সে টলে পড়ে যায়—তারপর—তারপর সে কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে আঘাতের স্থানে আরও দু-চারবার ছুরি বসায়—আমি—আমি ওকে হত্যা করিনি—

কিরীটী বললে, কিন্তু আপনি সমরেশকে হত্যা করেছেন—হয়ত প্রতিভা ভয় দেখিয়েছিল আপনাকে, সমরেশ সব দেখে ফেলেছে বলে—তাই সেই হকি স্টিক দিয়েই তাকেও হত্যা করেছেন—কাউকে দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে কোথায়ও কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে—

শ্যামল কোন জবাব দেয় না।

বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

॥ ২২ ॥

পরের দিন সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটায় কিরীটীর গৃহে।

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজও আকাশ মেঘলা—তবে এখনও বৃ
নামেনি।

কিরীটী, কৃষ্ণা ও সুদর্শন বসে সুশান্ত ও সমরেশের হত্যার ব্যাপারটাই আলোচ
করছিল।

আপনি দাদা তাহলে শ্যামলকেই সন্দেহ করেছিলেন? সুদর্শন বললে।

হ্যাঁ।

কেমন করে সন্দেহ করলেন?

ঐ চপ্পলজোড়া—

চপ্পলজোড়া!

হ্যাঁ—চপ্পলজোড়া ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখতে পেতে—তার ভিতরে নিয়মি
ব্যবহারে দুটো গর্ত সৃষ্টি করেছিল—

গর্ত!

হ্যাঁ—শ্যামলের ডান পায়ের তলায় ছিল দুটো কড়া—যে কারণে সে শক্ত জুতো পর
পারত না—হাওয়াই চপ্পল ব্যবহার করত—সাধারণ যে সব হাওয়াই চপ্পল ঐখানে পাও
যায় মার্কেটে তার চাইতে অনেক আরামপ্রদ জাপানী রবারের চপ্পল—তাই শ্যাম
জাপানী হাওয়াই চপ্পল ব্যবহার করত।

কিন্তু ইদানীং ঐ ধরনের জাপানী চপ্পল বড় একটা পাওয়া যায় না, তাই বোধ হ
শ্যামলের মত শৌখীন লোকও অনেক দিন ধরে ঐ চপ্পলজোড়া ব্যবহার করছিল—যা
ফলে চপ্পলে গর্ত হয়ে গিয়েছিল।

তোমাকে ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করতে বললেও আমি নিজে দূর থেকে ওদে
প্রত্যেককে—শ্যামল দিব্যেন্দু কল্যাণ—বিশেষ করে ঐ তিনজনকে লক্ষ্য করছিলাম-
তখনই আমার নজরে পড়েছিল একটা ব্যাপার—শ্যামল হাঁটবার সময় সামান্য খুঁড়ি
চলে ডান পা-টা—

পরে চপ্পলজোড়া দেশবন্ধু পার্কে পেয়ে চকিতে সেই কথাটা মনের মধ্যে ভেসে উঠেছি
—সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম নিঃসংশয়ে যে, সমরেশের হত্যাকারী আর কেউ নয়-
শ্যামল ঘোষালই। অবিশ্যি শ্যামলের ওপরে সন্দেহ আমার আগেই পড়েছিল বিশে

াকছুটা ত্রুটি কারণে—

ক কারণে? কৃষ্ণা শুধাল।

্রথম সুদর্শনের মুখে শুনি যে সে রাত্রে শ্যামল ও প্রতিভা একত্রে নাইট শোতে ্যায় গিয়েছিল—

কন? সুদর্শন শুধাল।

ারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা সমস্ত মনে পর্যালোচনা করে—হত্যাকারী াড়ির মধ্যবর্তী ছাতের স্বল্প উঁচু প্রাচীরটার সাহায্য নিয়েছে—হয় ঐ বাড়িতে েশের সময় বা নির্গমের সময়—যেহেতু সদরটা বন্ধ ছিল। এবং ঐ বাড়ির ভৃত্যকে সন্দেহ করিনি—আর সেই থেকে আরও একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম—

ক দাদা?

্রতিভা ও সুষমার মধ্যে কেউ-না-কেউ ঐ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে। তাই োমাকে ওদের প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দিতে বলেছিলাম। তারপর যখন শুনলাম ভ এককালে নামকরা হকি প্লেয়ার ছিল, অনেক মেডেল-কাপ পেয়েছে, সন্দেহটা ও দৃঢ়মূল হয়।

কন্তু দাদা—

্যা শোন, আরও আছে—শেষ সূত্র হাতে এল আমার যখন—আর কোন সন্দেহই না যে প্রতিভাই ঐ ব্যাপারে জড়িত ছিল।

ক সূত্র?

প্রতিভার লেখা সুশান্তর চিঠিটা—যেটা সুশান্ত প্রমীলাকে দিয়েছিল, পরে প্রমীলা ার হাতে তুলে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দনই স্থির করেছিলাম তোমাকে সঙ্গে করে প্রতিভার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব, কিন্তু সময় ফোনে এল সমরেশের মৃত্যুসংবাদ। অকুস্থলে গিয়ে বিশেষ করে চপ্পলজোড়া আর কিছুই বুঝতে আমার বাকি রইল না—ঐ চপ্পলজোড়া না ফেলে গেলে শ্যামল াকে আমরা ধরতে পারতাম না—সন্দেহ করলেও তাকে স্পর্শ করতে পারতাম না। েষ্হ তার শ্রীচরণে বেড়ি পরাল। তাই সেদিন তোমাকে বলেছিলাম—death ays leaves behind its footsteps—মৃত্যু পশ্চাতে তার পদচিহ্ন রেখে যায়!

কথা—যাক, প্রতিভার আর কোন খবর নিয়েছিলে?

্যা। ডাক্তার বলেছেন প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে সে তার মনের ভারসাম্য হারিয়েছে ২ে সুস্থ হবে বলা যায় না।

েয়টার জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হয় সুদর্শন—প্রেমের এমন কঠিন মূল্য শেষ পর্যন্ত

তাকে দিতে হল!

জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

বাবুজী!

কি রে?

একজন বাবু দেখা করতে চান।

কে?

নাম বললেন যতীন চক্রবর্তী।

কিরীটী সুদর্শনের মুখের দিকে চাইল—তারপর বললে, যা, এই ঘরে নিয়ে আয়—

একটু পরে জংলীর সঙ্গে যতীন চক্রবর্তী ঘরে ঢুকলেন।

একটা রাত্রি মাত্র ব্যবধান—কিন্তু তাঁকে যেন চেনাই যায় না।

চোখের কোণে কালি—মাথার চুল রুক্ষ।

আসুন যতীনবাবু—

এই যে দারোগাবাবুও আছেন—বলেই চুপ করে গেলেন যতীন চক্রবর্তী—প একটা সোফায় বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

সবাই যেন বোবা।

যতীনবাবু? কিরীটী ডাকল।

আজ্ঞে—

যতীনবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

প্রতিভা কেমন আছে? কিরীটী শুধাল।

ভাল না—বোধহয় মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল—বলতে বলতে গলাটা বুজে যতীন চক্রবর্তীর। সব গেল আমার—মান ইজ্জত—এর পর কেমন করে সমাজে মুখ দেখাব—

মেয়েকে নিয়ে আপনি অন্য কোথাও কিছুদিনের জন্য চলে যান—কিরীটী ব

কিন্তু দারোগাবাবু—

সুদর্শন আপত্তি করবে না—আমি কথা দিচ্ছি।

কিন্তু আদালতে যখন কেস উঠবে?

মামলায় প্রতিভার নাম থাকবে না।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ।

আঃ, আপনি আমাকে বাঁচালেন কিরীটীবাবু—কিন্তু শ্যামল—

শ্যামল বললেই বা—আসামীর সব কথাই কি আদালত মেনে নেয়—যান আপনি।

যতীন চক্রবর্তী চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সুদর্শন!

দাদা?

দুঃখিত হলে?

না দাদা।

হ্যাঁ—ভগবানই ওঁকে ওর পাপের দণ্ড দিয়েছেন।

কৃষ্ণা মৃদু মৃদু হাসছিল।

কিরীটী বললে, হাসছ যে?

এমনিই—কৃষ্ণা বললে। আবার হাসতে লাগল।

না—বল কেন হাসছ?

কিরীটী রায়কে কেউ কোনদিন ভুলবে না—কৃষ্ণা বললে।

এবার কিরীটীও হাসল।

হীরা চুনি পান্না

॥ এক ॥

্ণের শেষাশেষি।

সই সকাল থেকে আকাশটা মেঘে মেঘে থমথমে হয়ে আছে। এবং সেই সকাল ই কতবার যে ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে তারও ঠিক নেই। শেষ পশলাটা থেমেছে দুপুর দেড়টা নাগাদ এবং সেই থেকেই টিপটিপ বৃষ্টিটা আর থামেনি। শহরের ঘাটে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

করীটীর বাসার সামনের রাস্তায় তো প্রায় এক গোড়ালি জল থৈ থৈ করছে। ‌দিনে নেহাত কাজ না থাকলে কে আর একটা ঘরের বাইরে যায়! তার উপরে ও কোন কাজকর্ম নেই। কিরীটী গৃহিণী কৃষ্ণা দেবীকে নিয়ে বসবার ঘরে দুজনে সোফা অধিকার করে মুখোমুখি বসে দাবা খেলছিল গভীর একাগ্রতায়।

ার দুই কিরীটী ইতিপূর্বেই কৃষ্ণাকে মাত করেছে কিন্তু কৃষ্ণা সেটা মানতে রাজী বলে, সম্পূর্ণ জোচ্চুরি করেই নাকি কিরীটী তাকে হারিয়েছে।

করীটী মৃদু হেসে বলেছে, তা ঠিক, কারণ তুমি যখন নারী এবং বিশেষ করে র আমার গৃহিণী, সচিব, তখন হারটা আমারই হওয়া উচিত ছিল তোমার কাছে।

ক্ষেত্রে—

ানে ?

েটা বুঝলে না সখী, আজ আমাদের চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে পদে পদে আমিই তোমার কাছে হার মেনে এসেছি। অতএব সর্বত্রই যখন হার, তখন এ খেলাতেই বা—

ও:, তাই বুঝি!

আহা, বুঝতে পারছ না কেন সখী, তোমার কাছে হার মানি সেই তো মোর জয়।

থাক্, থাক্—হয়েছে। বলতে বলতে কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে।

আরে, একে বিশ্বপ্রকৃতি মুখ ভার করে বসে আছে বাইরে, এ সময় ঘরে তুমিও অপ্রসন্ন হও দেবী, তবে দাঁড়াই কোথায় বল?

তাই বলে তুমি যা খুশি তাই বলবে! অভিমান-স্ফুরিত রক্তিম ওষ্ঠ-যুগল কৃষ্ণার।

খুশি তা আর আজ পর্যন্ত বলতে পারলাম কই? বলার অধিকার কি আর তুমি প্রিয়ে! কিরীটী মৃদু ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে।

ও, আমিই বুঝি যত দোষে দোষী, আর তুমি একেবারে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতাটি!

কথায় কথা বাড়ে। আর স্ত্রীলোকের অভিমানের ব্যাপারটা হাওয়া-ভর্তি উদ্ধ বেলুনের মত, অতএব কিরীটীই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে মনে মনে হারবার দুঃসহ সংকল্প নিয়ে তৃতীয়বার খেলতে বসে যায়। কিন্তু খেলাটা বেশীদূর অগ্রসর পারে না।

মনের প্রতিশ্রুতিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে সবে কিরীটী বড়েব একটিচালে তৃতী আবার কৃষ্ণাকে মাত করবার জন্য উদ্যত হয়েছে, ভগ্নদূত শ্রীমান জংলীর ঘরের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল—বাবু !

কিরীটী খেলার দিকেই চোখ রেখে বললে, উঁ ?

বাইরে তখন আবার আকাশ ভেঙে ঝমঝম শব্দে বর্ষণ শুরু হয়েছে।

একজন বাবু কি জরুরী কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বলে দে দেখা হবে না। কিরীটী খেলা থেকে চোখ না তুলেই বলে।

বলেছিলাম, কিন্তু বললেন, দেখা না করে তিনি যাবেন না।

আবার বলগে যা—দেখা হবে না।

সহসা ঐ সময় প্রচণ্ড একটা কড-কড়াৎ শব্দ ও চোখ-ঝলসানো নীল অ ঝলকানিতে যেন একসঙ্গে যুগপৎ দুটি চক্ষু ও কর্ণপটাহ সচকিত হয়ে উঠল।

কিরীটীর চিন্তাসূত্রটি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেল।

কিরীটী তাকাল অদূরে একটি মূর্তিমান জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত দণ্ডায়মান দৃষ্টির সামনে জংলীর দিকে—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে ভূত, কি চাস ?

একজন বাবু—

একজন বাবু, এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে !

যাও না, দেখ না—বোধ হয় কোন জরুরী কাজে এসেছে, নইলে এই দুর্যোগে আসে ? কথাটা এবার বলে কৃষ্ণা।

তাই বলে নীচে এখন আমি যেতে পারব না। কিরীটী মাথা নাড়ে।

যা জংলী, বাবুকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়। বলতে বলতে এবারে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বা রে, তাই বলে খেলাটা না শেষ করে তুমি চললে কোথায় ?

আমি না গেলে ঠাকুরের হাতের খিচুড়ি খেতে হবে! হাসতে হাসতে কৃষ্ণা ব

তাই খাব।

কিন্তু আমি পারব না।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না কৃষ্ণা, দরজা-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জংলী ইতিপূর্বেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, বোধ হয় আগন্তুককে আহ্বান জানাতে। মনে মনে কিরীটী রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং হাত বাড়িয়ে সিগারেটের বাক্স ক একটা কর্কটিপ্‌ট্ সিগারেট তুলে নিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করে।

সিঁড়িতে একটা ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল।

মনে মনে বিরক্ত হয়েই শব্দটা বিশ্লেষণ করে কিরীটী, ব্যস্ততা বা অস্থিরতা কিছু নেই তার শব্দে।

পরম নিশ্চিন্তে কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একটার পর একটা সিঁড়ির গুলো অতিক্রম করে।

জুতোসমেত পদশব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে স্পষ্টতর।

দরজার গোড়ায় এসে থামল অবশেষে শব্দটা।

যান, ভিতরে যান, বাবু ভিতরে আছেন। শোনা গেল জংলীর গলা।

পরক্ষণেই অপরিচিত আগন্তুক কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল। এবং কিরীটীরও সন্ধানী দু চক্ষুর দৃষ্টি গিয়ে আগন্তুকের উপরে নিপতিত হল।

আগন্তুকের চেহারাটা রীতিমত ঢ্যাঙাই বলতে হবে, তবে দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থটা ।

পরিধানে দামী মভ্ কলারের ট্রপিক্যাল স্যুট, ডবল ব্রেস্ট কোট, গলায় কালো বো। হাঁটু পর্যন্ত গামবুট, জলে ভেজা। হাতের উপর ভিজে বর্ষাতিটা ভাঁজ করা ছিল, বারেকের জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে কক্ষের কোণে টুপির স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রেখে ঃ আসতেই কিরীটী বললে, বসুন!

আগন্তুক কিরীটীর মুখোমুখি সোফাটার উপর উপবেশন করল।

রুক্ষ তৈলহীন মাথার চুল, মাঝখানে সিঁথি করা, বেশ পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো। দুটো যেন বেশ খানিকটা ভিতরের দিকে বসে গিয়েছে। প্রশান্ত ললাটে বয়সের রেখা জেগেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে কোটরাগত চক্ষু। খাঁড়ার মত উঁচু নাক। দাড়ি-একেবারে নিখুঁত ভাবে কামানো। সমস্ত চোখেমুখে যেন একটা দীর্ঘ অত্যাচারের ক্লান্ত ফুটে বেরুচ্ছে। উপরের পাটির দাঁতগুলো যেন একটু উঁচু।

আগন্তুকই প্রথম কথা বললেন, এভাবে এসময় আপনাকে বিরক্ত করতে আসবার আমি বিশেষ দুঃখিত মিঃ রায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একান্ত নিরুপায় বলেই এই মাথায় করেও আমাকে আপনার কাছে ছুটে আসতে হয়েছে।

বলুন কেন এসেছেন?

আমার পরিচয়টা আগে আপনাকে দিই। মাস দুয়েকের জন্য মাত্র আমি কলকাতায়

এসেছি, আমি রেঙ্গুনে থাকি। সেখানে আমার টিম্বারের বিজনেস আছে। আমার রাঘবেন্দ্র শর্মা। জাতে যদিও আমি ব্রাহ্মণ, তবে জাতটাত বড একটা মানি না। সে সব অবান্তর কথা। যে জন্যে এই দুর্যোগ মাথায় করেই আপনার কাছে এসেছি।

কিরীটী কোন কথাই বলে না, নিঃশব্দে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিয়ে ধূম উদ্‌গ করে চলে।

রাঘবেন্দ্র বলে, একটি নিরুদ্দিষ্টা মেয়েকে খুঁজে বের করে দেবার জন্যই আপ শরণাপন্ন হয়ে এসেছি আমি। যেমন করেই হোক, যত টাকা লাগুক, সেই নিরু মেয়েটিকে খুঁজে আপনাকে বের করে দিতেই হবে মিঃ রায়।

এতক্ষণে কিরীটী কথা বলে, মেয়েটি আপনার কে মিঃ শর্মা ?

কিরীটীর অতর্কিত প্রশ্নে রাঘবেন্দ্র শর্মা যেন সহসা কেমন একটু চমকে ও কয়েকটা নির্বাক মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থা তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলেন, আমার কে ?

হ্যাঁ, কে সে আপনার ?

আমার ? বলতে পারেন আমার সে সব। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, অ —বলতে পারেন তাকে খুঁজে না পেলে আমার বেঁচে থাকাও মিথ্যে।

বুঝলাম, তবু জিজ্ঞাসা করছিলাম—

বাধা দিয়ে এবারে রাঘবেন্দ্র বললেন, সব—তার কথা একদিন আপনাকে আগে আপনি তাকে খুঁজে বের করে দিন।

বেশ, তাই বলবেন না হয়। কিন্তু সেই মেয়েটি সম্পর্কে সমস্ত ইতিহাসটা আমার জানা প্রয়োজন।

কিরীটীর শেষের কথায় আবারও রাঘবেন্দ্র শর্মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রই তারপর বললেন পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে, আপনাকে তো পূর্বেই বলেছি, আমি রেঙ্গুনে থ মাস দুই হবে মাত্র কলকাতায় এসেছি। ঐ মেয়েটি, মানে পান্না, এখানেই আমা বন্ধুর বাসায় থেকে পড়াশুনা করছিল গত চার-পাঁচ বছর।

তার পর ?

হঠাৎ মাস দুই আগে আমার বন্ধুটি বেনারসে তার মার অসুখের তার পে চাকরের জিম্মাতেই তাকে রেখে বেনারস চলে যায়। দিন পনেরো বাদে য এল, এসে দেখে বাড়ির সদরে তালা ঝুলছে।

তালা ঝুলছে ?

হ্যাঁ। ডাকাডাকি করতে পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক এসে চাবিটা তা

...লেন, আমার বন্ধুটি তার পেয়ে বেনারস চলে যাবার দিন দুই পরেই নাকি একদিন ... তার চাকরটা তাঁর হাতে চাবি দিয়ে বলে যে, তার মনিবের তার পেয়ে নাকি ... তারা রাত্রের গাড়িতে বেনারস চলে যাচ্ছে।

আচ্ছা ঐ ঝি-চাকর ছাড়া আর কেউ সে বাড়িতে ছিল না?

না।

হুঁ, তার পর?

তার পর আর কি! বন্ধুটি তো সব শুনে একেবারে হতভম্ব! তাড়াতাড়ি তখুনি ... আমাকেও তার করে দেয় অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসবার জন্য। তার পেয়ে ... চলে এলাম। তার পর এই দু মাস ধরে এই শহরে ও শহরের আশেপাশে সর্বত্র ... করছি, কিন্তু সেই ঝি-চাকর ও পান্নার কোন সন্ধানই করতে পারিনি।

থানায় খবর দেওয়া হয়নি?

হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারাও আজ পর্যন্ত কোন সন্ধানই বার করতে পারেনি। ... একান্ত নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি মিঃ রায়।

মেয়েটির কোন ফটো আছে?

আছে।

বলতে বলতে রাঘবেন্দ্র পকেট থেকে একটা খাম টেনে বের করলেন সন্তর্পণে। ... মুখটা খোলাই ছিল, তার ভিতর থেকে মিঃ শর্মা একটা পোস্ট কার্ড সাইজের ... টেনে বের করলেন—এই দেখুন!

রাঘবেন্দ্রর হাত থেকে কিরীটী ফটোটা নিল।

ফটোগ্রাফটি অনেক দিনের বোধ হয় তোলা। আসল রঙটা ফেড হয়ে একটু যেন ... বাদামী রঙের হয়ে গিয়েছে।

বছর চোদ্দ-পনেরোর একটি কিশোরীর ফটো।

ফটোটা পুরাতন হয়ে ফেড হয়ে গেলেও বুঝতে কষ্ট হয় না, নিখুঁত অপূর্ব মুখশ্রী ... কিশোরীর। যেমন চোখ তেমনি ভ্রূ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল।

ফটোটা দেখতে দেখতে কিরীটীর যেন মনে হয়, ফটোর মুখখানি যেন তার চেনা ... লাগছে। কবে কোথায় যেন অমনি ফটোর মতই, অবিকল একখানি মুখ সে ... ছে। কিন্তু কোথায়?

কোথায় দেখেছে, সেটাই কিরীটী ঐ মুহূর্তে যেন কিছুতেই মনে করে উঠতে পারে ... কিরীটী নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য, রাঘবেন্দ্রর ... রে তার দিকে ফিরে তাকাল।

দেখলেন ফটোটা ?

হ্যাঁ।

ঐ মেয়েটিকেই খুঁজে বের করে দিতে হবে আপনাকে।

এই ফটোটা দু-এক দিনের জন্য আমার কাছে রাখতে পারি মিঃ শর্মা ?

নিশ্চয়ই, রাখুন না।

বেশ, কাল এই সময় আপনি তাহলে আসবেন। কতদূর কি করতে পারব আপনাকে জানাব।

তাই হবে। তবে বুঝতেই তো পারছেন, দু মাস আমি আমার বিজনেসের কিছু দেখাশোনা করিনি। পরশুই জাহাজে কিছুদিনের জন্য রেঙ্গুনে আমাকে এ যেতে হবে। আমার বন্ধুর ঠিকানাটা আপনাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি, যা সংবাদ (তাকে দিলেই আমি পাব।

বেশ। একটা ছোট কাগজে অতঃপর একটা ঠিকানা লিখে রেখেছে কি রাঘবেন্দ্র উঠে দাঁড়াল নমস্কার জানিয়ে।

॥ দুই ॥

ফটোটা সামনের ত্রিপয়ের ওপরেই পড়েছিল।

কিরীটী চুপ করে সোফাটার উপর বসে থাকে। ভাবছিল সে ঐ ফটোর মে মুখটির কথাই।

হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে যায়। কিরীটী উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। র‍্যাকের উপর গত এক বছরের প্রতিদিনকার দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগবার্তা' পর পর করা আছে।

একটার পর একটা 'যুগবার্তা' উল্টে কিরীটী দেখতে লাগল।

মাস তিনেক আগেকার একটি 'যুগবার্তা'র তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার মধ্যেই সে ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেল।

চতুর্থ পৃষ্ঠার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি ফটোসহ বিশেষ একটি নিরু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবং শুধু ঐদিনই নয়, তার আগেরও পর পর চার সংবাদপত্রে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে দেখা গেল।

সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ে পূর্বের ঘরে ফিরে এসে রাঘবেন্দ্রের দেওয়া ফটোটি

.য়ে দেখা গেল তার অনুমান মিথ্যা নয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবির সঙ্গে ঘবেন্দ্রের ফটোর একেবারে হুবহু মিল।

একই মেয়ের ছবি!

একটি বক্স করে ছবিটি ও তার নীচে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

পান্না, তুমি কোথায় এবং কার কাছে বর্তমানে আছ জানি না। তুমি নিজে না পার কারো সাহায্যেও যদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দিতে পার, তোমার উদ্ধারের বস্থা অবিলম্বে করা হবে। যে কেউ উপরিউক্ত ছবির মেয়েটির কোন সংবাদ দিতে রবে তাকে নগদ পনের হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ইতি—

সলিল সরকার

ম্যানেজার, রতনগড় স্টেট, রতনগড়।

একবার দুবার তিনবার কিরীটী সংবাদটি আগাগোড়া পড়ল। তার পর আবার দপত্রে প্রকাশিত ফটো ও রাঘবেন্দ্রের ফটোটা পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখতে কিরীটী।

একই মেয়ের যে ফটো তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই। কারণ বিজ্ঞাপনেও যে নাম ার করা হয়েছে, রাঘবেন্দ্রও মেয়েটির সেই নামই বলে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন ঘোরালো হয়ে উঠল। একই নিরুদ্দিষ্ট মেয়ের সন্ধানে গড় স্টেটের ম্যানেজার সলিল সরকার ও রেঙ্গুন-প্রসাবী রাঘবেন্দ্র তৎপর হয়ে উঠেছেন। রাঘবেন্দ্রের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটির আসলে যে কি সম্পর্ক সেটা রাঘবেন্দ্র স্পষ্টাস্পষ্টি বলল না। একটা 'কিন্তু' রেখে গেল। অথচ মেয়েটির সন্ধান পাবার জন্য যে বেন্দ্র সত্যি-সত্যিই ব্যগ্র সেটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। এবং রতনগড় স্টেটও যে র সন্ধান পাবার জন্য সমান ব্যগ্র, তাও বিজ্ঞাপনটা পড়লেই বোঝা যায়।

কৃষ্ণা এসে ইতিমধ্যে যে একসময় ঘরে ঢুকেছে কিরীটী টেরও পায়নি।

এই!

কিরীটীর সাড়া নেই।

এবারে কৃষ্ণা মৃদু হেসে কিরীটীর কানের কছে একেবারে মুখ নিয়ে ডাকে, পূর্বের তে একটু উচ্চকণ্ঠে, এই!

উঁ! ও তুমি?

্যা, কিন্তু হঠাৎ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলে কেন? এসেছিল কে এই দুর্যোগ

মাথায় করে ?

পান্না-অন্বেষণকারী কশ্চিৎ ভদ্রমহোদয়।

মানে ?

কিরীটী সংক্ষেপে তখন স্ত্রীকে ক্ষণপূর্বের ব্যাপারটা বলে যায়।

বল কি! সব শুনে কৃষ্ণা মন্তব্য করে।

হুঁ, তাই ভাবছি, পান্না দেবী সত্যি-সত্যিই নিরুদ্দিষ্টা স্বেচ্ছায়ই হয়েছেন কিনা

সত্যি তুমি তাই মনে কর ?

আশ্চর্য নয়! উভয় পক্ষের আত্মীয়তার ঠেলা না সামলাতে পেরে হয়তো

হয়েছে মেয়েটি।

আচ্ছা সে সমস্যার সমাধান পরে না হয় রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেব।

তার মানে ?

মানে আর কিছুই নয়, খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মুখে রুচবে না অতএব গাত্রো

কিরীটী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র শর্মা যখন এলেন না, কিরীটী বেশ চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

কি হল, ভদ্রলোক কথা দিয়ে এলেন না কেন ?

নিরুদ্দিষ্টা পান্নার চিন্তাটা তখন কিরীটীর মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলিতে বেশ

বসেছে।

আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরও যখন রাঘবেন্দ্র এলেন না, কিরী

সিংকে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করতে বলে গায়ে একটা জামা চড়াচ্ছে, কৃষ্ণ

সামনে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, কোথায়ও বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, রাঘবেন্দ্র শর্মা এলেন না কেন বুঝতে পারলাম না, যাই একবার তাঁ

ওখানেই না হয় খোঁজ করে আসি।

বন্ধু ?

হ্যাঁ, একটা ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন কাল রাত্রে ভদ্রলোক, হরিপদ অধি

—নং কাঁটাপুকুর লেন।

ফিরবে কখন ?

বেশী রাত হবে না।

রাঘবেন্দ্রের দেওয়া ঠিকানামত বাড়িটা খুঁজে বের করতে বেশ একটু বেগই পেতে কিরীটীকে। ঠিক কাঁটাপুকুর লেন নয়, একটা অন্ধকার সরু গলির মধ্যে বহু পুরাতন তলা একটা বাড়ি। মিনিট পনেরো ধরে কড়া নাড়বার পর একজন ষণ্ডামার্কা ছের লোক, কালো আবলুস কাঠের মত গাত্রবর্ণ, মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ল গা, একটা লুঙ্গি পরিধানে, দরজাটা খুলে সন্তর্পণে দরজার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে প্রশ্ন করল, কে র‍্যা ?

মশাই, এটাই কি হরিপদ অধিকারীর বাড়ি ?

আজ্ঞে। মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? নাম, নিবাস ?

আপনি আমাকে চিনবেন না।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই তো জিজ্ঞাসা করলাম, কে, কি পরিচয় ?

রাঘবেন্দ্রবাবু আপানার কথা—

কে ?

রাঘবেন্দ্র শর্মা।

অ, তা বলেন কি প্রয়োজন ?

তার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি, বা কোথায় গেলে তার সঙ্গে—

তা কেমন করে বলব ? সেই যে কাল বিকেলের দিকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে, আর তো ফেরেনি।

ফেরেননি ?

না।

উনি তো রেঙ্গুনে থাকেন ?

উনি কোথায় থাকেন তা তিনিই বলতে পারেন।

কিন্তু তিনি যে বলেছিলেন আপনি তার বিশেষ বন্ধু হন ?

বলেছিলেন ? তা হলে তাই হবে !

কিরীটী রীতিমত চমৎকৃত হয় লোকটির কথায়। এবারে হঠাৎ বলে, আপনারই বোধ হয় হরিপদ—

ঠিক ধরেছেন তো ! হ্যাঁ, আমিই বটে। কিন্তু মশাই কি পুলিসের গোয়েন্দা ? সাতপুরুষের খবর নিচ্ছেন ?

আজ্ঞে না।

যাক, বাঁচালেন। আজ দু মাস থেকে যা পুলিসের অত্যাচার চলেছে—

পুলিসের অত্যাচার !

আর বলেন কেন, শালার বন্ধু—যাক গে মশাই, এখন আপনার কি প্রয়োজন সেট বলুন ?

পান্না বলে একটি মেয়েকে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, দড়াম করে লোকটা কিরীটীর মুখের উপরেই দরজ কবাট দুটো সশব্দে বন্ধ করে দিল।

কিরীটী তো হতভম্ব !

কয়েকটা মুহূর্ত তার পরও সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কিরীটী। পর মৃদু হেসে নিঃশব্দে আবার গলিপথ অতিক্রম করে বড় রাস্তার উপরে তার অপেক্ষম গাড়িতে এসে উঠে বসল।

পরের দিন সকালের যুগবার্তায় একটি বিশেষ দুর্ঘটনার সংবাদ কিরীটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ধমান ও আসানসোলের মাঝামাঝি জায়গায় একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলো পরশু শেষরাত্রে কাটা পড়েছে। এবং মৃত ব্যক্তির জামার পকেটে একটি পার্স পাও গিয়েছে, তার মধ্যে নগদ একশত টাকার নোট ও কিছু ক্যাশমেমো ছিল। ব্যাগের গা সোনালী কালিতে মনোগ্রাম করা ছিল রাঘবেন্দ্র।

ঐটুকু ব্যতীত মৃত ব্যক্তির আর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

তারপরই সংক্ষেপে মৃত ব্যক্তির চেহারার ও পরিধেয় বস্ত্রের যে বর্ণনা দেওয়া হয়ে তাইতেই কিরীটী আরো সন্দিহান হয়ে ওঠে। মৃত ব্যক্তির চেহারা ও পরিচ্ছদের রাঘবেন্দ্রের কোন পার্থক্যই নেই। হুবহু যেন একেবারে মিলে গিয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃতদেহটা দেখে একবার সন্দেহ ভঞ্জন না করা পর্যন্ত যেন কিরী মনের মধ্যে কিছুতেই শান্তি পায় না।

সঠিক সংবাদটা একমাত্র পাওয়া যেতে পারে বন্ধু তালুকদারের কাছে। লালবাজ স্পেশাল ব্রাঞ্চের সে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বর্তমানে।

আর কালবিলম্ব না করে কিরীটী হীরা সিংকে ডেকে গাড়ি বের করতে বললে।

রসা রোডে পড়ে হীরা সিং জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে যাব ?

একবার লালবাজার চল।

গাড়ি কিরীটীর নির্দেশমত তখন লালবাজারের দিকেই ছুটে চলে।

তালুকদার হেডকোয়ার্টারে তাঁর নিজস্ব ঘরেই তখন ছিলেন।

দ্বাররক্ষী সার্জেন্টকে দিয়ে খবর পাঠাতেই তালুকদার নিজেই বের হয়ে আসেন।

আরে কি সৌভাগ্য, এস এস ! তার পর সত্যসন্ধানী, পথ ভুলে নাকি ?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে মৃদু হেসে কিরীটী বলে, তোমাদের যা সুনাম ত পথ ভুলেও যে কেউ এ এলাকায় পা বাড়াবে তার কোন সম্ভাবনা কি আছে হে !

হো হো করে হেসে ওঠেন তালুকদার কিরীটীর কথায়।

তা যা বলেছ। কিন্তু সত্যি সত্যি আগমনের হেতুটা কি বল তো রায় ?

একটা সংবাদ চাই।

তা—তা তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম। এখন বল কি সংবাদ জানতে চাও ?

আজকের যুগবার্তায় তোমাদের এলাকায় যে একটা রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ াশিত হয়েছে দেখেছ ?

বুঝেছি, তুমি বোধ হয় আসানসোল ও বর্ধমান স্টেশনের মাঝামাঝি যে অ্যাক্সি- টা হয়েছে তার কথা বলছ !

হ্যাঁ।

কিন্তু কি ব্যাপার ? এ তো একেবারে আনকোরা কেস, এর মধ্যেই রহস্যের গন্ধ গেলে তার মধ্যে ? আমারও অবিশ্যি কিছুক্ষণ আগে মন্মথর মুখে ঘটনাটা শুনে 'সমপল' মনে হয়নি !

কি রকম ?

মৃত্যুর কারণটা অবিশ্যি এখনো জানা যায়নি, কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্ট আমেদ হব এখনো দেননি, তবে—

তবে ?

বুকের উপর দিয়ে ও পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু মৃতের মুখটাই এমন ভাবে বিকৃত হয়ে আছে, যাতে করে সে মুখ দেখে আর আইডেন্টি- ক্শেনেরই উপায় নেই।

তার মানে তুমি বলতে চাও মুখের মিউটিলেশন্টা নট্ ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্ট ?

তাই। আর তাতে করেই মনে হচ্ছে, হি ওয়াজ মার্ডারড্ ফাস্ট অ্যাণ্ড দেন ড্রপড্ দি রেলওয়ে লাইনস !

হুঁ।

আমার জুনিয়ার মন্মথই কেসটার ইনভেস্টিগেশন করছে, তার সঙ্গে আলাপ করতে তো তাকে ডাকাই !

বেশ তো।

টেবিলের সঙ্গে সংযুক্ত ইলেকট্রিক কলিং বেলটার বোতাম টিপতেই দ্বারের সার্জেন্ট

এসে ঘরে ঢুকে স্যালুট দিল, ইয়েস স্যার!

এস. আই. মন্মথ চৌধুরীকে একটু এ ঘরে ডেকে পাঠাও তো জন—বলবে আর্জেন্

সার্জেণ্ট স্যালুট দিয়ে বের হয়ে গেল।

তার পর আর কি খবর বল? অনেক দিন পরে এলে—

এই এক রকম—

মিসেসের সংবাদ কি?

ভালই।

মন্মথ একটু পরে এসে ঘরে ঢুকল। পরিচয় হবার পর কিরীটী মন্মথর সঙ্গেঃ গেল মৃতদেহটা একবার দেখবার জন্য। কিন্তু মৃতের মুখটা বিকৃত থাকায় সঠিক সন করতে পারল না।

॥ তিন ॥

ঐদিনই বেলা তিনটে নাগাদ কিরীটীর পূর্বনির্দেশমত এস আই. মন্মথ চৌধুরী বাসায় এল।

কিরীটী ঐদিনকারই একটা সংবাদপত্রের অ্যাডভারটাইজমেণ্ট কলমটার উপরে বুলোচ্ছিল, বললে, আসুন মন্মথবাবু, বসুন।

মন্মথ সামনের খালি সোফাটার উপরে উপবেশন করে।

তার পর ময়না তদন্তের রিপোর্ট আমেদ সাহেব দিলেন?

হ্যাঁ। সেখান থেকেই আসছি। ইট্ ইজ নট্ এ কেস অফ সুইসাইড—কেস অফ হোমিসাইড।

কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্ট কি?

আমেদ সাহেব বলছেন. থ্রট্ল অর্থাৎ শ্বাসরোধ করেই মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, মৃতের পকেটে 'রাঘবেন্দ্র' নামটা মনোগ্রাম করা পার্স ছাড়া আর তো কিছুই এমন পাওয়া যায়নি, যাতে করে ঐ মৃতব্যক্তিই যে রাঘবেন্দ্র প্রমাণিত হতে পারে?

না।

অতঃপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটীই প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, কাঁটাপুকুর লেনে হবি

ধিকারী নামে এক ব্যক্তি থাকেন, তিনি সম্ভবত ঐ রাঘবেন্দ্রকে খুব ভাল করেই নতেন। তাঁকে দিয়ে মৃতদেহটা ডিসপোজ করবার আগে একবার সনাক্ত করবার চেষ্টা রতে পারেন ?

নশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায় ?

করীটী সংক্ষেপে তখন রাঘবেন্দ্র-কাহিনী মন্মথর কাছে বর্ণনা করে গেল এবং হরি-র ঠিকানাটাও দিয়ে দিল।

থাক এতক্ষণে কিছু তবু এগুবার মত নির্ভরযোগ্য পাওয়া গেল। আমি এখুনি খানে যাচ্ছি।

বলতে বলতে মন্মথ চৌধুরী উঠে দাঁড়াল।

মন্মথ বিদায় নিয়ে যাবার পর কিরীটী বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

এবং নীচে এসে গাড়িতে উঠে হীরা সিংকে সোজা 'যুগবার্তা' অফিসের দিকে লাতে বলল গাড়ি।

অ্যাভিন্যুর উপরে দৈনিক যুগবার্তার অফিস।

যুগবার্তার প্রোপ্রাইটার সিদ্ধার্থ সরকার কিরীটীর পরিচিত। কিরীটী জানত প্রত্যহ ই সময়টিতে সন্ধ্যা থেকে রাত নটা পর্যন্ত সিদ্ধার্থ সরকার অফিসে এসে নিজে কাগজপত্র রে দেখাশুনা করে থাকেন। বেয়ারার হাতে স্লিপ দিতেই সিদ্ধার্থ সরকার নিজে াড়াতাড়ি বাইরে এসে কিরীটীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

বস—বস। অনেকদিন পরে দেখা, তারপর ?

ঘণ্টি বাজিয়ে সিদ্ধার্থ চা আনতে বললেন বেয়ারাকে।

চা পান করতে করতেই একসময় কিরীটী বললে, মাস তিন আগে পর পর কয়েকদিন মার কাগজে একটা মেয়ে হারানোর নিউজ বের হয়েছিল। তলায় ঠিকানা দেওয়া ছে—রতনগড় স্টেট, রতনগড়।

তা হবে।

আমাকে যদি একটু জেনে বলে দাও, সংবাদটি ছাপানোর জন্য কিভাবে এসেছিল—ক, না লোক মারফৎ ?

দাঁড়াও। নিউজ-এডিটর সৌরীনকে ডাকি। সে হয়ত তোমাকে এ ব্যাপারে হায্য করতে পারবে।

কিন্তু নিউজ-এডিটর সৌরীন সেনও বিশেষ কোন আলোকসম্পাত করতে পারলেন উক্ত ব্যাপারে। তাছাড়া অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, সাধারণত ডিপার্টমেণ্টের ক্লার্করাই

ঐসব নিউজ নেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয় ঐসব ব্যাপারের details মনে ক রাখা। কেবল খাতাপত্র দেখে এইটুকু জানা গেল, কে একজন টাকা জমা দিয়ে নিউজ ছাপাবার জন্য দিয়ে যায়। তবে হঠাৎ একসময় সিদ্ধার্থ সরকার বললেন, তাঁর ম পড়েছে। রতনগড় নামটা তাঁর একেবারে অজানা নয়। সাঁওতাল পরগণায় রতনগ নামে একটা জায়গা আছে বটে, তা সেটাও স্থানীয় এক বিরাট ধনী কয়লা-কুঠি মালিকের নিজস্ব দেওয়া স্টেটের নাম। বছর দেড়েক আগে একবার কি একটা কা সিদ্ধার্থ সরকার নাকি ওইদিকে গিয়েছিলেন।

তুমি সেখানে গিয়েছিলে? কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ এবং সেই সময়েই ওখানকার এক বহুদিনকার পরিচিত ডাক্তার-বন্ধুর—য বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম, কথায় কথায় তার মুখে শুনি, রতনগড় স্টেটের মালি জগদীশনারায়ণ সিংহ। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে তারও বছর পাঁচেক আগে। অর্থাৎ আ থেকে ছয় সাড়ে ছয় বছর আগে। কিন্তু তিনি বিবাহ না করায় তাঁর মৃত্যুর পর রতনগ স্টেটের মালিক বর্তমানে তাঁর ভাগ্নে রবিশঙ্কর।

রবিশঙ্কর লোকটা কেমন, তার বয়স কত, কি রকম দেখতে, কিছু শুনেছিলে তখন কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, শুনেছিলাম। এক কথায় যাকে বলে দুর্ধর্ষ। মেজাজ একেবারে মিলিটারী লম্বা-চওড়া বেশ শক্তিমান পুরুষ। ঘোড়ায় চড়ে, বন্দুক চালায়। আর রাত্রে সবা যখন ঘুমায় তখন তার চোখে ঘুম আসে না বলে নিজ হাতে সিরিঞ্জে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটি ঘুমানোর জন্য মরফিয়া ইনজেকশান নেয়।

সিদ্ধার্থের শেষের কথায় কি জানি কেন কিরীটী সোজা হয়ে বসে। চোখের তা দুটো তার অদ্ভুত একটা উত্তেজনায়, কি এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে ঝক্‌ঝক্ কর থাকে। বলে, আশ্চর্য! তারপর?

ওই রকমই সামান্য সামান্য তাঁর সম্পর্কে আমি শুনেছিলাম কিরীটী, তাও তাঁর সম্পর্ যেটুকু বলে স্থানীয় লোকেরা এবং কিছুটা আন্দাজে কল্পনায় গড়ে তুলে, কিছুটা বাড়ির চাকরবাকরদের মুখে শুনে।

কেন?

কারণ রবিশঙ্করের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস খুব কম লোকেরই হত জমিদারের প্রাসাদটার নামই রতনগড়। দিনের বেলায় কোন সময়ই বড় একটা কে রতনগড় থেকে তাকে বের হতে দেখত না তার সেখানে আসা অবধি, একমাত্র সন্ধ্যা দিকে একবার ঘণ্টাখানেকের জন্য ছাড়া। ঘোড়ায় চেপে ঐ সময়টা সে বেড়াতে বের হত

তাহলে বল একজন মিস্টিরিয়াস লোক !

তা বলতে পার। আট-দশটা কোল মাইনের মালিক। আসানসোল ও ধানবাদে
রাট অফিস। নিজে কখনো সে অফিসে যায় না। প্রয়োজন মত অফিসের ম্যানেজারকে
র রতনগড়ে ডেকে পাঠায় এবং আমার সেই বন্ধুর মুখেই শোনা, রতনগড়ের বাইরে না
র হলেও সমস্ত কিছু তার নখদর্পণে নাকি থাকে সর্বদা। ব্যবসা বা অন্যান্য
ন্ট সংক্রান্ত যাবতীয়—এমন কি খুঁটিনাটি ব্যাপারও নাকি তার দৃষ্টি এড়ায়

রাত প্রায় সাড়ে নটায় কিরীটী তার বাসায় ফিরে এল।

আকারহীন চিন্তা-নীহারিকা তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর সেই চিন্তা
হারিকার মধ্যে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি থেকে থেকে যেন উঁকি দিচ্ছে। লম্বা-চওড়া
ত্তমান পুরুষ। ঘোড়ায় চড়ে, বন্দুক চালায়, আবার রাত্রে মরফিয়া ইনজেকশান নেয়
হয় না বলে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক রাঘবেন্দ্র শর্মা। যার
কস্মিক মৃত্যু ঘটেছে রেলওয়ে অ্যাক্সিডেণ্টে। এবং যে রাঘবেন্দ্র এসেছিলেন এক
গমুখর মধ্যাহ্নে একটি অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরীর ফটোগ্রাফ নিয়ে কিরীটীকে দিয়ে
র অনুসন্ধান করবার জন্য। আর সেই কিশোরীটির নামই পান্না। সেই সঙ্গে
র একটি ছায়ামূর্তি তার পাশে এসে দাঁড়ায়, পুরুষ নয়, নারী। রহস্যময়ী অবগুণ্ঠনবতী।
 গিয়েছিল যার শুধু খালি পা, আর আর্টিস্ট রতিকান্তর বর্ণনায় যার শঙ্খধবল ননী
 গড়া নিরাভরণা একখানি নিটোল কোমল বাহু।

ওদিকে আবার রতনগড় স্টেট থেকে সেই পান্নার অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দেওয়াই
চ্ছে। তার অনুসন্ধান করে দিতে পারলে নগদ পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া
। কিন্তু রতনগড় থেকে এতদূরে বসে সে রহস্যের মীমাংসা তো করা যাবে না।
নগড় রহস্য জানতে হলে অন্তত একবার সেখানে যেতেই হবে। সম্ভব হলে রতন-
ড়র বর্তমান মালিক রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করতেও হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব ?

যুগবার্তার প্রোপ্রাইটার সিদ্ধার্থ সরকারের মুখ থেকে যেটুকু রবিশঙ্কর সম্পর্কে জানা
ছে, তাতে করে হঠাৎ তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
এমনও তাকাতে পারে, দেখা না করেই হয়ত তাকে হাঁকিয়ে দিতে পারে। ভাবতে
বতে হঠাৎ তার একটা কথা মনে হওয়ায় কিরীটীর দুটো চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে।

ঠিক। তা সে করবে।

আশ্চর্য, এতক্ষণ তার ও কথাটা মনেই হয়নি !

যুগবার্তায় প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞাপন-রজ্জুকে অবলম্বন করেই তো অনায়াসে সে রতনগ রবিশঙ্করের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। হাতের একেবারে এত কাছে এমন চমৎক একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র থাকতেও কিনা সে এতক্ষণ ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না !

হ্যাঁ, ঠিক আছে। কালই সিদ্ধার্থ সরকারের কাছ থেকে তার সেই পরিচিত ডাক্ত বন্ধুর নামে একটা পরিচয়-পত্র নিয়ে সে রতনগড়ের দিকে রওনা হবে।

কিরীটী নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

নতুন করে আবার প্রথম থেকে রাঘবেন্দ্র-কাহিনী ও সিদ্ধার্থের মুখে শোনা রতনগ কাহিনী আগাগোড়া দুটো চিন্তা করে, একের সঙ্গে অন্যের একটা যোগাযোগ স্থাপ চেষ্টা করতে লাগল।

কেবলই যেন তার মনে হতে লাগল, দুয়ে দুয়ে চারের অব্যর্থ যোগফলের মত উপ উক্ত দুটি ঘটনার মধ্যেও যেন একটা সত্য আছে।

সেইদিন রাঘবেন্দ্র চলে যাবার পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং ক রেখে দিয়েছিল কিরীটী এবং জামার পকেটেই কাটিংটা ছিল। পকেট থেকে সে বের করল কিরীটী।

বিজ্ঞাপনটা আর একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিরীটী ভাল করে পড়ল।

সলিল সরকার—ম্যানেজার, রতনগড় স্টেট। রতনগড়।

সলিল সরকারের কাছ পর্যন্ত তো এখন এগুনো যাক, তার পর এই সলিল সরকা মাধ্যমেই রতনগড়ের বর্তমান মালিক রবিশঙ্করের কাছ পর্যন্ত এগুনো যায় কিনা পরে দে যাবে।

মনে মনে কিরীটী তার ভবিষ্যতের প্ল্যান সম্পর্কে একটা ছকও এঁকে ফেলে। রত গড়—সলিল সরকার—তার পর রবিশঙ্কর।

॥ চার ॥

পরের দিন যুগবার্তার প্রোপ্রাইটার সিদ্ধার্থ সরকারের কাছ থেকে রতনগড়ে অবস্থিত ত ডাক্তার-বন্ধু শ্যামাকান্ত ঘোষালের নামে একটা পরিচয়-পত্র পেতে কোন অসুবিধাই না কিরীটীর।

কালবিলম্ব আর নয়, শুভস্য শীঘ্রম্।

বেলা তিনটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের ডাকগাড়িতে কিরীটী রতনগড় অভিমুখে রওনা হল। রওনা হবার পূর্বেই ডাঃ ঘোষালকে নিজের পরিচয় দিয়ে সিদ্ধার্থ সরকারকে দিয়ে একটা জরুরী তার পাঠাতে ভোলেনি।

কারণ ট্রেনটা পৌঁছাতে নির্দিষ্ট জায়গায় সেই রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। অত রাত্রে অপরিচিত স্থানে কোন পরিচিত ব্যক্তির সাহায্য না পেলে অসুবিধায়ও পড়তে পারে।

ট্রেনটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় মিনিট কুড়ি পরেই স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

সঙ্গে বিশেষ কোন লটবহর নেই।

মাঝারি গোছের একটা চামড়ার সুটকেস মাত্র নিয়েছিল সে। এবং তার মধ্যেই নিয়েছিল সে অতি আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্য তার জিনিসপত্রগুলো।

ডাকগাড়ি ঐ ছোট্ট স্টেশনটায় মাত্র আধ মিনিটের জন্য দাঁড়ায়। স্টেশন থেকে রতনগড় স্টেট প্রায় মাইল আষ্টেকের পথ হবে।

পূর্বে ঐ ছোট্ট স্টেশনটিতে ডাকগাড়ি দাঁড়াত না। পরে রতনগড়ের মালিকই সরকারকে লেখালেখি করে রাত্রের ডাকগাড়িটা আধ মিনিটের জন্য দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

সেই নিয়মই গত বিশ বছর থেকে আজও চলে আসছে।

কিরীটী গাড়ি থেকে নামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট লৌহসরীসৃপ শব্দ তুলে দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কেবল কিছুক্ষণ পর্যন্ত গাড়ির শেষপ্রান্তে লাল আলোটা যেন অন্ধকারে লাল একটা রক্তবিন্দুর মত জেগে রইল। তারপর সেটাও গেল মিলিয়ে।

যাত্রী কিরীটী ও অন্য একজন ছাড়া আর তৃতীয় কেউ ছিল না।

সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। কে যেন কালো কালি গুলে সমস্ত পরিদৃশ্যমান আকাশটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত লেপে দিয়েছে।

থেকে থেকে সেই কালো আকাশের বুকে সোনালী বিদ্যুতের ইশারা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় যেন বরফের চাবুক।

মাথায় ওয়াটারপ্রুফ কানঢাকা ক্যাপ ও গায়ে তদ্রূপ কোট চাপিয়ে কিরীটী এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

ছোট্ট স্টেশন।

টিম্‌টিম্‌ করে গোটা দুই কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। কিছুদূরে অস্পষ্ট দেখা যায়

অ্যাস্‌বেস্‌টাসের সেডের নীচে ছোট্ট স্টেশন-ঘরটি।

কিরীটী সুটকেসটা হাতে সেই স্টেশন-ঘরের দিকেই এগিয়ে চলল। একটু এগু
দেখা গেল দুজন লোক ছায়ামূর্তির মত ওই দিকেই অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। তা
একজনের হাতে একটা লণ্ঠন।

ভিজে মাটিতে লণ্ঠনের আলো পড়ে যেন কেমন অদ্ভুত দেখায়। সামনাসামনি হ
লণ্ঠন হাতে ব্যক্তি কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এই ট্রেনেই এলেন?

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসছেন?

হ্যাঁ।

আপনার নাম?

কিরীটী রায়।

এবারে কথা বললেন পূর্ব প্রশ্নকারীর সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি, নমস্কার মিঃ রা
আমার নামই শ্যামাকান্ত ঘোষাল।

নমস্কার। কিন্তু আপনি নিজে কষ্ট করে এই রাত্রে জল-বৃষ্টি মাথায় করে স্টেশ
আসতে গেলেন কেন ডাঃ ঘোষাল? কাউকে একজন পাঠিয়ে দিলেই পারতেন!

বিলক্ষণ! তাই কখনো হয় নাকি? সিদ্ধার্থের কাছ থেকে আপনি আসছেন!

এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে আবার ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল
তিনজনে তাড়াতাড়ি এসে স্টেশন-ঘরে ঢুকলেন কোনমতে মাথা বাঁচাতে।

তাই তো, বড় জোড় বৃষ্টিটা এসে গেল দেখছি! এ বৃষ্টিতে তো টমট
হাঁকানো যাবে না। বললেন ডাঃ ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে কিরীটী বললে, তাতে আর কি হয়েছে? বৃষ্টিটা ধরুক, তার পর রওনা
হওয়া যাবে'খন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভাল। বরং চট্‌পট একটু চা বানানো যাক, কি বলেন ডাক্তারবা
স্টেশনমাস্টার হরিশবাবু বললেন।

এবং কথাটা বলে স্টেশনমাস্টার হরিশবাবু ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে তাকালে

ভদ্রলোকের কথায় কিরীটী তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

বেশ নাদুসনুদুস প্যাটার্নের চেহারা, ফোলা ফোলা গাল। ওষ্ঠের উপরে বেশ পু
একজোড়া গোঁফ, যার দুটি প্রান্ত সূক্ষ্ম করে পাকানো। পরিধানে একটি ধুতি ও গ
টিপিক্যাল রেলওয়ে কর্মচারীদের মনোগ্রাম করা পিতলের বোতামওয়ালা ছা
কাপড়ের কালো কোট। কোটের সমস্ত বোতামগুলিই খোলা। গায়ের গেঞ্জির

াকে গলার ঠিক নীচেই রোমরাজির প্রাচুর্য উঁকি দিচ্ছে। বয়স চল্লিশের কোঠায় বলেই ন হয়।.

ব্যাচিলর লোক, একা একা থাকেন। হাসিখুশি আনন্দপ্রিয় মানুষ। ডাক্তাব াষালের সঙ্গে স্টেশনমাস্টার হরিশ চাটুয্যের আলাপটা একটু বেশীই। এবং আলাপেব াকর্ষণটা ছিল উভয়ের মধ্যে দুজনেরই দাবা খেলার প্রচণ্ড নেশা।

প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটি দিন দীর্ঘ আট মাইল পথ টমটম ছুটিয়ে ডাঃ ঘোষাল শনে দাবা খেলতে আসেন।

হরিশ চাটুয্যের কথায় ডাঃ ঘোষাল বললেন, ঠিক ঠিক, চাটুয্যে, বানাও দেখি গবম াম কাপ তিনেক স্ট্রং চা। কি বলেন মিঃ রায়, এ সময়ে চায়ে আপনার আপত্তি নেই া?

এ সময় কেন, কোন সময়েই চাযে আমার আপত্তি নেই। কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

স্টেশন-ঘরের মধ্যেই স্পিরিট-ল্যাম্প ছিল, হরিশ চাটুয্যে হাঁটুর উপরে কাপড তুলে ু হয়ে বসে ল্যাম্প জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন।

বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। স্টেশন-ঘরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ হয না। াক থাকে। সেই ফাঁক দিযে জলেব ঝাপটা এসে ঘরে প্রবেশ করছে হাওযার ঙ্গ সঙ্গে।

চা তৈরী করে চা পান শেষ করতে করতেই বৃষ্টিটা অনেকটা ধরে এল।

বাইরে বের হয়ে বৃষ্টিটা একটু অনুভব করে ডাঃ ঘোষাল ফিরে এসে বললেন, এই লা বেরিয়ে পডা যাক মিঃ রায়, আকাশের যা অবস্থা বৃষ্টি একেবারে ধরবে বলে মনে চ্ছ না। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

তাই চলুন।

স্টেশনের বাইরে একটা পত্রবহুল আমলকী গাছের নীচে ডাক্তারের টমটমটা দাঁড় ানো ছিল।

টমটমটা ঝকঝকে এবং ঘোড়াটিও সবল হৃষ্টপুষ্ট। বেচারী বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ডযে ভিজতে ভিজতে পাথরের নুড়ি ফেলা রাস্তার উপর থেকে থেকে পা ঠুকছিল।

উভয়ে টমটমে উঠে বসলেন।

উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ—এত বৃষ্টি হলেও কাদায় প্যাচপ্যাচ করে না। খুব চওড়া াবার খুব সরু নয় পথটা। এবং দুটো গাড়ি সর্বত্র পাশাপাশি যাওয়া একট লই।

াইল চারেক পথ যেতে যেতেই হঠাৎ আকাশে দেখা দিল ত্রয়োদশীর বাঁকা চাঁদ।

আকাশে সঞ্চরণশীল টুকরো টুকরো ধূসর মেঘের গায়ে সেই চাঁদের আলো যেন অপূর্ব একটা শ্রী ধারণ করে।

দূরে ধূসর পাহাড়শ্রেণী ঢেউ তুলে তুলে ছড়িয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে পথের দু পাশে শালপিয়ালের জঙ্গল।

বর্ষণ-সিক্ত সেই গাছপালার উপর চাঁদের আলো পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছে গলা রূপার মত।

কিরীটী মুগ্ধের মত চারিদিককার দৃশ্য দেখতে দেখতেই চলছিল।

বর্ষণ-সিক্ত মধ্যরাত সহসা যেন রহস্যঘেরা এক রঙমহলের দ্বার খুলে দিয়েছে ও চোখের সামনে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন এখনও কোন মেঘমল্লারের শেষ রেশ সদ্য ঘুমভাঙা স্বপ্নের মতই লেপে রয়েছে আলতোভাবে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে।

হঠাৎ ডাঃ ঘোষালের ডাকে কিরীটীর চমক ভাঙল।

কিরীটীবাবু!

বলুন।

সিদ্ধার্থের চিঠিটা পড়ে আপনার এখানে হঠাৎ এভাবে আগমনের হেতুটা আদপেই স্পষ্ট হল না। সে লিখেছে বিশেষ একটা কাজে নাকি আপনি এখানে আসছেন এবং আমাকে সে লিখেছে, যতদূর সম্ভব আপনাকে সাহায্য করতে। সাহায্য আপনি যে ঠিক কি রকম চান আমার কাছ থেকে এবং সেটা আদৌ আপনার কাজে লাগবে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না রায়মশাই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে কিরীটী তাকাল তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ডাঃ ঘোষালের দিকে।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, কারণ আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আপনার বহুল পরিচিত নাম ও মানুষটি সম্পর্কে সাধারণ লোক এত বেশী জানে যে, আপনার মত লোকের কী সাহায্যে আমি আসতে পারি সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি স্টেশনে আমাকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন রায়মশাই, কেন নিজে এত রাত্রে কষ্ট স্বীকার করে আপনাকে নিতে এসেছি? তার জবাবে বলতে পারি, আপনাকে দেখবার ও আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অদম্য একটা স্পৃহা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। তাই আপনাকে স্টেশনে রিসিভ করতে যাবার লোভটা সংবরণ করতে পারিনি।

ডাঃ ঘোষালের শেষের কথায় কিরীটী মৃদু একটু হাসল মাত্র নিঃশব্দে। কোন জবাব দিল না। পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌খট্ মেটালিক আওয়াজটা কেবল রাতের স্তব্ধতার বুকে একঘেয়ে একটা শব্দ-তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে।

চাঁদের গা ঘেঁষে বর্ষণক্লান্ত নিশাকাশে চলেছে টুকরো টুকরো মেঘের আসা-যাওয়া পথে।

মধ্যযামিনী যেন শূন্য নভোতলে স্বপ্নের আলপনা এঁকে চলেছে সূক্ষ্ম তুলির এলো-। টানে টানে। আসলে ঐ অদ্ভুত পরিবেশের ধ্যানটুকু যেন কথা বলে ভাঙতে চুল না কিরীটী। তথাপি ডাঃ ঘোষাল যখন নিজে থেকেই কথা শুরু করলেন, তখন ত কিছু না বলা কেমন যেন ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলেই মনে হয় তার।

কিরীটী তাই এবারে নিজে স্তব্ধতা ভঙ্গ করল, সত্যিই এখানে এসেছি আমি কয়েকটা দ সংগ্রহ করতে ডাঃ ঘোষাল।

সংবাদ! কথাটা বলেই হঠাৎ ডাঃ ঘোষাল যেন তাঁর ক্ষণপূর্বের বিস্ময়কে একপাশে দিয়ে বলে উঠলেন, বোধ হয় বুঝতে পারছি কেন এখানে আপনি এসেছেন!

কৌতূহলী কিরীটী প্রশ্ন করে, কি বলুন তো?

রতনগড় সম্পর্কেই কোন কিছু তো?

ডাঃ ঘোষালের কথায় কিরীটীর মুহূর্তেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ডাক্তার লোকটি ওঁর কে সাধারণের চাইতে বেশ কিছুটা বেশীই বুদ্ধি ধরেন। তাই এবারে স্মিত কণ্ঠে টী প্রত্যুত্তরে বললে, আপনি অনুমান ঠিকই করেছেন ডা ঘোষাল। রতনগড় র্কে কিছু সংবাদ সংগ্রহের আশাতেই এখানে আমার আসা। আর আমার বিশ্বাস ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট সহায়তাই পাব।

ডাঃ ঘোষাল জবাবে যেন একটু নিরুৎসাহের মতই চুপ করে রইলেন।

ডান হাতের শিথিল মুষ্টির মধ্যে ছুটন্ত অশ্বের বল্গার প্রান্তটি ধরা। দৃষ্টি সম্মুখের প্রসারিত। এতক্ষণে নির্জন রাস্তা অতিক্রম করে বহু দূর দূর বিচ্ছিন্ন হলেও কিছুটা লয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল ওদের ধাবমান টমটম।

উঁচু-নীচু রাস্তা এখানেও। একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অসমতল শূন্য প্রান্তর মধ্য-নীর ক্লান্ত স্তব্ধতার মধ্যে যেন গা এলিয়ে পড়ে আছে। অন্যদিকে কিছুটা অন্তর অন্তর মধ্যে দেখা যাচ্ছে দু-একটি সাঁওতাল-পল্লী ও সেই পল্লীর কুটীরগুলো।

কিরীটী স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, আচ্ছা ডাঃ ঘোষাল, আপনি রতনগড় স্টেটের নজার সলিল সরকারকে চেনেন নিশ্চয়ই?

সম্মুখের পথের দিকে দৃষ্টি রেখেই ডাঃ ঘোষাল জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অল্পবিস্তর পরিচয় বৈকি। মধ্যে মধ্যে পূর্বে যখন রতনগড়ের পূর্বতন মালিক জগদীশনারায়ণ জীবিত কালীন সময়ে সময়ে রতনগড়ে আমি যেতাম, তখনি আলাপ হয়েছিল সরকারমশায়ের শুনেছি বহুবর্ষ ধরে সলিল সরকার নাকি রতনগড়ে ম্যানেজারী করেছেন—সেই

ধরুন জগদীশনারায়ণের বাপের আমল মুরলীনারায়ণের সময় থেকেই।

তাহলে বেশ বয়স হয়েছে বলুন লোকটির !

হ্যাঁ, তা ধরুন পঁয়ষট্টি তো হবেই। কিন্তু এককালে বড় কুস্তিগীর ছিলেন, যথেষ্ট চর্চা করেছেন, ব্রহ্মচারী নিরামিষাশী মানুষ বলেই হয়ত এখনো ঐ বয়সেও বেশ কায আছেন। চট করে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতেই পারবেন না যে সলিল সরকারে বয়স হয়েছে !

এখনো তো তিনিই ম্যানেজার স্টেটের ?

হ্যাঁ, নামে তাই বটে তবে কার্যে আর নেই। রবিশঙ্কর নিজেই সব দেখাশুনো থাকেন আজকাল। কাউকেই তিনি বড় একটা বিশ্বাস করেন না।

খুব সন্দেহ-বাতিক বুঝি লোকটা ?

তা নয় ঠিক, তবে এক বিচিত্র ধাতুতে গড়া।

কি রকম ?

সে ঠিক আপনাকে আমি হয়ত এক কথায় বা দু কথায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে পারব না। A man of peculiar nature! একটা type character ম বিরাট চেহারা, তপ্ত কাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, কথা খুব কম বলেন, কারো সঙ্গেই মে তেমন, তেমনি হট করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবারও যেন কেউ সাহস পায় না। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পাইনি বটে, তবে যে দু-চারজ সুযোগ ঘটেছে তাদের মুখেই শুনেছি, সে চোখে নাকি আছে এক সম্মোহন দৃষ্টি। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় বলতে গেলে লোকটা দোতলার একটি ঘরে থাকেন। বৈ ঠিক সন্ধ্যার আগে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বের হন ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েকের জন্য। ঘোড়ায় চাপা নয়, ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটান। মধ্যে মধ্যে দু-একবার রাস্তায় ঐ চোখে পড়েছে—ঝড়ের বেগে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে সামনে দিয়ে ছুটে যেতেন। কেউ দেখা করতে চাইলে তাঁর সঙ্গে, আগে অনুমতি চেয়ে পাঠাতে হ তবে দেখা তিনি করবেন কি না করবেন জানা যাবে। কিন্তু এও শুনেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি বড় একটা পাওয়াই যায় না বা বলতে পারেন তিনি দেখাই না কারুর সঙ্গে। যে ঘরে দোতলায় তিনি থাকেন সে ঘরে প্রবেশ করবার হুকুম আছে শুনেছি ঠাকুর ও চাকরের এবং তাঁর অতি প্রিয় নেপালী দরোয়ান জঙ্গ বাহা সে সর্বদা বাঘের মত ওৎ পেতে দোরটার সামনে বসে আছে চব্বিশ ঘণ্টাই।

আশ্চর্য লাগছে লোকটার সম্পর্কে শুনতে। তার পর ?

হ্যাঁ, আশ্চর্যই লাগবার কথা। লোকটা যেন পুরোপুরি একটা মিস্ট্রি। শুনেছি সারা

ঘণ্টা দুই ছাড়া ঘুমোয় না লোকটা। এবং শুধু সেই দু ঘণ্টা ছাড়া বাকি রাতটা র মধ্যে হাজার পাওয়ারের বিদ্যুৎবাতি জ্বলে।

বিদ্যুৎবাতি!

হ্যাঁ, স্টেটের প্রাসাদে ওদের নিজস্ব ডায়নামোতেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

ওঁরা কি জাত ডাঃ ঘোষাল?

কনৌজ ব্রাহ্মণ।

পূর্বতন মালিক রতনগড়ের জগদীশনারায়ণের তো কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না— না?

প্রত্যুত্তরে যেন একটু ইতস্তত: করেই একটা ছোট্ট ঢোক গিলে ডাঃ ঘোষাল বলেন, হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। কারণ জগদীশনারায়ণ বিবাহ করেননি। আরে মশাই, তো কোথা থেকে উড়ে এসে ঐ ভাগ্নে একটা জুড়ে বসেছে!

জগদীশনারায়ণের কত বছর বয়সে মৃত্যু হয়?

তা খুব বেশী হবে না। বছর বিয়াল্লিশ বয়েস হবে তখন জগদীশনারায়ণের।

কিসে মারা গেলেন? কি হয়েছিল?

সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

কি রকম?

একদিন প্রত্যুষে রতনগড় প্যালেসের পশ্চাতের উদ্যানে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। ধরুন আজ থেকে বছর আষ্টেক পূর্বে। জগদীশ তাঁর পিতা মুরলীনারায়ণের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর বেঁচেছিলেন।

মৃত্যুর কারণ কিছু জানা যায়নি?

না। কেউ বলে হত্যা করেছে কেউ তাঁকে, আবার কেউ বলে তিনিই নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন।

কিন্তু আত্মহত্যা করবার তাঁর কোন কারণ ছিল নাকি? বা কোন চিঠিপত্র কি রেখে গিয়েছিলেন?

না, সে রকমের কিছুই নয়। পরের দিন সকালবেলা দশটা পর্যন্ত যখন তিনি শয়ন-দরজা খুললেন না, তখন সাড়া পড়ে যায় রতনগড় প্যালেসে। সাধারণত অবিশ্যি আটটা সাড়ে আটটার আগে জগদীশনারায়ণ ঘুম থেকে উঠতেন না। কিন্তু তাই বেলা দশটাও কখনো হত না তাঁর ঘুম ভাঙতে। তাতেই, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত যাবার পরও যখন দেখা গেল তিনি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না—একটা সাড়া যায়।

তার পর ?

তার পর পুলিস আসে, এসে দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে যখন ঘরের মধ্যে ক
কোন সন্ধান পেল না, তখন খুঁজতে খুঁজতে জগদীশনারায়ণের মৃতদেহ প্যালে
পিছনের দিকে উদ্যানে আবিষ্কৃত হল। মৃতদেহে তার পূর্বেই রাইগার মর্টিস শুরু হ
গেছে।

তাঁর মৃত্যু বা আত্মহত্যার কারণ কিছুই জানা যায়নি তাহলে ?

না। তবে আমার মনে হয়, স্থানীয় দারোগা পাণ্ডে কিছু জানেন হয়
ব্যাপারটাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবার চেষ্টা কিছুদিন করেছিলেন, কিন্তু শেষট
সব যেন কেমন ধামাচাপা পড়ে গেল। এবং তার মধ্যে ঐ ম্যানেজার সলিল সরকা
কিছু হাত ছিল বলেই সকলের বিশ্বাস।

একটা কথা ডাঃ ঘোষাল, ঐ জগদীশনারায়ণের চরিত্র কেমন ছিল ?

একটু খেয়ালী ও বিলাসী ছিলেন বটে, তবে মদ বা নারীতে কোন আসক্তি
বলে শুনিনি—যেটা সাধারণতঃ ঐ শ্রেণীর ধনী লোকদের মধ্যে খুব দেখা যায়।

ইতিমধ্যে ওঁরা প্রায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সামনেই লোকালয়। এ
তার মধ্যে বিশেষ করে একটা তিনতলা বিরাট প্রাসাদ চাঁদের আলোয় সহজেই কিরী
দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খুব বেশী দূরে নয় সেই বাড়িটা, তাই তার দ্বিতলের একটি কক্ষে যে তখনও প্র
শক্তিশালী বিদ্যুৎ আলো জ্বলছে, তা সহজেই নজরে পড়ে কিরীটীর দূর থেকেও। এ
কিরীটী কোনরূপ প্রশ্ন করবার আগেই ডাঃ ঘোষাল সেই আলোকিত প্রাসাদের দি
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলেন, ঐ যে দেখুন, দেখা যাচ্ছে রতনগড় প্যালেস! ঐ দে
এখনো রবিশঙ্করের ঘরে আলো জ্বলছে!

কিরীটী কোন কথা না বলে কেবল সেইদিকে তাকিয়েই রইল।

গাড়ি এসে ডাক্তারের বাংলো বাড়ির গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

ডাঃ ঘোষালের বাড়িটা রতনগড় থেকে খুব বেশী দূরে নয়। মিনিট দশেকের
হবে হয়তো।

ডাঃ ঘোষাল নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ। তিনি নিজে এবং তাঁর স্ত্রী। একটিমাত্র ছেলে
সে কলকাতায় এক মিশনারী কলেজের অ্যাটাচড বোর্ডিংয়ে থেকে বি. এস-সি পড়ে

অত্যন্ত ছিমছাম গোছানো বাড়িটি। এবং ঘরের আসবাবপত্র দেখলে মনে
ডাক্তারের আয় বেশ ভালই।

ডাক্তার-গৃহিণী অমলা দেবী স্বামীর প্রতীক্ষায় তখনও বাইরের ঘরে জেগেই বসে-লেন বোধ হয়। গাড়ির শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে সামনের সংলগ্ন বারান্দায় এসে ালেন।

কোচোয়ান ও কমবাইণ্ড সহিস ছট্টুলাল এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়ি াবলের দিকে নিয়ে গেল।

ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ওঁদের সুসজ্জিত পারলারেই এসে বসল। তে তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে বারোটা।

আলাপ-পরিচয়ই শুধু হল, বিশেষ কথাবার্তা সে রাত্রে আর হল না।

কিরীটী গিয়ে তার নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করল।

॥ পাঁচ ॥

র দিন সকালে বেশ একটু বেলাতেই কিরীটীর ঘুম ভাঙল। ডাক্তার ও ডাক্তার-ীর চিরদিন একটু সকাল-সকালই শয্যাত্যাগের অভ্যাস। তাঁরা দুজনেই ইতিপূর্বে রের বারান্দায় এসে বেতের দুখানি চেয়ার অধিকার করে বসেছেন। সামনে একখানি তর টেবিলে চায়ের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত। বোধ হয় তাঁরা তাঁদের অতিথির জন্যই পেক্ষা করছিলেন। ডাক্তার-গিন্নীর বয়স বছর পঁয়ত্রিশের উপরই হবে এবং শরীরে একটু মেদবাহুল্য দেখা দিয়েছে, তবে চেহারাটা সুন্দর বলে নেহাৎ মন্দ দেখায় না। ধানে সাদা তাঁতের চওড়া কালোপাড় শাড়ি। হাতে চার গাছি করে সোনার চুড়ি াখা। সিঁথিতে সিঁদুর। সদ্যস্নানের পর ভিজে চুলের রাশ ঘোমটার পাশ দিয়ে ব উপরে নামানো। গৌরবর্ণা। ডাঃ ঘোষাল কিন্তু স্ত্রীর ঠিক বিপরীত। দোহারা গাটে চেহারা। গায়ের রং কালো। মাথার সামনের দিকে বেশ খানিকটা টাক ড়েছে। রগের দু পাশের চুলেও পাক ধরেছে। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। খেমুখে একটা অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি। গতরাত্রে ভাল করে কিরীটী ডাঃ ঘোষালের হারাটা পর্যবেক্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু আজ দিনের আলোয় সেই মুখের দিকে াকিয়ে থাকতে থাকতে কেন যেন তার মনে হতে লাগল, কবে কোথায় যেন, ঠিক ঐ খানি না হলেও, অমনি মুখের একটি আদল সে দেখেছে। মুখের ডৌলটি যেন তার চেনা-চেনা লাগছে। মুখখানি যেন একেবারে অপরিচিত নয়। কিরীটী স্মৃতির াগুলো মনে মনে উল্টোতে থাকে। কেন—কেন অমন মনে হচ্ছে মুখখানি দেখে?

যাহোক, হাতমুখ ধুয়ে কিরীটী পুনরায় বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ডাঃ ঘোষাল ; সম্ভাষণ জানালেন, আসুন রায়মশাই !

উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল আমার। বলতে বলতে কিরীটী একটা খালি চে টেনে নিয়ে বসল।

ডাক্তার-গিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে চা তৈরী করে দুজনকে দিলেন।

কিরীটী প্রশ্ন করে, ও কি, আপনি চা নিলেন না মিসেস ঘোষাল ?

জবাব দিলেন ডাঃ ঘোষালই, না। উনি ও-রসে বঞ্চিতা গোবিন্দের দাসী। উ চা একেবারেই খান না, আর এ অধম দিনেরাত্রে অন্ততঃ বিশ কাপ চা পান করে থাকে

চা পানের সঙ্গে সঙ্গে মামুলী আলাপ চলতে লাগল।

বাড়িরই অন্য একটি ঘরে ডাক্তারের চেম্বার ও ডিস্‌পেনসারি। ইতিমধ্যে রো এসে একজন দুজন করে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। ডাক্তার তাই বিদায় নিয়ে দেখতে চলে গেলেন।

ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গেই কিরীটী তখন আলাপ চালাতে লাগল।

ভদ্রমহিলা যেমন মিশুকে তেমনি গল্পপটু।

জায়গাটা তো বেশ নির্জন বলেই মনে হয়। আপনাদের ফাঁকা ফাঁকা লাগে মিসেস ঘোষাল ? কিরীটী একসময়ে বলে।

অনেকদিন আছি তো, অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে ডাক্তার-গি বললেন।

কতদিন হল আপনারা এখানে আছেন ?

তা প্রায় কুড়ি বছর তো হবেই।

এখানে আর বাঙালী কোন পরিবার নেই ?

হ্যাঁ, চার ঘর বাঙালী আছেন। রতনগড়ের কোল মাইনস্‌-এর বড় বড় কর্মচারী ফ্যামিলি।

রতনগড়ের বর্তমান মালিক রবিশঙ্কর তো শুনলাম ব্যাচিলার মানুষ। সে আর কোন স্ত্রীলোক নেই ?

রতনগড় তো যাইনি কখনো, তবে শুনেছি জগদীশনারায়ণের এক বিধবা আছেন। তাছাড়া দু-চারজন দাসীও আছে।

জগদীশনারায়ণের বিধবা বোনের কথা বললেন, তবে কি রবিশঙ্কর তারই সন্তা

না। ও হচ্ছে পিসতুতো বোনের সন্তান। নিকটবর্তী আর কোন ওয়ারিশা থাকায় ওই দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে রবিশঙ্করই সম্পত্তির মালিক হয়েছেন শুনেছি।

সেদিনটা কিরীটী আর কোথাও বেরই হল না।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ কিরীটী ডাক্তারের বাংলো থেকে বের হয়ে শ্লথ মন্থর-
রতনগড় প্যালেস বা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

রতনগড় প্যালেস সত্যই এক বিরাট অট্টালিকা।

বহির্মহলে একটা অফিস-ঘর রয়েছে। আট-দশজন কর্মচারী কাজে ব্যস্ত। অফিস-
প্রবেশ করতেই লেজারবাবু কালীপদ সোম লেজারবুক থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন,
চাই ?

ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হতে
কি ? কিরীটী বলে।

বসুন।

একটি বেয়ারাকে দিয়ে পাশেই ম্যানেজারের অফিস-ঘরে সংবাদ পাঠানো হল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডাক পড়ল কিরীটীর ম্যানেজারের ঘরে। ভারী পর্দা তুলে
টী বেয়ারার নির্দেশে গিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করল।

একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে চোখে চশমা লাগানো মাথা নীচু করে মস্ত
একটা মোটা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে কে একজন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন
ছিলেন।

মাথা ভরা চকচকে বিস্তীর্ণ একখানি টাক। রগের দু পাশে সামান্য যা চুল আছে
কাঁচায়-পাকায় মেশানো।

কিরীটীর পদশব্দে মুখ না তুলেই তিনি আহ্বান জানালেন, আসুন, বসুন।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সামনের একটা খালি চেয়ারে উপবেশন করল।

পূর্ববৎ মুখ না তুলেই আবার প্রশ্নোচ্চারিত হল, বলুন কি চান ?

আমি ঠিক আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে আসিনি ম্যানেজারবাবু!

কিরীটীর কথা এবং বিশেষ করে তার উচ্চারণের ভঙ্গিতেই এবারে ম্যানেজার সলিল
গর মুখ তুলে তাকালেন তার দিকে।

হ্যাঁ, আমি এসেছি আপনারই একটা কাজে।

আমার কাজে! কি বলুন তো ?

কিরীটী এবার পকেট থেকে সেই বিজ্ঞাপনের কাটিংটা বের করে মৃদুকণ্ঠে বললে, এই
জ্ঞাপনটা আপনিই বোধ হয় সংবাদপত্রে দিয়েছিলেন ?

বিজ্ঞাপনটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার তাকালেন ম্যানেজার কিরীটীর মুখের

দিকে। বললেন, হ্যাঁ। কোন খোঁজ পেয়েছেন ?

পাইনি এখনো—

পাননি তবে মিথ্যে মিথ্যে বিরক্ত করতে এসেছেন কেন ?

এসেছি কারণ সবটা না পেলেও কিছুটা সংবাদ পেয়েছি বৈকি।

কি—কি সংবাদ পেয়েছেন ?

ব্যস্ত হবেন না। আগে আমার কিছু জানবার আছে, সেই সংবাদগুলো আপ কাছ থেকে জানতে চাই।

কি বলুন তো ?

এই পান্না মেয়েটি কে ? কি তার পরিচয ?

কি তার পরিচয় ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তা তো আমি বলতে পারব না।

তার মানে ?

ঠিক তাই। যতটুকু ঐ বিজ্ঞাপনের মধ্যে আছে তার বেশী কিছুই এখন আ জানতে পারবেন না। তাতে করে যদি আপনি ওর কোন সন্ধান দিতে পাবেন দেবেন, নচেৎ আপনার সাহায্যের কোনই আমার প্রয়োজন নেই, আপনি যেতে পা

তাহলে তো দেখছি মুশকিল !

হ্যাঁ, মুশকিলই তো। নচেৎ দশ হাজার টাকাটা কি খোলামকুচি মশাই ?

কিন্তু এ তো আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে, মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে তার কিছু কিছু particulars-এরও দরকার !

বললাম তো আপনাকে, ওর বেশী বর্তমানে কিছুই জানানো সম্ভব নয়। শুধু য জানানো হয়েছে বিজ্ঞাপনে, ওর সাহায্যেই যদি আপনি পান্নার খোঁজ দিতে পারেন চেষ্টা করে দেখুন।

অতঃপর কিরীটী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। কোন কথাই বললে না। তা হঠাৎ আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা এই যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, এটা রবিশঙ্কর তো দিয়েছেন ?

কিরীটীর শেষের কথায় হঠাৎ যেন চমকেই মুখ তুলে তাকালেন ম্যানেজার ও দিকে। এবং কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আ কি মনে হয় ?

সত্যি বলতে কি আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি কিছুই জানেন না।

আপনার ধারণা ভুল।

ভুল!

হ্যাঁ, কারণ তিনিই ওই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

ও। আচ্ছা রবিশঙ্করবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা হতে পারে কি?

না, তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

তবু যদি একবার আমার আর্জিটা তাঁর কাছে পেশ করেন।

কোন ফল হবে না।

না হলে তো কথাই নেই। তবু একটিবার জিজ্ঞাসা করে তাঁকে দেখুন না, একটা ন্টারভিউ তিনি দেন কিনা আমাকে?

বেশ, বসুন আপনি, আমি স্লিপ পাঠাচ্ছি।

বেয়ারাকে ডেকে তখুনি ম্যানেজার দোতলায় স্লিপ পাঠালেন।

করীটী অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বেয়ারা ফিরে এল। এবং আশ্চয ব্যাপার, ম্যানেজাব স্লিপে লেন দেখা করবার অনুমতি এসেছে।

ক হল, দেখা করবেন কি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, যান ওর সঙ্গে।

কিরীটী বেয়ারার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দক্ষিণমুখী একটা ঘোরানো বারান্দা অতিক্রম করে তৃতীয় ব দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই, দরজার গোড়ায় টুলের উপরে একজন নেপালী ছিল, সে উঠে দাঁড়াল।

হলদেটে মঙ্গোলিয়ান প্যাটার্নের চ্যাপটা মুখখানা যেন একেবারে পাথরে খোদাই । মনে পড়ল কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ঘোষালের কথাটা। বাঘের মত থাবা পেতে বগোড়াতেই বসে থাকে একটা নেপালী, জঙ্গ বাহাদুর।

ক্ষুদে ক্ষুদে গোল চক্ষু। সাপের চোখের মতই যেন পলকহীন।

খাকি একটা হাফ-প্যাণ্ট পরিধানে ও গায়ে একটা হাফ-সার্ট।

কোমরে ঝুলছে এক হাত পরিমাণ একটা খাপে-ভরা কুকরী।

জঙ্গ বাহাদুর উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ওদের বাধা দিল না।

বেয়ারা কিরীটীকে নির্দেশ দিল চোখের ইঙ্গিত করে, যান বাবু, ভিতরে যান।

কিরীটী কোন দ্বিধামাত্র না করে দরজার গায়ে ঝুলন্ত ভারী কালো পর্দাটা একপাশে

সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

বেশ প্রশস্ত ঘরখানি।

ঝকঝকে মসৃণ কালো ইটালীয়ান মার্বেল পাথরের মেঝে। এত পরিষ্কার যেন মনে হয় এখুনি পা ফেললেই বুঝি পা পিছলে যাবে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই যে লোকটির সঙ্গে কিরীটীর চোখাচোখি হল, সে হ লম্বায় প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি। বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশুসম বাহু। পরিধানে একা ঢোলা পায়জামা। গায়ে একটা গেঞ্জি, তার উপরে একটা সাদা সিল্কের লাল সুতো ড্রাগন আঁকা কিমোনো। পায়ে ঘাসের চপ্পল।

ছড়ানো চৌকো চোয়াল, নাকটা একটু চাপা। প্রশস্ত কপাল। মাথার চুল রু তৈলহীন।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সরু পাকানো গোঁফ।

বিশেষ করে চোখ দুটি থেকে যেন একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কিরীটীর আপাদমস্তক লেহ করছে। লোকটা একটা ত্রি-পয়ের সামনে ঠিক দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতে একা রিভলবার নিয়ে তার চেম্বারটা বোধ হয় পরীক্ষা করে দেখছিল।

ত্রি-পয়টার সামনে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিলের সামনেই এক সাধারণ চেয়ার ও একটা গদি-মোড়া আরামকেদারা।

ঘরের মধ্যে বাহুল্য আসবাব বড় একটা নেই। ঐ টেবিলটি ও চেয়ার দুটি ছা আছে একটি স্টিলের আলমারি, গোটা দুই বুক-সেলফ ও একটা কাপড়ে ঢাকা স্ট্যাচু।

দেওয়ালে কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডার নেই, একটিমাত্র সুদৃশ্য গোলাকার ওয়ালক্ল ছাড়া।

এই তাহলে রতনগড়ের বর্তমান মালিক রবিশঙ্কর!

কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে হাতের রিভলবার শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে রবিশঙ্কর বললেন, আসু আপনারই নাম কিরীটী রায়?

হ্যাঁ।

বসুন।

কিরীটী কি জানি কেন আরামকেদারাটাই বেছে নিল বসবার জন্য এবং কিরীট আরামকেদারায় বসতে দেখে একবার যেন ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন তার দিকে র শঙ্কর।

আপনি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন?

হ্যাঁ।

পান্নার কোন সংবাদ পেয়েছেন ?

একেবারে যে কিছুই পাইনি তা নয়, তবে পুরোপুরি পেতে হলে কিছু সংবাদ আমার
া প্রয়োজন।

কি সংবাদ জানতে চান বলুন ?

পান্না কে ? কবে সে হারিয়েছে ?

পান্না কে, সেকথা জেনে আপনার কি হবে ? বছর পনেরো-ষোলোর একটি মেয়ে।
ক পাওয়া যাচ্ছে না। তার খোঁজ চাই।

কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে ?

ধরুন তার জন্ম থেকেই।

এতদিন তার কোনরকম খোঁজ নেওয়া হয়নি ? মানে বলছেন যখন জন্ম থেকেই
ক পাওয়া যাচ্ছে না !

ধরুন তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এতদিন কোন কিছু জানাই ছিল না। এখন জানা যাওয়ায়
র খোঁজ করা হচ্ছে।

তাই যদি হবে তো সংবাদপত্রে যে ফটোটা ছাপানো হয়েছে সেটা আপনারা পেলেন
থায় এবং কেমন করেই বা জানলেন যে-পান্নার আপনারা খোঁজ করছেন সে ঐ পান্না ?

ধরুন যেমন করেই হোক আমরা স্থির-নিশ্চিত, যে ছবিটা আপনি দেখেছেন সেই
ন্নারই আমরা খোঁজ করছি।

বিটা কোথায় পেলেন তা জানতে পারি কি ?

না।

এবারে কিরীটী মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললে, তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে পান্না নামে
একটি নির্দিষ্ট মেয়ের আপনারা খোঁজ চান, অথচ যে খুঁজে বের করবে তাকে কোন
ই আপনারা সাহায্য করতে নারাজ, তাই নয় কি রবিশঙ্করবাবু ?

আপনার তাই মনে হচ্ছে বুঝি ?

তাই স্বাভাবিক নয় কি মনে হওয়া ? আপনিই বলুন না ?

ধরুন আপনার অনুমানই যদি সত্য হয়, তবে কি পারবেন তাকে খোঁজ করে দিতে ?

এই মুহূর্তে বলতে পারছি না তা।

শুনুন তবে মিঃ রায়, আমরাও ঐ ছবিটুকু ছাড়া পান্না সম্পর্কে কিছুই জানি না।
যেমন করেই হোক পান্নার সংবাদ আমার চাই-ই। বুঝতে পারছেন বোধ হয় এখন
ারটা !

বুঝলাম। তার পর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে কিরীটী বললে, তাহলে এবার অ
চলি ?

আসুন। হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটা ম্যানেজারবাবুর কাছে রেখে যাবেন।

তার কোন প্রয়োজন হবে না। সংবাদ পেলেই আপনাকে আমি জানাব। অ
নমস্কার।

কিরীটী ঘর থেকে সোজা বের হয়ে এল।

॥ ছয় ॥

বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ কিরীটী ডাক্তারের বাংলোতে ফিরে এল। ডাক্তার গৃ
রন্ধনশালায় পাচককে রন্ধনের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন, কিরীটী নিজের ঘরে প্র
করে একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে খোলা জানালার ধারে
বসল।

যে জন্যে সে এখানে ছুটে এসেছিল তার কোন সুরাহাই হল না। অতএব বা
ট্রেনেই সে ফিরে যাবে কলকাতায় স্থির করল।

কলকাতায় ফিরবার ট্রেনটা এখান থেকে ছাড়ে রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে, আ
সে দেখে রেখেছে।

অতএব পৌনে এগারোটা নাগাদ রওনা হলেই চলবে।

কিন্তু দ্বিপ্রহরে ভোজনে বসে কথাটা উত্থাপন করতেই ডাঃ ঘোষাল প্রবল প্র
তুললেন, না না, তা হবে না। আপনার সঙ্গে আরো দু-চার দান দাবায় না
আপনাকে ছাড়ছি না রায়মশাই।

গত সন্ধ্যায় কথায় কথায় কিরীটীরও দাবা খেলার নেশা আছে শুনে ডাক্তার
নিয়ে দাবায় বসেছিলেন। এবং খেলতে বসে তিনবারের মধ্যে দুবার তিনি কিরী
কাছে মাত হয়েছেন।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, বেশ তাই হবে, পরশুই যাব।

কিরীটীর ঐভাবে অনুরোধে পড়ে আরও একটা দিন রতনগড়ে থেকে যাওয়া
নিশ্চয়ই সেই বিধাতারই কোন ইঙ্গিত ছিল, যিনি মানুষের সকল চিন্তা-বুদ্ধির অগে
বসে মানুষ মাত্রেরই যাবতীয় গতিবিধিকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ক

তাছাড়া নেহাৎ একটা ঝোঁকের মাথাতেই কিরীটী রতনগড়ে চলে এসেছিল, বে

গড় সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ সে সরকারের কাছ থেকে কলকাতায় বসে সংগ্রহ ছিল এবং আসবার পথে বাকি যেটকু ডাঃ ঘোষালের মুখে শুনেছিল, তাতে করে টীর আর কিছু না হোক, এখানে যে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না এটা সে কিন্তু ই বুঝতে পেরেছিল।

তবুও কোন একটা বিষয়ে অত সহজে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া কিরীটীর স্বভাববিরুদ্ধ ই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সে ধীর ভাবে অপেক্ষায় ছিল।

আহারাদির পর সেরাত্রে দাবা খেলতে বসলেও কিরীটী একসময় লক্ষ্য করে, ডাঃ াল যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন এবং বারবারই কি কান পেতে শোনবার করছেন। রাত ঠিক বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই খেলা বন্ধ করে ডাক্তার উঠে লেন নিজে থেকেই। এবং কিরীটী যখন ডাঃ ঘোষালকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ষ্ট ঘরে শুতে এল, দু চোখের কোথাও তার তখন ঘুমের লেশমাত্রও আর নেই।

ঘরের আলোটা কমিয়ে কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে বাড়ির পশ্চাৎ কার খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

সারাদিন এবং রাত আটটা-নটা পযন্ত কোন বৃষ্টি বা বৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু পর থেকেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমতে শুরু হয়েছিল ইতিমধ্যে।

এবং দেখা গেল সন্ধ্যার দিকে আকাশে যে একঝাঁক ঝক্‌ঝকে তারা ছিল, মেঘের ড়ালে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে যে রাত্রে বৃষ্টি নামবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই।

দূরে ইতিমধ্যেই হয়তো কোথাও বৃষ্টি নেমেছে, তারই আর্দ্রতা বাতাসে। কিরীটী ঘরে ছিল সে ঘরে ছিল দুটো দরজা। তার মধ্যে একটা দরজা বাড়ির পশ্চাতের ক। সেটা সাধারণতঃ বন্ধই থাকে। হঠাৎ সেই বন্ধ দরজার কপাটের গায়ে অতি অথচ স্পষ্ট টুক্‌ টুক্‌ করে গোটাকয়েক যেন টোকা পড়ল।

সদাসতর্ক কিরীটীর কানকে সে শব্দটা কিন্তু এড়িয়ে যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

কয়েকটা মুহূর্তের স্তব্ধতা। তার পরই আবার পূর্বের মতই কপাটের গায়ে শব্দ হল টুক্‌ করে।

বিস্মিত কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দরজার খিলটা এবারে খুলতেই দেখতে পেল, অস্পষ্ট ারর মত আপাদমস্তক একটা চাদরে আবৃত একটি মূর্তি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

কে?

হিস্‌-স্‌! একটা চাপা শব্দ-সংকেতে আগন্তুক কিরীটীকে সতর্ক করে দেয়: এবং

কিরীটীর কোনরূপ আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই পূর্ববৎ চাপা সতর্ক কণ্ঠে প্রায় ফিস্‌ফি করেই যেন বললে, চলুন মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। বলে এ বারে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে নিজেই দরজার খিলটা তুলে বন্ধ করে দিল কিরীটী যেন নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে সরে দাঁড়াল।

ও দরজাটাও বন্ধ করে দিন। পূর্ববৎ ফিস্‌ফিস্‌ করেই আগন্তুক আবার বলল।

কিরীটী দ্বিতীয় দরজাটিও বন্ধ করে এগিয়ে যেমন ঘরের কোণে টেবিলের ও রক্ষিত কমানো আলোটি একটু উস্কে দিতে উদ্যত হয়েছে, আগন্তুকের সাবধান-বাণী শো গেল, থাক্‌, আলোটা কমানোই থাক্‌ মিঃ রায়।

কিরীটী আলোটা আর উস্কে দিল না।

বেশী আমার সময় নেই। এখুনি আমাকে চলে যেতে হবে। কেবল একটা ক বলতেই চোরের মত আত্মগোপন করে আপনার কাছে আমাকে আসতে হয়েছে।

কিন্তু আপনার পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

না। শুনুন, আপনি সকালবেলা রতনগড়ে গিয়েছিলেন, না?

প্রশ্নটা শুনে কিরীটী যেন দ্বিতীয়বার চমকে ওঠে। এবং আবারও প্রশ্ন করে, আপনি?

বললাম তো, আমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করবেন না। শুনুন, আপনি জান চেয়েছিলেন না, হঠাৎ যুগবার্তা দৈনিকে পান্না সম্পর্কে অনুসন্ধান করে পুরস্কার ঘোষ করা হয়েছে কেন? মাস চারেক আগে রতনগড়ে বেনামীতে রবিশঙ্করের নামে একখা চিঠি আসে। চিঠির একটা নকল আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। পড়ে দেখবেন য এই চিঠি থেকে পান্নার অনুসন্ধানের ব্যাপারে আপনার কোন সাহায্য হয়। এই চিঠির নকলটা। বলতে বলতে আগন্তুক হাত বাড়িয়ে ভাঁজ-করা একটুকরো কা এগিয়ে দিল অদূরে বোবার মত দণ্ডায়মান কিরীটীর দিকে।

যন্ত্রচালিতের মতই কিরীটী আগন্তুকের প্রসারিত হাত থেকে ভাঁজকরা কাগ নিজের হাতে নিল।

আচ্ছা চলি, নমস্কার। বলে দ্বিতীয় আর কোন বাক্যব্যয় পর্যন্ত না করেই ও কিরী সে অবকাশমাত্র না দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে যে পথে ক্ষণপূর্বে ঘ মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল, সেই পথেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল আগন্তুক।

কিরীটীর মত লোকও যেন হতভম্ব হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত স্থাণুর মতই সেখানে দাঁ রইল।

তার পর যখন খেয়াল হল, দেখল বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে ইতিমধ্যে কখন বৃষ্টি শুরু

য়েছে।

খোলা দরজা-পথে জলের ছাট আসছে ঘরের মধ্যে। আর সেই হাওয়ায় ঘরের তটা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কিরীটী দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তার পর এগিয়ে এসে আলোর সামনে আলোর শিখাটা আরও একটু উস্কে দিল।

অস্পষ্ট আলোছায়ায় ছমছমে ঘরটা হঠাৎ যেন এতক্ষণে আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

জ-করা কাগজটার ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আলোর সামনে মেলে ধরল কিরীটী।

একখানি চিঠি।

অত্যন্ত দ্রুত লেখার জন্য জায়গায় জায়গায় অক্ষরগুলো যেন জড়িয়ে গিয়েছে। এবং লিতে নয়, পেনসিলে লেখা চিঠিটা।

বিনয় নিবেদন,

কিরীটীবাবু, আপনি অবিশ্যি আমাকে চেনেন না। কিন্তু আমি পূর্বে আপনার নাম ছি এবং বহুবার সংবাদপত্রে ও অন্যান্য কাগজে আপনার ছবি দেখেছিলাম, তাই সকালে যখন আপনি রতনগড় থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, দূর থেকে আপনাকে খই চিনতে পেরেছিলাম। এবং পরে শুনলাম আপনি রতনগড়ে এসেছিলেন এবং এসেছিলেন তাও শুনতে পেলাম।

পান্নার আসল পরিচয় যে কি তা আমি নিজেও জানি না। এবং পূর্বে কোনদিন ার নামও শুনিনি। কিন্তু মাসখানেক আগে হঠাৎ রতনগড়ে রবিশঙ্করের নামে ামীতে একটা চিঠি আসে। সৌভাগ্যক্রমে সে চিঠিটা আমার নজরে পড়ে এবং ঠতে যে কথাগুলি লেখা ছিল তা আজও স্পষ্ট আমার মনে আছে। চিঠিতে লেখা

ঙ্কর,

মি বোধ হয় জান যে রতনগড়ের আসল মালিক তুমি নও। যা হোক, তোমার র্থে জানাচ্ছি, রতনগড়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হচ্ছে হীরা, চুনি ও পান্না। হীরা-দুই যমজ ভাই ও তাদের বড় বোন পান্না। হীরা-চুনির সংবাদ আমি জানি কিন্তু র খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আশা করছি শীঘ্রই পাব। এবং তখন আমাদের য়র সাক্ষাৎ হবে। সব বোঝা-পড়া সেই সময়েই হবে। ইতি—

এই চিঠি পড়ে আপনি যদি কোন মীমাংসায় পৌছতে পারেন তো জানাবেন, আমি নার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ইতি হীরা-চুনি-পান্নার কশ্চিৎ হিতাকাঙ্ক্ষী।

দু-তিনবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিরীটী চিঠিটা পড়ল। কে এই পত্রলেখক?

জড়ানো ও অস্পষ্ট হলেও হাতের লেখা দেখে মনে হয়, এ কোন পুরুষের হস্তাক্ষর হবে। কিন্তু কে সে?

আর কেনই সে এভাবে আত্মগোপন করে থাকতে চায়?

হঠাৎ এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দুড়ুম দুড়ুম শব্দে পর পর দু গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

গুলির শব্দে চমকে ওঠে কিরীটী।

এবং গুলির পর পর দুটো আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কড়-কড়-কড়াৎ করে মে গর্জন ও বিদ্যুতের একঝলক সোনালী আলো যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকারকে চিরে দি গেল।

একটা শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দটা যেন একাকার হয়ে গেল।

দ্বিতীয়টা যেন প্রথমটার প্রতিধ্বনি বলেই মনে হল।

বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে যেন আকাশ ভেঙে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া। সোঁ সে কি গর্জন প্রায় দু ঘণ্টা ধরে!

কিরীটীর চোখে ঘুম আসতে প্রায় রাত তিনটে হয়ে গেল। এবং পরের দিন ভাঙল একটু বেলাতেই।

পরের দিন সকালে।

চায়ের টেবিলে ডাঃ ঘোষাল কিরীটীর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

কিরীটীকে আসতে দেখে বললেন, আসুন মিঃ রায়, আমায় উনি কি বলছি জানেন? অতিথির সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে আমি নাকি আপনার ওপর অত্যা করছি।

মিসেস ঘোষাল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই তো। ভদ্রলোককে ভাল ম পেয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত জাগিয়ে রেখে দাবা খেলে—

না না মিসেস ঘোষাল, দাবা বস্তুটির ওপরে আমারও নেশা আছে। কিরীটী স ভাবে প্রতিবাদ জানায়।

অগত্যা। ও-কথা না বলে আপনার উপায় কি বলুন? মৃদু হাসির সঙ্গে ডা গৃহিণী বলেন।

আরে তুমি কি বুঝবে বল! দাবার নেশা যে কি নেশা, যিনি একবার অ পেয়েছেন তিনিই জানেন!

কিরীটী হাসতে হাসতে মিসেস ঘোষালের দেওয়া চায়ের কাপটা হাতে তুলে

রেম চায়ে চুমুক দেয়।

না খেললে তুমি দাবা, না খেলে কোন দিন চা, জীবনের কী মূল্যবান দুটি বস্তু যে তুমি অজ্ঞতায় হারালে তা যদি বুঝতে! স্মিতকণ্ঠে বলেন ডাঃ ঘোষাল স্ত্রীকে সম্বোধন করে।

থাক্, থাক্, যত সব কু-অভ্যাসের আর বড়াই করতে হবে না। কিন্তু ওদিকে যে কম্পাউণ্ডার দুবার তাগাদা দিয়ে গেল—রোগীরা সব এসে ভিড় করে বসে আছে বাইরে।

হ্যাঁ উঠি। আর এক কাপ চা খেয়েই উঠব।

এক এক করে তো তিন কাপ তখন থেকে হল। আর না। এবারে ওঠ দেখি।

দেখুন মিঃ রায়, দেখুন, এখনো সেই শাসন! আরে বাবা, পঞ্চাশটা বছর তো পার হতে চলল, আর এ বয়সে বজ্র-আঁটুনি কেন?

কিরীটী হাসতে থাকে স্বামী-স্ত্রার কথায়।

সত্যিই ভারি সুখী এই ডাক্তার-দম্পতি। কোন ঝামেলা নেই, কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। একটি মাত্র ছেলে, তাও প্রায় মানুষ হয়ে এল।

বুঝলেন মিঃ রায়, ডাক্তারদের মত আর কোন profession-য়েই বোধ হয় আর কেউ এমন চোরদায়ে ধরা পড়েনি। দশ-দশটা হত্যা করলে বোধ হয় একজন মরে ডাক্তার হয়। বলতে বলতে ডাঃ ঘোষাল চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন।

ও কি, সমান্য মাত্র একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়েই চললে, কাল সারাটা রাত ধরে না কেশেছ! যাও, জামাটা গায়ে দিয়ে নাও। ডাক্তার-গিন্নী স্বামীকে বাধা দিলেন।

ডাঃ ঘোষাল আর কি করেন, জামা গায়ে দিতেই বোধ হয় শয়নঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

সস্নেহে স্বামীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোষাল-গিন্নী বললেন, এতটা বয়েস হল মিঃ রায়, তবু যদি নিজের শরীরের প্রতি এতটুকু খেয়াল থাকে। উনি আবার অন্যের ডাক্তার! বুঝলেন মিঃ রায়, সারাটা জীবন ধরে উনি অন্যের ডাক্তারী করলেন, আর আমাকে করতে হচ্ছে আজও ওঁর ডাক্তারী, এমন অন্যমনস্ক।

ঘোষল-গিন্নীর সমস্ত কথার ভিতর দিয়ে যেন অপরিমিত স্নেহ আর বুকভরা ভালবাসা ঝরে পড়তে লাগল তাঁর স্বামীর প্রতি।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসে কেবল।

বেলা তখন গোটা এগারো হবে। কিরীটী বাইরের বারান্দায় বসে বসে একটা ইংরাজী নভেলের পাতা উল্টোচ্ছিল। একপ্রকার যেন হন্তদন্ত হয়েই সেখানে এসে

দাঁড়ালেন ডাঃ ঘোষাল, শুনেছেন মিঃ রায়, কাল রাত্রে যে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘ
গেছে।

কি ব্যাপার?

খুন হয়েছে!

খুন হয়েছে? কে—কে খুন হল আবার?

রতনগড়ের বৃদ্ধ ম্যানেজার সলিলবাবু।

সে কি!

ইতিমধ্যে ঘোষাল-গিন্নীও স্বামীর সাড়া পেয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এব
স্বামীর শেষ কথাগুলো তাই তাঁর কানে গিয়েছিল।

তিনিও বলে ওঠেন, কি বলছ তুমি?

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে ডাঃ ঘোষাল ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, শুধু তাই নয় রম
ম্যানেজারের মৃতদেহটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে পাওয়া যায়নি। রাস্ত
বাঁকে যে ইউক্যালিপটাস্ গাছ দুটো আছে তারই নীচে—

মৃত্যুর কারণ বোধ হয় বুলেট! এবারে কথা বললে কিরীটী।

হ্যাঁ, দুটো গুলি করা হয়েছিল। একটা তার কপাল ভেদ করেছে, অন্যটা বাঁ হাত
লেগেছে। কিন্তু আশ্চর্য মিঃ রায়, আপনি বুঝলেন কি করে যে গুলি করেই তা
মারা হয়েছে!

কাল রাত্রে দু-দুটো গুলির শব্দ শুনেছিলাম যে। শান্তকণ্ঠে কিরীটী জবাব দে

গুলির শব্দ শুনেছিলেন কাল রাত্রে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কই, আমরা তো শুনিনি! তুমি শুনেছ? ডাঃ ঘোষাল স্ত্রীর মুখের দি
তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

আপনারা শুনতে পাননি—তারও কারণ আছে। ঠিক ফায়ারিংয়ের শব্দের সা
দঙ্গেই প্রচণ্ড একটা বাজ পড়ার শব্দ হয়েছিল। কিরীটী বলে।

তা হবে।

কিন্তু সংবাদটা আপনি পেলেন কোথায় ডাঃ ঘোষাল?

এই তো কিছুক্ষণ আগে একজন রোগীই বলছিল। সে-ই সব দেখে এসেছে।

পুলিসে জানতে পেরেছে কি ব্যাপারটা?

হ্যাঁ, মথুরাপ্রসাদ চৌবে এখানকার থানা অফিসার। অল্প বয়স, বেশ চালাক-চ
এবং ইন্‌টেলিজেন্ট। সেও এসেছে শুনলাম।

ডাঃ ঘোষালের কথাটা শেষ হল না, একটা অপরিচিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, কটর সাব!

আরে কেউ—মথুরাপ্রসাদ? আইয়ে—আইয়ে।

কিরীটী ঘুরে দেখল বছর আটাশ-উনত্রিশ বয়সের একটি পুলিসের ইউনিফর্ম রিহিত ভদ্রলোক সাইকেল থেকে নামছেন।

॥ সাত ॥

ানীয় থানা অফিসার মথুরাপ্রসাদ চৌবে।

সাইকেলটা বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে মচমচ শব্দ তুলে মথুরাপ্রসাদ সিঁড়ি দিয়ে বান্দায় উঠে এলেন।

রোগাটে চেহারা। কিন্তু চোখেমুখে একটা বেশ বুদ্ধির দীপ্তি আছে যেন। থুরাপ্রসাদ বারান্দায় একটা খালি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছেন তো খবর ডকটর সাব?

ডাঃ ঘোষাল মৃদুকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। মহেন্দ্র সিং এসেছিল, তার কাছেই খবব পেলাম।

কিন্তু আপনাদের এখান থেকে তো জায়গাটা খুব বেশী দূর নয়। আপনারা ফায়ারিং-এর শব্দ শোনেননি? মথুরাপ্রসাদ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

না। কাল রাত্রে যা দুর্যোগ গেছে, তা শুনব কি! তবে উনি বলছেন, উনি কি গুলির শব্দ শুনেছেন। ডাক্তার ঘোষাল ইঙ্গিতে কিরীটীকে দেখিয়ে কথাটা শেষ করলেন।

আপনি? মথুরাপ্রসাদ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনাকে আগে এখানে দেখেছি বলে তো কই মনে পড়ছে না?

মথুরাপ্রসাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন এবারে ডাক্তারই। বললেন, না চৌবেজী, আপনি ওঁকে দেখেননি। উনি মাত্র তিন দিন হল এখানে এসেছেন। তবে ওঁর নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়!

হ্যাঁ, বিখ্যাত রহস্য-ভেদী।…বেসরকারী ভাবে উনি detection করে থাকেন।

আরে ব্যাস্! চিনেছি—চিনেছি বৈকি! নমস্তে নমস্তে। কি আশ্চর্য, আপনার সঙ্গে যে কোনদিন এখানে এভাবে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি! তার পরই মথুরাপ্রসাদ আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এলেন, আপনি ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনেছিলেন

মিঃ রায় ?

হ্যাঁ, এবং আমার মত অনেকেই হয়ত শুনতে পেত, কিন্তু পর পর দুটো ফায়ারিংয়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একটা বজ্রপাতের শব্দ হওয়ায় ব্যাপারটা হয় সঠিক অনেকে বুঝতে পারেননি। তাহলেও এত কাছে যখন, তখন আশা করেছিলাম ওঁরা—মানে ডাঃ ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রীও বুঝি আমার মতই পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনে থাকবেন। কিন্তু ওঁরা শোনেননি।

আচ্ছা মিঃ রায়, গুলির শব্দ যখন কাল রাত্রে আপনি শোনেন, তখন কি আপনি জেগেই ছিলেন ? মথুরাপ্রসাদ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

রাত তখন কত আপনার মনে আছে ?

তা ধরুন প্রায় পৌনে দুটো হবে বৈকি।

বলেন কি ? অত রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন ?

হ্যাঁ, আমি আর ডাক্তারবাবু কাল রাত দেড়টা পর্যন্ত তো দাবাই খেলেছি!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবুর যে দাবা খেলার প্রচণ্ড নেশা।

কিন্তু মথুরাপ্রসাদবাবু, ব্যাপারটা সর্বপ্রথম জানতে পারে কে ? প্রশ্নটা ক কিরীটী।

একজন গোয়ালা। দুষ্টুরাম। দূর গাঁ থেকে রতনগড় আসবার ঐ একটিই প দুষ্টু প্রতিদিন ভোরবেলা দুধ নিয়ে রতনগড়ের বাজারে বেচতে আসে। তারই ন সর্বপ্রথম পড়ে। সে-ই তখন ছুটে গিয়ে আমাকে থানায় খবর দেয়। আমি ে মশাই প্রথমে শুনে ব্যাপারটা বিশ্বাসই করিনি। তার পর দুষ্টুর সঙ্গে সেখানে এ নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে তবে না বিশ্বাস হল।

তা বিশ্বাস হঠাৎ না হবারই তো কথা। কিরীটী বলে।

না না, ঠিক সেজন্য নয়। আপনি তো জানেন না, আমি জানি, ম্যানেজার—ম ঐ সলিল সরকার লোকটা, এখানে এসে অবধি যতদূর শুনেছি, রাত আটটার কখনো বেরই হত না নাকি। তাই তো ভাবছি অত রাত্রে অমন দুর্যোগের মধ্যে কাল এমন কি দরকার পড়ল যে বাড়ি থেকে তাকে বের হতে হয়েছিল!

হয়ত কোন কাজ পড়েছিল। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে।

তাই তো ভাবছি, কি এমন কাজ তার পড়ল! তাছাড়া, আরো একটা কথা জানেন রায়সাহেব? লোকটার নাম অন্ততঃ তিন-তিনটে মার্ডারের সঙ্গে জড়িত ছি কিন্তু কোন রকম প্রমাণ না থাকায় ওকে ছুঁতে পর্যন্ত পারিনি। এখানকার লোে

।ত, লোকটা নাকি ছিল শিয়ালের মত ধূর্ত। তাকে কিনা শেষ পর্যন্ত এমনি করে ।ঘোরে প্রাণ দিতে হল! অদ্ভুত ব্যাপার!

এমনিই হয় দারোগা সাহেব। ও ধরনের লোকদের সাধারণতঃ শেষটায় এইভাবেই ।ঘোরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু মৃতদেহ রিমুভ করেছেন?

না, এখনো করিনি, পুলিস পাহারা রেখে এসে'ছ। দেখবেন নাকি, চলুন না!

বেশ তো চলুন। ডাক্তারবাবু আসবেন নাকি? কিরীটী ডাক্তারের দিকে ।াকিয়ে প্রশ্ন করে।

এতক্ষণ ডাঃ ঘোষাল নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাই শুনছিলেন। একটি ।থা ও বলেননি।

এবার মৃদুকণ্ঠে কেবল বললেন, না। আপনারাই যান। আমাকে এখুনি একবার ।জারগাটে একটা জরুরী কলে বেরুতে হবে। কিন্তু বেশী দেরি করবেন না মিঃ রায়, ।াঞ্চ রেডি।

না না, বেশী দেরি হবে না। চলুন মথুরাপ্রসাদবাবু।

কিরীটী আর মথুরাপ্রসাদ বারান্দা থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গের কনস্টেবলটি মথুরাপ্রসাদের সা'ইকেলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। ওদের পশ্চাতে।

অকুস্থান ডাঃ ঘোষালের বাংলো থেকে বেশী দূর নয়। হাঁটাপথে মিনিট পনেরোর ।াস্তা হবে। সমস্ত রতনগড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত যে সড়কটি সেইটিই যেথ নে ডাইনে বাঁক খেয়ে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সরু হয়ে, প্রান্তরের মধ্য দিয়েই আবার অদূরবর্তী গাঁয়ের দিকে চলে গেছে, সেইখানেই উঁচু টিলার কোল ঘেঁষে দুটি ইউক্যালিপটাস্ ।াছ যেন প্রান্তরের সীমানার নির্বাক প্রহরীর মতই দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছ থেকে ।াত দশেক ব্যবধানে বড় সড়কটার উপরই তখনো পড়েছিল মৃতদেহটা—রতনগড়ের ।ানেজার সলিল সরকারের। দেহটা রাস্তার উপরে উবুড় হয়ে পড়েছিল।

সাধারণতঃ ঐ সড়কটা ধরেই স্থানীয় লোকেরা যাতায়াত করে, কিন্তু ঠিক রাস্তার পরেই দুর্ঘটনাটা ঘটায় সড়কটা একেবারে ফাঁকা তখন।

ক্ষণকালের জন্য খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েই কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহটা লক্ষ্য ।রে। উবুড় হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা। একটা হাত ভাঁজ করা, অন্য হাতটা মুষ্টিবদ্ধ, ।সারিত। পরিধানে ধুতি ও গায়ে একটা বেনিয়ান ছিল। পায়ে নিউকাট জুতো।

গুলি দুটি যে পশ্চাৎ দিক থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল, কিরীটীর বুঝতে তা কষ্ট হয় ।। একটি পৃষ্ঠদেশের বাঁ দিকে লেগেছে, অন্যটি বাঁ হাতে বিদ্ধ হয়েছে।

পশ্চাৎ দিক থেকে আততায়ী গুলি করেছে। কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। মথুরাপ্রসাদ সায় দিলেন, কিন্তু অত রাত্রে উনি এখানে কি কাজে এসেছিলেন তাই তো বুঝতে পারছি না।

এখানে ঠিক আসেন নি, হয়ত অন্য কোথাও, এই পথ দিয়েই ফিরবার পথে আততায়ী পশ্চাৎ দিক থেকে গুলি করেছে অতর্কিতে। এবং সম্ভবতঃ এইখানেই কোথাও আততায়ী ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিল বা ওঁকে অনুসরণ করে এই পর্যন্ত এসে তারপর পশ্চাৎ দিক থেকে গুলি করে। তাছাড়া দেখুন মৃতদেহের উণ্ড্ দেখে মনে হচ্ছে খুব Close range নয়, বেশ distance থেকেই গুলি করা হয়েছিল আর ঐ সঙ্গে এও প্রমাণিত করছে—আততায়ীর হাতের নিশানা খুব ভাল, একেবারে অব্যর্থ। কথাগুলো বলেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে একেবারে মথুরাপ্রসাদের মুখোমুখি হয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল, দারোগা সাহেব, আপনিই তো এ এলাকার বলতে গেলে সরকারী হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখানে কার কার গান লাইসেন্স আছে বা কার বন্দুক আছে?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। ঐ ম্যানেজারেরও তো ছিল।

ওঁরও লাইসেন্স ছিল নাকি?

হ্যাঁ, ওঁর একটা রাইফেলের লাইসেন্স ছিল। উনি যে মস্ত বড় একজন নামকরা শিকারী ছিলেন এ তল্লাটে একসময়।

Pity! তার পর আর কার কার লাইসেন্স আছে বলুন তো?

রতনগড়ে রবিশঙ্করের আছে একটা রিভলবার ও একটা গান-লাইসেন্স। রতনগড় স্টেটের মাইন্‌সের ওভারসিয়ার কপিলাপ্রসাদের আছে গান লাইসেন্স, আর আছে ডাঃ ঘোষালের।

ডাঃ ঘোষালও বন্দুক রাখেন নাকি?

হ্যাঁ, তাঁরও দো-নলা একটা বন্দুক আছে। এ তল্লাটে সকলেই অল্প বিস্তর শিকার করেন তো!

এখানে বুঝি আশেপাশে গেমস আছে?

হ্যাঁ, এই মাইল দশ-বারো দূরে, রতনগড় স্টেটের একটা রিজার্ভড ফরেস্ট আছে সেখানে বুনো বয়া, হরিণ, সম্বর, চিতা, হায়না যথেষ্ট পাওয়া যায়।

হুঁ ভাল কথা, আপনাদের রতনগড়ের বর্তমান মালিক রবিশঙ্করবাবু এ সংবাদ শুনেছেন?

শুনেছেন বোধ হয়, তবে এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। এবারে যাব।

বড় বড় পাথরের টুকরো ফেলা উঁচু-নীচু পাহাড়ী রাস্তা, তাই যতই বৃষ্টি হোক জলও জমবে না কাদাও হবে না।

মেঘশূন্য আকাশ। রৌদ্রের তাপ তখন বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে।

লাশটা আর বেশীক্ষণ রাস্তার উপরে ফেলে রাখা যায় না। লাশ সরাবার তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করবার জন্য মথুরাপ্রসাদ স্থানীয় ডোমেদের সংবাদ পাঠালেন। লাশ শুধু সরালেই হবে না, ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিতে হবে নিকটবর্তী শহরে এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেনের কাছে। দারোগা মথুরাপ্রসাদ তাই একটা গরুর গাড়ির জন্যও লোক পাঠালেন।

এদিকে কিরীটী বিদায় নিয়ে ডাক্তারের ওখানে ফিরবার উদ্যোগ করতেই মথুরাপ্রসাদ বললেন, আপনি আজকালের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন, না দু-চারদিন এখানে আছেন মিঃ রায়?

আজই সন্ধ্যার দিকে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ভাবছি—

ভাবাভাবি নয়। জানি না অবিশ্যি আপনি এখানে কেন এসেছেন, তবে অতর্কিতে এসময় আপনাকে যখন পেয়েই গিয়েছি, আমার বিশেষ অনুরোধ, দু-চারটে দিন আরো যদি আপনি থেকে যান তো আমার বড় উপকার হয়। মথুরাপ্রসাদ বললেন।

বেশ, আপনি যখন বলছেন থেকেই যাব। কিন্তু পরের বাড়িতে উঠেছি—

না না, সেজন্য আপনি কিছু ভাববেন না মিঃ রায়। ডাঃ ঘোষালকে জানি তো, অমন সজ্জন ভদ্রলোক বড় একটা দেখা যায় না।

সত্যিই চমৎকার লোক ঐ ডাঃ ঘোষাল।

সন্ধ্যার সময় একবার আসুন না থানায়। আলাপ-সালাপ হবে'খন। আর গরীবের কুটীরে দুটি যা হোক আহারও করবেন।

না, না, ওসব হাঙ্গামা করবেন না মথুরাপ্রসাদবাবু। সন্ধ্যার দিকে যাব'খন।

হাঙ্গামা আবার কি? আমি মশাই ব্যাচিলার মানুষ, একা একা থাকি। একটা মবাইও হ্যাও আছে, সেই যা পারে রান্না করে। বরং খেয়েছেন তো মিসেস ঘোষালের হাতের রান্না, সেই অমৃতের বদলে আপনারই হয়ত কষ্ট হবে।

তা যা বলেছেন, মিসেস ঘোষাল সত্যিই বড় চমৎকার রান্না করেন।

তাহলে কি বলেন, আমার ওখানেই আজ রাত্রে—

আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

আমি তাহলে সন্ধ্যার দিকে লোক পাঠিয়ে দেব'খন।

বেশ।

কিরীটী ফিরে এসে দেখল ডাক্তার তখনও কল থেকে ফেরেননি। ডাক্তার-গিন্নী কিরীটীর জন্য বসে অপেক্ষা করছেন।

কিরীটী ভেবেছিল ডঃ ঘোষাল না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কিন্তু ডাক্তার-গিন্নী বললেন, সে কি হয় মিঃ রায়, ওঁর জন্য কতক্ষণ আপনি অপেক্ষা করবেন? কখন উনি ফিরবেন তার কিছুই ঠিক নেই। এসে যদি শোনেন অতিথিকে আমি অভুক্ত রেখেছি, হয়ত অনর্থ বাধাবেন। আপনি বসুন, আপনার খাবার দিতে বলি।

তবু কিরীটী আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু ডাক্তার-গৃহিণী শুনলেন না।

কিরীটীকে অগত্যা আহারে বসতেই হল।

এবং আহারে বসেই কথায় কথায় এক সময় কিরীটী মথুরাপ্রসাদের ওখানে রাত্রের আহারের নিমন্ত্রণের সংবাদটা দিল।

না না, তার প্রয়োজন কি, আপনি এখানেই থাবেন।

উনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন, তাই—

কিন্তু অন্যান্য দিন দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে আহারে বসে যেমন নানারকম গল্প জমে ওঠে আজ তেমন যেন কিছুই হল না। কি জানি কেন ডাক্তার-গৃহিণীকে কেমন যে চুপচাপ বলে মনে হল।

আহারাদির পর কিরীটী তার ঘরে গিয়ে আরাম-কেদারাটা খোলা জানালার সামনে টেনে নিয়ে বসল একটা চুরোট ধরিয়ে।

গতরাত্রের ব্যাপারটা একটু স্থির হয়ে বসে ভাল করে চিন্তা করবারও সময় পায়নি কিরীটী। পরে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই তার মনে পড়ল গতরাত্রের রহস্যময় পরিস্থিতির মধ্যে যে চিঠিটা তার হস্তগত হয়েছিল সেই চিঠিটার কথাই। পকেটেই চিঠিটা ছিল। চিঠিটা পকেট থেকে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল।

জড়ানো টানা টানা লেখা দেখলে মনে হয় হস্তাক্ষর কোন পুরুষেরই। কিন্তু কার? রতনগড় প্রাসাদেরই কারো হস্তাক্ষর কি? তাই যদি হয়, তবে কার হওয়া সম্ভব? আরো একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। গত পরশু রতনগড় প্রাসাদে গিয়ে পান্না সম্পর্কে দুজনের সঙ্গেই মাত্র কিরীটীর কথা হয়েছিল। প্রথমে ম্যানেজার সলিল সরকার ও পরে খোদকর্তা রবিশঙ্করের সঙ্গে। এবং উভয়ের কাছেই মোটামুটি একই রকমের জবাব পাওয়া গিয়েছিল। যাতে করে বোঝা যায়, দুজনের একজনও পান্না সম্পর্কে কোন কথা বলতে নারাজ, অথচ উভয়েই তাঁরা পান্নার সংবাদ চান। প্রথমটায় অবিশ্যি মনে হয়েছিল, তাঁরা দুজনের একজনও পান্না সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানলেও অন্যের কাছে বলতে সেটা নারাজ। পরে অবিশ্যি কাল রাত্রের ঐ পত্র পেয়ে মনে হয়েছে,

তাই খুব বেশী কিছু তাঁরা হয়তো পান্না সম্পর্কে জানতেন না। এবং যেটুকু জানতেন, সেটুকুই কিরীটীকে জানাতে এসেই কি ম্যানেজার সলিল সরকারকে ঐভাবে প্রাণ দিতে হল, না ঐ কারণ ছাড়াও অন্য কোন গুরুতর কারণের জন্যই সলিল সরকার নিহত হলেন? তবে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদি গতরাত্রের সেই আগন্তুক সলিল সরকারই হন, তাহলে এটা এখন বোঝা যাচ্ছে প্রথম দিকে পান্না সম্পর্কে কোন সংবাদ তাকে দিতে তিনি অনিচ্ছুক থাকলেও মনে মনে অনিচ্ছুক ছিলেন না। আর সেটাও এখন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে, পান্নার সংবাদের প্রয়োজনটাও হচ্ছে রতনগড়ের কোন স্বত্ব সম্পর্কে একটা ফয়সালা। এবং এখন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় রাঘবেন্দ্র অকস্মাৎ একদিন তার ওখানে এসে যে ফটোটা দিয়ে তাকে পান্না সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে অনুরোধ করেছিল, তারও মূলে ঐ রতনগড়েরই সম্পত্তি। কিন্তু এখনো যেটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, পান্না ও হীরা-চুনির সঙ্গে রতনগড়ের কি সম্পর্ক? কোন্ সম্পর্কের জোরে তারা রতনগড়ের সম্পত্তির ওয়ারিশন? রতনগড়ের বর্তমান মালিক তো বিবাহই করেননি। এক যদি গোপনে বিবাহ করে থাকেন। কিন্তু তা যদি করেই থাকেন সে কথাটা গোপন করে যাবার কি এমন প্রয়োজন ছিল তাঁর? তার পর রাঘবেন্দ্রের কাছে পান্নার ফটোটা এলই বা কি করে? পান্নার সঙ্গে তারই বা কি সম্পর্ক? আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে, হীরা চুনি পান্নাই যদি রতনগড়ের সম্পত্তির সত্যিকারের ওয়ারিশন হয় এবং রবিশঙ্কর তাদের চিরতরে সরিয়ে নিজের পথটা পরিষ্কার ও নিষ্কণ্টক করে নিতে চান, তবে ঐভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের খোঁজ করার চাইতে গোপনে গোপনে ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টা করলেন না কেন?

সত্যিই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটু খটকা থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে বর্তমানে, গতকালের মধ্যরাত থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানকার পরিস্থিতিটা যেভাবে অতর্কিতে জটিল হয়ে দাঁড়াল, তাতে করে ঠিক এই সময়টিতে কিরীটীর মন যেন কিছুতেই রতনগড় ছেড়ে চলে যেতেও সায় দিচ্ছে না।

অথচ গত পরশু পর্যন্ত এখান থেকে চলে যাবার জন্য আগ্রহ দেখিয়ে এখন যদি হঠাৎ কিরীটী তার মত পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে ডাঃ ঘোষাল আবার অন্য রকম কিছু ভাববেন না তো!

নানা রকমের চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা শুরু করে। এবং সব চিন্তার মধ্যে তিনটি নাম কেবলই থেকে থেকে তার মনের পাতায় ভেসে ওঠে, হীরা—চুনি

—পান্না।

হীরা চুনি পান্না! দুটি ছেলে, একটি মেয়ে!

গতরাত্রির জাগরণের ফলে কখন একসময় যে কিরীটির দু চোখের পাতায় নি

নেমে এসেছে সে টেরও পায়নি।

ঘুম ভাঙল একেবারে বেলা পাঁচটায়। ঘোষাল-গিন্নীর ডাকে।

মিঃ রায়, বেলা যে পড়ে গেল, আর কত ঘুমোবেন? উঠুন—চা নিন!

॥ আট ॥

কিরীটী ঘোষাল-গিন্নীর ডাকে চোখ মেলে দেখল, সামনে চায়ের কাপ হাতে দাঁ

তিনি। খোলা জানালা-পথে বিকেলের শেষ রৌদ্র ঘরের মধ্যে এসে দিনের মত

বিদায়প্রার্থী।

তাড়াতাড়ি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে কিরীটী বলে, উঃ, অনেক

ঘুমিয়েছি! ডাঃ ঘোষাল ফেরেননি?

না, কই এখনও তো ফেরেনি!

কিন্তু ও কি, চায়ের কাপ হাতে আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? রাখুন না

টুলটার ওপরেই। আমি চোখেমুখে জল দিয়ে আসি।

ঘোষাল-গিন্নী চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চলে গেলেন।

আরও আধ ঘণ্টা পরে ডাঃ ঘোষালের টমটমের ঘোড়ার গলার ঘণ্টার টুং টুং

পাওয়া গেল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

টমটম থেকে নেমে বারান্দায় এসে উঠতেই কিরীটী ডাক্তারকে সম্বোধন ক

বললে, সমস্ত দিনটাই কাটিয়ে দিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু?

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন, দেখছেন তো, এই হচ্ছে আমাদের ডাক্তা

জীবন!

স্বামীর সাড়া পেয়ে ডাক্তার-গিন্নী এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বা

দিয়ে বললেন, এখন আর কথা নয়, যাও আগে স্নান সেরে এস। তোমার চা জ

তৈরী করে রাখছি।

যাচ্ছি গো যাচ্ছি। ডাক্তার ঘোষাল হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্র

করলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই থানা থেকে মথুরাপ্রসাদের লোক এল কিরীটীকে নিয়ে যেতে। কিরীটী তখন ডাক্তারের সঙ্গে বসে বসে দ্বিপ্রহরে তিনি যে রোগীটা দেখতে য়েছিলেন তারই গল্প করছিল।

ডাক্তার বললেন, ফিরতে বেশী দেরি করবেন না কিন্তু মিঃ রায়। আজও দাবায় যাবে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, না, তাড়াতাড়িই ফিরব।

ডাক্তারের বাংলো থেকে থানা মিনিট পঁচিশের পথ হবে।

রাস্তার একেবারে উপরেই থানা।

থানার ঠিক সামনেই মস্ত বড় একটা নিমের গাছ। একতলা বাড়ি, সামনে রানো বারান্দা। তার পশ্চাতেই দারোগা মথুরাপ্রসাদের কোয়ার্টার।

থানার বারান্দাতেই মথুরাপ্রসাদ কিরীটীর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

কিরীটী এসে পৌঁছতেই সাদর আহ্বান জানালেন, আসুন আসুন, মিঃ রায়!

জগদেও নামে একটি বছর আঠারো-উনিশের ইউ-পি ছোকরা মথুরাপ্রসাদের বাইও হ্যাণ্ডের কাজ করে।

তাকে ডেকে চা দিতে বললেন।

চারদিক বেশ ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আজকের আকাশে কোথাও মেঘের লেশমাত্রও নেই।

নির্মল আকাশে একঝাঁক তারা ঝকঝক করছে।

জনের চা-পানের পর বারান্দাতেই বসে গল্প করতে লাগলেন।

এই স্টেশনে আপনার কতদিন হল মথুরাপ্রসাদবাবু? এক সময় কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন কিরীটী।

তা ধরুন বছর দেড়েক তো হবেই।

আচ্ছা মথুরাপ্রসাদবাবু, রতনগড় প্রাসাদে আপনি কখনো গিয়েছেন?

সে কথা আর বলবেন না!

কিরীটী একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো?

একবার মাত্র যেতে হয়েছিল—তাও যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, বাব্বাঃ, রতনগড় লস তো নয় বাঘের গুহা!

কি রকম? কৌতূহলী দৃষ্টিতে কিরীটী মথুরাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাল।

আর কি রকম! ওই যে রবিশঙ্কর লোকটি না, ওটা নিশ্চয়ই maniac—বদ্ধ ল! মাসকয়েক আগে ১নং রতনগড় কোলিয়ারীতে একটা accident হয়।

পিটের ছাত ধসে পড়ে জনাদশেক কুলী মারা যায়। তারই তদন্তে যেতে হয়েছিল আমা
প্যালেসে। তার পর inspection করে ফিরে এসেছি থানায়, এমন সময় রতনগ
প্যালেস থেকে এক লোক এল, মালিক রবিশঙ্কর নাকি আমাকে অবিলম্বে তাঁর সা
দেখা করতে বলেছেন। তাঁর লোককে বললাম, এখন যেতে পারব না, কাল যাব
যে লোকটা আমাকে ডাকতে এসেছিল, তার নাম রতনলাল সিং। পাঞ্জাবী। র
শঙ্করের নিজস্ব পেয়াদা —পরে জেনেছিলাম। যাহোক, লোকটা আমার কথা শু
বললে, কাল নয় আজই সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন। লোকটার কথা শুনে যে
যেন আমার আপাদমস্তক রি-রি করে উঠল। কঠিন কণ্ঠে বললাম, যা তোমা
বলতে বললাম তাই বলগে। আমি তোমার মনিবের চাকর নই যে ডাকলেই স
সঙ্গে আমায় যেতে হবে। লোকটা মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললে, ঘণ্টাখানেক
মধ্যেই আসবেন, নচেৎ সাহেব এবারে হয়ত জঙ্গ বাহাদুরকেই পাঠাবেন। সে যে
আবার একদম বুনো। আদব-কায়দার বড় একটা ধার ধারে না। বলেই লোকটা চ
গেল। রতনলাল চলে যাবার পরেই আমার রাইটার কনস্টেবল দেলোয়ার বললে, কাজ
ভাল করলেন না হুজুর। বললাম, কেন? তাতে দেলোয়ার বললে, আপনি তো জানে
না, আপনার আগে যিনি ছিলেন, তাঁকে রবিশঙ্কর রতনগড় প্রাসাদে ধরে নিয়ে গি
ঘরের মধ্যে বন্ধ করে কম্বল জড়িয়ে সারারাত ধরে এমন নাগরা-পেটা করেছিলেন
দারোগা সাহেবের গায়ের সে ব্যথা সারতে এক মাস লেগেছিল।

বলেন কি মথুরাবাবু? কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে, কর্তৃপক্ষকে তিনি জানান
ব্যাপারটা?

মথুরাপ্রসাদ বললেন, জানিয়েছিলেন। শহর থেকে এস-পি সাহেব এনকোয়ারি
এলেন। আর এসে উঠলেন ঐ রতনগড় প্রাসাদেই এবং একদিন পরে ফিরেও গেলে
এবং তারই দিন দশ বাদে এল হুকুম, তার মানে দারোগারই বদলির পরোয়ানা।

বটে!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেলোয়ারের মুখে আমি তখন সেই কথা শুনে আর দেরি ক
সমীচীন বোধ করলাম না। রাগে ও আক্রোশে যদিও তখন আমার সমস্ত দেহ জ
যাচ্ছিল, তবু কোনমতে পোশাক পরে রতনগড় প্যালেসের দিকে রওনা হলাম।

তার পর?

প্যালেসে গিয়ে যখন পৌঁছলাম রাত তখন আটটা হবে। ম্যানেজার সা
সরকারই আমাকে সোজা উপরে রবিশঙ্করের ঘরে পাঠিয়ে দিল। রবিশঙ্কর তখন ঘা
দেওয়ালে লোহার কাঁটা দিয়ে টারগেট্ প্র্যাকটিস করছিল হাতের। আমাকে

প্রবেশ করতে দেখে ফিরে দাঁড়াল।

উঃ মশাই, সে কি ভয়ানক চোখের দৃষ্টি, যেন শিকারী বাঘের চোখ। ধকধক করে কি এক বন্য জিঘাংসায় যেন জ্বলছে! কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে আমার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, তুমিই এ অঞ্চলের দারোগা?

বললাম, হ্যাঁ।

এক নম্বর কোলিয়ারিতে তুমি আজ inspectionয়ে গিয়েছিলে?

লোকটার কথার ধরন দেখে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যেতে লাগল। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় জানেন না?

আমার কথায় হঠাৎ রবিশঙ্কর চাপা গর্জন করে উঠল, Shut up, উল্লুক। বেতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব। এটা রতনগড় প্যালেস মনে রেখো। প্যালেসের চিড়িয়াখানায় চার-চারটে বাঘ আছে, বেশী লাফালাফি কর তো সেই বাঘের খাঁচায় ফেলে দেব, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে দেবে। কোন চিহ্ন থাকবে না।

শুনেছিলাম বটে রতনগড় প্যালেসে একটা চিড়িয়াখানা আছে। তাতে চার-চারটে বেঙ্গল টাইগারও আছে। অগত্যা অপমান হজম করে চুপচাপ রইলাম। আমাকে চুপচাপ দেখে এবারে আবার রবিশঙ্কর কথা বললে, inspectionয়ের report লেখা হয়েছে?

বললাম, না।

রিপোর্টে লিখে দিও, কোলিয়ারির কর্তৃপক্ষের কোন গলদ ছিল না।

তাই দেব। বললাম।

বললেন তাই? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তখন কোনমতে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। তার পর জঙ্গ বাহাদুরকে ডেকে রবিশঙ্কর বললে, দারোগাবাবুকে টমটম করে পৌঁছে দিতে বল ম্যানেজারবাবুকে থানায়। আর ৫০০৲ টাকা তাকে দিতে বলে দিবি। যা।

রতনগড় প্যালেসে আমার সেই প্রথম ও সেই শেষ যাওয়া। তার পর আজকের এই দুর্ঘটনা ঘটল। এবার একেবারে খোদ ম্যানেজার নিহত। আবার হয়তো সেই রবিশঙ্করের সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে গিয়ে। সকাল থেকে আজ আমার সেইটাই সব চাইতে বড় ভাবনা হয়েছে। জানি না কপালে কি আছে মিঃ রায় এবার আমার।

আপনার রিপোর্ট আপনি লিখেছেন? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে মথুরাপ্রসাদকে।

না।

ঠিক এমনি সময় দূর থেকে অতি দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি অন্ধকারে ভেসে এল—

খট্ খট্ খটা খট্! কে যেন ঝড়ের বেগে এই থানার দিকেই অশ্ব ছুটিয়ে আসছে।

সর্বনাশ, রবিশঙ্কর আসছে। চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে মথুরাপ্রসাদ।

রবিশঙ্কর!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি। অমন ঝড়ের বেগে এ তল্লাটে আর কেউ ঘোড়া ছোটা পারে বলে আমার জানা নেই।

ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি তখন নিকটবর্তী হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে।

এবং দেখতে দেখতে ঝড়ের বেগে এক অশ্বারোহী থানার ঠিক বারান্দার সাম এসেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র কৌশলে অশ্বের রাশ টেনে ঘোড়ার গতিরোধ করতেই বারান্দ হ্যারিকেনের আলোয় কিরীটীর নজরে পড়ল, লম্বা এক ছায়ামূর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও তেজী অশ্বের পৃষ্ঠ থেকে জিনের রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে ভূমিতে অবতরণ ক বারান্দার দিকেই এগিয়ে আসছেন।

মথুরাপ্রসাদ সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে, কিন্তু কিরীটী যে বসেছিল তেমনিই বসে থাকে চেয়ারে।

পরিধানে ব্রিচেস। হাঁটু অবধি চর্মপাদুকা। গায়ে হাফসার্ট, হাতে এক বিনুনির মত পাকানো চামড়ার লম্বা চাবুক, রবিশঙ্কর বারান্দায় একেবারে ও সামনে এসে দাঁড়ালেন।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল গৌরবর্ণ মুখখানি তাঁর গুরু পরিশ্রমে লাল হয়ে উঠে এবং সমস্ত কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ।

আসুন, আসুন রবিশঙ্করবাবু! মথুরাপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি যে কর ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেন না।

রবিশঙ্কর মথুরাপ্রসাদের কথার কোন জবাব না দিয়ে সামনেই উপবিষ্ট কিরী মুখের দিকে তাকিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, কিরীটীবাবু না?

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছেন দেখছি!

কাউকে একবার দেখলে তাঁকে আমি ভুলি না। কিন্তু আপনি তো শুনেছি উঠেছেন ডাক্তারের ওখানে! তা এখানে—

এমনি বেড়াতে এসেছি।

হুঁ। হঠাৎ যেন মনে হল রবিশঙ্কর মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। পরই মথুরাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ম্যানেজারের মৃতদেহটা ম তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছ শুনলাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হত্যাকারীকে ধরতে পারবে বলে তোমার মনে হয়?

আজ্ঞে—

শোন মথুরাপ্রসাদ, আমি চাই না যে আমার ম্যানেজারের মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হয় প্রকাশ্যে। যে প্রাণ গেছে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে মিথ্যে টানা-হেঁচড়া করা আমার ইচ্ছা নয়।

অবিশ্যি আমি এখানে সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ, তবু একটা কথা না বলে পারছি না! কথাটা বললে কিরীটী।

কী?

আপনি যা বলছেন সেটা কি ঠিক যুক্তিসঙ্গত হবে? আইনের কথা না হয় ছেড়েই দিন, ন্যায়-অন্যায় বলেও তো একটা কথা আছে!

বটে? তাহলে না হয় আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, পারবেন আপনি ম্যানেজারের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে?

আশা করি পারব।

আশা করেন?

হ্যাঁ, কারণ আশা করি আমি তখনি, যখন বুঝতে পারি সে আশা করাটা আমার অন্যায় বা অসঙ্গত হচ্ছে না।

বেশ, তবে চেষ্টা করে দেখুন।

হ্যাঁ, চেষ্টা করব বৈকি। তবে আপনার সাহায্যও আমি চাই।

আমার সাহায্য?

হ্যাঁ।

কি রকম সাহায্য আপনি আশা করেন আমার কাছ থেকে মিঃ রায়?

ধরুন সেদিন যে কথাটা আমাকে বলেননি, সে কথাটা যদি আজ বলেন?

কি, পান্নার কথা?

হ্যাঁ।

কিন্তু পান্নার সঙ্গে সলিলের মৃত্যুর কি সম্পর্ক আছে?

মথুরাপ্রসাদ হাঁ করে উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। একটি বর্ণও তার বুঝতে পারছেন না যে তাঁর মুখ দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিরীটী জবাব দেয়, রবিশঙ্করবাবু, সাধারণের চাইতে আপনি একটু বেশীই বুদ্ধিমান, আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এটুকু জানবেন, হীরা-চুনি-পান্নার সঙ্গে—

কি—কি বললেন ? চমকে প্রশ্ন করেন রবিশঙ্কর।

বলছি হীরা-চুনি-পান্নার সঙ্গে আপনার ম্যানেজার সলিল সরকারের আক
নিহত হবার ব্যাপারে একটা যোগাযোগ আছে বৈকি।

হুঁ। আচ্ছা রাত হল, আমি চললাম। বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আ
আবার কিরীটীর দিকে তাকিয়ে ফিরে দাঁড়ান রবিশঙ্কর এবং তাকে লক্ষ্য করেই ব
পারেন তো কোন এক সময় একবার আসবেন মিঃ রায় আমার প্যালেসে।

কথাটা শেষ করে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না রবিশঙ্কর। এগিয়ে গিয়ে জি
রেকাবে পা দিয়ে এক লাফে অশ্বারূঢ় হয়ে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ কেবল একটা অশ্বক্ষুরের খট খট শব্দ অন্ধকার থেকে ভেসে আ
আসতে এক সময় সেটা মিলিয়ে গেল।

আশ্চর্য !

মথুরাপ্রসাদের কণ্ঠোচ্চারিত ঐ কথাটিতে ফিরে তাকাল কিরীটী ওর মু
দিকে। কিরীটী ক্ষণপূর্বে অন্ধকারে যে অশ্বারোহী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেই দি
তাকিয়েছিল।

কি আশ্চর্য, মথুরাপ্রসাদবাবু ?

Really তাজ্জব কা বাত হ্যায় মিঃ রায় !

কি, রবিশঙ্করের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, আমি কোথায় ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছিলাম আমাদের দুজনের মাঝখানে আপ
কথা বলতে শুনে—রবিশঙ্কর হয়তো এখুনি খাপ্পা হয়ে উঠবে, কিন্তু সে না হয়ে-

হ্যাঁ মথুরাপ্রসাদবাবু, গোখরোর সামনে পড়লে অজগরকেও তাক বুঝে তবে
ল্যাজের ঝাপটা মারতে হয়। কিন্তু সে কথা যাক, বলছিলাম কি, যাবেন
রতনগড় প্যালেসে ?

রতনগড় প্যালেসে !

হ্যাঁ।

কখন ?

এই ধরুন এখুনি !

এখুনি ?

হ্যাঁ, শাস্ত্রেই তো বলেছে শুভস্য শীঘ্রম্ ! তাছাড়া দুর্জনদের মতিগতি বদলা
বা কতক্ষণ ? আজ আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল, কাল গেলে হয়তো গলাধাক্কা দি
বলবে, কভি এইসা বাত নেহি হাম বোলা, না বোল সেকতা ? বলেই কিরীটী নি

:সে ওঠে।

কিন্তু তাই বলে এই রাত্রে? আপনি জানেন না মিঃ রায়, এখুনি ও ফিরে গিয়ে
৳ করবে—

মরফিয়া ইনজেকশন নিতে—তাই না? কথাটা যেন একপ্রকার মথুরাপ্রসাদের
(থেকেই কেড়ে নিয়ে শেষ করল কিরীটী।

আরে আরে, তাও আপনি জানেন দেখছি!

হ্যাঁ, অনেক কিছুই জানি। তাই বলছিলাম, এখন তার যখন নেশা করবার সময়, খন এইটাই হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করবার প্রকৃষ্ট সময়। He will be rather in .s mood! মৌতাতে থাকবে। কথাটা বলে কিরীটী হাসতে থাকে।

কিন্তু মিঃ রায়—

না। আর কিন্তু নয় মথুরাবাবু, চলুন, আজ এখুনি এই মুহূর্তে যাওয়া যাক। মওকা ।ন হাতের কাছে এসে গেছে তাকে হেলায় হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চাই ।, আপনার ম্যানেজারের অনেক কথাও হয়ত জানা যেতে পারে। নিন, উঠুন।

খানা খেয়ে গেলে ভাল হত না?

আরে মশাই, খানা তো রইলই। রতনগড় প্যালেসের দরজা সব সময় খোলা ।বেন না।

চলুন তবে।

নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন মথুরাপ্রসাদ কিরীটীর আহ্বানে উঠে দাঁড়ালেন।

॥ নয় ॥

'কাশ পরিষ্কার। কোথাও মেঘের লেশমাত্র নেই। এক ঝাঁক উজ্জ্বল তারা সেই রিস্কার কালো আকাশপটে হীরার কুচির মতই যেন ঝিকমিক জ্বলছে মনে হয়।

দুজনেই পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চলল রতনগড় প্যালেসের দিকে নিঃশব্দে শাপাশি।

থানা থেকে পথও খুব বেশী দূরে নয়। বড় জোর মিনিট ত্রিশেকের পথ হবে।

আবার সেই রতনগড় প্যালেস।

আধ ঘণ্টা পূর্বেও কিরীটী ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি আবার সে রতনগড় প্যালেসে াবে।

সোজা সড়কটা বরাবর চলে গেছে দক্ষিণে রতনগড় প্যালেসের দিকে।

প্যালেসের দোতলার ঘরের খোলা জানলাপথে দেখা যাচ্ছে ঘরে অত্যুজ্জ্বল আ জ্বলছে। বাকি প্যালেসটার মধ্যেও এদিক-ওদিক আরো দু-চারটে আলোর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলো অত্যুজ্জ্বল আলোর কাছে যেন মিটমিট করছে।

রতনগড় প্যালেসের লোহার গেটের সামনে ওরা দুজনে এসে যখন পৌ প্যালেসের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি নটা ঘোষণা করল।

বিরাট প্রাসাদটা যেন অদ্ভুত একটা স্তব্ধতার মধ্যে থমথম করছে।

দুজনে এসে বহির্মহলের সামনে যে বারান্দাটা সেখানে পৌঁছতেই, রাইফেলধ শিখ প্রহরীর কণ্ঠ শোনা গেল, হল্ট— কোন্ হ্যায় ?

ফ্রেণ্ডস্।

যে ঝোলানো বাতিটা সিলিং থেকে বারান্দাটায় আলোকদান করছে (আদৌ পর্যাপ্ত নয়।

বারান্দার একাংশ মাত্র আলোকিত হয়েছে সে আলোয়।

রাইফেলধারী শিখ প্রহরী এগিয়ে এল। কাকে চাই ? কি চাই ? আবাব করল।

তোমাদের হুজুরকে সংবাদ দাও, বলবে মিঃ রায় এসেছেন।

এমন সময় একজন ভৃত্য এগিয়ে এল অন্দরের দিক থেকে। কিরীটীর মু দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চান ?

কিরীটী তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে।

কিন্তু কর্তাবাবু তো কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

তা জানি। বল গিয়ে আমার কথা।

তথাপি ভৃত্যটি ইতস্তত করছে দেখে কিরীটী আবার বললে, তোমার কোন নেই। তুমি আমার কথা বলগে।

আচ্ছা, আপনারা এই ঘরে এসে তবে বসুন। আমি খবর দিচ্ছি।

সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে, সেই ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ভৃত্য তা বসতে বলে বারান্দার অন্য দিকে চলে গেল।

এ অন্য আর একটা ঘর। কিরীটী ঘরটার এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছি এ ঘরে সেদিন কিরীটী প্রবেশ করেনি।

ঘরের মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। চারিদিকে সব দামী দামী শৌ সোফা ও কাউচ পাতা।

ঘরের দেওয়ালে চারিদিকে বিরাট বিরাট চারটি অয়েলপেন্টিং ও গোটা

্যাঘ্রচর্ম ঝোলানো। চারটি অয়েলপেন্টিংয়ের মধ্যে, ঘরে ঢুকতেই সামনের দেওয়ালে
য পেন্টিংটি চোখে পড়ে, সেটি একজন দাড়িগোঁফওয়ালা বিরাট দশাসই পুরুষের।
াথায় পাগড়ি। পরিধানে শিকারীর বেশ। হাতে ধরা রাইফেল। পায়ের নীচে
ড়ে আছে এক মৃত নরখাদক বিরাট ব্যাঘ্র।

সেই পেন্টিংটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মথুরাপ্রসাদ বললেন, এই যে দেখছেন
য়েলপেন্টিংটা মিঃ রায়, ঐ হচ্ছে শুনেছি জগদীশনারায়ণের পিতা মুরলীনারায়ণ সিংহ।

বেশীক্ষণ বসতে হল না, পূর্বের সেই ভৃত্যটি ফিরে এসে জানাল, হুজুর তাদের
পরের ঘরে সেলাম দিয়েছেন। উভয়ে ভৃত্যকে অনুসরণ করে অগ্রসর হল।

সেই সিঁড়ি, সেই ঘর। ঘরের সামনে টুলের উপরে ঠিক সেদিনকার মতই বাঘের
ত থাবা পেতে বসে আছে হলদে মঙ্গোলিয়ান টাইপের চ্যাপটামুখো জঙ্গ বাহাদুর।

ভৃত্য ইঙ্গিতে জানাল ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য।

প্রথমে কিরীটী ও তার পশ্চাতে মথুরাপ্রসাদ ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। এবং
। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সাদর আহ্বান শোনা গেল, আসুন, আসুন মিঃ রায়।

রবিশঙ্করের সাদর আহ্বান শুনে কিরীটী, সত্যি কথা বলতে কি, কেমন যেন একটু
মতই হয়। আহ্বান ও গলার স্বরটি পর্যন্ত যেন রবিশঙ্করের বিপরীত।

চোখ তুলে তাকাতেই কিরীটীর নজর পড়ে, সাদা ঢোলা পায়জামা ও ঢোলা
াবি গায়ে সেদিনকার সেই আরামকেদারাটার উপর অলস শিথিল ভঙ্গীতে গা
ল বসে আছেন রবিশঙ্কর। কিন্তু কিরীটীর পশ্চাতে মথুরাপ্রসাদকে দেখেই
শঙ্কর বলেন, এলেন তো একলা এলেই পারতেন। ওটিকে আবার লেজে বেঁধে
নলেন কেন? সাহস হল না বুঝি এই রাত্রে আমার ঘরে একলা আসতে? বলে
ুখানি যেন মুচাক ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন রবিশঙ্কর।

কিরীটী তাঁর শেষের কথার জবাব না দিয়ে কেবল বললে, এ সময় এসে আপনাকে
ক্ত করলাম তো রবিশঙ্করবাবু?

না না, মোটেই না। বসুন, বসুন।

কিরীটী ও মথুরাপ্রসাদ দুখানি আসনে উপবেশন করে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে
ধ-ঝলসানো হাজার শক্তির অত্যুজ্জ্বল শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো। দিনের মতই
ষ্ট, অত্যন্ত প্রখর। সেই আলোর সম্মুখেই উপবিষ্ট রবিশঙ্করের মুখের দিকে
কিয়ে কিরীটী বোঝে—নেশায় আছেন রবিশঙ্কর এই সময়।

গৌর মুখখানিতে রক্ত-চাপ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটি
এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে শাণিত ছুটি ছুরির ফলার মত ঝকঝক করছে।

Any drink, মিঃ রায় ? হঠাৎ প্রশ্ন করেন রবিশঙ্কর, সব রকম ড্রিঙ্কই আম এখানে আছে, কিছু ইচ্ছা করেন তো বলুন !

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই ।

চলে না বুঝি ? তা বেশ । অর্ডিনারী সরবৎ ? তাই না হয় দিক । বলতে বলা হাতের সামনে ছোট ত্রিপয়ের ওপর রক্ষিত একটা বেল বাজাতেই জঙ্গ বাহাদুর ঘ মধ্যে এসে প্রবেশ করে দাঁড়াল নিঃশব্দে ।

জঙ্গ বাহাদুর, রঘুনন্দনকে বল দু গ্লাস সরবৎ ।

জঙ্গ বাহাদুর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই আবার ঘর থেকে ব হয়ে গেল ।

তার পর হঠাৎ কি মনে করে, বলুন মিঃ রায় ?

কিরীটী নিজেকে তখনও ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি বর্তমান ঐ মুহূর্তে পরিস্থিতি বা রবিশঙ্করের সঙ্গে ।

পূর্বে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে ও যতটুকু পরিচয় পেয়েছে, সে রবিশঙ্করের স এই রবিশঙ্করের যেন একেবারেই কোন মিল নেই, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী । ত ভাবছিল, তার বক্তব্য ঠিক কি ভাবে কোন্‌খান থেকে শুরু করবে । এবং শুরু কর সেটা কোনক্রমে তাল কেটে যাবে কিনা ।

এমন সময় ভৃত্য রূপার ঝকঝকে প্লেটের ওপরে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে দু গ্ল ঘন বাদামী রঙের সরবৎ নিয়ে ঘরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল ।

দুজনেই দুটো গ্লাস হাতে করে নিল বটে, কিন্তু কেউই গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে এবং চুমুক দিতে যে ইতস্তত করছে, সেটা রবিশঙ্করের বোধ হয় বুঝে উঠতে এতটুক দেরি হয় না ।

তাই মৃদু হেসে বলে ওঠেন, ভয় নেই মিঃ রায়, ও দুটো সত্যি একেবা নির্ভেজাল খাঁটি ঠাণ্ডা বাদামের সরবৎ । নির্ভয়ে পান করতে পারেন । রবিশঙ্ক নামে হয়তো অনেক কথাই শুনেছেন, কিন্তু সে যত বড়ই দুশমন হোক না বে জানবেন সে নীচ নয় । বাঘকে সে খোঁয়াড়ে ফেলে বন্দী করে, গুলি করে না । ব খখন করে, সে সামনাসামনিই গুলি চালায় ।

না না, ঠিক তা নয় । বলতে বলতে আর দ্বিধামাত্রও না করে কিরীটী হস্ত সরবতের গ্লাসে চুমুক দেয় ।

শুধু ঠাণ্ডা নয়, অতীব সুস্বাদু সরবৎ ।

সরবৎটি রতনগড় প্যালেসের স্পেশাল সরবৎ । মোগলাই সরবৎ । প্যালেসের

'বুর্চি আছে এ তারই হাতে তৈরী। লোকটা বাদশাহ আলমগীরের বাবুর্চি বংশের কেবারে direct descendant! মৃদু হাস্যস্ফুরিত কণ্ঠে কথাগুলো বলেন রবিশঙ্কর।

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে, সত্যিই চমৎকার!

কিন্তু দারোগা সাহেব, আপনি যে কিছু বলছেন না! আপনার কেমন লাগছে? বিশঙ্কর কথাটা বলে মথুরাপ্রস দের দিকে তাকালেন।

ভাল। মৃদুকণ্ঠে কোনমতে জবাব দিলেন মথুরাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, এ আপনাদের ফিরিঙ্গী প্রভুদেব কল্পনাতেও আসবে না। একেবারে সাক্ষাৎ াগলাই অন্দরের খানদানী ব্যাপার। জীবন ধন্য হয়ে গেল বলুন! রবিশঙ্কর ব্যঙ্গভরে থাটা বলেন।

কিন্তু বাধা পড়ল, হঠাৎ কিরীটী তার কথা শুরু করে, রবিশঙ্করবাবু, কাল রাত্রে ড়টা থেকে দুটোর মধ্যে আপনি কি জেগেছিলেন, না ঘুমিয়েছিলেন?

রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে, না?

হ্যাঁ।

জেগেই ছিলাম। কারণ রাত তিনটে সাড়ে তিনটের আগে আমার চোখে বড় কটা ঘুম আসে না।

যদি কিছু মনে না করেন, জিজ্ঞাসা কর'ছলাম, সে সময় কি করছিলেন?

বন্দুকটা নিয়ে বাইরে বার হয়েছিলাম।

অত রাত্রে ঐ বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ বন্দুক নিয়ে ঐ সময়টায়?

কয়েকদিন থেকেই নাকি এ তল্লাটে একটা বাঘের আনাগোনা চলেছে. তাই ার হয়েছিলাম তার সন্ধানে। কথাটা বলে বিচিত্র একটা চাপা হাসি হাসতে াকেন রবিশঙ্কর।

তা বাঘের সন্ধান পেলেন?

না, বাঘটা বড় চালাক। কিছুতেই আমার সামনে পড়ছে না। ঠিক তাক্ ুঝে সরে যায়। বলে পূর্ববৎ হাসতে থাকেন রবিশঙ্কর।

আচ্ছা রবিশঙ্করবাবু, যে মেয়েটির খোঁজের জন্য আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সেই পান্না মেয়েটি কে?

পান্না, না? কথাটা বলে রবিশঙ্কর তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

তাহলে আপনাকে একটা পূর্বকাহিনী শোনানো উচিত।

কি রকম?

আমার ছোট ভাই মণিশঙ্করকে দেখেননি, রবিশঙ্কর বলতে লাগলেন, ইউনিভারাসটি: একটি জুয়েল। অবিশ্যি মণির সঙ্গে আমার পরিচয়ও খুবই সামান্য। আমি ঝালোয়া মানুষ হলেও মণি বরাবর কলকাতার এক কনভেণ্টে মানুষ। এবং কনভেণ্টে মান্ হয়েও, কি করে যে সেই ক্রিশ্চানী আবহাওয়ার মধ্যেও তার মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতে প্রতি স্পৃহা জন্মাল সেইটাই আশ্চর্য! সেই অদম্য স্পৃহাই তাকে একদিন ম্যাট্রি পরীক্ষায় সর্ববিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ঘরছাড়া করল। যাহোক, কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন হিন্দু হোস্টেল থেকে রাত্রে পালাল। চারদিে তার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বাবা তখনও অবিশ্যি জীবিত। অনে খোঁজ করা হল তার, কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। তার পর যেন একটু থে আবার রবিশঙ্কর বললেন, দীর্ঘ আট বছর পরে তার খোঁজ পেলাম। লাহোরে এ অপেশাদারী গায়িকার গৃহে সে ছিল, রুক্মিণী তার নাম। ঐ রুক্মিণীরই মেয়ে হে পান্না। পান্নাকে ভালবেসেছিল মণিশঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে আশ্চর্যরকমভা পান্না রুক্মিণীর গৃহ হতে নিরুদ্দেশ হয় এবং সেই থেকেই পান্নার খোঁজে আজ মণিশঙ্কর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই মণির জন্যই কাগজে পান্নার বিজ্ঞাপন দেওা হয়েছে, অর্থাৎ আমিই দিয়েছি।

রবিশঙ্করের কাহিনী একটি আরব্যোপন্যাসের মত শোনালেও কি জানি কে তার সবটাই কিরীটী অবিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু মুখে বা ভাবে সেটা প্রকা না করে বলে, এই ঘটনা যা বললেন, তা কতদিন আগেকার রবিশঙ্করবাবু?

কোন্ ঘটনা?

মানে পান্নার নিরুদ্দিষ্টা হওয়ার ব্যাপারটা?

তা ধরুন মাস আষ্টেক হবে।

তা এতদিন সে সম্পর্কে আপনারা খোঁজ নেননি বা বিজ্ঞাপন দেননি কেন?

দেব কি, আমরা কি জানতাম নাকি? মাত্র মাসখানেক আগে হঠাৎ এক রাত্রে ধূমকেতুর মত মণি এখানে এসে হাজির হয় দীর্ঘ নয় বৎসর পরে—তার নিরুদ্দেশ হবার পর। সেই সময়েই তো তার মুখে সব কথা শুনি।

হুঁ। মণিশঙ্করবাবু কি এখন এখানেই আছেন?

না।

তবে এখন তিনি কোথায়?

সে যে এখন কোথায় তা একমাত্র সে-ই জানে। যে রাত্রে সে এখানে আসে তার পরের দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে কাউকে কিছু না জানিয়ে আবার সে চলে যায়।

পান্নার মা রুক্মিণী দেবীর কোন সংবাদ জানেন? এখন তিনি কোথায় বা—

না। তার শেষ সংবাদ যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মাস কয়েক আগে অকস্মাৎ তিনি লাহোর থেকে যে কোথায় চলে গেলেন তা কেউ জানে না।

আচ্ছা রবিশঙ্করবাবু, হীরা-চুনি সম্পর্কে কিছু জানেন? হঠাৎ কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হীরা-চুনি? না তো।

ও দুটো নামও কখনো শোনেননি?

না।

ঠিক এমন সময় রবিশঙ্করের ঘরের এক কোণে রক্ষিত বিরাট একটি জার্মান ক্লকে ঢং ঢং করে রাত্রি এগারোটার সময় ঘোষণা শুরু হতেই যেন ধড়ফড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রবিশঙ্কর এবং কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা এবারে তাহলে আপনারা আসুন মিঃ রায়, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণের সমস্ত সৌজন্য ও আতিথেয়তা যেন রবিশঙ্করের ভিতর থেকে সহসা কর্পূরের মতই মুহূর্তে উবে গেছে বলে মনে হল।

তাঁর আচরণের সেই ঔদ্ধত্য কর্কশ কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রকাশ পেল। তিনি অতঃপর গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, জঙ্গ বাহাদুর?

হাজুর। নেপালী ব্যাঘ্র মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। যেন ঐ ডাকটির জন্যই এতক্ষণ সে ওৎ পেতে ছিল দরজার বাইরে।

বাবুলোগকো নীচুমে পৌঁছা দেনা।

কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে মথুরাপ্রসাদকে অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে নিজেই সর্বাগ্রে নিঃশব্দে।

ইতিমধ্যে রাতের আকাশে কখন একসময় কালো কালো মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে জমে উঠেছে, দুজনে ওরা দেখল। নিঃশব্দে রতনগড় প্যালেসের লোহার গেট অতিক্রম করে নির্জন রাস্তায় যখন এসে দাঁড়াল, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

নিঃশব্দেই দুজনে পাশাপাশি পথ অতিক্রম করে চলে।

হঠাৎ একসময় সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মথুরাপ্রসাদ তার এতক্ষণের কৌতূহলটা প্রকাশ করেন, কি সব পান্না-হীরা-চুনির গল্প করছিলেন মিঃ রায় আপনারা? আসল কথাটাই আমার তোলা হল না!

কিরীটী যেন চমক ভেঙে মথুরাপ্রসাদের কথায় সাড়া দেয়, আসল কথাটা
বলুন তো?

কোথায় আমি ভাবছিলাম, এবারে বুঝি আপনি ম্যানেজারের কথাটাই তুলবে
তা আপনি তার ধার দিয়েও গেলেন না!

তারই তো অনুসন্ধান নিচ্ছিলাম। মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

তার মানে?

তার মানে হচ্ছে, গতরাত্রে ম্যানেজারের যে হত্যার ব্যাপারটা শুনলেন,
বহুদূর প্রসারিত। গোড়া থেকে না শুরু করলে ডগায় এসে পৌছবেন কি কবে
তাই তো মূল থেকেই আমি খোঁজ নিচ্ছিলাম।

কি যে আপনি বলছেন মিঃ রায়, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

বলছি, কাল রাত্রের হত্যাটা সাধারণ হত্যা নয় মথুরাপ্রসাদবাবু।

সাধারণ হত্যা নয়? বিস্ময়ে তাকায় মথুরাপ্রসাদ কিরীটীর মুখের দিকে।

না। শুনলেন তো, রবিশঙ্করবাবু বললেন, অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহ
আমাদের সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে সেই নিরুদ্দিষ্টা রুক্মিণী দেবীকেই।

রুক্মিণী দেবী! কিন্তু কে সে?

শুনলেন তো, নিরুদ্দিষ্টা পান্না নামে একটি কিশোরীর মা। হ্যাঁ, তাকে খু
পেলেই হয়তো নিরুদ্দিষ্টা পান্নার ইতিহাসও জানা যাবে। এবং পান্না-ইতিহাস
জানতে পারি, তবে আশা করছি, সলিল সরকার ম্যানেজারের হত্যার মোটিভ
উদ্দেশ্যটাও জানতে পারব। আর হত্যার মোটিভ যদি জানতে পারি তবে হত্যাকারী
খুঁজে বের করতে কতক্ষণ? সে তো অঙ্ক কষার মতই কষে বার করা যাবে!

বৃদ্ধ কথাটার যা যথার্থ মানে, ঠিক তাই যেন বনে যান মথুরাপ্রসাদ ঐ মু
কিরীটীর কথায়। একটি বর্ণও কিরীটীর কথার তিনি বুঝতে পারেন না।

তিনি কেবল অন্ধকারে পরম বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে সায় দেন, তা বটে,
বটে। তাহলে এখন উপায়?

উপায় সে পরে ভেবে দেখা যাবে, ক্ষিদের জ্বালায় এখন তো পেটের মধ্যে খ
দাহন চলেছে, সেটার কথাই এখন বেশী আমি ভাবছি। তার পরে ডাঃ ঘোষাল দা
ছক সাজিয়ে হয়তো আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। দু-এক বাজি দাবা খে
খেলতে যদি কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়! তাড়াতাড়ি একটু পা চালিয়ে চলুন।

আহারের আয়োজন সামান্য হলেও মথুরাপ্রসাদ রসালই করেছিলেন। গরম
কাউলকারীর সঙ্গে ঘৃতপক্ক গরম গরম চাপাটি ও পুদিনার চাটনী সহযোগে অত

লেও কিরীটীর ক্ষুধার তৃপ্তি বেশ ভালভাবেই হল এবং আহার শেষ করে সে-রাত্রের
ত বিদায় নিয়ে কিরীটী পথে এসে নামল এক সময়।

অন্ধকার রাত।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মথুরাপ্রসাদ আলো ও একজন লোক দিতে
য়েছিলেন সঙ্গে, কিন্তু কিরীটী রাজী হয়নি। বলে, এ সামান্য পথটুকু সে একাই
লে যেতে পারবে।

মন্থর পদবিক্ষেপে কিরীটী পথ অতিক্রম করে চলে।

জলো হাওয়া বইছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন একেবারে রাস্তাটা।

ডাঃ ঘোষালের বাংলোর সামনে এসে যখন কিরীটী পৌছাল, হাতঘড়ির দিকে
াকিয়ে দেখল রাত প্রায় সোয়া বারোটা তখন। কিন্তু তখনও ডাক্তারের বাইরের
রে আলো জ্বলছে দেখা গেল।

বারান্দায় উঠে খোলা দরজা-পথে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল, টেবিলের উপরে
াবার ছক পেতে ঘুঁটি সাজিয়ে নিনিমেষে সেই ছকের ঘুঁটিগুলোর দিকে তাকিয়ে
ালে হাত দিয়ে চেয়ারের উপরে তখনও বসে আছেন ডাঃ ঘোষাল একাকী।

ঘরের মধ্যে ঢুকে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী ডাকল, ডাক্তারবাবু!

এবারে আপনার মন্ত্রী সামলান! বলেইসামনেরদিকে তাকিয়ে কিরীটীকে দেখতে
পেয়ে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন, এই যে মিঃ রায়, এত দেরি হল যে আসতে?

হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল।

তাহলে এক বাজি বসা যাক এবারে, কি বলেন?

বেশ তো, সাজান।

॥ দশ ॥

সেরাত্রেও পর পর দুটো বাজি দাবা খেলে কিরীটী যখন ঘরে শুতে এল রাত তখন
তিনটে। শয্যায় এসে শুলেও চোখের কোথাও ঘুম ছিল না। এবং এতক্ষণ যে চিন্তাটা
দাবার ছক ও ঘুঁটিগুলোর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, এখন যেন সেটাই শয্যায় এসে
শয়ন করবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত স্পষ্ট মুখোমুখি হয়ে এসে দাঁড়াল।

হীরা, চুনি, পান্না এবং পান্না-জননী রহস্যময়ী রুক্মিণী, রাঘবেন্দ্র শর্মা এবং
আকস্মিক তাঁর মৃত্যু। তারপর এই রতনগড়। রহস্যময় রবিশঙ্কর। দু-দুবার তার সঙ্গে
পরিচয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রবিশঙ্কর বর্ণিত মণিশঙ্কর, রুক্মিণী ও পান্না-কাহিনী।
সব যেন ছায়াচিত্রের মত মনের পর্দায় পর পর ভেসে উঠতে থাকে।

এবং গতরাত্রের সেই রহস্যাবৃত আগন্তুক। তার পত্র। এই সব ছিন্ন ছিন্ন ঘটনা গুলোর মধ্যে কি কোথাও কোন অলক্ষিত যোগসূত্র আছে?

মনে মনেই কল্পনায় একটা কাহিনীকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে কিরীটী ঐ ছি ছিন্ন অংশগুলিকে নিয়ে, কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়।

বারবারই এক জায়গায় এসে কল্পনাটা যেন কেমন শিথিল হয়ে যায়।

আবার ভাবতে থাকে কিরীটী রুক্মিণীর কথা।

সঙ্গীত-পটিয়সী রুক্মিণী—তার কন্যা পান্না।

হঠাৎ মনে পড়ে তার এক সঙ্গীত-পাগল বন্ধুর কথা। ঐ সঙ্গীত বিদ্যাটিকে আয় করবার জন্য তার সেই বন্ধু বীরেন্দ্রকিশোর ভারতের এমন কোন জায়গা নেই যেথা সে ঢুঁ দেয়নি।

জমিদারের একমাত্র ছেলে। পয়সার অভাব নেই। বিয়ে-থা করেনি এব একমাত্র ঐ সঙ্গীত ছাড়া অন্য কোন খেয়ালও নেই তার।

সঙ্গীত-অম্বেষণের জীবনে কত বিচিত্র বিচিত্র সব কাহিনীই না কিরীটী বীরেন্দ্র মুখে কতদিন শুনেছে। তার পক্ষে হয়তো লাহোরের রুক্মিণীর সংবাদ জানাটা খু বিচিত্র নয়।

হ্যাঁ ঠিক, যদি কেউ রুক্মিণীর কোন সংবাদ দিতে পারে তো ঐ বীরেন্দ্রই দিত পারবে তাকে।

অতএব কালই তার কলকাতা একবার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এবং সত্যি সত্যি পরের দিনই রাত্রের গাড়িতে কিরীটী কলকাতায় ফিরে যাবা জন্য প্রস্তুত হল।

ডাঃ ঘোষাল কিছুতেই ছাড়তে চান না।

কিরীটী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলে, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে শীঘ্রই আবার সে ফি আসছে খুব সম্ভবত রত্নগড়ে।

ডাঃ ঘোষালই টমটম করে কিরীটীকে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিলেন।

পরের দিন প্রত্যুষে কিরীটী কলকাতায় এসে পৌছাল।

এবং সেইদিনই বিকালে শ্যামবাজারে বীরেন্দ্র-ভবনে গিয়ে ঢুঁ দিল।

বীরেন্দ্রকিশোর সেন ঐ সময় গৃহেই ছিলেন। কিরীটীকে দেখে সাদর আহ্বা জানালেন, আরে রহস্যভেদী যে, এস এস!

বীরেন্দ্রর আহ্বানে কিরীটী সোজা এসে ফরাসের উপরেই জুতো খুলে বসল

সামনে মুখোমুখি হয়ে।

প্রাচীন বনেদী কেতায় সজ্জিত বীরেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব বসবার ঘরটি। ঢালা স পাতা। ফিকে নীল সাটিনের সব তাকিয়া। ঘরের এক কোণে বিরাট একটি মাটির ফ্লাওয়ার ভাসে একথোকা রক্তগোলাপ। তারই পাশে মাটির তৈরী বিচিত্র হাঙরমুখো ধূপাধারে জ্বলছে মহীশূরের সুগন্ধি চন্দন ধূপ। ঘরের বাতাসে তারই ছড়িয়ে আছে। ফরাসের একধারে একটি বিরাট তানপুরা, বাঁয়া তবলা। ঘরের য়ালে চারিদিকে নাম-না-জানা অজানা সব সঙ্গীতবিদদের চিত্র ঝোলানো।

বীরেন্দ্রকিশোর লোকটি নিজেও ভারী শৌখিন।

সরু কালোপাড় মিহি কাঁচি ধুতি পরিধানে, গায়ে চুরিদার হাতা করা আদ্দির ঞ্জাবি।

শ্যামবর্ণ হলেও দেহে ও চোখেমুখে বুদ্ধির একটা দীপ্তি আছে।

একটা সঙ্গীত-বিষয়ক পুঁথি নিয়ে তার পাতা উল্টাচ্ছিলেন বীরেন্দ্র। পুঁথিটা শে রেখে বললেন, তার পর হঠাৎ কি মনে করে?

এমনিতেই আসতে নেই নাকি?

বিনা প্রয়োজনে তুমি আসবারই লোক বটে! বল তো এখন কি ব্যাপার?

ত হলে সত্যি কথাটাই বলি। একটা সংবাদ যদি পাই তোমার কাছে তাই এসেছি।

সংবাদ! কি সংবাদ হে? আমি হচ্ছি সঙ্গীতের ব্যাপারী, তোমার ঐসব খুন-খমের সংবাদ কি—

অবিশ্যি তোমারই লাইনের। তুমি তো ভাই সঙ্গীতের সন্ধানে একসময় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছ, লাহোরেও গিয়েছ নিশ্চয়ই!

তা দু-চারবার গিয়েছি বৈকি। কিন্তু কেন বল তো?

রুক্মিণী নামে কোন গাইয়ে—

দাঁড়াও, দাঁড়াও। কি নাম বললে, রুক্মিণী—তাই না?

হ্যাঁ।

হুঁ, মনে পড়ছে বটে, বছর সাতেক আগে আমার ওস্তাদজীর সঙ্গে উত্তর ভারতের সঙ্গীত কনফারেন্স থেকে ঘুরতে ঘুরতে এক নবাবের আমন্ত্রণে লাহোরে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন রাত্রে জলসার পর সোহিনী রাগ নিয়ে আলোচনা হতে ওস্তাদজী একসময় আমাকে বললেন, এমন সোহিনী তোমাকে আমি শোনাব যা খুব কমই শুনেছ বেটা। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। বললাম, কোথায় ওস্তাদজী? নেই কি? মৃদু হেসে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই লাহোরেই। তবে সে পেশাদার নয়।

আর করমাশেও গায় না। গায় নিজের খেয়ালে। চল, কাল একবার তার ওখানে যাব

তার পর ?

পরের দিন সন্ধ্যার পরে ওস্তাদজী আমায় টাঙ্গায় চাপিয়ে নিয়ে শহরের একেবা প্রান্তে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজায় কড়া নাড় কে একজন এসে দরজা খুলে দিল। আমরা ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। ছে একতলা বাড়ি। মাত্র খানতিনেক ঘর। কিন্তু সর্বত্র যেন একটা দারিদ্র্য থাকে রুচি ও সৌন্দর্যের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। যেঘরে গিয়ে আমরা বসেছিলাম কিছুক্ষণবা সেই ঘরে অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী এক নারী প্রবেশ করল। সাদা থান পরিধানে। স নিরাভরণা। নারী এসে নত ভূলুণ্ঠিত হয়ে ওস্তাদজীর পায়ের ধুলো নিতেই ওস্তা তার মাথায় একখানি হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, রুক্মিণী, ভাল তো বিটি ?

হ্যাঁ। লাহোরে কবে এলেন ?

দিন দুই হল এসেছি।

আমার পান্না মাঈ কই বিটি ? তাকে দেখছি না ?

আছে, ঘরে কাজ করছে।

এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই বিটি। আমার সাকরেদ বীরেন্দ্রকিশো বড় মিঠা গলা। আর গলার কাজও চমৎকার।

রুক্মিণীই তাকে বলব। তিনি তখন হাত তুলে আমাকে নমস্কার জানালে তারপর ওস্তাদজীর অনুরোধে সেই রাত্রে রুক্মিণী আমাদের গান শোনালেন। ত গলা জীবনে আমি শুনিনি। স্বয়ং মা বীণাপাণি সরস্বতী যেন তাঁর কণ্ঠে অধি করছেন। শুধু মুগ্ধ নয় বিস্ময়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলাম। আহা, কত হয়ে গেল, আজও যেন সে সুর কানে আমার লেগে রয়েছে ভাই। বলতে বল বীরেন্দ্র চক্ষু দুটি বুজলেন।

কিরীটীও তন্ময় হয়ে শুনছে। ভুলেই গিয়েছিল সে—কেন এবং কি জন্য বীরে ওখানে এসেছে! কিরীটী কোন প্রশ্ন করবার আগেই বীরেন্দ্র নিজে থেকেই আ বলতে শুরু করলেন, ফিরবার পথে টাঙ্গায় ওস্তাদজীর পাশে বসে রাত্রে নিজের ে হলকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই রুক্মিণী ওস্তা জবাবে তিনি বললেন, রুক্মিণী সম্পর্কে আমিও খুব বেশী জানি না বীরেন্দ্র। বছর তি আগে এই লাহোরেই একটা সঙ্গীতের জলসায় গান গাইতে এসেছিলাম। জলসার দিন রুক্মিণীর এক ভৃত্য একখানি চিঠি নিয়ে আমার কাছে এল। রুক্মিণী আমার প্রার্থী। যদি আমি দর্শন দিই তো পরের দিন ঐ ভৃত্য সন্ধ্যায় এসে তার গৃহে আ

র যাবে। বললাম, যাব। গেলাম পরের দিন ঐ গৃহে। আলাপ হল রুক্মিণীর সঙ্গে। বিনীত অনুরোধ জানাল, আমার কাছে কিছু শিক্ষা করতে চায়। বললাম তার গলা শুনে আমি তাকে কথা দিতে পারি না। তখন সে একটি মীরার ভজন আমাকে র শোনাল। আহা কি গলা, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রুক্মিণী আমাকে কিনে নিল। লাম হ্যাঁ, শিখাব তোমাকে। থেকে গেলাম সেবারে লাহোরে মাস দুই। প্রতি ্যায় তার গৃহে যেতাম। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তাকে তালিম দিতাম। কিন্তু ণী জন্মশিল্পী। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাকে নিংড়ে নিল। সেই সময়েই ার কথায় বুঝেছিলাম, লাহোরে তার বাড়ি নয়। বাঙালী বিধবা, অনেক দুঃখে ত্যাগিনী হয়েছে একটিমাত্র কন্যা-সন্তান নিয়ে। তার বেশী কোনদিন তাকে আমিও ছু আর জিজ্ঞাসা করিনি। সেও বলেনি। এই পর্যন্ত বলে বীরেন্দ্র চুপ করলেন।

কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে, রুক্মিণীর সঙ্গে আর কখনো তোমার সাক্ষাৎ হয়নি?

না।

তার আর কোন সংবাদ জান না?

না! তবে—

তবে কি? প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কিরীটী বীরেন্দ্রর মুখের দিকে আবার।

মাস দুয়েক আগে ধর্মতলার মোড়ে সন্ধ্যার দিকে একটা সিনেমা হাউসের লাবির মনে দাঁড়িয়ে আছি, হাউসে সেদিন একটা গানের জলসা ছিল। একটা রিকশা এসে মল। এবং রিকশা থেকে নামলেন একটি ভদ্রমহিলা। হঠাৎ তার মুখের প্রতি নজর চায় যেন চমকে উঠলাম। মুহূর্তের জন্য সে মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল যেন তিনি ক্মিণী ছাড়া আর কেউ নন কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে কথা বলবার জন্য সামনের দিকে ন এগিয়ে গেলাম, ভিড়ের মধ্যে তখন আর তাঁকে খুঁজে পেলাম না।

তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল?

না।

আচ্ছা তোমার ওস্তাদজী বেঁচে আছেন বীরেন্দ্র?

না, গত ফাল্গুনে তিনি কাশীতে দেহ রেখেছেন। কিন্তু আরো একটু আছে রুক্মিণী পর্কে।

কী বল তো!

কাটুনার ঠিক দিন দশেক পরে আবার একদিন ভবানীপুর অঞ্চলে একটা কাজে ন্তু রাস্তায় গাড়ির মধ্যে বসে আছি, হঠাৎ যেন আমার চোখে পড়ল, রাস্তায় খন ময়োলার কাছ থেকে রুক্মিণীর মতই একজন কি কিনছেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি

থেকে নেমে এগিয়ে যাব হঠাৎ যেন কোন্ পথে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ড-ড্রবা
রুক্মিণী বলেই তাকে মনে হলেও সঠিক বলতে পারি না সে সত্যিই সেই রুক্মিণী কিনা

মনে আছে তোমার বীরেন্দ্র ঠিক সে জায়গাটা ?

জগুবাবুর বাজারের কাছেই।

আশাতীত অনেকখানি সংবাদই বীরেন্দ্রর কাছে পাওয়া গেল। কিরীটী অত:
বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কলকাতায় ছুটে এলেও কিরীটীর মন কিন্তু পড়েছিল রতনগড়েই। বীরে
কাছ থেকে যেটুকু জানবার কিরীটীর প্রয়োজন ছিল, সেটুকু সে বীরেন্দ্রকে চিঠি লিখে
জানতে পারত, কিন্তু খেয়ালী বীরেন্দ্রর নিকট হতে চিঠির জবাব আদপেই সে পে
কিনা এবং পেলেও যে দেরি হত, সে দেরিটুকুও কিরীটীর যেন সইছিল না। তাই
ছুটে গিয়েছিল কলকাতায় বীরেন্দ্রর কথা মনে হতেই। এবং যে মুহূর্তে সেটুকু ত
জানা হয়ে গেল, কিরীটী আর অপেক্ষা করল না—পরের দিনই আবার রাত্রের ট্রে
কিরীটী রতনগড় অভিমুখে যাত্রা করল। কেন যেন তার বারবারই মনে হচ্ছিল হীর
চুনি-পান্নার মূল রহস্যটার শিকড়গুলো রতনগড়ের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে কোথাও
কোথাও। এবং তাকে সেইখানে বসেই অনুসন্ধান চালাতে হবে।

ট্রেনের কামরায় বসে বসে কিরীটী তার চিন্তাধারাটা রতনগড়কে কেন্দ্র করে
বিস্তার করে দিয়েছিল। রতনগড়ের পরিধিটা খুব বিস্তৃত নয়।

সিংহদের তিন পুরুষ ও তাদের আট-দশটা শাসালো কয়লার খনিকে ভিত্তি করে
গত ষাট বৎসরের রতনগড়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সে ইতিহাসের কিছু কি
কথাপ্রসঙ্গে কিরীটী ডাঃ ঘোষালের মুখেই পূর্বে শুনেছিল।

প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাপ-মা-খেকো বোম্বেটে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এক যুবক, ঐ অঞ্চলে
একদা গিয়ে ছিলেন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠ সাপ্লাই করবার জন্য। ওখা
থেকে মাইল দশেক দূরে নদীর উপরে এক ব্রিজ তৈরী হচ্ছিল, সেই ব্রিজের কাঠামো
তৈরীর ব্যাপারে [illegible] ছিল তার ট্যাম ফিরিঙ্গি ওভারসিয়ার মরিসন সাহেব। মরিসনে
কয়লাখনি সম্পর্কে কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল খনিতে কাজ করার দরুন। জঙ্গলের মধ্যে
কাঠ কাটাবার সময় একদিন মাটিতে তাঁবুর খুঁটি গাড়তে গিয়ে কয়লার [illegible]
সে-ই প্রতাপনারায়ণকে বলে, নিশ্চয়ই জায়গাটায় কয়লা আছে। উৎসাহি[illegible] [illegible]সার
প্রতাপনারায়ণ কথাটা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের তিনি কাঠ কাটা [illegible] [illegible]মার
খুঁড়তে শুরু করিয়ে দেন। তারপর কি করে সেখানে খনি [illegible] [illegible] গৃহে ব

কে মরিসন পার্টনার জুটিয়ে এনে এবং আশেপাশে হাজার হাজার বিঘে জমি লিজ য়ে খনির ব্যাপারে এগিয়ে চলল—সে ইতিহাস আজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তী-ালে দেখা গেল, সিংহরাই ক্রমে ক্রমে সব আবিষ্কৃত খনিগুলির একাধীশ্বর হয়ে উঠতে াগলেন। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ বেশীদিন সে-সব ভোগ করতে পারলেন না। হঠাৎ ক রাত্রে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হল। গদিতে বসল তাঁর পুত্র মুরলীনারায়ণ। তাঁরই য়ে প্রকৃতপক্ষে একের জায়গায় হল পর পর সাতটি খনি। এবং তাঁর মৃত্যুর পর তস্য ত্র জগদীশনারায়ণ হলেন ঐসব খনির মালিক। জগদীশের এক বোন ছিল বিমলা। বাহের মাত্র ছয় বৎসর পরই তার মৃত্যু হয়। জগদীশের এক দূর-সম্পর্কীয় মামাতো ানের পুত্র রবিশঙ্করই বর্তমানে রত্নগড় স্টেটের মালিক, কারণ জগদীশনারায়ণ বাহ করেননি। এবং মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই তাঁর আকস্মিক রহস্যময় মৃত্যু য়। জগদীশনারায়ণ লোকটি যেন তাঁর পিতামহ প্রতাপনারায়ণের একেবারে বিপরীত ছলেন। যেমনি ভদ্র তেমনি শান্ত এবং একমাত্র ঐ বংশে তিনিই ছিলেন শিক্ষিত। বং সেই কারণেই হয়তো তার পিতা মুরলীনারায়ণের সঙ্গে তাঁর এতটুকু বনিবনাও ল না। পিতা-পুত্রে বাদ-বিসংবাদ সর্বদা লেগেই ছিল; কারণ মুরলীনারায়ণ লোকটা ছলেন যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি বেপরোয়া ও গোঁয়ার। অথচ অনেকের ধারণা গদীশনারায়ণই নাকি তাঁর পিতা মুরলীনারায়ণকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে হত্যা রেছিলেন। যদিও তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

আবার জগদীশনারায়ণের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল রত্নগড় প্রাসাদের পিছন-দিককার উদ্যানে একদিন প্রত্যূষে এবং জগদীশের দেহে যদিও কোন আঘাতের চিহ্ন ল না, তথাপি তাঁর মৃত্যুর কারণটাও বোঝা যায়নি। সম্পূর্ণ নীরোগ, সুস্থ-সবল ও ঠ লোক ছিলেন জগদীশনারায়ণ এবং তার আগের দিন রাত্রেও প্রায় রাত বারোটা ন্ত দরকারী কাজগুলি করেছেন। লোকের ধারণা জগদীশ নাকি আত্মহত্যা করেন।

বর্ধমানে গাড়ি থামল।

রেস্টুরেন্টের লোককে চা দেবার কথা বলবার জন্য কিরীটী দরজা খুলতেই একটি ইশ-চব্বিশ বছরের যুবক কিরীটীকে যেন একপ্রকার ঠেলেই গাড়ির কামরার ধ্যে এসে ঢুকল।

একটু বিরক্ত হয়েই কিরীটী আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু তাকাতে গিয়েই যেন কিরীটির মনে হল আগন্তুকের মুখখানি চেনা-চেনা। কখন কোথায় দেখা—অথচ ঠিক মনে পড়ে না। চিনেও যেন চেনা যায় না।

স্মৃতির পৃষ্ঠা হাতড়ে হাতড়ে সঠিক পরিচয়টা যেন পাওয়া যায় না।

আগন্তুককে কিন্তু মনে হল বড় অন্যমনস্ক। গায়ের রংটা টকটকে গৌর ছিল হয়ে একসময়। রৌদ্রে পুড়ে অত্যাচারে একটু যেন জলে গিয়েছে। মাথার চুল তৈলহ রুক্ষ। চোখের কোলে পড়েছে একটা কালো দাগ।

পরিধানে আগন্তুকের একটা মলিন ঢোলা পায়জামা ও ঢোলা পাঞ্জাবি—গে রঙের খদ্দরের। পায়ে একটা পেশোয়ারী চপ্পল।

হাতে একটা ছোট সুটকেস ছিল, সেটাকে সীটের উপরেই একপাশে নামি রেখে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল আগন্তুক।

কিরীটী কামরা থেকে নেমে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এল আবার। এ দেখল আগন্তুক তেমনি চোখ বুজে বসে আছে।

ডাকগাড়ি আবার ছুটে চলেছে।

এবারে থামবে সেই আসানসোলে। হঠাৎ কিরীটী তার সহযাত্রীর পার্শ্বেই রক্ষি তার সুটকেসটার দিকে নজর পড়তেই যেন চমকে ওঠে।

চামড়ার সুটকেসটার গায়ে সাদা রংয়ের ইংরাজী টাইপে লেখা মণিশঙ্কর চৌধুরী

মণিশঙ্কর চৌধুরী!

কে এই মণিশঙ্কর? রতনগড়ের রবিশঙ্করের সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাই নয় তো? কি সত্যি যদি তাই হয়? সত্যিই যদি ও সেই মণিশঙ্করই, তাহলে বলতে হবে আ যোগাযোগ তো! এমনিভাবে চলন্ত ডাকগাড়ির কামরায় রতনগড়ের পথেই যে ম শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এ কি ক্ষণপূর্বেও কিরীটী ভেবেছিল? অথচ গত কয় ধরে ঐ বিশেষ লোকটিকেই মনে মনে কিরীটী অন্বেষণ করছিল যেন। একেই হয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মনের আকর্ষণ।

কি জানি কেন কিরীটী তার সহযাত্রীর সঙ্গে কথা বলবার লোভটা বেশীক্ষণ সং করতে পারল না—তার স্বাভাববিরুদ্ধ হলেও।

মণিশঙ্করবাবু? মৃদুকণ্ঠে ডাকল কিরীটী।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। দ্বিতীয় পক্ষ একেবারে চুপচাপ। ঘুমিয়ে পড়ল কি তাই বা কে জানে!

আবার ডাকল কিরীটী, মণিশঙ্করবাবু?

সহযাত্রী এবারে চোখ মেলে তাকাল। কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তার ভ্রূ যেন বিরক্তিতে।

মাপ করবেন, আপনাকেই ডাকছিলাম। কিরীটী আবার বলে।

কেন বলুন তো ? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না !

না, পারবেন না। তার কারণ আপনি আমাকে পূর্বে কখনো দেখেন নি। াপনাকেও অবিশ্যি পূর্বে কখনো যদিও আমি দেখিনি, তবু মনে হচ্ছে আপনাকে াধ হয় চিনি।

আমাকে চেনেন ?

হ্যাঁ। রতনগড়ের রবিশঙ্করবাবুর ছোট ভাই তো আপনি ?

তাতে আপনার প্রয়োজন আছে কি কিছু ?

আছে হয়তো কিছু।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তা পান্নার খোঁজ পেলেন ?

কিরীটীর মুখ থেকে পান্না নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মণিশঙ্কর দু চোখ মেলে সোজা হয়ে বসে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কে—কে আপনি ? কি করে জানলেন আপনি যে পান্নাকেই আমি খুঁজছি !

শেষ সন্দেহটুকুর নিরসন হওয়ায় মৃদু স্বস্তির হাসি হেসে এবারে কিরীটীও একটু নড়ে-চড়ে বসল।

বললাম তো আপনি আমাকে চিনবেন না।

কিন্তু আপনি পান্নার কথা কি করে জানলেন ?

জানি এমন কথা তো আপনাকে আমি বলিনি। তবে হয়তো সাহায্য করতে পারি আপনাকে পান্না সম্পর্কে।

সাহায্য করতে পারেন !

হ্যাঁ।

জানেন আপনি পান্না কোথায় ?

আগে যদি আপনি পান্নার সব কথা আমাকে খুলে বলেন, তাহলে ও প্রশ্নের আপনার জবাব আমি হয়তো দিতে পারি।

এগারো

একটানা যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে

মেঘলা আকাশের নীচে ঘন অন্ধকার যেন মুখ থুবড়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

দ্রুত ঘূর্ণমান লৌহচক্রের একঘেয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দ শুধু শোনা যায়।

কিরীটীর শেষের কথায় মণিশঙ্কর ওর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

কি আপনি জানতে চান পান্না সম্পর্কে?

যতটুকু আপনি জানেন সেইটুকুই।

মণিশঙ্কর অতঃপর মাথা নীচু করে আপন মনে কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন ভা'ব তারপব মাথা তুলে বললে, লাহোরে রুক্মিণী দেবীর খোঁজ পেয়ে তাঁর কাছে শিখতে গিয়ে পান্নার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

সে আমি জানি। কিন্তু তার পরের ইতিহাস বলুন। কিরীটী বললে।

আপনি জানেন! তাহলে রুক্মিণী দেবীকেও কি আপনি চিনতেন নাকি?

আমার কথা পরে বলব। আগে আপনার ইতিহাসটাই বলুন।

রহমৎউল্লার নাম আপনি শুনেছেন কিনা জানি না। তার মুখে আমি রু নাম শুনি। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে যখন সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময় লাহে একদিন রুক্মিণীর খোঁজ পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। প্রথমে তো কি কিছুতেই আমায় সঙ্গীত শিক্ষা দিতে রাজী হন না। তারপর যখন তাঁকে মা ডেকে পায়ে ধরলাম, রাজী হয়ে গেলেন। শুধু রাজী নয় তাঁরই গৃহে ঠাঁইও গেলাম। তার পর সেইখানেই পান্নার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। সে আজকের নয়। দীর্ঘ আট বছর আগেকার কথা। রুক্মিণী মা'র গৃহে পান্নাকে যখন প্রথম তখন তার বয়স বড় জোর দশ-এগারো বছর হবে। বালিকা সে। ছিপছিপে গ স্বর্ণচাঁপার মত গায়ের রং। মাথা ভরা কালো চুল। সেও তার মা রুক্মিণীর ক গান শিখত। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের দুজনকে পাশে বসিয়ে রুক্মিণী সঙ্গীত দিতেন। দিন—সপ্তাহ—মাস—বৎসর কেটে যেতে লাগল। দুজনেই রুক্মিণীর ক গান শিখি। ধীরে ধীরে পান্না বড় হতে লাগল। তার দেহে একটু একটু করে লাগতে শুরু করল। বালিকা ক্রমে হল কিশোরী। কিশোরী রূপান্তরিত হতে লাগ যৌবনায়। সেই সঙ্গে একটু একটু করে কখন এক সময় যে আমারও চোখে পা ঘিরে রং ধরেছে টের পাইনি। টের যেদিন পেলাম সেদিন বুঝলাম, পান্নাকে না আমার চলবে না। কিন্তু পান্না—পান্না কি আমাকে ভালবাসে? সেই কথাটিই এখনো আমার জানতে বাকি। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু সুযোগ আর হয় সদা জাগ্রত বাঘিনীর মতই যেন রুক্মিণী সর্বদা ঘিরে রেখেছে দুটি চক্ষু মেলে তার মাত্র সন্তান পান্নাকে। এক বাড়িতে থাকি অথচ একটি মুহূর্তের জন্যও পান্নাকে

পাওয়ার সুযোগ মেলে না। এক একবার মনে হয় যা থাকে কুলকপালে, রুক্মিণীর কাছেই স্পষ্টাস্পষ্টি ইচ্ছাটা আমার প্রকাশ করি। কিন্তু রুক্মিণীর মুখের দিকে চাইলেই যেন ভয়ে বুকটা আমার কেঁপে উঠত। এমন কিছু সে মুখে দেখতাম, যেজন্য সব তাঁর কাছে অসঙ্কোচে বলতে পারলেও পান্না সম্পর্কে যেন কোন কথা তাঁর কাছে বলতে পারতাম না। এমন সময় সুযোগ এসে গেল। হঠাৎ রুক্মিণীর ভীষণ অসুখ হল। বাড়িতে লোকজনের মধ্যে রুক্মিণী, একটা বুড়ী ঝি, পান্না ও আমি। এতদিন রুক্মিণীর ওখানে আছি, কখনো একদিনের জন্য তাঁকে অসুস্থ হতে দেখিনি। সেই প্রথম দীর্ঘ সাত বছর বাদে তাঁকে অসুস্থ হতে দেখলাম। শুশ্রূষা আর কে করবে? আমি আর পান্নাই পালা করে শুশ্রূষা করি। প্রথম দশটা দিন ও রাত যে কোথা দিয়ে কেমন করে কাটল টেরই পেলাম না। তার পর ধীরে ধীরে রুক্মিণী আরোগ্যের পথে যেতে লাগলেন। আগে কখনও আমার চা ও জলখাবার নিয়ে পান্না আসে নি। বরাবর এসেছে ঝি। সেদিন সকালে পান্না এল চা ও জলখাবার নিয়ে আমার ঘরে। সদ্য স্নান করেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো। এসে বললে, আপনার চা হঠাৎ সেদিন প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলোয় পান্নাকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। এমনি নির্জনে এত কাছাকাছি তাকে কখনো এর আগে পাইনি। চা ও জলখাবার টেবিলের ওপরে রেখে সে চলে যাচ্ছিল। ডাকলাম, পান্না!

পান্না ফিরে দাঁড়াল।

আমার একটা কথা বলবার ছিল।

নিঃশব্দে মুখ তুলে কেবল আমার দিকে তাকাল পান্না তার দীর্ঘায়ত দুটি চক্ষু তুলে।

কথাটা অনেক দিন ধরে তোমাকে বলব বলব করেও বলতে পারিনি। পান্না আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথাটা শুনলে কি তুমি রাগ করবে? বল পান্না, বল, জবাব দাও?

পান্না আমার কথায় মুখ নীচু করল। কি দুঃসাহস হল এগিয়ে গিয়ে ওর একখানি হাত ধরে ফেললাম, পান্না!

আমি কি বলব—মাকে বলুন। বলে আমার হাত থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করে নিয়ে পান্না ধীরপদে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বুঝলাম পান্না আমারই। তাকে আমি পাব। আনন্দে সমস্ত পৃথিবীর রংটাই যেন আমার কাছে বদলে গেল। পান্না আমার। এইবার শুধু রুক্মিণীর সম্মতি। কিন্তু হায় রে, তখন কি জানি, স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, পান্না আমার ভাগ্যে নেই! · এই পর্যন্ত বলে মণিশঙ্কর চুপ করল।

তার পর ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

তার পর রুক্মিণী একদিন সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবং সুযোগ বুঝে একদিন সন্ধ্যায় রুক্মিণী সবে যখন পূজার ঘর থেকে বার হয়ে এসেছেন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, মা !

আমায় কিছু বলবে মণি ? রুক্মিণী শুধালেন।

আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে মা।

বল, তোমাকে অদেয় কি আর আমার থাকতে পারে বাবা ? এক দিক দিয়ে তুমি যে আমার পুত্রেরও অধিক।

পান্নাকে আমি চাই মা—স্ত্রীরূপে।

কী—কী বললে ?

পান্নাকে আমি বিবাহ করতে চাই মা।

তা হয় না মণি।

হয় না—কেন হয় না মা ! আমি কি ওর অযোগ্য ?

তা নয় মণি। তোমার মত স্বামী যদি পায় তবে জানব সে ওর ভাগ্য !

ও কথা বলবেন না মা। বরং আমিই যদি ওকে স্ত্রীরূপে পাই তো জানব আমারই ভাগ্য। বলুন মা, আপনি সম্মত ? আমি ওকে মাথায় তুলে নিয়ে যাব।

বললাম তো মণি, তা হবার নয়। আর যাই করি না কেন, কেবলমাত্র ওর মঙ্গলটা দেখতে গিয়ে তোমার সর্বনাশ আমি করতে পারব না বাবা।

সর্বনাশ ! কি বলছেন মা ?

হ্যাঁ তাই। পান্নার জন্ম-পরিচয়ের কোন স্বীকৃতি নেই।

মা ? আমি চিৎকার করে উঠলাম।

হ্যাঁ।

কিন্তু পান্না—পান্না কি আপনারই মেয়ে নয় ?

হ্যাঁ, আমারই মেয়ে। কিন্তু ওর পিতৃ-পরিচয় আজও আমি জানি না। ছেলেমানুষ তুমি। তাছাড়া তুমি আমার সন্তান-তুল্য। সব কথা তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না। আর বলতেও আমি পারব না তোমাকে। শুধু জেনো বিয়ে তোমাদের হতে পারে না।

আবার কিরীটী প্রশ্ন করল, আর কিছুই তিনি বললেন না আপনাকে ?

না। কিন্তু তবু—তবু আমি পান্নার আশা ত্যাগ করতে পারিনি। সেইখানেই রয়ে গেলাম। এবং ঐ ঘটনার মাস দুই পরে হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভেঙে

বাইরের বারান্দায় এসে দেখি রুক্মিণী দেবী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, মা! কি হয়েছে মা? অমন করে বসে কেন?

পান্না নেই!

পান্না নেই? কি বলছেন মা?

হ্যাঁ। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠতেই দেখি আমার ঘরে তার শয্যাটা খালি পড়ে আছে। আর ঘরের দরজাটা খোলা।

নিশ্চয়ই সে আশেপাশে কোথাও গিয়েছে। আর যাবে কোথায়?

সতেরো বছর তার বয়স হল, আজ পর্যন্ত কখনো তো সে আমার সঙ্গ ছাড়া বাড়ির বাইরে পা দেয়নি মণি!

তার পর দু দিন ধরে সমস্ত লাহোর তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পান্নার সন্ধান পাওয়া গেল না। এবং তৃতীয় দিন ভোরে উঠে দেখলাম রুক্মিণী দেবীও নেই। ঘরে ঘরে তাঁর নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সব কিছু পড়ে আছে—কেবল তিনিই নেই। তাঁর ঘরে আমার নামে একটা চিঠি চাপা দেওয়া ছিল একটা জলের গ্লাস দিয়ে। চিঠিটায় লেখা: মণি, পান্নার খোঁজে চললাম। তাকে খুঁজে পাই ভালই, নচেৎ আর ফিরব না। এই বাড়িতে তুমি থেকো। আর বাক্সে কিছু টাকা রইল, প্রয়োজন হলে খরচ করতে দ্বিধা করো না। ইতি—

রুক্মিণী

তার পর?

তারপর আর কি—তারপর আমিও সেই বাড়ি ছেড়ে বার হলাম। এই কয় মাস ধরে তাদের কত খুঁজলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের খোঁজ পেলাম না। তাই এখন আমার মনে হয়, সে হয়তো আর বেঁচেই নেই। কোনদিনই আর তার খোঁজ পাব না।

শেষের দিকে মণিশঙ্করের গলাটা যেন কেমন বুজে এল। অন্যদিকে সে মুখ ফিরাল।

পাবেন তার খোঁজ মণিশঙ্করবাবু।

পাব! আপনি বলছেন পাব—পাব আবার পান্নাকে খুঁজে?

হ্যাঁ পাবেন। বিশ্বাস করুন আমি বলছি পান্না আপনার মরেনি। সে বেঁচেই আছে।

বলছেন? আপনি বলছেন সে আজও বেঁচে আছে? পাব আবার তাকে ফিরে?

নিশ্চয়ই, পাবেন বৈকি। নইলে এতবড় ভালবাসাটাই যে মিথ্যে হয়ে যাবে মণিশঙ্করবাবু। আপনার ঐ ভালবাসাই পান্নাকে তার জীবনের সমস্ত দুর্যোগ, সমস্ত বিপদ থেকে আগলে রাখবে। কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে বোধ হয় কোন একটা স্টেশন আসায় গাড়ির গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এসেছিল। এবং গাড়ি থামতেই হঠাৎ মণিশঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে স্টেশনে নেমে গেল এবং এত অকস্মাৎ নেমে গেল যে কিরীটী বুঝে উঠে বাধা দেবারও যেন অবকাশ পেল না। তবু তাড়াতাড়ি কিরীটী খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, মণিশঙ্করবাবু! মণিশঙ্করবাবু!

কিন্তু কোথায় মণিশঙ্করবাবু! স্টেশনের জনতার মধ্যে কোথাও তাঁকে আর দেখাই গেল না। বৃথাই কিরীটী মণিশঙ্করের খোঁজে ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছিল। মাত্র এক মিনিট স্টপেজ সেখানে।

গার্ডের হুইসেল শোনা যায়। জ্বলে ওঠে সাঙ্কেতিক সবুজ বাতি। গাড়ি চলতে শুরু করে আবার।

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি এসে গন্তব্য স্টেশনে দাঁড়াল। কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে নেমে পড়ল। সকালেই কিরীটী ডাঃ ঘোষালকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল ঐ রাত্রে তার রতনগড়ে পৌছানোর সংবাদ দিয়ে। স্টেশনে নেমে কিরীটী দেখল ডাঃ ঘোষাল তার টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং নিজে না আসতে পারলেও কোচোয়ানকে দিয়ে তাঁর টমটমটা স্টেশনে পাঠাতে ভোলেননি।

সংবাদটা পেয়ে কিরীটী তথাপি কিছুটা আশ্বস্ত হল। নইলে হেঁটেই তাকে ঐ রাত্রে হয়তো ঐ দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করতে হত।

কোচোয়ান বললে, ডাক্তারবাবু অসুস্থ, তাই তিনি নিজে আসতে পারেননি।

কি হয়েছে ডাক্তারবাবুর?

কাল থেকে বোখার। বুকে ব্যথা।

সামনে দীর্ঘ আট মাইল পথ। কিরীটী নিশ্চিন্তে একটা সিগার ধরিয়ে বেশ জুত করে আরাম করে বসল টমটমের উপর। মনের মধ্যে তার মণিশঙ্করের মুখখানাই ভেসে উঠছিল বার বার। এবং মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্বে মণিশঙ্করের মুখে শোনা রুক্মিণী-কাহিনীই মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল তখনো।

রুক্মিণীর গর্ভজাত কন্যা পান্না!

অথচ রুক্মিণী পান্নার জন্মদাতার কোন সত্য পরিচয় জানে না। এ কি করে সম্ভব? একজনকে সে ভালবেসে তার দেহমন সর্বস্ব দিল নিঃশেষে, অথচ তার পরিচয়টুকু

ল না, এ কেমন রহস্য ? না, জানতে চেয়েও জানতে পারে নি সে ? রুক্মিণীর মত মতী নারী তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে তাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে কি রুক্মিণীর বন-কলঙ্কেরই ফুল ঐ পান্না ? না—তাও যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। থায় যেন একটা গোলমাল আছে।

তার পর পান্না—সেই বা অমন আচমকা নিরুদ্দেশ হল কেন ?

না, রত্নগড়-রহস্যটা প্রায় মিলে আসছিল, হঠাৎ মাঝখান থেকে যেন রুক্মিণীর তীত ইতিহাস বিশ্রী একটা জট পাকিয়ে তুলল।

কি রুক্মিণীর অতীত ইতিহাস ?

কে রুক্মিণী ? কী তার সত্যকারের পরিচয় ?

ডাক্তারের বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে টমটম এসে প্রবেশ করতেই দরজা খুলে লো হাতে ডাক্তার-গৃহিণী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

কিরীটী টমটম থেকে নেমে বারান্দায় এসে উঠে হাত তুলে নমস্কার জানাল, ব অাপনাদের বিরক্ত করতে এলাম মিসেস ঘোষাল।

না না, এ তো আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। একা একা এই ন্ধব-বর্জিত দেশে পড়ে থাকি। কেউই তো আসে না। কেউ এলে তো আমরা ত স্বর্গ পাই।

কিন্তু কোচোয়ানের মুখে শুনলাম ডাঃ ঘোষালের জ্বর—কী ব্যাপার ?

ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ সর্দি-কাশি হয়। বুকেও একটু ব্যথা হয়েছে। জ্বরও আছে। টনি আপনার তার পেয়ে নিজেই স্টেশনে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমিই যেতে ম না।

ছিঃ ছিঃ বেশ করেছেন।

আপনি আর দেরি করবেন না মিঃ রায়। হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমি তৎক্ষণে নার খাবারটা গরম করে আনি। আপনার পূর্বের ঘরেই আপনার সব ব্যবস্থা ই করে রেখে দিয়েছি।

হাতমুখ ধুয়ে কিরীটী খাবার ঘরের টেবিলে এসে বসল ; মিসেস ঘোষাল প্লেটে গরম খাবার এনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

আপনি কেন আর বসে থাকবেন মিসেস ঘোষাল, রাত অনেক হয়েছে, আপনি যান শুয়ে পড়ুন গে। কিরীটী মিসেস ঘোষালকে অনুরোধ জানায়।

না না, আপনি খেয়ে নিন।

বেশ, তাহলে বসুন আপনি। খেতে খেতে গল্প করা যাক।

মিসেস ঘোষাল কিরীটীর অনুরোধে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের অপ দিকে মুখোমুখি বসলেন।

আচ্ছা মিসেস ঘোষাল, আপনারা তো এখানে অনেকদিন আছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

রবিশঙ্করবাবুর মামা জগদীশনারায়ণ সিংহকে আপনি কখনো দেখেছিলেন?

আমি তো বাড়ির বাইরে বড় একটা বার হই না কিরীটীবাবু। কেবল আ মধ্যে মধ্যে ওঁর কাজকর্ম তেমন না থাকলে সন্ধ্যার পর কখনো-সখনো ওঁর সঙ্গে টমটে চেপে একটু-আধটু বেড়াতে বার হতাম। সেই সময় একদিন ফিরবার মুখে দূর থে জগদীশনারায়ণকে দেখেছিলাম। ঘোড়ায় চেপে তিনি যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। উ বললেন, ঐ জগদীশনারায়ণ সিংহ। সে এত অস্পষ্ট যে না দেখারই মত।

ডাক্তারবাবু বুঝি বড় একটা ওই রতনগড়ের লোকজনদের সঙ্গে মেলামে করতেন না?

না।

মুরলীনারায়ণ সিংহও শুনেছি দুর্ধর্ষ লোক ছিলেন তাই না?

হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। বছর দশ আগে মুরলীনারায়ণ তখনো জীবি সেই সময় একদিন সন্ধ্যার সময় কি কারণে জানি না ওঁকে মুরলীনারায়ণ রতন প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাই নাকি! তার পর ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন বোধ হয়?

হ্যাঁ। কিন্তু ফিরে যখন এলেন তখন সমস্ত মুখখানা যেন থমথম করছে।

আপনি জিজ্ঞাসা করেননি কিছু?

না, সাহস হয়নি সে সময় ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

পরেও কখনো জিজ্ঞাসা করেননি?

না। এখানে আমরা প্রায় কুড়ি বছর আছি, কিন্তু উনি বোধ হয় ঐ প্রথম ঐ শেষ রতনগড় প্যালেসে গিয়েছিলেন।

আচ্ছা মিসেস ঘোষাল, আপনি জানেন কিছু, এত জায়গা থাকতে ডাঃ ঘো এখানে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে এসেই বা প্র্যাকটিস্ শুরু করলেন কেন?

চিরদিন উনি একটু নির্জনতা ও শান্তিপ্রিয়, তাই পাস করবার পর কলকা ভাল চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও, সে চাকরি না নিয়ে এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু কর স্বাধীন ভাবে।

॥ বারো ॥

খনও ভোরের আলো চারিদিকে ভাল করে জাগেনি। পরের দিনের রাত্রিশেষ ও নের শুরুর সন্ধিক্ষণ।

অস্পষ্ট একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে প্রকৃতির বুকে।

কিরীটীর ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল।

বহুদূর হতে অস্পষ্ট ভেসে আসছে স্বপ্নের খেয়াতরী বেয়ে একটি বহু-পরিচিত ানের সুর।

প্রথমটায় অস্পষ্ট—তার পর একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কে যেন এস্রাজ বাজিয়ে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছে—অদ্ভুত সুরেলা মিষ্টি ঠে:

আমার জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছ দান—

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ

গলাটা পুরুষের এবং ভাব-গম্ভীর ভরাট। তবু অদ্ভুত একটা মিষ্টতা আছে সে লায়।

আছে সত্যিকারের দরদ।

কে গায়?

শয্যা থেকে না উঠে শুয়ে মুদ্রিত চোখে শুনতে লাগল সেই গান কিরীটী।

তার পর একসময় ধীরে ধীরে থেমে গেল গান।

আরো একটু বেলা হলে হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে দেখল মিসেস ঘোষাল াচের টি-পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালছেন আর উল্টোদিকে চেয়ারে বসে আছেন াঃ ঘোষাল।

ডাক্তারের চেহারার মধ্যে যেন একটা বিষণ্ণ ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

দুজনেই একসঙ্গে কিরীটীকে আহ্বান জানালেন, আসুন মিঃ রায়।

কিরীটী একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, আপনার প্রতি মামার কিন্তু একটা অভিযোগ আছে ডাঃ ঘোষাল।

অভিযোগ! সবিস্ময়ে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার আপনি আমার কাছে গোপন করেছেন!

গোপন করেছি? ডাক্তারের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হ্যাঁ, এর আগের বার তো একবারও আপনি বলেননি যে, আপনি এত সুন্দর গান গাইতে পারেন ?

সমস্ত আশঙ্কা মুহূর্তে কেটে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ততায় ডাক্তারের মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বললেন, তাই বলুন! আপনি যেভাবে শুরু করেছিলেন আপনার কথা, আমি তো ভেবেছিলুম বুঝিবা না-জানি কি আপনার কাছে গোপন করে গেছি।

কিন্তু আপনিই বলুন, সত্যই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের নয় কি ?

ডাঃ ঘোষাল নিঃশব্দে হাসতে থাকেন।

হাসছেন আপনি।

কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ?

ও এমন জিনিস যে কষ্ট করে জানতে হয় না ডাঃ ঘোষাল। ফুলের গন্ধকে আপনি কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবেন ? বাতাসই যে তাকে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আজ আর দাবা নয়। আজ রাত্রে শুনব আপনার গান। ডাক্তার কিন্তু কিরীটীর শেষের কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। আচমকা ডাক্তারের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ায় কিরীটী যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

ডাক্তার-গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু সঙ্কুচিত কণ্ঠে ডাকে কিরীটী, মিসেস ঘোষাল!

মিসেস ঘোষালও বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কিরীটীর ডাকে হঠাৎ চমকে উঠে বলেন, অ্যাঁ! আমাকে কিছু বলছেন কিরীটীবাবু ?

হ্যাঁ, আচ্ছা ডাঃ ঘোষাল হঠাৎ অমন করে উঠে চলে গেলেন, অজ্ঞাতে ওঁর মনে কোন রকম আঘাত দিইনি তো ?

না না—আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়, উনি হয়তো এমনি—

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, একটা সত্যি কথা বলব মিসেস ঘোষাল ?

কি ?

মনে হচ্ছে আপনিও যেন আমার কাছে কিছু গোপন করছেন!

না না—সেরকম কিছু নয় মিঃ রায়।

মিসেস ঘোষাল কণ্ঠে একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে মুখে কিছু না বলে কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, আর কারো পক্ষে ধরা কষ্টকর হলেও কিরীটীর পক্ষে কষ্টকর হয় না।

কিন্তু সে কোনরূপ আর পীড়াপীড়ি করে না।

চায়ের কাপটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে তাতেই মনোনিবেশ করে।

কিরীটীর প্রশ্নে ডাঃ ঘোষালের অকস্মাৎ অমনি করে ঘর ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপার-কিরীটীর সমস্ত চিন্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে একটা আবর্ত রচনা করে ফিরতে লাগল। অল্প কয়েক দিনের আলাপ হলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল, তে সেই ঘনিষ্ঠতার দিক থেকেও কিরীটী ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে, ডাক্তারের কর্তব্য-ব্যস্ত মনের কোন এক নিভৃতে অমন একটি সুন্দর শিল্পী-সত্তা ঘুমিয়ে ছে। এবং আজ শেষরাত্রের দিকে আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গিয়ে সেই সংবাদটুকু জানবার থেকেই যেন কিরীটী ডাঃ ঘোষালের চরিত্রের অন্য একটি দিকের সহসা সন্ধান য়েছিল। ডাঃ ঘোষালের কণ্ঠস্বর ও গান শুনে কিরীটী এটা বুঝেছিল নিজে একজন তে রসজ্ঞ হয়ে যে, এককালে ডাক্তারের সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। এবং দীর্ঘদিন চর্চাই শুধু নয়, সঙ্গীত সম্পর্কে যথেষ্ট দরদ ও সেই সঙ্গে সাধনা ও শক্তি না থাকলে উ অমন তাল, লয় ও সুর দিয়ে গাইতে পারে না।

সাধারণ অন্যান্য দশজন সঙ্গীতপ্রিয়র মত অবসর সময় গুনগুন করে কোন একটি গানের দু-চার লাইন গাওয়া নয়। চর্চা ও সাধনা-লব্ধ কণ্ঠও সুর দিয়ে গাওয়া গান। কিন্তু এমন করে যে একদিন চর্চা করেছে বা সঙ্গীতের সাধনা করেছে, সে আজ গায় না কেন? কেন সে আজ সঙ্গীতকে ভুলতে চায়?

সাধারণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ সেই ব্যাপারটাই কিরীটীর মনেরমধ্যে চিন্তার ঝড় তুলেছিল। কিন্তু আপাতত কিরীটীকে উঠতেই হল। তার এই কয়দিনের অনুপস্থিতে তার স্রোত অন্য কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে কিনা তারও একটা অনুসন্ধান য়া প্রয়োজন মথুরাপ্রসাদের কাছ থেকে।

ডাক্তার-গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, উঠছেন? কোথাও বের হবেন নাকি?

হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি।

তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু।

ফিরব।

॥ তেরো ॥

টী জামাটা গায়ে দিয়ে থানার দিকে বার হয়ে পড়ল। মথুরাপ্রসাদের সঙ্গে একবার করা প্রয়োজন। সলিল সরকারের হত্যার ব্যাপারটার আর কোন নতুন সূত্র আবিষ্কৃত হয়ে থাকে ইতিমধ্যেই তার অনুপস্থিতিতে।

ঐদিনটা ছিল রবিবার। স্থানীয় হাটবার।

হাটুরে ও ব্যাপারীদের আনাগোনা, পথে আজ তাই একটু ভিড়। সপ্তাহে দু
এখানে হাট বসে—রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে।

মথুরাপ্রসাদ ঐ সময় থানাতেই ছিলেন। কিরীটীকে দেখে সানন্দ আহ
জানালেন, এই যে মিঃ রায়, আসুন, কবে এলেন ?

কাল রাত্রে। চেয়ারটা অতঃপর টেনে নিয়ে বসতে বসতে কিরীটী বলল, তার
এদিকে আর কোন নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?

নতুন খবর আর কি!

সলিল সরকারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সব মুভ্‌মেণ্টস্ ও আর সমস্ত সংবা
আপনাকে সংগ্রহ করতে বলেছিলাম, জেনেছেন কিছু ?

হ্যাঁ, কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি। জগদীশনারায়ণের বাপ মুরলীনারায়ণ সিং
আমল থেকেই সলিল সরকার রতনগড় স্টেটে কাজ করছিলেন। মুরলীনারায়ণের অ
প্রিয়পাত্র ছিলেন ঐ সলিল সরকার। এমনও শুনলাম মুরলীনারায়ণের সমস্ত ব্যাপা
ম্যানেজার সলিল সরকারই নাকি একপ্রকার দক্ষিণহস্ত, বা ব্রেনও বলতে পারেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কিন্তু বাপের সঙ্গে অমন একটা ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক থাকলেও ছেলে জগ
নারায়ণ কিন্তু সলিলকে বড় একটা পছন্দই করতেন না।

কেন ?

তা কিছু অবিশ্যি জানা যায়নি, তবে যে পাঁচ বছর জগদীশনারায়ণ পিতার মৃ
পর রতনগড়ের মালিকানা-স্বত্ব পেয়ে বেঁচেছিলেন, সলিলের প্রসার প্রতিপত্তি
দাপট অনেকটা সে সময়ে যেন কমে এসেছিল শোনা যায়। তারপর আবার রবি
গদিতে আসবার পর কিছুটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন নতুন করে ধীরে ধীরে।

লোকটা তো বিয়ে-থা করেনি শুনেছি, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনও কি কেউ কো
ছিল না ?

তারও বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে মনে হয় ত্রিসংসারে লোক
আপনার জন বলতে সত্যিই বোধ হয় কেউ ছিল না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কারণ দীর্ঘ আঠারো বছর লোকটা রতনগড় স্টেটে কাজ করছিল, কিন্তু
দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ যেমন তাকে একদিনের জন্যও রতনগড়ের বাইরে
দেখেনি, তেমনি কাউকে ওর সঙ্গে এখানে দেখা করতেও আসতে কেউ দেখেনি

কিন্তু এসব খবর আপনি সলিল সরকার সম্পর্কে সংগ্রহ করলেন কি করে দারোগা াহেব ?

ব্রজকিশোরবাবুর কাছ থেকে।

ব্রজকিশোর! সে আবার কে ?

ব্রজকিশোর পাঁড়ে—সে-ই তো ছিল সলিল সরকার আসবার পূর্বে রতনগড় স্টেটের ানেজার। হঠাৎ মুরলীনারায়ণ একদিন সলিলকে এনে ম্যানেজার করে ব্রজকিশোরকে াচ্যুত করে তাকে সেরেস্তার হেডক্লার্ক করে দিলেন।

তা লোকটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা হল কি করে ?

বলতে পারেন সেও এক মজার ব্যাপার। গতকাল সন্ধ্যার পরে ব্রজকিশোর ৷জেই আমার এখানে এসেছিলেন।

বটে। তা সে-ই বুঝি নিজে থেকে ঐসব কথাগুলো আপনাকে বললে ? কিরীটী দ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

না, সে এসেছিল অবিশ্যি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে! কিরীটীর চোখেমুখে সুস্পষ্ট বিস্ময়।

হ্যাঁ, সে জানত না যে আপনি কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন। তার পর আমিই ়কে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঐসব প্রশ্নগুলো করে জবাব নিয়েছি।

লোকটার সঙ্গে আর একবার দেখা হতে পারে না ? কোনমতে ওকে আর একবার এখানে ডাকিয়ে আনাতে পারেন দারোগা সাহেব ?

দেখি চেষ্টা করে, তবে আসবে কিনা সন্দেহ !

কেন ?

বুঝতেই তো পারছেন, রবিশঙ্কর কোনক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলে গুলি করে ারবে ব্রজকিশোরকে।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখুন। আমি আবার না-হয় সন্ধ্যার পরে একবার আসব।

বেশ।

প্রতিশ্রুতিমত সন্ধ্যার কিছু পরে কিরীটী আবার থানায় এলে মথুরাপ্রসাদ বললেন, ল না মিঃ রায়। তার পর আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, একটা চৌকিদারকে রতনগড় প্যালেসে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঘরের জানলা থেকে রবিশঙ্কর তাকে দেখতে পায় এবং সঙ্গে ঙ্গে দারোয়ানকে হুকুম করে পাঠায় চৌকিদারকে গলাধাক্কা দিয়ে প্যালেস-কম্পাউণ্ড

থেকে বার করে দিতে। বেচারী গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে।

কথাগুলো শেষ করে হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে মথুরাপ্রসাদ বললেন, উঃ, বেটা এক নম্ব
হারামজাদা, বুঝলেন মিঃ রায়, একেব নম্বরের হারামজাদা! কি করব বেটার টা
জোর আছে, নচেৎ আমিও ওকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতাম। কিন্তু কি অন্যায় ব
তো মিঃ রায়! লোকটা আজকের দিনে আইন, থানা, পুলিসকে এমনি করে অ
করবে, চোখ রাঙাবে, অথচ আমাদের কর্তারা বেমালুম সেটা হজম করে ওরই গি
সস্নেহে হাত বুলাবেন। সত্যি বলছি, ঘেন্না ধরে গেছে শালার এ পুলিসের কাজে

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, আপনি এই সামান্য ব্যাপারেই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন মথু
প্রসাদবাবু! ধনিক সম্প্রদায়ের স্বৈরাচারের এ তো একটা ছোট্ট দিক মাত্র। এ
সমস্ত ব্যবস্থায় এমনভাবে ঘুণ ধরেছে যে, মূলসমেত উপড়ে ফেলে নতুন করে বীজ
রোপণ করা পর্যন্ত এ চোরা-গোপ্তা সকলকে আমাদের হজম করতেই হবে।

কিরীটীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা ছায়া
নিঃশব্দে বারান্দার উপরে এসে উঠল।

কে? মথুরাপ্রসাদ চমকে প্রশ্ন করে।

দারোগাবাবু, আমি। ছায়ামূর্তি বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে আরো ক
এগিয়ে আসে।

অ রে কেও, ব্রজকিশোরবাবু? আসুন, আসুন। কিরীটীবাবু, এই সেইব্রজকি

নমস্কার। ব্রজকিশোর কিরীটীর দিকে হাত তুলে বললে।

নমস্কার। আসুন ব্রজকিশোরবাবু, আপনার কথাই এইমাত্র ওঁর সঙ্গে হচ্ছি
বসুন।

এখানে বসা ঠিক নিরাপদ হবে না কিরীটীবাবু। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেই
হয়। রবিশঙ্করের চোখে যদি কোনক্রমেই পড়ে যাই, কাল সকালে আর সূর্যের
আমাকে দেখতে হবে না।

বেশ তাই চলুন না কিরীটীবাবু, আমরা ঘরের মধ্যে গিয়েই বসি। কথ
বললেন মথুরাপ্রসাদ।

চলুন।

সকলে এসে থানার অফিসঘরে ঢুকলেন।

একটা রেক্ট্যাংগুলার টেবিল। টেবিলের উপরে কাগজপত্র সব ছড়ানো। একপ
একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল, মথুরাপ্রসাদ তার শিখাটা একটু উসকে দিলেন।

ঘরটা এবারে স্পষ্ট আলোকিত হয়ে উঠল।

মথুরাপ্রসাদ ও কিরীটী দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে মথুরাপ্রসাদ বললেন, বসুন ব্রজকিশোরবাবু।

ব্রজকিশোর বসলেন।

ল্যাম্পের আলোয় কিরীটী ব্রজকিশোরের মুখের দিকে তাকাল। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। মাথার চুল বেশ বিরল হয়ে এসেছে এবং তা'র তিনের চার অংশই সাদা হয়ে গিয়েছে। কপালে ও গালে বয়সের বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাকটা একটু চাপা, ছোট ছোট কুতকুতে চোখে শিকারী বিড়ালের সর্তক চাউনি।

কথা বলে কিরীটী প্রথমে, কাল রাত্রে আপনি এখানে এসেছিলেন শুনলাম ব্রজকিশোরবাবু দারোগা সাহেবের মুখে!

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—ব্রজকিশোরবাবু এবারে মথুরাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আজ প্যালেসে হঠাৎ চৌকিদার পাঠাতে গেলেন কেন বলুন তো?

আপনাকেই একবার এদিকে আসবার জন্য তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম। বললেন মথুরাপ্রসাদ।

খুব অন্যায় করেছেন। ব্যাপারটা আমিও অবিশ্যি আন্দাজ করেছিলাম।

ব্রজকিশোরের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে কতকটা বোকার মতই মথুরাপ্রসাদ যেন প্রশ্ন করলেন, অন্যায় করেছি?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ধূর্ত রবিশঙ্কর সন্দেহমাত্র করলেই আপনার চৌকিদারটিকে গুলি করে তো মারতেনই, সেই সঙ্গে আমাকেও জ্যান্ত মাটিতে গোর দিতেন। জানেন না তো আপনারা, ওঁর অসাধ্য কিছু নেই! মানুষের দেহে লোকটা একটি সাক্ষাৎ শয়তান।

কিন্তু ওসব কথা থাক ব্রজকিশোরবাবু! কাল আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন কেন বলুন তো? প্রশ্ন করে এবারে কিরীটী।

আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না রায়মশাই, সলিল সরকারকে খুন করেছে, আমার ধারণা ঐ রবিশঙ্করই।

কিন্তু আপনার এ ধারণার কারণ কি ব্রজকিশোরবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

দেখুন কিরীটীবাবু, সলিল সরকার লোকটাও অবিশ্যি যেমনি শয়তান তেমনি একের নম্বরের হারামজাদা ছিল এবং আমাদের সঙ্গেও কোনদিন বনিবনা হয়নি তবু লোকটার ঐভাবে মৃত্যু হোক তা কখনো চাইনি।

কেন বলুন তো? কিরীটী শেষোক্ত প্রশ্নটা করে ব্রজকিশোরের মুখের দিকে তাকাল।

তাহলে আপনাকে কথাটা খুলেই বলি। প্যালেসের বহির্মহলে সলিল সরকারের পাশের ঘরেই আমি থাকি। বয়স হয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সেরাত্রে হঠাৎ

খুট খুট একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট কে যেন পাশের ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে, বাইরে তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তার পরই দরজার খিল খোলার শব্দ পেলাম। মনের মধ্যে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। এত রাত্রে এই বৃষ্টির মধ্যে সরকার কোথায় বেরহচ্ছে, জানবার জন্য আমিও উঠে পা টিপে টিপে দরজার খিলটা খুলে বাইরের বারান্দায় উঁকি মারলাম। বারান্দার স্বল্প আলোয় দেখলাম, সলিল সরকার ঘর থেকে বের হয়ে সন্তর্পণে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা কথা ব্রজকিশোরবাবু, হঠাৎ কথার মাঝখানে বাধা দিল কিরীটী, সে সময় সলিলবাবুর গায়ে কোন চাদর ছিল? অর্থাৎ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েছিলেন কি তিনি?

বিস্মিত ব্রজকিশোর কিরীটীর প্রশ্নটা শুনে যেন কেমন হকচকিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, চাদর!

হ্যাঁ।

কই না তো। মনে তো পড়ছে না সেরকম কিছু দেখেছি বলে। গায়ে তার সর্বদা ব্যবহৃত বেনিয়ানটাই ছিল বলে মনে পড়ছে যেন আমার।

ওঃ আচ্ছা, তার পর বলে যান।

সলিল সরকার, ব্রজকিশোর আবার বলতে লাগলেন, সোজা বারান্দা অতিক্রম করে গেটের দিকে চলে গেলেন, আর ঠিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পদশব্দ অন্য দিক থেকে পেয়ে লক্ষ্য করে সেদিকে তাকাতেই দেখি, রবিশঙ্কর!

রবিশঙ্কর? কথাটা বলেন মথুরাপ্রসাদ।

হ্যাঁ রবিশঙ্কর, তার হাতে রাইফেল।

মথুরাপ্রসাদ বারেকের জন্য আড়চোখে ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে, কিন্তু কিরীটী তার সে ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে যেন কোন সাড়াই দিল না।

॥ চোদ্দ ॥

ব্রজকিশোর বলতে লাগলেন, রাইফেল হাতে রবিশঙ্করকে মনে হল যেন সলিল সরকারকেই অনুসরণ করলেন।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু সলিল সরকার যে সেরাত্রে বের হবেন রবিশঙ্কর জানতেন?

তা তো জানি না।

তবে কেমন করে বুঝলেন যে, রবিশঙ্কর সলিল সরকারকেই অনুসরণ করেছিলেন ঐ রাত্রে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয়নি কিরীটীবাবু। শুনলেই সব বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, বলুন।

আমিও ঘর থেকে বের হয়ে রবিশঙ্করকে নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম। বাইরে অন্ধকার, মেঘ করেছে, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন।

আমি যতদূর জানি, কিরীটী আবার বাধা দিল, রাত নটার পরই নাকি রতনগড় প্যালেসের লোহার গেট বন্ধ হয়ে যায়, তালা পড়ে যায়। তাই নয় কি ব্রজকিশোরবাবু?

হ্যাঁ, কিন্তু সে তালার চাবি তিনটি এবং তিনটি চাবি তিনজনের কাছে থাকত।

কি রকম?

হ্যাঁ, বরাবরের নিয়ম। একটি থাকে দারোয়ানের কাছে, একটি থাকত ম্যানেজার সলিল সরকারের কাছে ও তৃতীয়টি থাকে মালিকের জিম্মায়।

তাহলে গেট খোলাই ছিল আপনি দেখলেন সেরাত্রে?

হ্যাঁ।

বেশ তার পর বলুন!

অন্ধকারে পদশব্দ লক্ষ্য করে আমিও এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, তখন নজরে পড়ছিল হাত পনেরো-কুড়ি দূরে হনহন করে চলেছেন রবিশঙ্কর অন্ধকারেই। একে বুড়ো মানুষ, চোখেও ইদানীং ভাল দেখি না, পারব কেন জোয়ান মরদ রবিশঙ্করের সঙ্গে সমান তালে হেঁটে যেতে? তাই ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। অন্ধের মত চলেছি, অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে হোঁচটও খাচ্ছি। তার পর হঠাৎ অন্ধকারে বেটক্কর একটা পাথরের গায়ে এমন লাগল যে দাঁড়াতেই হল। এবং বেশীক্ষণ দাঁড়াতেও পারলাম না। বসে পড়লাম সেইখানেই। টনটন করছে পা-টা। এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল, সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখলাম। কিন্তু কাউকেই আর নজরে পড়ল না। বুঝলাম রবিশঙ্কর তখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। আর অন্ধের মত ঐ দুর্যোগের মধ্যে এগিয়ে যাওয়াও বোকামি। তাই ওইখানেই পথের একধারে স্থির করলাম মনে মনে, ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কারণ জানতাম ঐ একটি মাত্র পথ ছাড়া প্যালেসে ফিরবার দ্বিতীয় কোন আর পথ নেই। অপেক্ষা করে রইলাম সেইখানেই। বৃষ্টির বেগ এদিকে ক্রমেই বাড়তে লাগল। ভিজে সর্বাঙ্গ সপসপ করছে। ভিজে জামা-কাপড়ে ঠাণ্ডায় রীতিমত শীত-শীত করছে। শেষটায়

বৃষ্টির বেগ এত বৃদ্ধি পেল যে, আর ওভাবে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নঃ ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দুড়ুম দুড়ুম করে পর পর দুটো বন্দুকের আওয়াজ কা এল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হল বোধ হয় কোথাও। কিন্তু আর আমি অপেক্ষা করলা না, ভিজতে ভিজতেই ফিরে এলাম প্যালেসে। ঘরেএসেজামা-কাপড় বদলিয়ে দরজ কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওদের প্রত্যাগমনের। প্রায় আধ ঘণ্টারও পা পদশব্দ শোনা গেল বারান্দায়। দরজা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখি, বারান্দা দি রাইফেল হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন রবিশঙ্কর অন্দরের দিকে। সর্বাঙ্গ তাঁর ভিজে সপস করছে। রবিশঙ্কর ফিরে এলেন বটে, কিন্তু তার পরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে জে রইলাম, সলিল সরকার কিন্তু ফিরে এলেন না। এবং পরের দিন সকালে শো গেল, কে নাকি সলিল সরকারকে গুলি করে হত্যা করেছে। তার মৃতদেহ বড় রাস্তা ওপরে পাওয়া গেছে। তাই তো বলছিলাম, এ আর কারো কাজ নয়, আমি হল করে বলতে পারি দারোগা সাহেব, এ সেই খুনে রবিশঙ্করেরই কাজ। রবিশঙ্কর ম্যানেজারকে খুন করেছে।

কিন্তু রবিশঙ্করবাবুই বা হঠাৎ সলিল সরকারকে হত্যা করতে যাবেন কেন ব্র কিশোরবাবু? প্রশ্ন করে কিরীটী এবারে।

কেন? তারও কারণ আছে বৈকি! ছোট কর্তা জগদীশনারায়ণের মৃত্যুর প রবিশঙ্কর যখন সামান্য দূর-সম্পর্কের জোরেই উড়ে এসে রতনগড়ের গদিতে চে বসলেন, তখন ঐ ম্যানেজার যে আদপেই ব্যাপারটা সুচক্ষে দেখেনি সেটা তো বুঝা কারুরই আমাদের বাকি ছিল না কিরীটীবাবু।

কিন্তু কেন? জগদীশনারায়ণও যখন অবিবাহিত এবং সিংহদের বংশে নিকট কেউ আর ছিল না, সম্পত্তির দাবিদার হিসাবে তখন রবিশঙ্করের দাবিই তো অগ্র এবং আইনও তাই মেনে নেবে।

আপনি যা বলছেন তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তবু মনে হয় সলিল সরকার রবিশ বাবুকে রতনগড়ের গদিতে সহ্য করতে পারছিলেন না এবং তার নিশ্চয়ই কোন এ কারণ ছিল।

কারণ ছিল? কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

আমার তো তাই মনে হয়। যদিও ব্যাপারটা আমি ভাল করে জানি না, ত রাগের মাথায় মাত্র কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন ম্যানেজার সলিল সরকারকে অস্প ভাবে বলতে শুনেছিলাম, রাজত্ব করা ঘোচাচ্ছি, দাঁড়াও যাদু, আমীরি করা তোম ঘোচাচ্ছি!

আর কিছু আপনি জানেন না ?

না।

আচ্ছা ব্রজকিশোরবাবু, পান্না নামে কোন মেয়ের কথা কখনো রতনগড় প্যালেসে কারো মুখে শুনেছেন ? কিরীটী শুধাল।

পান্না ! বিস্মিত ব্রজকিশোর কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ পান্না—বা হীরা-চুনি দুটি নাম শুনেছেন ?

হীরা—চুনি ! নাম দুটো অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করতে করতে কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান ব্রজকিশোর। তার পরই হঠাৎ মুখটা তাঁর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে রবিশঙ্করের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে রাত্রে কালো ঢ্যাঙা মত একজন লোককে দেখা করতে আসতে দেখেছি। লোকটা এলেই খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ডাক পড়ত একেবারে রবিশঙ্করের খাস কামরায়। একবার সেই লোকটা এসেছে, এমন সময় ম্যানেজারের হুকুমে একটা দরকারী ভাউচার নিয়ে সই করবার জন্য রবিশঙ্করের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, মনে পড়ে, শুনে ছিলাম যেন ঐ দুটি কথা। হীরা আর চুনি—বার দুই ! কিন্তু তখন তো ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারিনি।

আর কিছু শুনতে পাননি ?

না। শোনবার চেষ্টাও করিনি। কারণ সত্য কথা বলতে কি, হীরা-চুনি কথা দুটো শুনে ঐ সময়ে মনে আমার কোন কৌতূহলই জাগেনি।

আচ্ছা একটা কথা ব্রজকিশোরবাবু, রবিশঙ্করবাবু রতনগড়ের গদিতে বসবার আগে কখনো কি রতনগড়ে এসেছেন ?

হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে আসতেন বৈকি। রবিশঙ্কর আর ছোট কর্তা আমাদের জগদীশ-নারায়ণ যে মাত্র চার-পাঁচ বছরের ছোট-বড় ছিলেন। এবং শুনেছি রবিশঙ্করের ও জগদীশনারায়ণের মধ্যে বেশ ভাবও ছিল।

জগদীশনারায়ণবাবু রতনগড়ের গদিতে বসবার পর রবিশঙ্কর রতনগড়ে আর আসেননি ?

হ্যাঁ, বারতিনেক এসেছিলেন, তবে শেষবার এসেছিলেন জগদীশনারায়ণের মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে।

আচ্ছা, আপনাদের জগদীশনারায়ণের মৃত্যুর ব্যাপারটা শুনেছি—

হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণটা আজও কেউ জানে না। তবে আমার মনে হয়, মৃত্যুটা আদপেই স্বাভাবিক নয়।

একটা কথা ব্রজকিশোরবাবু, আপনিই তো সলিলবাবুর আগে স্টেটের ম্যানেজার

বলুন, সিংহ পরিবারের এমন কোন অতীত ঘটনা আছে কি, যা সাধারণ লোকেরা জানে না, সযত্নে গোপন করা হয়েছে বলে জানেন?

কই এমন তো কোন ঘটনার কথা আমি জানি বলে মনে পড়ে না!

আচ্ছা শুনেছি মুরলীনারায়ণ ও তস্য পুত্র জগদীশনারায়ণের মধ্যে বিশেষ বনিবনা নাকি ছিল না, কথাটা সত্যি?

হ্যাঁ।

কেন, কিছু তা জানেন? কি নিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে অমিল ছিল?

আপনি যে সময়ের কথা বলছেন কিরীটীবাবু, তখন আমার ম্যানেজারী নেই। আমাকে স্টেটের হেডক্লার্ক করে দিয়েছেন মুরলীনারায়ণ। তবে কানা-ঘুষায় দু একবার শুনেছি, জগদীশনারায়ণ বিবাহে সম্মত হচ্ছিলেন না বলেই নাকি পিতা-পুত্রের মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হয়েছিল।

বিবাহ করতে জগদীশনারায়ণ রাজী হচ্ছিলেন না কেন? অন্য কাউকেই—মানে কোন প্রেমের—

তা জানেন না বুঝি—কিন্তু ব্রজকিশোরের কথা শেষ হল না, ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

ব্রজকিশোরবাবু!

বজ্রগম্ভীর সেই ডাক শুনে যুগপৎ তিনজনেরই ছয় জোড়া চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল পশ্চাতের দিকে।

হাত দুয়েক মাত্র ব্যবধানে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রবিশঙ্কর। পরিধানে তাঁর ব্রিচেস। হাতে বিনুনি করা সেই ঘোড়া হাঁকাবার চামড়ার কালো চাবুকটা।

বেচারী ব্রজকিশোরের অবস্থাটা তখন বর্ণনাতীত। সমস্ত মুখ তাঁর ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর শুনেই ভদ্রলোক বিদ্যুৎবেগে চেয়ার দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। ঠক্ ঠক্ করে তিনি তখন বংশপত্রের মতই কাঁপছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ব্রজকিশোরবাবু যে এতবড় স্পর্ধা, এত বড় দুঃসাহস আপনার কি করে হল? আমার ঘরে বসে আপনি আমারই ঘরে সিঁদ দেবেন?

ব্রজকিশোরবাবুর অবস্থার চাইতে বেশী কিছু উন্নততর তখন অবস্থা ছিল না মথুরাপ্রসাদের নিজের। সেও তখন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। এবং সেই আকস্মিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতির মধ্যে একমাত্র যে নার্ভ হারায়নি সে হচ্ছে কিরীটী। সে-ই প্রথমে কথা বলল, আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন রবিশঙ্করবাবু—

কিরীটীর বক্তব্য শেষ হবার পূর্বেই যেন অকস্মাৎ একটা থাবা দিয়েই কিরীটীর

বক্তব্যটা থামিয়ে দিলেন রবিশঙ্কর। বললেন, কিরীটীবাবু, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—অনধিকার চর্চা আমি সহ্য করব না। আপনি দেখছি ক্রমেই সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। কথাটা বলেই ঘুরে তাকালেন মথুরাপ্রসাদের দিকে এবং বললেন, মথুরাপ্রসাদবাবু, আপনার পূর্ববর্তী এখানে যিনি ছিলেন, তার ইতিহাসটা যদি আপনার না জানা থাকে তো এখানকার কাউকে জিজ্ঞাসা করে শুনে নেবেন। আর তাতেও যদি আপনার সন্দেহ না মেটে তো আপনার পূর্ববর্তী ভদ্রলোক বর্তমানে মুঙ্গেরে আছেন শুনেছি, আমিই পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দেব, গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসবেন তার পৃষ্ঠদেশটা। নিশ্চয়ই আমার দারোয়ানের নাগরার দাগগুলো এখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি!

কথাটা শেষ করে দ্রুত পদভরে এগিয়ে এলেন রবিশঙ্কর ব্রজকিশোরের কাছে এবং শক্ত মুষ্টিতে তার একটা হাত চেপে ধরে দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তাকে একপ্রকার টেনেই টানতে টানতে হিড়হিড় করে।

একটু পরেই বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

রবিশঙ্কর প্রস্থান করলেন।

ঘরের মধ্যে মথুরাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে তখনও মূহ্যমান, নির্বাক।

হঠাৎ তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরে এল একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার শব্দে। দেখলেন কিরীটী তার পাইপের নিবন্ত তামাকে অগ্নিসংযোগ করছে।

॥ পনেরো ॥

উঃ, বড্ড বাঁচা বেঁচে গিয়েছি! মথুরাপ্রসাদ একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বললেন।

কিরীটী এবারে কথা বলল, সদরে আপনাদের পুলিস সাহেব মিঃ হসকিনকে একটা চিঠি দেব, সেটা এক্ষুনি আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে মথুরাপ্রসাদ-বাবু, পারবেন?

হসকিনের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি? বিস্মিত মথুরাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন।

সে কথা পরে শুনবেন। আগে একটা চিঠির কাগজ আনুন দেখি।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরটাও বোধহয় একটু পরিবর্তিত হয়েছিল। মথুরাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি খানিকটা সাদা কাগজ ও দোয়াত-কলম এগিয়ে দিলেন নিঃশব্দে কিরীটীর সামনে।

খস্ খস্ করে একখানা চিঠি লিখে খামের মধ্যে ভরে নাম ঠিকানা লিখে কিরীটী বললে, কই, ডাকুন দেখি, কোন্ লোক আপনার যাবে! এবং কথাটা শেষ করে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, এখন রাত সাড়ে আটটা—রাত বারোটা কুড়ি মিনিটের

ডাকগাড়ি যাতে ধরে সদরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন।

ঘোড়া আছে থানায়। শচীনন্দনকেই পাঠাচ্ছি, চালাক-চতুর আছে ছেলেটা, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। বলতে বলতে মথুরাপ্রসাদ ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

একটু পরেই কিরীটীর পরামর্শমত তার লেখা চিঠিখানা শচীনন্দনকে ডেকে এনে তার হাতে তুলে দিয়ে মথুরাপ্রসাদ বললেন, শচীনন্দন, আমার ঘোড়া নিয়ে সোজা তুমি স্টেশনে চলে যাও। ডাকগাড়ি ধরে সদরে গিয়ে এস-পি সাহেবকে এই চিঠিখানা দিয়ে তাঁর জবাব নিয়ে আসবে। স্টেশনমাস্টার হরিশ চাটুযোর কাছে ঘোড়াটা রেখে যেও।

জি সাব্!

শচীনন্দন ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

কিরীটীর হাতের পাইপটা ইতিমধ্যে কখন এক সময় অন্যমনস্কতায় নিবে গিয়েছিল, সেটার মধ্যে আবার খানিকটা টোবাকো পুরে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, রাত হয়েছে, আমিও চললাম দারোগা সাহেব আজকের মত।

আপনিও যাবেন? মথুরাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন।

মথুরাপ্রসাদের গলার স্বরেই কিরীটী তাঁর প্রশ্নের তাৎপর্যটা বোধহয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই, রবিশঙ্কর আপনার পূর্বতন অফিসারকে নাগরাপেটা করলেও, এবারে আপনার গায়ে হাত দেবার আগে অন্ততঃ সে দশবার ভাববে।

কিন্তু—

চললাম, কাল আবার দেখা হবে। বলে দ্বিতীয় কোন কথা আর না বলে এবং মথুরাপ্রসাদকেও কোন কথা বলবার আর অবকাশ না দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল কিরীটী।

অন্ধকার নির্জন রাস্তা ধরে কিরীটী মন্থর পদে ডাঃ ঘোষালের বাংলোর দিকে হেঁটে চলল। থানায় ক্ষণপূর্বে রবিশঙ্করের আকস্মিক আবির্ভাবে কিরীটী নিজেও প্রথমটায় কম উত্তেজিত হয়ে ওঠেনি। আচমকা রবিশঙ্কর যে কখন ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাও আদৌ টের পায়নি। এবং রবিশঙ্করের আকস্মিক আবির্ভাবেই ব্রজকিশোর পাণ্ডের শেষ কথাগুলো আর শোনা হল না। বাধা পড়ল। ফলে ঘটনা যা দাঁড়াল, এরপর ব্রজকিশোরের সেই অসমাপ্ত বক্তব্যটুকু যে ভবিষ্যতে কখনো সহজে শোনা যাবে, তারও সম্ভাবনা এখন সুদূরপরাহত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অতীব ধূর্ত এবং সর্বদা সজাগ রবিশঙ্কর লোকটা। এবং কিরীটীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। ব্রজকিশোর আর যাতে তার মুখোমুখি না পড়ে, অতঃপর রবিশঙ্কর বিশেষ

ভাবেই সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহে সতর্ক থাকবে। কিন্তু কি এমন কথা ব্রজকিশোর জগদীশনারায়ণ সম্পর্কে বলতে উদ্যত হয়েছিল? এবং যা সে রবিশঙ্করের জন্যই শেষ করতে পারল না? কিন্তু সে যাই হোক, ব্রজকিশোরের আরও কিছু বক্তব্য ছিল যেটা অতর্কিতে বাধা পড়ায় শেষ পর্যন্ত জানা হল না তার।

আরো একটা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ব্রজকিশোরের কথায়, ঢ্যাঙা কালো মতন একজন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে রবিশঙ্করের সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে আসত। কে সে? এলেই সোজা একেবারে রবিশঙ্করের খাস কামরায় ডাক পড়ত। সাধারণতঃ রবিশঙ্করের সঙ্গে কারো দেখা হওয়াটাই ছিল একটা আশ্চর্য ব্যাপার। দর্শন মেলাই তার ভার। অথচ কালো ঢ্যাঙা মত সেই লোকটির ছিল রবিশঙ্করের ঘরে আসামাত্রই প্রবেশাধিকার। এবং সেই লোকটিই একদিন রবিশঙ্করের ঘরে থাকাকালীন সময়ে, সে ঘরে অকস্মাৎ একটা ভাউচার সই করাতে প্রবেশ করতেই ব্রজকিশোরের কানে এসেছিল 'হীরা-চুনি' কথা দুটি।

হীরা-চুনির গোপন রহস্যের সঙ্গে কি তাহলে সেই কালো ঢ্যাঙা মত লোকটি জড়িত? এবং রবিশঙ্করও তাহলে মনে হচ্ছে, তার কাছে মিথ্যা কথাই বলেছেন। হীরা-চুনির ব্যাপার তিনি জানেন। জানেনই যদি তো গোপন করে গেলেন কেন সে কথাটা কিরীটীর কাছে?

তবে কি হীরা-চুনির গোপনে গোপনে সন্ধান করছেন রবিশঙ্কর? তাই যদি হবে তো হীরা-চুনির সন্ধান তিনি পান্নার মতই জানেন না। এবং সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে সংবাদ-পত্রে একমাত্র পান্নার নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিয়ে হীরা-চুনি সম্পর্কে গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন?

আরো একটা কথা, হীরা চুনি ও পান্নার মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক কি? আর কিভাবে তারা ঐ রতনগড়ের সিংহ-পরিবারের সঙ্গে জড়িত? কোন্ সূত্রে বা কোন্ অধিকারে তারা রতনগড় স্টেটের ন্যায্য অধিকারী?

ম্যানেজার সলিল সরকার ব্যাপারটার সমস্ত কিছু না হলেও কিছু যে জানতই, সে বিষয়েও কিরীটীর সন্দেহমাত্র এখন আর নেই। প্রথমটায় কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে হীরা-চুনি সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য প্রকাশ না করার মধ্যে সলিল সরকার সম্পর্কে কিরীটী নিজের মনে মনে যে ধারণা বা যুক্তি গড়ে তুলেছিল, পরে আকস্মিকভাবে সে নিহত হওয়ায় অদৃশ্য আততায়ীর হাতে, সে যুক্তির বাঁধনটাও শিথিল হয়ে গিয়েছে। যে যুক্তির উপরে সলিল সরকারের ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতিটা তার কাছে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল, এখন আর সে যুক্তির উপরে সে নির্ভর করতে পারছে না।

আচমকা সলিল সরকারের হত্যার ব্যাপারটা যেন সব কেমন এলোমেলো করে দিয়ে গিয়েছে। তাই সলিল সরকারের হত্যার কারণ অর্থাৎ মোটিভটা যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছে, হীরা-চুনি-পান্না রহস্যের হারানো সূত্রটাও সে যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

আবার মনে হয়, বর্তমানে সলিল সরকারের হত্যার উদ্দেশ্যটা বাদ দিয়ে যদি হত্যাকারীকেই খুঁজে পাওয়া যেত, তাহলেও হয়তো উদ্দেশ্যটার কিছু একটা আঁচ পাওয়া যেত।

সলিল সরকারের হত্যাকারী! হ্যাঁ, সর্বাগ্রে তাকেই খুঁজে বার করতে হবে। কে হতে পারে সলিল সরকারের হত্যাকারী? কার—কার পক্ষে সেই ঝড়-জলের রাত্রে সলিল সরকারকে হত্যা করা সম্ভব ছিল? সলিল সরকার বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং মথুরাপ্রসাদের কাছ থেকে যতদূর জানা গেছে, এখানে বন্দুক আছে তিন-চারজনের। সলিল সরকার সেই ঝড়-জলের রাত্রে রাস্তার মধ্যে নিহত হয়েছেন যখন, তখন একটা ব্যাপার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে কারণেই হোক, সলিল সরকার ঐ ঝড় জলের রাত্রেও রতনগড় প্যালেসের বাইরে এসেছিলেন। এবং সেই ঝড়-জলের রাত্রে বাড়ির বাইরে বার হয়েছিলেন যখন, তখন এও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই তিনি বার হয়েছিলেন। আর উদ্দেশ্যটা যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। ব্রজকিশোর বর্ণিত কাহিনী যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এও ঠিক যে, সেরাত্রে সলিল সরকারকে অনুসরণ করেছিলেন স্বয়ং রবিশঙ্কর। এবং শুধু অনুসরণই নয়, তাঁর হাতে বন্দুকও ছিল। তার পর ব্রজকিশোর একমাত্র রবিশঙ্করকেই রতনগড় প্যালেসে ফিরে যেতে লক্ষ্য করেছে। ঘটনাকে সাধারণভাবে বিচার করলে রবিশঙ্কর সলিল সরকারের হত্যাকারী হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক। তারপর রবিশঙ্করের গদিতে বসবার আগে থেকেই সলিল সরকারের আধিপত্য অনেকটা কমে এসেছিল—জগদীশনারায়ণের যুগ থেকেই, কিন্তু কেন? এবং তারপর রবিশঙ্কর গদিতে এসে বসতে তার আধিপত্য কিছুটা আবার ফিরে এসেছিল, যদিচ রবিশঙ্কর নিজের এবং স্টেটের ব্যাপারে কারো মতামতেরই অপেক্ষা রাখতেন না। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে রবিশঙ্করের পক্ষে সলিল সরকারকে হত্যা করবার এমন কোন জোরালো যুক্তিও তো কই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর রবিশঙ্কর যে সেরাত্রে বন্দুক নিয়ে প্যালেসের বাইরে গিয়েছিলেন, সেকথাও তো তিনি স্বীকার করেছেন। রবিশঙ্করের উপরে সন্দেহটা তাতেই যেন কেমন ঠিক দানা বেঁধে উঠছে না।

নানা রকমের চিন্তা একটার পর একটা কিরীটীর মাথার মধ্যে এসে জট পাকাতে থাকে—এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। প্রত্যেকটাই যে বেশ দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে,

াও নয়।

চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক কিরীটী ইতিমধ্যে কখন যে একসময় ডাক্তারের বাংলোর প্রায় গেট-বরাবর পৌঁছে গেছে টেরই পায়নি।

ডাক্তারের বাড়ির বাইরের ঘরের খোলা দরজাপথে আলোর শিখাটাই যেন অচম্‌কা কিরীটীকে সজাগ করে দিল।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে যখন, তখন নিশ্চয়ই এখনো ডাক্তার গিন্নী হয়তো জেগেই আছেন তার অপেক্ষায়। একান্ত স্বার্থপরের মত এত রাত পর্যন্ত ডাক্তার-গিন্নীকে কিরীটী জাগিয়ে রেখেছে ভাবতে গিয়ে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে।

গেট দিয়ে প্রবেশ করে বারান্দায় উঠে সোজা কিরীটী ঘরের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মিসেস ঘোষাল বলে সম্বোধন করতে গিয়ে হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘরখানি একটা অবরুদ্ধ চাপা কান্নার অস্পষ্ট গুমরানিতে যেন থমথম করছে।

সামনেই টেবিলের উপরে দু-হাতের মধ্যে মাথা গুজে, চেয়ারের উপর বসে গুমরে গুমরে কাঁদছেন মিসেস ঘোষাল। ঘরের মধ্যে নিশিরাত্রের সেই স্তব্ধতা যেন মিসেস ঘোষালের চাপা কান্নার শব্দটা বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতই হাহাকার ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মিসেস ঘোষাল কাঁদছেন। কিন্তু কেন?

একাকিনী এই নিশিরাত্রে এমনি করে তিনি কাঁদছেনই বা কেন? স্তব্ধ অনড় কিরীটী দাঁড়িয়ে থাকে। একবার তার মনে হল, তার ঐ গোপন কান্নার সাক্ষী সে থাকবে না। নারীর নিভৃত হৃদয়ের ঐ গোপন উচ্ছ্বাস, তা সে যে কারণেই হোক, সকলের দৃষ্টির বাইরে থাক।

কে জানে কত বড় দুঃখ ঝরছে ঐ নারীর গোপন অশ্রুর মধ্য দিয়ে নিশীথের এই নির্জন মুহূর্তে!

কিরীটী ঘর ছেড়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই আচমকা মুখ তুলে ফিরে তাকালেন মিসেস ঘোষাল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর চোখের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি মিলিত হল।

মিসেস ঘোষালের দুই চোখের কোণে তখনও চকচক করছে ক্ষণপূর্বের অশ্রুর চিহ্ন।

আচমকা কিরীটীকে ঘরের মধ্যে দেখে মিসেস ঘোষালও কম বিস্মিত হন নি। এবং প্রথমটায় কয়েকটা মুহূর্ত তাঁরও কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দই বার হয় না।

এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই মিসেস ঘোষাল নিজেকে সামলে নিয়ে, অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু সিক্ত চক্ষু দুটি মুছে নিয়ে স্মিত হাস্যের সঙ্গে বললেন, কিরীটীবাবু! কখন ফিরলেন?

এই ফিরছি।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে যেন কি পড়ল। মানে—

অনেকক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি মিসেস ঘোষাল!

না না—তার জন্য কি! আপনি তাহলে হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমি আপনা খাবার নিয়ে আসি।

কিরীটীর সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য মিসেস ঘোষাল যেন ব্য হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কিরীটীকে আর অন্য ক বলবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কিরীটী কয়েকটা মুহূ মিসেস ঘোষালের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল

॥ ষোল ॥

পরের দিন কিরীটীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হল, আকাশে তখনো রাত্রিশেষের অ্বা আবছা আঁধারের যবনিকাটা যেন আলতো ভাবে ছুঁয়ে আছে।

বাকি রাতটুকু ঘুমও ভাল হয়নি। নানা চিন্তায় মস্তিষ্কের কোষগুলো যেন কেম অবসন্ন ভারী বলে মনে হচ্ছিল। একবার করে ঘুম হয়, আবার ঘুম ভেঙে যায়।

সলিল সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেন কিছুতেই কিরীটী ভুলতে পারছিল না অথচ এমন কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না যার সাহায্যে সেই হত্যারহস্যের কাছাকা পৌছতে পারে।

ঘুম আর হবে না জেনেই কিরীটী শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথরুমে গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে গায়ে জামাটা চাপিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বার হয়ে এল। রাত্রিশেষে আবছা অন্ধকারে প্রথম ভোরের আলোর স্পর্শ লেগেছে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এক আধো-আলো আধো-ছায়ার লুকোচুরি।

গেটটা খুলে কিরীটী রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল।

রাত্রে আজকাল শিশির ঝরে। তারই সিক্ততা রাস্তার পাথর ও নুড়ির বুকে বাতাসেও একটা রাতভোর শিশির-ঝরা আর্দ্রতা।

মনের মধ্যে তখন কিন্তু তার গতরাত্রের নির্জন মুহূর্তে একাকিনী ঘরের মধ্যে ব ক্রন্দনরতা ডাক্তার-গৃহিণীর কথাটাই বার বার ভেসে উঠছিল।

কেন কাঁদছিলেন ডাক্তার-গৃহিণী?

কোন দুঃখে কি? কিন্তু কি সে দুঃখ? স্বামী-স্ত্রীকে দেখে তো তাঁদের মধ্যে ান দুঃখের কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় অত্যন্ত সুখী পতিই তাঁরা। তবে ঐ সঙ্গে একটা কথা চকিতে কিরীটীর মনে হয়, সঙ্গীতের থা তোলায় সেদিন ডাক্তারের ত্রস্ত চকিত পলায়ন। এবং সে ব্যাপারটা ডাক্তার-গীরও চেপে যাওয়ার প্রয়াসটা।

নানা এলোমেলো চিন্তা একটার পর একটা কিরীটীর মনের মধ্যে আনাগোনা তে থাকে।

ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এক সময় কিরীটী উঁচু টিলাটার কোল ঘেঁষে দুটি ই ইউক্যালিপটাস্ গাছের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি ইতিমধ্যে।

এবং টের পায়নি কখন এর মধ্যেই ভোরের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

টিলাটা বরাবর পৌঁছেই কিরীটী থমকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে য়, মাত্র হাত দশেক ব্যবধানেই সামনে ঐ বড় সড়কটার উপরেই সেদিন সলিল কারের মৃতদেহটা পড়েছিল।

গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহটা যেন মানসচক্ষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৃতের একটা হাত ছিল মুষ্টিবদ্ধ প্রসারিত, অন্য হাতটা ছিল ভাঁজকরা। পরিধানে ল একটা ধুতি ও গায়ে একটা বেনিয়ান। পায়ে নিউকাট জুতো।

দুটি গুলির চিহ্ন ছিল মৃতদেহে। একটি ক্ষত পৃষ্ঠদেশের বাঁ দিকে, অন্যটি বাঁহাতে।

সড়কের ঐ জায়গাটি থেকে রতনগড় প্যালেস মিনিট কুড়ির হাঁটা-পথ হবে, র ডাক্তারের বাংলো মিনিট পনেরোর বেশী পথ হবে না। মনে আছে কিরীটীর, দেহের মুখ ছিল রতনগড় প্যালেসের দিকে। এবং পশ্চাৎদিকে থেকে যখন সলিল কারকে গুলি করা হয়েছে তখন মনে হয়, রতনগড় প্যালেসের দিকেই বা ডক্তার পথে যখন সে ফিরে যাচ্ছিল, তখন হয়তো অতর্কিতে পশ্চাৎদিক কে গুলি করা হয়েছিল তাকে।

রাত্রিটা ছিল ঝড়-জলের মেঘলা দুর্যোগভরা। ক্ষতস্থান দেখে মনে হয়েছিল এবং না তদন্তের রিপোর্টও বলে, গুলি ছোঁড়া হয়েছিল বেশ দূর থেকেই। এতে করে জেই প্রমাণিত হয় হত্যাকারীর হাতের নিশানা অব্যর্থ—যার নিশানা সেই দুর্যোগের ধ্য অন্ধকারেও ব্যর্থ হয়নি। এক কথায় বলা যেতে পারে, যেন দশরথের সেই শব্দভেদী বানের মতই অব্যর্থ অমোঘ ছিল হত্যাকারীর বন্দুকের গুলি।

হয়তো দূর থেকে সলিল সরকারের জুতোর শব্দ শুনে সেই শব্দ লক্ষ্য করেই হত্যাকারী গুলি ছুঁড়েছিল এবং ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে।

কে এমন অব্যর্থ লক্ষ ভেদী? কার হাতের নিক্ষিপ্ত গুলি অন্ধকারেও লক্ষ্যে ভুল করেনি?

কিরীটী পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল।

একটা ইউক্যালিপটাস্ গাছে হেলান দিয়ে কিরীটী চুরুট টানতে টানতে অ টিলাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কি মনে হওয়ায় এগিয়ে টিলাটার উ উঠতে লাগল এক সময়।

টিলাটা বেশ উঁচু। এবড়ো-খেবড়ো পাথর ও নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে বুনো আগ আপন খেয়াল-খুশিতে বংশবৃদ্ধি করে কায়েমী হয়ে বসেছে এদিক-ওদিক।

মধ্যে মধ্যে দু-একটা বিচিত্র রঙের ফুলও তার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে প পাতার আড়ালে আড়ালে।

টিলাটার চূড়ায় উঠে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সামনের দ ন পড়তেই একসময় কিরীটীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। বুনো গা মধ্যে কি যেন একটা পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে ঐ সামনেই।

কৌতূহলে কিরীটী এগিয়ে গেল। নীচু হয়ে বস্তুটা হাতে তুলে নিতেই দে একটা চামড়ার দস্তানা। কয়েকদিন ধরে এখানে পড়ে থাকায় এবং রৌদ্র-জলবৃষ্টি দস্তানাটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ডান হাতের দস্তানা এবং বুঝতে কষ্ট হয় না যে পুরুষের হাতের দস্তানা।

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী হাতের দস্তানাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। দস্তানা মধ্যে হাত পুরতেই কি যেন শক্তমত একটা আঙুলে ঠেকল। কৌতূহলে দস্তান ঝাড়তেই একটা কি যেন ছিটকে পায়ের কাছে সামনেই পড়ল তার ভিতর থেকে।

ভোরের আলোয় জিনিসটা চিকচিক করে ওঠে। একটা সোনার আংটি।

নীচু হয়ে কিরীটী সোনার আংটিটা তুলে নিল।

আংটিটার উপর মিনাকরা ইংরেজী অক্ষর 'R' লেখা।

'R' মিনাঙ্কিত সোনার আংটি! আংটির ফাঁদটা দেখে মনে হয় কোন পুরু হাতেরই হবে। এবং সেই পুরুষের হাতের আঙুল বেশ মোটাসোটা।

কিন্তু কার হাতের আংটি?

আর কার নামের আদ্যাক্ষরই বা ইংরাজীতে 'R'?

চামড়ার দস্তানা ও আংটিটা নিয়ে কিরীটী টিলার উপরেই ইতস্তত থাক থাকে। নতুন চিন্তা আবার যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে আবর্ত রচনা করে চলে

একটা সন্দেহ কিরীটীর মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে, হত্যাকারী নিশ্চ

্কের গা ও ট্রিগার থেকে নিজের আঙুলে ছাপ বাঁচানোর জন্য চামড়ার দস্তানা
়তে পরে বন্দুক ছুঁড়েছিল। এবং তার পর কাজ হাসিল হয়ে যাবার পর হাতের
ানাটা যখন খুলে ফেলে দেয় সেই সময় হয়তো অসাবধানতাবশত আংটিটাও হাত
কে খুলে দস্তানার মধ্যে যে থেকে গিয়েছে তা সে টের পায়নি। কিন্তু তাই যদি
ব তো একটা মাত্র দস্তানা কেন? আর একটাদস্তানা কোথায়? এবং শুধু তাই নয়,
তের আঙুলের ছাপ বাঁচানোর জন্যই যদি দস্তানা ব্যবহার করে থাকে হত্যাকারী,
ধন সেক্ষেত্রে হত্যার পর দস্তানা খুলে ফেলে হাতে করে বন্দুকটা নিয়ে গেল কেন?
্কেও তো তার হাতের ছাপ পড়তে পারত! সত্যি সত্যিই যদি হত্যাকারী হাতের
আঙুলের ছাপ যাতে বন্দুকের গায়ে না পড়ে সেইজন্যই চামড়ার দস্তানার সাহায্য
য়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে হত্যাকারী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে এবং সেক্ষেত্রে বন্দুকটা
বহার করার পর সেটা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যায়নি। এখানেই কোথাও না
াথাও ফেলে রেখে গিয়েছে। কথাটা মনে হতেই কিরীটী তখন দ্বিগুণ উৎসাহে
াটির চারিদিকে বন্দুক ও দ্বিতীয় দস্তানাটা খুঁজে দেখতে লাগল। এবং দ্বিতীয়
ানাটা খুঁজে পেতে দেরি হল না, একটা বড় পাথরের ওপাশেই পড়েছিল। কিন্তু
্কটা খুঁজতে খুঁজতে কিরীটী হয়রান হয়ে পড়ল। দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে টিলাটার
রিদিকে খুঁজে খুঁজেও কিরীটী বন্দুকটার কোন চিহ্নমাত্রও দেখতে পেল না।

টিলাটির পিছনের দিকে ঢালু জমিটা পার হলেই একটা অপরিসর নালার মত।
লাটার ভিতর দিয়ে ঝিরঝির করে একটা ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে চলেছে। পায়ের
ড়ালি পর্যন্ত ভিজতে পারে, তার বেশী জল নয়। স্ফটিকের মত জলস্রোত—
ড়গুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায় চিকচিক করছে।

নালার দু পাশে ঢালু জমিতে বুনো ঘাস ও কন্টিকারীর আগাছায় ছেয়ে আছে।
এবং সেই নালা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কিরীটীর চোখের মণি দুটি
নন্দে চকচক করে ওঠে। ঢালু পাড়ের উপরে পড়ে আছে বন্দুকটা।

ডাবল ব্যারেল ইংলিশ গান।

কয়েকদিনের জল-রৌদ্রে ইস্পাতের মসৃণ ব্যারেলের গায়ে জং ধরেছে। নীচু
়গানটা তুলে নিল কিরীটী।

বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ এক সময়
্কটার কাঠের বাঁটের গায়ে নজর পড়ল—কাঠের বাঁটের উপরে কুঁদে লেখা একটি
রাজী অক্ষর—'S'

কার নামের আদ্যাক্ষর ইংরাজী 'S'?

মিনাক্বিত সোনার আংটিতে ইংরাজী অক্ষর 'R', আর বন্দুকের বাঁটে ইংরাজ
অক্ষর কোঁদা 'S'। কার নামের আদ্যাক্ষরই বা 'R', আর কারই বা 'S'—সে-কথ
পরে ভাবলেও আপাতত চলবে। সলিল সরকারের হত্যারহস্যের মস্ত বড় দু
হারানো সূত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, এটাই সর্বাপেক্ষা বড় আশার কথা বর্তমানে।

অন্ধকারে দেখা দিয়েছে স্পষ্ট দুটি আলোর শিখা, ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট। ইতিমধ্যে
মাথার উপর রৌদ্রের তেজটাও বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং টিলার উপরে ঘোরাফের
করার পরিশ্রমও কম হয়নি।

সকালের চির-অভ্যস্ত চা এখনও গলায় পড়েনি। পিপাসাও পেয়েছে। কিরী
বাড়ির দিকে ফিরল। বাড়ির কাছবরাবর এসে হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়
কিরীটী সামনের গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ না করে, পশ্চাতের বাগান দিয়ে ত
ঘরের দিকে দ্বিতীয় দরজাটির সামনে এসে দাঁড়াল, কিন্তু দরজাটা ভিতর থেকে ব
সে-পথে অন্দরে প্রবেশের উপায় নেই। কি করা যায়? একটু ভাবতেই এক
বুদ্ধি মাথায় এল।

ঘরে ঢুকবার যে দু ধাপ সিঁড়ি তারই নীচে বন্দুকটা গুঁজে রেখে ফের আবার ঘু
সামনের গেট দিয়েই এসে বাংলোতে প্রবেশ করল কিরীটী। বেলা তখন প্রায় সা
আটটা হবে। বাইরের বারান্দায় দক্ষিণদিকে খানিকটা ঘেরা জায়গা, মধ্যে ম
যেখানে ডাক্তার-গৃহিণী নির্জনতা উপভোগ করেন, সেইখানে একটা বেতের টেবিল
দু পাশে বসেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ডাক্তার ও ডাক্তার-গিন্নী।

ডাঃ ঘোষাল একটা ইংরাজী বই পড়ছিলেন আর মিসেস ঘোষাল একটা উলের ব
নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সামনেই টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জামগুলি তখনও পড়ে আ

জায়গাটা কিরীটীকে যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তারই বাঁয়ে, সামনে।

কিরীটী বারান্দায় উঠতেই তার জুতোর শব্দে ফিরে তাকালেন মিসেস ঘো
প্রথমে এবং চোখাচোখি হতেই বললেন, মিঃ রায়!

এক মিনিট মিসেস্ ঘোষাল—আমি এখুনি আসছি।

কিরীটী ক্ষিপ্রপদে তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। এবং প্রথমেই ঘরের বাগা
দিককার দ্বিতীয় দরজাটি খুলে সিঁড়ির নীচে থেকে বন্দুকটা এনে ঘরের অর্গল
দিল পুনরায়।

বন্দুকটা ঘরের মধ্যে একটা আলমারি ছিল তার পিছনেই আড়ালে দাঁড় কা
রেখে নিশ্চিন্ত হল।

অতঃপর হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে এসে পূর্বোক্ত সেই ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করল

সে সময় ডাঃ ঘোষাল একাই সেখানে ছিলেন, ডাক্তার-গৃহিণী ছিলেন না। এই যে মঃ রায়,...এত সকালে কোথায় বার হয়েছিলেন ? ডাঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন।

একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। তার পর আজ আপনার শরীর কেমন ? কিরীটী একটা খালি চেয়ার টেনে বসতে বসতে প্রশ্ন করল।

ভালই। কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?

এই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে...তা মিসেস ঘোষাল গেলেন কোথায়? এইখানেই তো ছিলেন !

হ্যাঁ, এখানেই ছিলেন, বোধ হয় আপনার চা আনতে গিয়েছেন।

মুহূর্তকাল অতঃপর কিরীটী যেন কি ভাবে, তার পরই মৃদুকণ্ঠে ডাকে, ডাঃ ঘোষাল !

বলুন ? মুখ তুলে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল সামনের দিকে।

আপনার তো বন্দুক আছে, তাই না ?

বন্দুক ! কিরীটীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সবিস্ময়ে যেন কথা'টা উচ্চারণ করে ডাঃ ঘোষাল তার মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, বন্দুক আপনার নেই ?

আছে। অত্যন্ত ধীরে যেন জবাবটা দিলেন এবারে ডাঃ ঘোষাল।

শিকারের শখ আছে আপনার, কই কখনো তো বলেননি !

এককালে ছিল। পনেরো-ষোলো বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠেই জবাব দিলেন।

বলেন কি ? শিকারীরা কখনো জীবনে তাদের শিকারের সখ ছাড়তে পারে নাকি ? আমি তো একজন শিকারীকে জানতাম, ৩৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি শখ বাঘ শিকার করতে গিয়ে হাত কেঁপে যাওয়ায় প্রথমবারে, বাঘ জখম হয়ে এমন থাবা বসিয়েছিল যে পরে সেফটিক উণ্ড হয়ে—তাতেই ভদ্রলোক মারা যান।

মিথ্যে অবিশ্যি বলেননি কথাটা মিঃ রায়, আমাকে অবিশ্যি শিকার শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে—ওই যে, ওরই জবরদস্তিতে। বলতে বলতে সামনের দিকে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল।

ডাঃ ঘোষালের কথার ইঙ্গিতে কিরীটীও চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই ঘোষাল-গৃহিণীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ঘোষাল-গৃহিণী একটা ট্রের ওপরে একটা চায়ের গরম কেতলি ও গরম টোস্ট নিয়ে সেখানে ঢুকছেন তখন।

সামনের টেবিলের ওপরে ট্রে-টা নামিয়ে রাখতে রাখতে স্মিতহাস্যে ঘোষাল-গৃহিণী বললেন, কি হল আবার ? আমি কি আবার জবরদস্তি করলাম ! শুনবেন না মিঃ রায়

ওর কথা, বাধা আমি অনেক দিই বটে তবে উনি কোনদিনই আজ পর্যন্ত ওঁর নিজে পছন্দমত বা ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন পথেই চলেননি।

তা তো বলবেই। দেখ অমলা, আর যাই কর, এত বড় অপবাদটা অন্তত আমাকে দিও না।

ঘুরে তাকালেন মিসেস ঘোষাল, অপবাদ!

নয়? তাছাড়া উনি হয়তো ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই ঠাট্টা বলে আদপেই ধরবেনন।

প্রত্যুত্তরে মিসেস ঘোষাল আর অন্য কোন কথা বললেন না বটে, তবে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে নিঃশব্দ চাপা হাসির ক্ষীণ রেখাটা কিন্তু কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

মিসেস ঘোষাল টোস্টে মাখন মাখিয়ে একটা প্লেটে করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাপে চা ঢালতে লাগলেন।

আমাকে এক কাপ দাও!

দু কাপ তো হয়েছে, আবার খাবে?

দাও।

আবার একসময় চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে আপনার কি বন্দুক ডাঃ ঘোষাল?

মিসেস ঘোষাল বার হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কিরীটীর প্রশ্নটা তাঁর কানে যেতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

ইংলিশ গান।

আপনার গানটা একবার দেখতে পারি?

কিন্তু এবার আর কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বোবা-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডাঃ ঘোষাল তার মুখের দিকে।

আনুন না আপনার গানটা, একবার দেখি! পুনর্বার অনুরোধ জানায় কিরীটী।

ডাঃ ঘোষাল চুপ।

কিরীটী অন্যমনস্কতার ভান করলেও, তার তীব্র দৃষ্টি নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে একবার ডাক্তারের মুখের ওপরে এবং পরক্ষণেই ডাক্তার গৃহিণীর মুখের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছিল।

ডাক্তার ও তস্য গৃহিণীর মুখের রেখায় রেখায় যে বিপন্ন অসহায় একটা ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ঐ মুহূর্তে, সেটা কিন্তু তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না।

কিরীটীর ঐ শেষ প্রশ্নে যে তাঁরা দুজনেই বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন, সে বুঝতে আর যারই কষ্ট হোক, কিরীটীর একটুও হয় না।

কিন্তু বন্দুকটা তো নেই! কতকটা যেন ঢোঁক গিলেই কথাটা কোনমতে উচ্চারণ

করলেন ডাঃ ঘোষাল।

নেই?

না।

তবে কোথায় বন্দুকটা?

ঠিক ঐ মুহূর্তে বাইরের বারান্দায় সাইকেল-ঘণ্টি শোনা গেল।

কিরীটী ঘণ্টির শব্দে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

মথুরাপ্রসাদ সাইকেলটা বারান্দার সিঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে রেখে জুতোর মচ মচ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছেন তখন।

আরে মথুরাপ্রসাদবাবু, আসুন আসুন! আহ্বান জানালেন ডাঃ ঘোষাল।

ক্ষণপূর্বে কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, মথুরাপ্রসাদের হঠাৎ আগমনে সেটা থেকে যেন মুক্তি পেয়ে সৌজন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ডাঃ ঘোষাল। কিন্তু মথুরাপ্রসাদের দিক থেকে যেন ডাক্তারের সেই সৌজন্য আহ্বানের কোন সাড়াই এল না। এবং অন্য কেউ না লক্ষ্য করলেও কিরীটীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না সে ব্যাপারটা। মথুরাপ্রসাদের সমস্ত মুখে যেন কি এক গভীর উত্তেজনার সুস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত। কিরীটী তাই একটু বিস্মিত হয়েই মথুরাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মথুরাপ্রসাদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে কিরীটীর মুখের দিকেই তাকিয়ে প্রথম কথা বললেন, মিঃ রায়, আমি আপনার কাছেই আসছি।

কি ব্যাপার?

রতনগড়ের ম্যানেজার সলিল সরকারের হত্যাকারীর বোধ হয় সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কথাটা এমনই আকস্মিক ও বিস্ময়কর যে, শ্রবণ মাত্রই কথাটায় সকলেই চমকে যুগপৎ একসঙ্গে মথুরাপ্রসাদের দিকে তাকায়।

কিন্তু কথা বলে কিরীটীই হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে ডাঃ ঘোষালকে আমার কতকগুলো প্রশ্ন করবার আছে। কথাটা বলেই মথুরাপ্রসাদ এবারে অদূরে পাথরের মতই নিশ্চল দণ্ডায়মান ডাক্তার-গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস ঘোষাল, আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি যদি একটু অন্য ঘরে যান!

পাথরের মত খোদাই করা ঘোষাল-গৃহিণীর স্থির-দৃঢ় ওষ্ঠ দুটি ঈষৎ নড়ে উঠল। তিনি অবিচলিত শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না, আমার স্বামীকে আপনার যা প্রশ্ন করবার

আমার সামনে করুন।

কিন্তু আমি বলছি আপনি গেলেই ভাল হয়। মথুরাপ্রসাদ আবার বললেন।

যাও না অমলা! এবারে ডাঃ ঘোষালও অনুরোধ জানালেন স্ত্রীকে।

না। ওঁর যা বলবার তোমাকে, আমার সামনেই উনি বলতে পারেন। তেম

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

বেশ, তবে থাকুন। বলে মথুরাপ্রসাদ ডাঃ ঘোষালের দিকে ঘুরে তাকালেন, ড ঘোষাল, গত ১৩ই অর্থাৎ শনিবার যে রাত্রে সলিল সরকার নিহত হন, সে রা আপনি ঝড়-জলের মধ্যে বাইরে বার হয়েছিলেন?

ডাক্তার নিশ্চুপ।

কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিন! বার হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, উনি বার হয়েছিলেন। মুহূর্তে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে কথাটা বল কিরীটী। এবং কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নোত্তরটা যেন অত্যন্ত কঠিন হয়েই উচ্চারি হল। সকলেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

আপনিও তাহলে সে কথা জানেন মিঃ রায়? প্রশ্নটা করে মথুরাপ্রসাদ কিরীট মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল মথুরাপ্রসাদও কম বিস্মিত হননি কিরীট প্রশ্নোত্তরে।

হ্যাঁ জানি, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে সেকথা?

চন্দন সিং নামে আমার এক চৌকিদার আছে, তার মুখেই আজ কিছুক্ষণ আ কথাটা জানল'ম।

কি রকম?

হ্যাঁ, সে-ই দেখেছে ডাঃ ঘোষালকে সেই রাত্রে।

এতদিন সেকথা তবে সে আপনাকে বলেনি কেন?

যে রাত্রে সলিল সরকার খুন হন, সেরাত্রেই ঐ সময়ের কিছু আগে দশ দিনের ছু নিয়ে প শের গাঁয়ে সে ত র বাড়িতে যাচ্ছিল। যাবার পথেই সে বড় সড়কে দেখে ঘোষালকে হনহন করে পূবমুখো যেতে। সে সময় চন্দন সিংয়ের কিছু মনে হয়নি পরে আজ ফিরে এসে থানায় রিপো'ট দিতে—সলিল সরকারের নিহত হবার কাহি শুনেই কথাটা আ মাকে বলে। তাই তো আমি ওঁর কাছে জানতে এসেছি, সেইঝ জলের মধ্যে অত রাত্রে কোথায় তিনি যাচ্ছিলেন? আর কেনই বা যাচ্ছিলেন তাছাড়া আপনি তো জানেন মিঃ রায়, ওঁর মানে ডাঃ ঘোষালের বন্দুক আছে এ উনি এককালে এ তল্লাটে নামকরা শিকারী ছিলেন। বহু বড় বড় শিকার

।রেছেন একসময়ে।

কথাগুলো শেষ করে মথুরাপ্রসাদ আবার তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ ঘোষালের থব দিকে, তাই না ডাঃ ঘোষাল?

কিরীটী ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে তাকাল। ভাবলেশহীন মুখখানা। কোথাও বনের কোন চিহ্নমাত্রও যেন নেই।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা থমথ'মিয়ে উঠছে।

ডাঃ ঘোষাল। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে ডাকল একবার।

নিঃশব্দে কিরীটীর ডাকে মুখ তুলে তাকালেন ডাঃ ঘোষাল এবার।

উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন, তার জবাব দেবার কি কিছু আপনার নেই ডাঃ ঘোষাল? মৃদু একটা স্নেহ ও সহানুভূতির সুর যেন কিরীটীর কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ে।

কিন্তু তথাপি ডাক্তার নিরুত্তর।

সেরাত্রে ঠিক রাত বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ খেলা বন্ধ করে আমাকে ায় দিয়ে কেন আপনি সেই মধ্যরাত্রে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলেন, বলুন না? রীটী আবার প্রশ্ন করে ডাক্তারকে।

আমার বিশেষ একটা কাজ ছিল। এতক্ষণে কথা বললেন সর্বপ্রথম ডাক্তার ান্ত মৃদুকণ্ঠে।

বার হয়েছিলেন তাহলে আপনি সেরাত্রে? মথুরাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? কি এমন কাজ পড়েছিল যাতে করে অত রাত্রে আপনাকে বাড়ি বার হতে হয়েছিল? নিশ্চয়ই কোন কলে নয়?

সেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিঃ রায়। কিরীটীর মুখের দিকে য়েই জবাবটা দিলেন ডাক্তার, মথুরাপ্রসাদকে যেন অগ্রাহ্য করেই।

তাহলেও আমরা শুনতে চাই! আবার মথুরাপ্রসাদই প্রশ্ন করলেন।

ক্ষমা করবেন। আপনার ও প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। দুঃখিত। ায় ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যেন ঋজু শোনাল।

জবাব তাহলে দেবেন না? প্রশ্ন করেন মথুরাপ্রসাদ।

বললাম তো।

বেশ, আপনার বন্দুক ও লাইসেন্সটা একবার দেখতে চাই। মথুরাপ্রসাদ এবারে লন।

বন্দুক!

হ্যাঁ।

নেই।

নেই? কিন্তু এ মাসের পয়লা তারিখেই তো লাইসেন্স রিনিউ করবার সা
দেখেছিলাম আপনার বন্দুকটা, তবে কি হল সেটা?

চুরি গেছে।

চুরি গেছে? কবে?

দিন দশেক হল।

থানায় রিপোর্ট করেননি কেন?

করতাম, কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় হঠাৎ—

দেখুন ডাঃ ঘোষাল, কথাটা আপনার একেবারে ছেলেমানুষের মত শোনাচ্ছে
কি? কোন যুক্তিই নেই কথাটার মধ্যে আপনার।

আমার যা বলবার ছিল আপনাকে আমি বলেছি দারোগা সাহেব, এবা
আপনার যেমন অভিরুচি করতে পাবেন। একটা বিরক্তিরই সুর যেন ডাঃ ঘোষালে
কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে।

বেশ, যদি বলি arrest করব আপনাকে?

ডাঃ ঘোষাল চুপ করে থাকেন, কোনও উত্তর দেন না।

বেশ, তবে তাই হোক। যথেষ্ট পরিচিত আমরা পরস্পরের। ভেবেছিলাম কে
কথা গোপন না করেই আপনি সব আমাকে খুলে বলবেন। তা যখন বলতে আপ
ইচ্ছুক নন, তখন আমিও আপনাকে arrest করতে বাধ্য হচ্ছি।

মথরাপ্রসাদবাবু! একটা অর্ধস্ফুট আর্ত শব্দের মত কথাটা উচ্চারিত হ
ডাক্তারের কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ, আপনাকে আমি arrest করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে আমার স
থানায় যেতে হবে ডাঃ ঘোষাল।

॥ সতেরো ॥

মথুরাপ্রসাদের কথাটা যেন বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হল।

কয়েকটা মুহূর্ত সকলেই নির্বাক। সামান্যতম ছুঁচপতনের শব্দও যেন শোনা যা
হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললেন ডাঃ ঘোষাল, বেশ চলুন, আমি প্রস্তুত

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ ঘোষাল।

এমন সময় কথা বললেন ঘোষাল-গৃহিণী, না না, এ অসম্ভব—এ হতে পারে না।

কিন্তু বাধা দিলেন ডাঃ ঘোষাল, ব্যস্ত হয়ো না অমলা, যাও তুমি আমার জামাটা এনে দাও।

কিন্তু—

আঃ, কেন তর্ক তুলছ! যা বললাম, যাও জামাটা এনে দাও। ডাঃ ঘোষালের ধমকেই হোক বা যে কারণেই হোক, আর কোনই প্রতিবাদ জানালেন না ঘোষাল-গৃহিণী। একবার মাত্র স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘেরা জায়গাটা ছেড়ে চলে গেলেন।

হঠাৎ আবার প্রশ্ন করলেন এবারে ডাঃ ঘোষাল, কিন্তু আমাকে কেন arrest করছেন, জানতে পারি কি দারোগা সাহেব?

রতনগড়ের ম্যানেজার সলিল সরকারের হত্যার ব্যাপারে আপনাকে আমি সন্দেহ করি।

শুধুমাত্র সেই রাত্রে বাইরে বার হয়েছিলাম, সেই কারণেই বোধ হয়? কিন্তু ধরুন যদি বেরিয়েই থাকি, তাতে নিশ্চয়ই একথা প্রমাণ হচ্ছে না যে আমিই তাকে হত্যা করেছি?

তা হচ্ছে না বটে, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই আজ আপনি অস্বীকার করবেন না যে সলিল সরকারের উপরে আপনি কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমন কি একদিন কথায় কথায় এ কথা পর্যন্ত বলেছেন আমার কাছে যে, তাকে গুলি করেই মারা উচিত—এত বড় শয়তান লোকটা!

হ্যাঁ বলেছি এবং আজও সে ধারণা আমার বদলায়নি—যদিও he is already dead! সে মরে বেঁচেছে, নইলে একদিন আমিই তাকে গুলি করে মারতাম কিনা কে জানে!

মিসেস ঘোষাল এমন সময় ডাক্তারের জামাটা নিয়ে আসতেই সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে গায়ে চাপাতে চাপাতে ডাক্তার বললেন, চলুন, আমি প্রস্তুত।

কিন্তু এবারে বাধা দিল কিরীটী, মথুর প্রসাদবাবু, এ বেলার মত যদি আমি ডাঃ ঘোষালের জন্য দায়ী থাকি—অর্থাৎ বিকালে এসে আপনি আপনার যে ব্যবস্থা করবার করবেন, তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?

না না, আপত্তি নেই। বেশ বেলা পাঁচটাতেই আসব।

ধন্যবাদ।

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না মিঃ রায়। বললেন ডাঃ ঘোষাল।

কোথাও একটা ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে ডাঃ ঘোষাল। পরস্পরের মধ্যে আলোচ করে যদি সেটা আমরা মীমাংসা করে নিতে পারি, সেটাই কি ভাল নয় ডাঃ ঘোষা জবাবে বলল কিরীটী।

ভুল—কি ভুল? ডাক্তার কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

সেটারই তো একটা মীমাংসা করতে চাই আমরা পরস্পর আলোচনা করে।

কিন্তু মিঃ রায়—

বসুন বসুন, ডাঃ ঘোষাল।

আচ্ছা তাহলে আমি চলি মিঃ রায়। চলে যেতে উদ্যত হয়েই আবার ঘু দাঁড়ালেন মথুরাপ্রসাদ, আপনার সঙ্গেও আমার কিছু কথা ছিল মিঃ রায়!

বেশ তো, সন্ধ্যার পর দেখা হবে।

বেশ। আচ্ছা নমস্কার।

মথুরাপ্রসাদ অতঃপর আর দাঁড়ালেন না। বার হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হল।

তার পর প্রথমে কিরীটীই কথা বললে, বসুন ডাক্তারবাবু!

ডাঃ ঘোষাল বসলেন একটা চেয়ারে।

মিসেস ঘোষাল, আপনিও বসুন।

না মিঃ রায়, ও বরং যাক এখান থেকে। আপনি আমার সঙ্গে কি আলোচ করতে চান না বললেও এখন আমি যে কিছুটা বুঝতে পারছি না তা নয়। তু যাও অমলা।

মিসেস ঘোষাল নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করলেন।

কিরীটী ডাক্তারের প্রস্তাবে আর কোন বাধা দিল না। কেবল চামড়ার বে থেকে একটা সিগার বার করে তাতে অগ্নিসংযোগে মন দিল।

জ্বলন্ত সিগারটায় কয়েকটা টান দিয়ে মুখ তুলে তাকাল কিরীটী ডাক্তারের দিে ডাক্তারবাবু!

বলুন।

আপনার বন্দুকটা কি সত্যিই চুরি গিয়েছে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বন্দুকটার বাঁটে আপনার কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন খোদাই করা ছিল কি

ছিল। বন্দুকের বাঁটে কাঠের গায়ে ইংরাজী 'S' অক্ষরটা—আমার নাে প্রথম অক্ষরটা আমিই ছুরি দিয়ে এক সময় লিখেছিলাম।

ডাঃ ঘোষালের কথায় কিরীটী বুঝতে পারে, ঐদিনই সকালে নালার ধারে জংধরা
। বন্দুকটা সে কুড়িয়ে পেয়েছে সেটা ডাক্তারেরই বন্দুক।

আবার কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে থাকে।

জ্বলন্ত সিগারটায় গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটী আবার ডাঃ ঘোষালের মুখের দিকে
াকিয়ে প্রশ্ন করল, বন্দুকটা কি সত্যিই আপনার চুরি হয়ে গিয়েছে ডাঃ ঘোষাল?

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন ডাক্তার।

বন্দুকটা আপনার কোথায় থাকত? আগ্নেয়াস্ত্র যখন নিশ্চয়ই আপনি সাবধানে
খতেন?

আমাদের শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা দক্ষিণদিকের যে ঘরটা, যার মধ্যে বাড়তি সব
িনিসপত্র বাক্স-প্যাঁটরা থাকে, সেই ঘরেই বরাবর থাকত একটা চামড়ার কেসের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে এমনিই আলগা থাকত?

না, একটা বড় চেস্ট-ড্রয়ার আছে তার মধ্যে থাকত।

সেটা কি চাবি দেওয়া থাকত না?

না।

আর ম্যাগাজিনের বাক্স?

ঐ চেস্ট-ড্রয়ারেই থাকত।

বন্দুকটা যে চুরি হয়েছে তা আপনি জানলেন কবে?

গত চোদ্দ তারিখে সকালে।

তারিখটা শুনে কিরীটী যেন হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপরই বলে, তার মানে যে
াত্রে সলিল সরকার নিহত হন তার পরের দিন সকালে?

হ্যাঁ।

শেষ আপনি বন্দুকটা কবে দেখেছিলেন মনে আছে?

মাসের পয়লা তারিখে লাইসেন্স রিনিউ করে এসে বন্দুকটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে
িয়েছিলাম, তার পর আর ড্রয়ার খুলিনি।

তা হঠাৎ সেদিনই বা সকালবেলা বন্দুকের খোঁজ করতে গেলেন কেন?

বিশ্বাস করতে চাইবেন না হয়তো আমার কথা এখন মিঃ রায়, তবে সলিল
রকারের বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুর কথাটা শুনে নিছক একটা কৌতূহলে এবং কিছুটা
াজানিত একটা আশঙ্কাজড়িত দুর্বলতাতেই খোঁজ করেছিলাম।

কিরীটী ঐ জবাবে এবার কোন কথা না বলে মৃদু হাসল মাত্র। তারপর মৃদু কণ্ঠে
ন করল, আচ্ছা ডাঃ ঘোষাল, সলিল সরকার যে রাত্রে নিহত হন, সেই রাত্রে ঐ

দুর্যোগের মধ্যে আপনি বের হয়েছিলেন কেন ?

ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বলবেন না তাহলে ?

বললাম তো আমি দুঃখিত।

অচ্ছা ডাঃ ঘোষাল, আপনি কখনো চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করেছেন ?

দস্তানা ?

হ্যাঁ।

না। কেন বলুন তো ?

না, এখানে শুনেছি শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে এবং রাত্রে ঠাণ্ডায় বের হতে হলে অনেকে দস্তানা ব্যবহার করে থাকেন। আর আপনাকেও তো রাত্রে ক এলে বার হতে হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

না, জীবনে আমি কখনো দস্তানা ব্যবহার করিনি।

আচ্ছা অনেকের দেখেছি পোশাকী নামটা ছাড়াও দু-একটা অন্য ডাকনা থাকে, আপনার কোন সেরকম নাম আছে কি ?

আছে। শ্যামাকান্ত ছাড়াও আমার অন্য একটা নাম ছিল—রুণু, বাবা ডাকতেন সে নামে।

নাম—রুণু? চকিতে কিরীটীর মনে পড়ে যায় রুণুর আদ্যাক্ষরও ইংরাজীতে 'আর'। তবে কি—

আচ্ছা আপনার বাবার কি নাম ছিল ? আবার প্রশ্ন করে কিরীটী।

রমাকান্ত ঘোষাল।

কিরীটী মনে মনে মনে কি ভেবে আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনার স্ত্রীর অম ছাড়া অন্য কোন নাম আছে কি ?

হ্যাঁ, ওঁর ডাকনাম রমা।

কিরীটীর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়, রণু, রমাকান্ত, রমা ও রবিশঙ্কর সকলেরই আদ্যাক্ষর 'আর', অর্থাৎ ইংরাজীতে 'R'। কিন্তু মুখে সেরকম কো আভাসমাত্রও না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে, আপনার হাতের আঙুলগুলো দে একবার ডাঃ ঘোষাল।

কিরীটীর শেষের দিককার পর পর অদ্ভুত সব প্রশ্নগুলিতে ডাঃ ঘোষালের বি যেন ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে দু হাতের দ আঙুল কিরীটীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল সম্মুখে প্রসারিত ডাঃ ঘোষালের হাতের সেই দশটি আঙুলের দিকে।

না, দুই হাতের তারই চোখের সামনে প্রসারিত দশ আঙুলের মধ্যে কোথাও অঙ্গুরীয় ধারণের কোন চিহ্নমাত্রও নেই। লম্বা ও মোটা মোটা পুরুষোচিত আঙুলগুলি। এবং বুঝতে কষ্ট হয় না আঙুলগুলি যথেষ্ট শক্তি ধরে।

কি দেখছেন আমার হাতের আঙুলের দিকে অমন করে তাকিয়ে মিঃ রায়? ডাঃ ঘোষালই এবার প্রশ্ন করেন।

না, বিশেষ কিছু না।

কিরীটী বোধ হয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল মিসেস ঘোষালের কণ্ঠস্বরে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে মিসেস ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, আসতে পারি মিঃ রায়? আমি আপনাদের জন্য চা এনেছি।

নিশ্চয়ই, আসুন আসুন। আহ্বান জানাল কিরীটী।

মিসেস ঘোষাল একটা ট্রের ওপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে প্রবেশ করলেন।

দুজনকে দু কাপ চা এগিয়ে দিয়ে মিসেস ঘোষাল স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হতেই বাধা দিল কিরীটী, বসুন মিসেস ঘোষাল, আপনার সঙ্গেও আমার কিছু কথা আছে।

ঠাকুরকে রান্নাটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি এখুনি আসছি। মিসেস ঘোষাল চলে গেলেন।

ডাঃ ঘোষাল নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, তিনি কোন কথাই বললেন না। কিরীটীও চায়ের কাপটা তুলে নিল।

মিনিট দশেক বাদেই মিসেস ঘোষাল ফিরে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, বলুন মিঃ রায়, কি বলছিলেন?

কিন্তু কিরীটী কোন কথা বলবার পূর্বেই ডাঃ ঘোষাল বললেন, মিঃ রায়, যদি আমাকে একটু অনুমতি দেন তো একবার চেম্বারটা ঘুরে আসি।

নিশ্চয়ই, যান না।

ডাঃ ঘোষাল নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলেন।

মিসেস ঘোষাল খোলা জানলাপথে সামনের রৌদ্র-ঝলকিত বাইরের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন। হঠাৎ কিরীটীর ডাকে তিনি চমকে উঠলেন।

মিসেস ঘোষাল!

বলুন।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি সঠিক উত্তর দেন।

মিসেস ঘোষাল কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবল ওর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী বললে, আজ শেষরাত্রের দিকে আপনার স্বামীর গান ও গলা শুনে একটা কথা আমার বিশেষ করে মনে হয়েছে, কণ্ঠ ও সঙ্গীতের চর্চা এক কালে তিনি রীতিমতই করতেন। নাহলে অমনি গান কেউ হঠাৎ গাইতে পারে না। আমার অনুমানটা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়?

না। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন মিসেস ঘোষাল।

কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এ কদিন পরিচয় হবার পর কখনো সঙ্গীত সম্পর্কে কোন আলোচনাই আমি তাঁর মুখে শুনিনি। অথচ সঙ্গীত এমন একটা নেশা যে, একবার যাকে সে নেশায় ধরেছে তাকে সে নেশার হাত থেকে রেহাই পেতে বড় একটা দেখি নি বা শুনিনি। তবে একদিন যে জিনিসটা সাধনার দ্বারা তিনি অর্জন করেছিলেন সেটাকে আজ এভাবে ভুলতে পারলেন কেমন করে?

কিরীটীর প্রশ্নের পর কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে রইলেন মিসেস ঘোষাল। কোন জবাবই তাঁর কণ্ঠ হতে বার হয় না। তার পর এক সময় ধীরে ধীরে মুখ তুলে বললেন, পারিবারিক এক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক আঘাত পেয়েই একদিন উনি গানবাজনা ছেড়ে দেন।

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, আজ সকালে চায়ের টেবিলে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর ডাঃ ঘোষালের মুখের ভাব পরিবর্তন দেখে সেই রকমই একটা কিছু আমার মনে হয়েছিল মিসেস ঘোষাল। অবিশ্যি আপনার যদি আপত্তি না থাকে এবং আপনি যদি বলেন সে দুর্ঘটনার কথাটা—

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মিসেস ঘোষাল। তার পর এক সময় আবার ধীরে ধীরে বললেন, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল ওর একটি মাত্র বোনকে কেন্দ্র করে—যাকে তিনি প্রাণের চাইতেও বুঝি বেশী ভালবাসতেন।

দুর্ঘটনা মানে কি, মৃত্যু নয় তো?

কিরীটীর শেষের কথায় মিসেস ঘোষাল যেন হঠাৎ চমকে উঠলেন। তার পর যেন মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ—তাই।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

মিসেস ঘোষাল কিন্তু জবাবে কিরীটীর শেষ প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না, বলতে লাগলেন, ওঁরা দুই ভাই, এক বোন; এবং ভাই-বোন তিনজনই যেন ছিল অপূর্ব এক ধাতুতে গড়া। যেমন খেয়ালী, তেমনি একগুঁয়ে, জেদী ও অত্যন্ত sentimental

অথচ তিনটি ভাই-বোনের মধ্যেই যেন ছিল এক অপূর্ব শিল্পীর প্রতিভা। বড় ভাই আর বোন গানে, আর ছোট ভাইয়ের প্রতিভা ছিল তুলিতে—চিত্রাঙ্কনে। যাক যা বলছিলাম, শুনেছিলাম আমার শ্বশুরমশাই এম-এ, বি-এল পাস করবার পর কোথায় নাকি চাকরি নিয়ে যান। পরে কি কারণে যেন সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই পসার জমিয়ে তোলেন, এবং মৃত্যুর সময় প্রচুর পয়সা রেখে যান। এবং তিনি যখন মারা যান, আমার স্বামীর বয়স তখন পঁচিশের ঊর্ধ্বে নয়, তাঁর ছোট ভাই রতুর বয়স তখন হবে আঠারো কি উনিশ আর ওদের একমাত্র বোন সুষির বয়স দশ কি এগারো। আমার শাশুড়ী আমার শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর বারো বছর আগেই গত হয়েছিলেন। রতুর বিদ্যা ক্লাস সিক্সের বেশী যায়নি। অল্প বয়সে একদল বয়াটে ছোকরাদের সঙ্গে মিশে একেবারেই বিগড়ে গিয়েছিল। শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শোধরাতে না পেরে হতাশ হয়েই শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ও নিজের খেয়াল-খুশি মত আড্ডা দিয়ে বেড়াত। আমার শ্বশুরমশাই যখন মারা যান, এক বৎসর তখন মাত্র আমার বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি ও টাকাকড়ি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বেধে গেল ঝগড়া। এই পর্যন্ত বলে মিসেস ঘোষাল থামলেন।

গভীর আগ্রহ সহকারে কিরীটী মিসেস ঘোষালের বর্ণিত কাহিনী শুনছিল। বললে, তার পর ?

ফলে এসব ক্ষেত্রে যা হবার এদেরও তাই হল, মিসেস ঘোষাল আবার তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী টেনে চললেন—দুই ভাই সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে পৃথক হয়ে গেল। এ ঘটনার বছর দুই আগেই আমার স্বামী ডাক্তারী পাস করে কলকাতার মধ্যেই একটা মার্চেন্ট অফিসে মেডিকেল অফিসারের চাকরি নিয়েছিলেন। তার পর হঠাৎ একদিন সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন এবং তারই মাস তিনেক বাদে এখানে কয়েক-দিনের জন্য বেড়াতে এসে স্থির করেন এখানেই প্র্যাকটিস করবেন।

এখানে হঠাৎ বেড়াতে এলেন যে ?

ওঁর এক বন্ধু রতনগড় মাইনস্-এ মেডিকেল অফিসার ছিলেন, তাঁরই অনুরোধে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন এবং তাঁরই পরামর্শে এখানে এসে প্র্যাকটিস করা স্থির করেন শেষ পর্যন্ত।

তার পর ?

আমি আর উনি এখানে চলে এলাম। সুষি লরেটোতেই পড়তে লাগল বোর্ডিংয়ে থেকে। এখানে আসার মাস পাঁচেক বাদেই আমাদের ছেলে খোকন জন্মায়।

আর ডাঃ ঘোষালের ভাই ?

সে তো আগেই পৃথক হয়ে গিয়েছিল। তার খবর আর আমরা রাখতাম না।

আর কখনো তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখাও হয়নি ?

কিরীটীর শেষ প্রশ্নে কেমন যেন একটু থতমত খেয়েই ধীরে ধীরে মিসেস ঘোষাল বললেন, না।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার পর আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনার সেই ননদ—সুষমা দেবীর কিভাবে মৃত্যু ঘটেছিল বললেন না তো ?

আবার কিরীটীর প্রশ্নে মিসেস ঘোষাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর মৃদুকণ্ঠে বললেন, তার কথা থাক মিঃ রায়।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন তুলল, সুষমা দেবীর মৃত্যুর পর থেকেই তাহলে ডাঃ ঘোষাল গান-বাজনা ছেড়ে দেন ?

হ্যাঁ। কোন ওস্তাদের কাছে নয়, আমার স্বামী নিজেই তার বোনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। এবং অদ্ভুত সুরেলা ও মিষ্টি কণ্ঠ ছিল সুষির। তাই তার মৃত্যুতে সেই যে তিনি গান-বাজনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আর কখনো সেতার বা তানপুরায় হাত দেননি। আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমাদের শোবার ঘরের দেওয়ালে আজ দীর্ঘ ষোলো বৎসর ধরে সেই তানপুরা ও সেতারটা ঝোলানোই রয়েছে। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে একবারও আর সে দুটি তিনি স্পর্শ করেননি।

খুবই স্বাভাবিক মিসেস ঘোষাল। সত্যিকারের দুঃখ মানুষের জীবনে এক-এক সময় এমনি দাগই কেটে দেয়, যে দুঃখের দাগ জীবনে আর মিলায় না।

এমন সময় সেখানে ওঁদের ভৃত্য এসে দাঁড়াল।

কি রে কালু, মিসেস ঘোষাল ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন।

মাংস দিয়ে আপনি কি 'স্টু' করবেন বলেছিলেন মা !

হ্যাঁ, চল আসছি।

কিরীটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিসেস ঘোষাল রন্ধনশালার দিকে চলে গেলেন

কথা বলতে বলতে কখন একসময় অন্যমনস্কতায় হাতের সিগারটা নিবে গিয়েছিল কিরীটী সেটা আবার ওষ্ঠাগ্রে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করে নিল।

মিসেস ঘোষাল বর্ণিত ক্ষণপূর্বের কাহিনী এমন কোন সূত্রের সন্ধানই দেয়নি, যার সাহায্যে তার বর্তমান জটিল রহস্যের মীমাংসার কোন সাহায্য হতে পারে।

॥ আঠারো ॥

বৈকাল বেলা চারটে নাগাদ থানা থেকে মথুরাপ্রসাদের সংবাদবাহী একজন সিপাই এল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে ডিস্ট্রিক্ট সুপার মিঃ হসকিনস্ নাকি অকস্মাৎ স্বয়ং রতনগড়ে এসে পৌঁছেছেন। এবং তিনি কিরীটীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন থানায়।

কিরীটী চিঠিটা পেয়ে মুহূর্ত-মাত্রও আর দেরি করল না। থানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

কিরীটী যখন প্রস্তুত হচ্ছে মিসেস ঘোষাল কিরীটীর বৈকালী চা নিয়ে সেই ঘরের দিকেই আসছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে কিরীটীকে জামা গায়ে দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বেরুচ্ছেন নাকি মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

কখন ফিরবেন?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে বললে, হয়তো ফিরতে আমার রাত হতে পারে মিসেস ঘোষাল। আমার অপেক্ষায় আপনারা কিন্তু না খেয়ে বসে থাকবেন না। আর একটা কথা, বলতে বলতে কিরীটী যেন একটু ইতস্তত করেই বললে, ডাঃ ঘোষালের আমি সিকিউরিটি হয়ে আছি মথুরাপ্রসাদবাবুর কাছে। আমার বিনানুমতিতে তিনি যেন বাড়ি থেকে কোথাও না বের হন।

মিসেস ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে এবারে মুখ তুলে তাকালেন।

তাঁর সেই দৃষ্টিতে সেই মুহূর্তে যে প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা কিন্তু কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়ায় না।

তাই বোধ হয় কিরীটী ব্যাপারটাকে একটু হালকা করে দেবার জন্যই বলে, বুঝতে পাচ্ছেন তো ব্যাপারটা—Just a formality!

হঠাৎ ঐ সময় ঘোষাল-গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, মিঃ রায়?

বলুন!

সত্যিই কি আপনিও আমার স্বামীকে সন্দেহ করছেন?

কিরীটী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তার পর শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার ঐ প্রশ্নের জবাবটা ঠিক এই মুহূর্তে আমি দিতে পারছি না মিসেস ঘোষাল, আমি দুঃখিত।

কিন্তু—

হ্যাঁ দিতে পারতাম, যদি আপনি ও আপনার স্বামী সত্যিকারের বন্ধুর মতই

আমাকে বিশ্বাস করে আপনাদের সমস্ত কথা অকপটে এতটুকুও গোপন না করে বলতেন। কিন্তু আপনারা তা তো পারেননি।

কি বলছেন আপনি, আপনাকে বিশ্বাস করিনি।

না। নিজের মনেই প্রশ্নটা করুন মিসেস ঘোষাল, জবাব পাবেন।

কিন্তু কি কথা আপনার কাছে গোপন করেছি ?

দেখুন মিসেস ঘোষাল, সলিল সরকারের রহস্যজনক হত্যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমানে এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘটনাচক্রে যার সঙ্গে আপনার স্বামীও জড়িত হয়ে পড়েছেন, বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই কথাটা, কেমন কি না ? সেক্ষেত্রে পুলিস যদি আজ আপনার স্বামীকে সন্দেহই করে. তাহলে কি তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় ?

কিন্তু—

না। বাধা দিল কিরীটী, শুনুন আমার কথা। আপনার স্বামী সলিল সরকারের হত্যার রাত্রে যখন বের হয়েছিলেন এবং তাঁকে অকুস্থানের সন্নিকটে যখন দেখা গিয়েছিল, তখন সেক্ষেত্রে তিনি যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর সেরাত্রের মুভমেণ্টস্ সম্পর্কে নিজেকে ক্লারিফাই করছেন, ততক্ষণ আপনিই বলুন তাঁর উপর থেকে পুলিসের সন্দেহটা কি যেতে পারে !

কিন্তু সেরাত্রে তিনি একমাত্র বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন বলে যে তাঁকেই হত্যাকারী বলে ধরে নিতে হবে সেটাই বা কেমন যুক্তি ?

কিরীটী মৃদু হাসল।

তার পর বললে, না মিসেস ঘোষাল, সেটাই একমাত্র যুক্তি নয়। মথুরাপ্রসাদের যুক্তিটা কিসের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্যি সেটা আমি জানি না বটে, তবে আমার যুক্তিটা কিন্তু একমাত্র ঐ ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে নেই।

তার মানে ? একটা আর্ত ব্যাকুলতা যেন মিসেস ঘোষালের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটী বলে, প্রথমতঃ আপনার স্বামী দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার কাছে গোপন করে আসল সত্যকে একটা মিথ্যার আবরণ দিয়ে আমাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

কি বলছেন আপনি ?

ঠিক বলছি। প্রথমতঃ বন্দুকের ব্যাপারটা সম্পর্কে সত্যি কথা তিনি আমাকে বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ সলিল সরকার যেরাত্রে নিহত হন, সেই তেরো তারিখের রাত্রে

তিনি যে একটা definit উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ ঝড়জলের মধ্যেও বের হয়েছিলেন, সেটা স্বীকার না করলেও আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি। তারপরই হঠাৎ তীক্ষ্ণ ঋজুকণ্ঠে মিসেস ঘোষালের চোখের উপরে চোখ রেখে কিরীটী বললে, একটু আগে আপনাকে বলেছিলাম না, এখনো আপনারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছেন না—কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই, আমি থানা থেকে ঘুরে আসি। আমি যা বলে গেলাম একটু ভেবে দেখবেন ভাল করে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের সাহায্যই করতে চাই। কথাগুলো বলে আর মুহূর্তকালও অপেক্ষা করল না।

কিরীটী ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

প্রস্তরমূর্তির মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস ঘোষাল ঘরের মধ্যে একাকী।

থানার বারান্দাতেই মথুরাপ্রসাদ কিরীটীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন।

কিরীটীকে আসতে দেখে আহ্বান জানালেন, আসুন মিঃ রায়, মিঃ হসকিনস্ আপনার চিঠি পেয়ে স্বয়ং এসে গিয়েছেন। ঘরের মধ্যে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

কিরীটী মথুরাপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই পুলিস সুপার মিঃ হসকিনস্ উঠে দাঁড়িয়ে সানন্দে বললেন, What a surprise! তোমার চিঠি পেয়ে তো আমি একেবারে বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছি রায়। বসো, বসো। তার পর কি ব্যাপার বল তো? চিঠিতে কিছুই ভেঙে স্পষ্ট করে লেখোনি, কেবল লিখেছ রতনগড় স্টেটের ম্যানেজারের হত্যাকে কেন্দ্র করে দারুণ একটা মিস্ট্রির উদ্ভব হয়েছে! একটানা কথাগুলো বলে মিঃ হসকিনস্ কিরীটীর দিকে তাকালেন।

কিরীটী বসতে বসতে মৃদু হেসে বললে, একটা difficult situation-এর মধ্যে পড়েছি বলেই তোমার শরণাপন্ন হতে হয়েছে মিঃ হসকিনস্। অথবা বলতে পার আইনের সাহায্যেরজন্য আইনের সাক্ষাৎ একজন প্রতিভূকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি।

Nonsense! এতটুকু বিরক্তও আমি হইনি রায়, rather তোমার সঙ্গে দেখা হবে জেনে সোজাসুজিই চলে এসেছি। তাছাড়া তুমি যখন এর মধ্যে আছ, বুঝতেই আমি পেরেছিলাম, ব্যাপারটা একটু জটিলই হবে।

তুমি যে ভাবে জটিল মনে করেছ ঠিক তা না হলেও রবিশঙ্কর লোকটা একটু জটিল হয়েই উঠেছে বলে তোমাকে স্মরণ করেছিলাম।

রবিশঙ্কর। Who is he?

রতনগড় স্টেটের বর্তমান মালিক।

Yes, I remember! শুনেছি এবং রিপোর্টও পেয়েছি, লোকটা খুব সুবিধার নয়।

হ্যাঁ, কতকটা সেইরকমই pose নিচ্ছেন বটে। এবং সেই pose ভেঙে দিয়ে তাঁর সত্যিকারের আসল চেহারাটা দেখবার জন্যই তাঁকে একটু আইনের দাওয়াই সেবন করাতে হবে বলে মনে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন সায় দিয়ে মথুরাপ্রসাদ, সত্যিই স্যার, আইন-আদালতকে একদম মানে না।

ফিরে তাকালেন মথুরাপ্রসাদের কথায় মিঃ হসকিনস্ তাঁর মুখের দিকে, কি রকম?

ওই মিঃ রায়কেই জিজ্ঞাসা করুন না! জবাব দিলেন মথুরাপ্রসাদ, তবে আমিও ছেড়ে কথা বলিনি, সেদিক থেকে সুবিধা করতে না পারলেও হত্যাকারীকে বোধ হয় ধরে ফেলেছি।

মিঃ হসকিনস কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মথুরাপ্রসাদের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। তার পরই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার রায়?

উনি অবিশ্যি যাঁর কথা বলছেন তাঁর মুভমেন্টস্ সন্দেহজনক বটে, তবে সেইটুকু এভিডেন্সের উপর নির্ভর করেই তাঁবমত একজন বিশেষ ইনফ্লুয়েনসিয়াল ভদ্রলোককে একেবারে নিঃসন্দেহেই হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে না।

এবার বাধা দিলেন মথুরাপ্রসাদ, বললেন, কিন্তু মিঃ রায়, আমি নিঃসন্দেহ যে এ ডাক্তারেরই কাজ। ওঁকে অ্যারেস্ট করে একটু চাপ দিলেই সত্যি কথা স্বীকার করতে পথ পাবেন না দেখবেন।

সেকথা আলোচনা করবার এখনো সময় আছে মথুরাপ্রসাদবাবু, তার আগে একবার চলুন রতনগড় প্যালেসে, যদি ব্রজেশ্বর পাণ্ডের মুখ থেকে কোন কিছু নতুন শোনা যায়! বললে কিরীটী।

একান্ত যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই কিরীটীর প্রস্তাবে সায় দিয়ে মথুরাপ্রসাদ বললেন, বেশ, চলুন।

মিঃ হসকিনস্, কিরীটী বলে, তুমি যখন এসেই গিয়েছ আমাদের সঙ্গে গেলে—

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই যাব। হসকিনস্ উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে।

রতনগড় প্যালেসে পৌঁছে নিজেদের আগমন-সংবাদটা দেবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই উপর থেকে ডাক এল সবার।

দোতলার যে-ঘরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল রবিশঙ্করের সঙ্গে কিরীটীর, সেই ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন রবিশঙ্কর। সকলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মুখে সাদর আহ্বান জানিয়ে রবিশঙ্কর কিরীটীর মুখের দিকেই তাকিয়ে বললেন, বলুন মিঃ রায়, কি আমি করতে পারি আপনাদের মত সম্মানিত অতিথিদের জন্য ?

আর কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। বিশেষ কিছু নয়, আর দুটি অনুরোধ আপনাকে করব রবিশঙ্করবাবু।

মাত্র দুটো কেন, দশটা অনুরোধ থাকলেও বলুন না। আর প্রশ্ন যত খুশি করতে পারেন।

না, বেশী বিরক্ত করব না আপনাকে রবিশঙ্করবাবু। আপনাকে ও আপনার কমচারী ব্রজেশ্বর পাণ্ডেকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। অনুগ্রহ করে মিঃ পাণ্ডেকে যদি এই ঘরে একটু ডেকে পাঠান !

কিন্তু ব্রজেশ্বর তো রতনগড়ে নেই, আজ সকালে অফিসের একটা জরুরী কাজে তাকে কলকাতায় যেতে হয়েছে। শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন রবিশঙ্কর।

ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী রবিশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রবিশঙ্করও সমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিরীটীর চোখে চোখ রেখে।

চোখের দৃষ্টি তো নয়, দুটো শাণিত ছোরার ফলা যেন পরস্পরকে স্পর্শ করছে।

ও আচ্ছা, আপনি দস্তানা ব্যবহার করেন ? কিরীটী সহসা প্রশ্ন করে।

না। কখনো ব্যবহার করিনি।

হুঁ, আপনার দু হাতের আঙুলগুলো দেখি ?

রবিশঙ্কর দু হাতের দশ আঙুল সামনে মেলে ধরলেন।

ধন্যবাদ। তাহলে এবার আমার আর দু-একটি প্রশ্নের জবাব দিন, গত তেরো তারিখে ঝড়জলের রাত্রে, অর্থাৎ যে রাত্রে সলিল সরকার নিহত হন, সেরাত্রে আপনি রতনগড় প্যালেসের বাইরে গিয়েছিলেন কেন ?

সে তো সেইদিনই আপনাকে আমি বলেছিলাম মিঃ রায়।

হ্যাঁ বলেছিলেন বটে, আপনি আপনার সঙ্গে বন্দুক নিয়ে বের হয়েছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ, এও বলেছিলাম, বাঘ শিকার করবার জন্য।

ফায়ারিং করেছিলেন ?

হ্যাঁ, ফায়ারিং করেছিলাম দু-দুবার। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার মিঃ রায় ?

আছে। শুনেছি রতনগড়ের ভূতপূর্ব মালিক জগদীশনারায়ণ ও আপনি প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং আপনাদের উভয়ের মধ্যে নাকি যথেষ্ট সদ্ভাবও ছিল।

থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয় মিঃ রায় ?

নিশ্চয়ই। আর সেই কারণেই যদি বলি, জগদীশনারায়ণের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা জানা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই সে সম্পর্কেও আপনার দ্বিমত হবে না ?

শেষের কথাটা যেন অতর্কিতে একটা চাবুকের মতই রবিশঙ্করের মুখের উপর এসে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষণপূর্বের প্রশ্নোত্তর দানের তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীটাও যেন সহসা দপ করে নিভে গেল। রবিশঙ্কর এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে, প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ কিরীটী কোন্ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই রবিশঙ্করের মুখখানা যেন হঠাৎ গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে ওঠে। হঠাৎই যেন স্তব্ধ হয়ে যান।

রবিশঙ্করবাবু, আমার প্রশ্নের জবাব এখনো পাইনি !

জগদীশের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আপনি ঠিক কি মিন করছেন বুঝতে পারলাম না তো মিঃ রায় !

না বুঝতে পারার মত ব্যাপারটা তো আদৌ দুর্বোধ্য নয় রবিশঙ্করবাবু। শুনেছি মুরলীনারায়ণের সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্র জগদীশবাবুর ঘোরতর একটা মতান্তর ঘটেছিল।

হতে পারে।

হতে পারে নয়, হয়েছিল। আর আমার ধারণা আপনি জানেন তার কারণটা।

আপনি দেখছি অন্তর্যামীর মতই কথা বলছেন মিঃ রায় !

না রবিশঙ্করবাবু, অন্তর্যামী আমি নই। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই প্রশ্নটা আমি করছি। আর সেই সঙ্গে আমার আর একটি প্রশ্নেরও যদি জবাবটা দেন। ডাঃ শ্যামাকান্ত ঘোষালের সঙ্গে জগদীশনারায়ণের এমন কি হয়েছিল যাতে করে দু পক্ষের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় ?

আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাটা দেখছি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী মিঃ রায়। কিন্তু দুঃখিত আমি, আপনার শেষোক্ত দুটি প্রশ্নের একটিরও জবাব দেবার মত সামর্থ্য আমার নেই।

নেই নয়, বলুন দেবেন না ! কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন রবিশঙ্করবাবু, ব্রজেশ্বর পাণ্ডের সম্পর্কে যত সতর্কতাই অবলম্বন করুন না কেন, আপনি হয়তো জানেন না যে, সেদিন রাত্রে থানায় তার মুখ থেকে আমাদের যতটুকু জানবার ছিল তা বলবার পরই সেখানে আপনি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এবারে যেন সত্যি-সত্যিই চমকে উঠলেন রবিশঙ্কর। এবং স্খলিতকণ্ঠে বললেন,

কি—কি শুনেছেন সেই গর্দভটার কাছে আপনি ?

একটা শঙ্কা, একটা ভয় রবিশঙ্করের কণ্ঠের সুরে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটী বুঝতে পারে, অতর্কিতে কৌশলে অন্ধকারে যে তীর সে নিক্ষেপ করেছে, লক্ষ্যভেদে সেটা ব্যর্থ হয়নি।

বললাম তো অপনাকে, একটু আগে যে প্রশ্নের উত্তর আপনি এড়িয়ে গেলেন, তার জবাব সেদিন তার মুখ থেকেই আমি পেয়েছিলাম, কেবল যাচাইয়ের জন্যই আপনাকে আমি প্রশ্নগুলো করছিলাম।

কি শুনেছেন আপনি সেই ইডিয়েটটার মুখে জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি, সে যা বলেছে সম্পূর্ণ তার উর্বর মস্তিষ্কেরই কল্পনা জানবেন, কিছু তার মধ্যে সত্য নেই।

বেশ, কিন্তু আপনার ভাই মণিশঙ্করবাবুর মুখে যা শুনেছি—

মণিশঙ্কর! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন রবিশঙ্কর কথাটি বলে, কি—কি শুনেছেন আপনি মণির কাছে ?

সেও হয়তো বলবেন তাঁর উর্বর মস্তিষ্কেরই কল্পনা। নাই বা আর শুনলেন তাঁর মুখে যা শুনেছি সে কথা। শুনুন রবিশঙ্করবাবু, সত্য যা তাকে যত চেষ্টাই করুন আপনি চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। কিরীটী গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

রবিশঙ্কর যেন অতঃপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন কিরীটীর মুখের দিকেই তার কথায়।

আপনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন যে রতনগড়ের গদিতে বেশী দিন আর আপনার নয়।

তাই নাকি !

হ্যাঁ, আর যে মুহূর্তে সেটা আপনি স্থিরনিশ্চয় করে জেনেছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই কুৎসিত এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রতনগড়ের সত্যিকারের উত্তরাধিকারের সর্বনাশ সাধনে আপনি প্রবৃত্ত হয়েছেন।

মিঃ রায়, সত্যিই আপনি দেখছি জেগে স্বপ্ন দেখছেন। এবারে হয়তো বলবেন জগদীশের এখনো মৃত্যুই হয়নি, সে এখনো বেঁচেই আছে !

তিনি বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা আজও বেঁচে আছে। এবারে বলবেন কি, জগদীশনারায়ণের দুই পুত্র হীরা ও চুনিকে কোথায় আপনি গোপন করে রেখেছেন ?

হীরা-চুনি ?

হ্যাঁ, হীরা-চুনি।

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে একসময়ে ধীরে ধীরে রবিশঙ্কর বললেন, তারা মারা গেছে

ও, আর হীরা-চুনির মা ?

সেও আর বেঁচে নেই।

বাধা দিলেন এবারে মথুরাপ্রসাদ। বললেন, এসব আপনি কি বলছেন মিঃ রায় ? জগদীশনারায়ণ তো শুনেছি বিবাহ করেননি!

ঠিকই বলছি মথুরাপ্রসাদবাবু। আর রবিশঙ্করবাবুও যে সেকথা স্বীকার করলেন তাও তো আপনি এইমাত্র শুনলেন। জগদীশনারায়ণ গোপনে বিবাহ করেছিলেন, এবং তিনি যে বিবাহ করেছিলেন, সেকথা আর কেউ না জানলেও, উনি রবিশঙ্করবাবু জানতেন। আর জগদীশের দুই যমজ ছেলের নামই হীরা আর চুনি। তারা যদি আজ সত্যিই না বেঁচে থাকে, তাহলে বলব ঐ রবিশঙ্করবাবুই কৌশলে তাদের এ পৃথিবী থেকে সরিয়েছেন, যাতে করে নির্বিবাদে উনি রতনগড়ের গদিতে বসে বহাল তবিয়তে রাজ্যপাট চালাতে পারেন!

মিঃ রায় ? অনুচ্চকণ্ঠে এবারে রবিশঙ্কর কথা বললেন, এতক্ষণ ধরে আপনার অনেক পাগলামি সহ্য করেছি ভদ্রতার খাতিরে, কিন্তু আর সহ্য করব না। আপনাকে এবার এ স্থান ত্যাগ করবার জন্য বলতে বাধ্য হব।

মিঃ হসকিনস্ এতক্ষণ নির্বাক দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে একটা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন।

রবিশঙ্কর ও কিরীটীর পরস্পরের মধ্যে বাংলায় কথাবার্তা চলবার দরুন উভয়ের আলোচনার বিষয়বস্তুটাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু রবিশঙ্করের শেষ কথাগুলো উচ্চারণের ভঙ্গিটা তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনিই এবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, ব্যাপার কি রায়, উনি তোমাকে কি বলছেন ?

কিরীটী দু-চারটে কথায় মিঃ হসকিনস্‌কে বুঝিয়ে দেয় যে, রবিশঙ্কর কিরীটীর কোন প্রশ্নেরই জবাব তো দিচ্ছেনই না, বরং তাকে বলছেন পাগল এবং ঘর ত্যাগ করবার জন্য বলছেন।

নো বাবু, ইউ মাস্ট আনসার টু হিজ কোশচেইনস্। ভাল ভাবে তুমি উত্তর না দিলে তোমাকে অ্যারেস্ট করতে আমি বাধ্য হব। হসকিনস্ এবারে বললেন।

মিঃ হসকিনস্-এর কথায় যেন রবিশঙ্কর দপ করে জ্বলে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, তবে রে ইংরাজ কুত্তা! বলে সামনের টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে একটা পিস্তল হাতে তুলে নিতেই চক্ষের পলকে এক লাফ দিয়ে কিরীটী রবিশঙ্করের সামনে এসে পড়ল এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জুতো সমেত রবিশঙ্করের পিস্তল-ধৃত হাতটার উপরে—রবিশঙ্কর ব্যাপারটা বুঝে ওঠবার আগেই—একটা লাথি বসিয়ে দিল।

পিস্তলটা রবিশঙ্করের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে অদূরে ঘরের মেঝেতে পড়ল ঠং করে।

মিঃ হসকিনস্ ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুত ঘটায় প্রথমটায় বুঝতে পারেননি, কিন্তু বুঝবার সঙ্গে সঙ্গেই মথুরাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পুট্ হিম আনডার অ্যারেস্ট মিঃ চৌবে।

॥ উনিশ ॥

কিরীটী অতর্কিত হাতে ঠিক কব্জির কাছে লাথি বসিয়ে, হাতের মুষ্টি থেকে রিভলবারটা ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে বাঁ হাত দিয়ে রবিশঙ্কর আহত ডান হাতটা চেপে তখনো দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে।

কারো মুখে কথা নেই আর। সমস্ত ঘরটা অস্বাভাবিক একটা স্তব্ধতায় তখন যেন থমথম করছে।

ক্ষণপূর্বের পরিস্থিতিটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যেন কেমন একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এবং চরম আদেশটা মিঃ হসকিনস্-এর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও মথুরাপ্রসাদ স্থাণুর মতই তখনো দাঁড়িয়ে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটী প্রথম কথা বললে, রবিশঙ্করবাবু!

কিরীটীর ডাকে রবিশঙ্কর তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন নিঃশব্দে। রবিশঙ্করের গৌরবর্ণ মুখখানি রক্তচাপে তখন যেন একেবারে ফেটে পড়ছে। কপালের পাশে নীল শিরা দুটো ফুলে উঠেছে। দু চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলছে। চেয়েই রইলেন শুধু রবিশঙ্কর কিরীটীর মুখের দিকে, কোনরূপ সাড়াই দিলেন না।

বসুন রবিশঙ্করবাবু। বুঝতে পারছেন, ছেলেমানুষি করে কোন লাভই নেই। প্রস্তুত হয়েই আজ আমি এসেছি।

রবিশঙ্কর তথাপি বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন।

আপনাকে আমার যে প্রশ্নগুলো করবার ছিল তা এখনো শেষ হয়নি। বসুন ঐ চেয়ারটায়, ভালভাবে আমার প্রশ্নের জবাবগুলো দিন।

রবিশঙ্কর কিন্তু পূর্ববৎ নীরব।

তথাপি কিরীটী প্রশ্ন করে, ডাঃ ঘোষালের উপর আপনার মামা স্বর্গীয় মুরলী-নারায়ণবাবুর রাগের কি কারণ ছিল জানেন?

তাহলে দুঃখের সঙ্গে আপনাকে আমি জানাচ্ছি রবিশঙ্করবাবু, হীরা-চুনির কথা সম্পর্কে এখনো আমি স্থিরনিশ্চিত নই বটে, তবে তাদের মা সুষমা দেবী আজও বেঁচে আছেন। এবং আছেন রুক্মিণী দেবী ছদ্মনামে, আর বোধ হয় ছদ্মনামটা আপনাদেরই ভয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

মৃদু হাসলেন এবারে রবিশঙ্কর।

হাসছেন যে?

হাসছি এইজন্য যে, আপনিও ভুল সংবাদ পেয়েছেন। রুক্মিণী পান্নার দাই। তার মা সুষমা নয়।

সত্যি বলছেন আপনি?

নিশ্চয়ই। আর পান্না বেঁচে আছে জেনেই না সংবাদপত্রে তার নিখোঁজের সংবাদ সমেত পুরস্কার ঘোষণা করেছিলাম। যাতে করে পান্না তার পৈতৃক সম্পত্তিটা না। হতে পারে।

তার মা কিরীটী অদ্ভুত শান্ত ও কঠিন স্বরে বললে, সবই আপনি করেছিলেন মানে সু, কিন্তু সব করেও মাত্র একটি—হ্যাঁ, একটিমাত্র ভুল চালের জন্যই আপনি কি বলুন্মাত হয়ে গিয়েছেন। আর মাত্র দুটো দিন অপেক্ষা করুন, তার পরই সুষমার মন কি মারাত্মক ভুল চাল আপনি দিয়েছিলেন। এও নিশ্চয়ই বুঝতে কিরীটীর।ব পর্যন্ত যাই আপনি এতক্ষণ ধরে স্বীকার করুন না কেন, অকপটে সমস্ত শেষের কথানি বলেননি এখনো। আর সেইজন্যই রতনগড়ের রহস্য সম্পূর্ণরূপে যতক্ষণ তো মীমাংসিত হচ্ছে, দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, আপনাকে মথুরাপ্রসাদ চৌবের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া মিঃ হসকিনস্ স্বয়ং যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করেছেন, সেক্ষেত্রে কারুরই আমাদের কিছু বলবার বা করবার নেই।

হঠাৎ এতক্ষণ পরে যেন পূর্ব রবিশঙ্কর আবার ঘুমভেঙে উঠে বললেন, রবিশঙ্করকে নজরবন্দী করবার আগে একটা কথা মনে রাখবেন, আমিও সহজে আপনাদের নিষ্কৃতি দেব না। আগুনে হাত দেবার ফলাফলটা আপনাদেরও জানতে দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে এবারে কিরীটী মৃদু হাসল মাত্র।

অতঃপর ঘর থেকে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সরিয়ে সশস্ত্র চারজন প্রহরীর প্রহরায় রবিশঙ্করকে নজরবন্দী রাখবার ব্যবস্থা করে সকলে রতনগড় প্যালেস ত্যাগ করলেন।

॥ কুড়ি ॥

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ কিরীটী ডাক্তারের বাংলোতে ফিরে এল। বাইরের ঘরে তখনো আলো জ্বলছে দেখে একটু বিস্মিত হয়েই কিরীটী খোলা দরজা-পথে বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মিসেস ঘোষাল তাকে আহ্বান জানালেন, আসুন মিঃ রায়।

কিন্তু মিসেস ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়েই কিরীটী প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মিসেস ঘোষাল ?

উনি আমার কথা কিছুতেই শুনলেন নাঃ মিঃ রায়, রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় চলে গেলেন।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, হঠাৎ কলকাতায় গেলেন যে ?

জানি না। কিছুই বললেন না। কিন্তু কি হবে মিঃ রায় !

কি আবার হবে, চিন্তা করবেন না। বু দ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক, ছেলেমানুষের মত নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন না।…

কিন্তু মথুরাপ্রসাদ যে আপনার কথায়ই—

সে দায়িত্ব আমার। সে যা করবার আমিই করব।

আমি যাই। আপনার খাবারটা—

ব্যস্ত হবেন না, বসুন। মথুরাপ্রসাদের ওখান থেকেই খেয়ে এসেছি।

কিরীটী চামড়ার সিগার কেসটা থেকে একটা সিগার বার করে তাতে অগ্নি-সংযোগে প্রবৃত্ত হল।

হঠাৎ মিসেস ঘোষালই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, কিরীটীবাবু !

বলুন।

আমার ননদ সুষমা সম্পর্কে আপনাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

দেখুন মিঃ রায়, তখন আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলতে পারিনি। কিন্তু আপনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছি। ভেবে মনে হল, আপনার কাছে সব কথা খুলে বলা প্রয়োজন। আপনাকে বলেছিলাম সুষমা মারা গিয়েছে—

কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন, তাই না ? কথাটা আমি জানতাম।

আপনি জানতেন !

হ্যাঁ। আর এও জানি, তাঁকেই জগদীশনারায়ণ গোপনে বিবাহ করেছিলেন।

আপনি—আপনি এসব কথা কি করে জানলেন ?

কি করে জানলাম সে কথা থাক। আপনি কি বলতে চাইছিলেন তাই বলুন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস ঘোষাল ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, মায়ের পেটের বোনকে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু সুষমাকে আমার স্বামী যতখানি ভালবাসত, বোধ হয় খুব কম ভাই-ই বোনকে অতখানি ভালবাসতে পারে। নিজের গান-বাজনার সখ থাকার দরুন কত যত্নে ও অধ্যবসায়ে যে তিনি তাঁর বোনকে গান শিখিয়েছিলেন, তা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। শুধু গান-বাজনা কেন, লেখাপড়া, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো—সব কিছু বোনকে তিনি হাতে করে শিখিয়েছেন। সেই বোন যখন হঠাৎ কলকাতার কোন একটা গানের ফাংশনে গান গাইতে গিয়ে জগদীশ নারায়ণের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এবং সেই আলাপ ক্রমে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে গোপনে তাকে বিবাহ করে একটা পত্র মারফৎ আমার স্বামীকে জানায়, সে বুঝতেও পারেনি কত বড় মর্মান্তিক আঘাত সে হেনেছিল তার দাদার বুকে। সেই সংবাদে আমার স্বামী যেন পাগলের মতই হয়ে গেলেন। গান-বাজনা ছেড়ে দিলেন, লোকের সঙ্গে মেশা ছেড়ে দিলেন, চার মাস অবধি একজনও রোগী পর্যন্ত দেখেননি। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতেন।

গানের প্রসঙ্গে সেদিন আপনার স্বামীর চাঞ্চল্য দেখে ঐরকম একটা কিছু আমি অনুমান করেছিলাম মিসেস ঘোষাল। কিরীটী বললে।

যে বোনকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবারও যেন কারো অধিকার ছিল না পরে। যাহোক তারপর আবার একসময় ধীরে ধীরে আমার স্বামী কাজকম দেখতে শুরু করলেন। এমনি করে বছর চারেক কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন রতনগড় থেকে মুরলীনারায়ণ আমার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন।

কিন্তু কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন জানেন কি ?

না। পরে এটা বুঝেছিলাম, একটা গুরুতর কিছু—

হ্যাঁ, আপনার স্বামী তখনো ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে মুরলীনারায়ণ সিংহ তাঁর আপন দাদু। তাঁরই মায়ের বাপ—

সে কি ! বিস্ময়ে যেন একেবারে চমকে ওঠেন মিসেস ঘোষাল।

সত্যিই তাই মিসেস ঘোষাল। আপনার শাশুড়ী বিমলা দেবী, মুরলীনারায়ণেরই একমাত্র কন্যা, যিনি তাঁর পিতার অমতে গোপনে রতনগড় থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁরই পিতার অধীনস্থ এক কর্মচারী রমাকান্ত ঘোষাল—আপনারই শ্বশুরমশায়কে ভালবেসে বিবাহ করেছিলেন। এবং যে কারণে পিতা তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুসংবাদ রটনা

রে দিয়েছিলেন।

এসব আপনি কি বলছেন মিঃ রায়?

— বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য হলেও কঠিন সত্য। তাই মুরলীনারায়ণ তাঁর একমাত্র পুত্রের রই নিজের ভগ্নীকে বিবাহ করার ব্যাপারটা ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেননি!

তাই—তাই সেদিন আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম!

অথচ কথা কি জানেন, সুষমা দেবী ও জগদীশনারায়ণ কাউকেই এ ব্যাপারে দোষী রা চলে না, কারণ দুজনের একজনও পরস্পরের সত্যিকার সম্পর্কটা জানতেন না যে তাঁরা পরস্পরের মামা ও ভাগ্নী। আর যদি জানতে পারতেনও, তাতেও কিছু এসে যেত বলে মনে হয় না। কারণ সম্পর্কটা একটা নিছক সামাজিক সংস্কার ছাড়া আর কিছুই তো নয়।

তবু, ছিঃ ছিঃ, এ যে ভাবতেও পারছি না আমি মিঃ রায়। হতভাগী এমনি করে আমাদের মুখ পুড়িয়েছে। এর চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে সে মরল না কেন? কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি মিঃ রায়, আমার স্বামী কেন রতনগড়ে মুরলীনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে আসবার অনেকদিন পরে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশাইয়ের জীবনে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূলে হচ্ছে ঐ শয়তান মুরলীনারায়ণ। জীবনে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও তাঁর জীবনে একদিনের জন্য ও নাকি শান্তি ছিল না। নানাভাবে যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, চক্রান্ত করে আমার শ্বশুরমশাইকে তিনি কি কেবলই পর্যুদস্ত করেছেন। রক্তগত শনির মতই যেন তাঁর জীবনের সমস্ত শান্তি ও সুখই হরণ করেছিলেন। এখন বুঝতে পারছি তাঁর কন্যাকে তাঁর অজ্ঞাতেই বিবাহ করবার অপরাধে আমার শ্বশুরমশাইকে কোনদিনই তিনি ক্ষমা করতে পারেননি যতদিন বেঁচেছিলেন। আর পিতার দুঃখের কারণ হয়েছিলেন বলেই মুরলীনারায়ণকেও আমার স্বামী কোনদিন ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেননি।

সম্ভবত তাই। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনো আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি মিসেস ঘোষাল, ম্যানেজার সলিল সরকার এর মধ্যে—এই জটিলতার মধ্যে কি ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। আর যতক্ষণ না সেটা পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর হত্যার কারণটাও পরিষ্কার হচ্ছে না। আমার মনে হয় আপনার স্বামী হয়তো এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারতেন, কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি চুপ করে রইলেন।

সেও ঐ পারিবারিক কারণেই মিঃ রায়।

এখন সেটা বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু যাক সেকথা। অন্য একটা প্রশ্ন আমার আপনাকে করবার আছে। সলিল সরকার যেরাত্রে নিহত হন, সেরাত্রে আপনার স্বামী

বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন কেন কিছু জানেন ?

একটা জরুরী চিঠি পেয়ে তিনি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

জরুরী চিঠি! কা'র চিঠি ?

কার চিঠি জানি না। সেইদিন দুপুরের দিকে এখানকারই একজন স্থানীয় লোকে তাঁকে চিঠিটা দিয়ে যায়। চিঠিটা যখন তিনি পান আমি তখন পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। চিঠিটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখের অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, কার চিঠি ? কে লিখেছে ? কিন্তু আমার স্বামী কোন জবাব দেন না। মনে কেমন আমার সন্দেহ ও কৌতূহল জাগে। স্বামী চিঠিটা হাতে করে ডিস্‌পেনসারিতে চলে যান। বিকেলের দিকে তিনি একটা কলে বের হয়ে যাবার পর, ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা বইয়ের মধ্যে চিঠিটা পেয়ে আমি পড়ি।

কি লেখা ছিল চিঠিটায় ?

সে এক অদ্ভুত চিঠি। তাতে মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল :

আজ রাত্রে দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে বড় সড়কের টিলাটার সামনে যেখানে একজোড়া ইউক্যালিপটাস গাছ আছে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করো যদি নিজের মঙ্গল চাও। সাবধান, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানতে পারে। ইতি

তোমার কোন বিশেষ শুভার্থী।

চিঠিটা কি রকম কাগজে লেখা ? আর হাতের লেখাটাই বা কি রকম ছিল মনে আছে আপনার ?

সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটা মোটা সাদা কাগজে—যে সব কাগজে সাধারণত ড্রয়িং করা হয়, আর লেখাটা ঠিক অবিকল ছাপানো বাংলা টাইপের মত তবে অক্ষরগুলো একটু বড় বড়। প্রথম তো ভেবেছিলাম বুঝি ছাপাই, পরে লক্ষ করে বুঝেছিলাম, খুব সরু তুলি ও কালো রং দিয়ে লেখা।

আশ্চর্য তো !

হ্যাঁ।

বুঝতে পারেননি বোধ হয় যে লেখক তার হাতের identityটা গোপন করবার জন্যই ঐভাবে চিঠিটা লিখেছিলে।

আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে সত্যিই হয় তো তাই।

মনে হচ্ছে নয় মিসেস ঘোষাল, সত্যিই তাই। যাক সে চিঠিটা—

কয়েকদিন আগে খুঁজেছিলাম আবার চিঠিটা, কিন্তু আর দেখতে পাইনি।

তাহলে আপনার মনে হয় ঐ চিঠি পেয়েই আপনার স্বামী সে রাত্রে—

হ্যাঁ, তাই আমার মনে হয়। এবং আমাকে না জানিয়ে সেরাত্রে যখন তিনি আমাকে নিদ্রিত জেনে বের হয়ে যান, তখন আমি জেগেই ছিলাম, ঘুমাইনি। কিন্তু সে কথা আজও তিনি জানেন না।

আচ্ছা সেরাত্রে যখন তিনি বের হয়ে যান তাঁর হাতে বন্দুক ছিল?

না।

ঠিক বলছেন, বন্দুক ছিল না তাঁর হাতে সেরাত্রে বাইরে যাবার সময়?

ঠিকই বলছি।

বাড়ির কোন্ দরজা দিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন?

পিছনের বাগানের দরজাপথে।

আচ্ছা আপনার স্বামীর বন্দুকটা আপনি শেষ কবে দেখেছেন?

১২ই তারিখে দুপুরের দিকে বন্দুকটা আমি আমার স্বামীকে পরিষ্কার করতে দেখেছিলাম। এবং বিকেলের দিকে যে ঘরে বন্দুকটা থাকত সে ঘরে ঢুকে বন্দুকটা খাপসমেত দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে দেখেছিলাম।

কিন্তু বন্দুকটা শুনেছি চেস্ট-ড্রয়ারে থাকত!

হ্যাঁ, তাই থাকত বটে, তবে সেদিন দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানোই দেখেছিলাম।

তার পর বন্দুকটা নেই জানলেন কবে?

পরের দিন সলিল সরকারের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে মথুরাপ্রসাদ আমাদের এখানে এসে কথাবার্তার পর আপনাকে সঙ্গে করে যখন চলে গেলেন, আমার স্বামী ভিতরের দিকে গেলে আমি রান্নাঘরে গেলাম। হঠাৎ তিনি আমাকে ডাকলেন নাম ধরে। ডাক শুনে যে ঘরে বন্দুকটা থাকত সেই ঘরে গিয়ে দেখি হতভম্বের মত আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, সর্বনাশ হয়েছে রমা। বন্দুকটা দেখছি না তো। বললাম, সে কি! অন্য কোথাও রাখনি তো? কালই তো বন্দুকটা পরিষ্কার করছিলে। তাতে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরিষ্কার করে দেয়ালের গায়েই তো দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম ঐখানে।

আচ্ছা মিসেস ঘোষাল, আপনাদের এখানে আপনারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও একজন তোলা রাঁধুনী ও চাকর ভুলু আছে, তাই না?

হ্যাঁ। রাঁধুনী এখানে থাকে না, ভুলুই দিনরাত থাকে।

লোকটা কেমন?

দশ বছর আমাদের কাছে আছে, অত্যন্ত বিশ্বাসী।

আচ্ছা যেরাত্রে ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটে, সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আপনাদের

দুজনেরই স্বামী-স্ত্রীর মুভমেন্টস্ যতটা আপনার মনে আছে বলবেন কি ?

বেলা এগারোটা পর্যন্ত আমি রান্নাঘরে ছিলাম। আর আমার স্বামী সকালে চা খেয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন সেই বারোটায়। তারপর দুপুরটা আমি ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙে বেলা তিনটে নাগাদ। উনি দুপুরে আবার একটা কলে যান, ফেরেন পৌনে তিনটে নাগাদ বোধ হয়। তার পর চা পানের পর আমি রান্নাঘরে যাই, উনি যান ডিস্‌পেনসারিতে।

অর্থাৎ সেদিনটা আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজনের একজনও বন্দুক যে ঘরে থাকত সে ঘরে যাননি ?

না।

হঠাৎ দেওয়াল-ঘড়িতে এমন সময় ঢং করে রাত্রি একটা ঘোষণা করতেই কিরীটী বলে, না, আর না, অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি আপনাকে, আপনি এবার শুতে যান।

মিসেস ঘোষালকে বিদায় দিয়ে কিরীটীও নিজের নির্দিষ্ট শয়নঘরের দিকে পা বাড়াল।

॥ একুশ ॥

পরের দিন বেলা আটটা নাগাদ চা পান করে কিরীটী থানায় গিয়ে হাজির হল। মিঃ হসকিনস্ তখন চা, টোস্ট, মাখন, আণ্ডারপোচ ইত্যাদি সহযোগে রাজসিক ব্রেকফাস্টএ ব্যস্ত।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে বসতেই মিঃ হসকিনস্ বললেন, আমি আজ রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যেতে চাই রায়।

বেশ তো। তাই যেও। এখন একবার আমাদের রতনগড় প্যালেসটা ভাল করে খানাতল্লাসী করতে হবে। তোমার ব্রেকফাস্ট শেষ হলেই আমরা উঠতে পারি।

আমারও যাওয়া একান্তই দরকার মনে কর নাকি রায় ?

হ্যাঁ।

রতনগড় প্যালেসের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখে বেলা এগারোটা নাগাদ কিরীটী আবার ডাঃ ঘোষালের বাংলোতে ফিরে এল। সত্যি কথা বলতে কি, রতনগড় প্যালেস তল্লাসী করে কিরীটী যেন মনে মনে একটু নিরাশই হয়েছিল। আসবার সময় কিরীটী একবার রবিশঙ্করের খোঁজ নিয়েছিল। গত রাত থেকেই লোকটা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন।

ভৃত্য আহার্য নিয়ে গিয়েছিল, স্পর্শমাত্রও করেন নি। রতনগড়ের কর্মচারী ও ভৃত্যের দল রবিশঙ্করের ভাগ্যবিপর্যয়ে সকলেই মনে মনে যে খুশী হয়েছিল, তাদের চোখে-মুখেই সেটা ফুটে উঠেছিল, একমাত্র রবিশঙ্করের প্রিয় নেপালী ভৃত্য জঙ বাহাদুর ছাড়া।

কিরীটীর নির্দেশমত তাকেও অস্ত্রহীন করা হয়েছিল, তথাপি লোকটা সেই গত রাত থেকেই দরজার গোড়ায় ঠুঁটো জগন্নাথের মত যেন বসে আছে।

সমস্তটা দ্বিপ্রহর বসে বসে কিরীটী লালবাজারে তার এক বন্ধু স্পেশাল ব্রাঞ্চ ডিটেকটিভ ইন্‌সপেকটারের নামে এক দীর্ঘ পত্র লিখে সন্ধ্যায় গিয়ে মথুরাপ্রসাদেরই একজন লোক মারফৎ পত্রটা ঐদিনই ট্রেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে এল।

মিঃ হসকিনস্‌ও ঐদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরে গেলেন।

দিন চারেক বাদে সেদিন রাত্রে।

ডাঃ ঘোষালের কোন সংবাদ তখনও পাওয়া যায়নি।

কিরীটী ও মিসেস ঘোষাল বসে গল্প করছিলেন।

হঠাৎ বাইরে একটা ভারী জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

কিরীটীই প্রথমে শব্দ শুনতে পেয়ে বলে, কে যেন এল বলে মনে হচ্ছে, জুতোর শব্দ পেলাম। এবং পরিচিত জুতোর শব্দ বলেই যেন মনে হচ্ছে। এ জুতোর শব্দ চেনা, আমার চেনা।

বলতে বলতেই মচমচ জুতোর শব্দ তুলে দীর্ঘকায় এক আগন্তুক ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

ভদ্রলোকের পরিধানে তসরের স্যুট। মুখে কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চমৎকার পাকানো একজোড়া কালো গোঁফ। মাথায় ঘন কালো চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। চোখে দামী সোনার ফ্রেমের চশমা।

এক হাতে একটা স্যুটকেস ও এক হাতে দামী মলাক্কা বেতের ছড়ি একটা।

আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, কে, বৌদি না?

এ কি ঠাকুরপো!

Thank my star! যাক, তাহলে চিনতে পেরেছ। কিন্তু দাদা কই?

বসো ঠাকুরপো, বসো।

তা বসছি। After a pretty long time, কি বল! তা বছর কুড়ি-একুশ হবে।

তা বৈকি।

কিরীটী কিন্তু ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরেই চমকে উঠেছিল। মিসেস ঘোষাল সম্বোধন করলেন ঠাকুরপো বলে। তবে কি ইনিই সেই ডাঃ ঘোষালের একমাত্র ছোট ভাই রতিকান্ত ঘোষাল? কিন্তু কোথায় কবে যেন ঐ কণ্ঠস্বর সে শুনেছে!

তাছাড়া ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি চক্ষু, খাঁড়ার মত উঁচু নাকটা, উপরের পাটির দাঁতগুলো যেন একটু তেমনি উঁচু বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু বাঁ কপালের উপরে ঐ ক্ষতচিহ্নটা! আর ফ্রেঞ্চকাট কালো দাড়ি! মাথার ঘন কালো চুল!…

খানিকটা মিলল আবার খানিকটা একেবারেই যেন মিলছে না। অত্যন্ত পরিচিতির মধ্যেও যেন একটা অপরিচয়ের নতুনত্ব। স্পষ্টের মধ্যে খানিকটা অস্পষ্টতা।

কিরীটী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের মুখের দিকে।

হঠাৎ এমন সময় কিরীটীর প্রতি নজর পড়ায় যেন আগন্তুক সচকিত হয়ে উঠে মিসেস ঘোষালকে প্রশ্ন করে, ইনি—এঁকে তো চিনতে পারলাম না বৌদি!

ইনি কিরীটী রায়। আমাদের বিশেষ বন্ধু।

নমস্কার। হাত তুলে আগন্তুক কিরীটীকে নমস্কার জানাল।

কিরীটীও প্রতি নমস্কার জানায়।

আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—কিরীটী কথাটা আর না বলে যেন পারে না।

আমাকে? তা দেখে থাকবেন, আশ্চর্য কি! আমি তো কলকাতাতেই বরাবর আছি, তবে গত বছর চারেক ভারতবর্ষের বাইরে বাইরে ঘুরছি।

ঠাকুরপো দেখছি ঠিক কুড়ি বছর আগের মতই আছ।

হ্যাঁ, ব্যাচিলার ব্রহ্মচারী মানুষ। কিন্তু দাদার খবর কি? এতকাল তোমরা তো আমার খবর পর্যন্ত নাওনি একটা।

হঠাৎ এমন সময় ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি দশটা ঘোষণা করতেই কিরীটী যেন আর একবার চমকে উঠল। এবং কিছুক্ষণ অপলকে ঘড়িটার দিকে চেয়ে রইল।

কিরীটী আবার যখন ঘড়ি থেকে দৃষ্টি নামিয়ে অদূরে উপবিষ্ট আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকাল, তিনি তখন সামনের টেবিলের উপর বাঁ হাতটা রেখে সোৎসাহে তাঁর বৌদিকে কি যেন বলছেন।

ভদ্রলোকের টেবিলের উপরে রক্ষিত বাঁ হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই সহসা কিরীটীর চোখের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল। নির্নিমেষে সে চেয়ে রইল সেই দিকে

আরো মিনিট পাঁচেক বাদে হঠাৎ কিরীটী উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ঘোষালের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনারা গল্প করুন মিসেস ঘোষাল, আমি এখুনি আসছি।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে কিরীটী ফিরে এল।

বাইরের ঘরে প্রবেশ করতেই সে দেখল, দুজনে তখনও গল্প করছেন। মিসেস ঘোষালই বললেন, কোথায় গিয়েছিলেন মিঃ রায় হঠাৎ উঠে?

মাথাটা বড্ড ধরেছে, তাই একটু বাইরে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

কিরীটী লক্ষ্য করল, আগন্তুক ইতিমধ্যে কখন একসময় সুট্ ছেড়ে একটা স্লিপিং পায়জামা ও একটা কিমোনো গায়ে দিয়েছেন। মুখে একটা পাইপ।

আমি মশাই আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, feeling too hungry—খেয়ে নিয়েছি। আগন্তুক বললেন।

তা বেশ করেছেন।

আপনার খাবার দিই মিঃ রায়? মিসেস ঘোষাল শুধালেন।

বেশ তো, দিন। আপনারটাও নিয়ে আসবেন কিন্তু।

আমি এবেলা আর কিছু খাব না।

তা হবে না মিসেস ঘোষাল। আপনি না খেলে আমিও খাব না।

অগত্যা মিসেস ঘোষালকেও বসতে হল কিরীটীর সঙ্গে আহারে।

আহারাদির পর তিনজনে এসে বাইরের বারান্দায় বসে আবার গল্প শুরু করেন। ডাঃ ঘোষালের ছোট ভাই তাঁর বিদেশভ্রমণের কাহিনী ফলাও করে বলে যাচ্ছেন, এমন সময় দূরে টমটমের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের টমটমের শব্দ না! মিসেস ঘোষালই বললেন কথাটা।

হ্যাঁ ডাঃ ঘোষাল বোধ হয় এলেন। কিরীটী জবাব দিল।

বলতে বলতে টমটমটা এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ডাঃ ঘোষাল টমটম থেকে নেমে এলেন।

সকলেই তাঁর দিকে তাকালেন।

বিষণ্ণ ক্লান্ত চেহারা, সমস্ত চোখেমুখে ও পোশাকের মধ্যে একটা অগোছালো ক্লান্তি।

দাদা!

ছোট ভাইয়ের ডাকে ডাঃ ঘোষাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি!

হ্যাঁ, but at this unearthly hour, তুমি এমন ঝড়ো-কাকের মত কোথা হতে আসছ? Where had you been so long? বৌদির মুখে শুনলাম এসে, কাউকে কিছু না বলে তুমি নাকি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে!

যাও যাও, হাতমুখ ধুয়ে গা থেকে ওগুলো নামাও। আর তোমাদের এখানে আ[illegible] থাকতে দেব না। কলকাতায় নিয়ে যাব।···

ঝড়ের মতই যেন একটানা কথাগুলো বলে গেলেন ডাঃ ঘোষালকে তাঁর ভাই।

মিসেস ঘোষাল একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন এতক্ষণ। সে[illegible] দিকে তাকিয়ে ডাঃ ঘোষাল স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি করে জানলে রা[illegible] যে আজই আমি আসব?

আমি—

হ্যাঁ, টমটম পাঠিয়েছ!

উনি নন, টমটম পাঠিয়েছিলাম আমি। কথাটা কিরীটী বললে।

কিরীটীর কথায় ডাঃ ঘোষাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

অনুমান। যাক সেকথা, কিন্তু অমন করে আপনি কাউকে কিছু না জানি[illegible] চলে গিয়েছিলেন কেন বলুন তো?

সেসব কথা পরে হবে। He looks tired! ওর এখন বিশ্রামের দরকার যাও বৌদি ওর হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে, আগে ওকে কিছু খেতে দাও। যা[illegible] বাধা দিলেন ডাক্তারের ছোট ভাই।

বাইরে এমন সময় একসঙ্গে তিন-চার জোড়া জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

জুতোর শব্দে সকলেই একসঙ্গে দরজার দিকে ফিরে তাকায়।

প্রথমে ঘরে ঢুকলেন থানা অফিসার মথুরাপ্রসাদ চৌবে, তাঁর পশ্চাতে কলকা[illegible] হতে আগত সি. আই. ডি. অফিসার মন্মথ চৌধুরী ও দুজন কনস্টেবল।

সকলেই মধ্যরাত্রির ঐ আগন্তুকদের দেখে বিহ্বল নির্বাক।

কথা বলল কিরীটী, আসুন, you all are Just in time!

হঠাৎ ঐ সময় যেন পাগলের মতই মিসেস ঘোষাল চিৎকার করে উঠলেন। চেয়[illegible] থেকে উঠে স্বামীকে এসে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, না না—আপনাদের ওঁ[illegible] আমি অ্যারেস্ট করতে দেব না।

কিরীটী উঠে এসে মিসেস ঘোষালের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত সহানুভূতির কণ্ঠে বল[illegible] বসুন, বসুন মিসেস ঘোষাল। ব্যস্ত হবেন না।

না না, মিঃ রায়, আমি আপনাকে বলছি উনি সলিল সরকারকে হত[illegible] করেননি। বলতে লাগলেন মিসেস ঘোষাল।

কি—ব্যাপার কি দাদা? এসব কি? ছোট ভাই দাদাকে প্রশ্ন করলেন। তার
াবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ রায়, কি ব্যাপার? What
:his?

ব্যস্ত হবেন না, একটু সকলে স্থির হয়ে বসুন, সবই জানতে পারবেন। কিরীটী
র দেয়।

দকলে আবার যে-যার জায়গায় বসবার পর কিরীটী মথুরাপ্রসাদের দিকে
য়ে প্রশ্ন করল, আর নতুন কিছু স্বীকার করলেন আপনাদের রবিশঙ্কর,
চৌবে?

হ্যাঁ, সেদিন বলেছিলেন বাঘ শিকার করতে নাকি সেরাত্রে বন্দুক নিয়ে বের
ছিলেন, কিন্তু আজ বললেন তা নয়। একজনের একটা চিঠি পেয়েই নাকি রাত্রে
্যালিপটাস গাছের নীচে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

বটে? তবে বন্দুকে দুবার ফায়ারিং করেছিলেন কেন?

এখন বললেন firing নাকি আদৌ করেননি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না
কথা মিঃ রায়, he is a damn liar!

যাক সে চিঠিটা কোথায় কিছু বললেন?

হ্যাঁ, এই যে সেই চিঠি। বলতে বলতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন
াপ্রসাদ কিরীটীর দিকে।

আলোয় কাগজের ভাঁজটা খুলে সেটা পড়তে পড়তে সহসা কিরীটীর চোখের
দুটো যেন কি এক দীপ্তিতে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। তারপরই মৃদু চাপা উত্তেজিত
বলে, পেয়েছি—নিঃসংশয়ে এতক্ষণে পেয়েছি!

কি বলছেন মিঃ রায়? মথুরাপ্রসাদই প্রশ্ন করেন।

অন্য সকলে নিঃশব্দ।

পেয়েছি—সলিল সরকারের হত্যাকারীকে পেয়েছি মথুরাপ্রসাদবাবু!

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই সোৎসুক ব্যগ্রদৃষ্টিতে যুগপৎ কিরীটীর মুখের দিকে
াল।

॥ বাইশ ॥

টী বলতে লাগল:

হত্যাকারী অতীব ধূর্ত। এবং তার লক্ষ্য ঠিক সলিল সরকার ছিল না। ছিল

সম্পূর্ণ অন্য লোক। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রে সলিল সরকার নিহত হয়েছেন।

কি বলছেন মিঃ রায়? প্রশ্ন করেন মথুরাপ্রসাদ সবিস্ময়ে।

ঠিকই বলছি মিঃ চৌবে। হত্যাকারী তার পূর্ব প্ল্যান অনুযায়ী দুখানা চিঠি একই সময়ে একই জায়গায় অর্থাৎ অকুস্থানে দুজনকে ডেকে পাঠায়—একজন হত্যা করবে, আর দ্বিতীয়জন, নির্বিবাদে যার ঘাড়ে হত্যার সমস্ত দায়িত্ব চা দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি মাঝখানে পড়ে তার সমস্ত পরিকল্পনাটাকে দিল ওলটপালট করে। সলিল সরকারের নিয়তি তাঁকে অ টেনে নিয়ে গেল, ফলে যার মরবার কথা তার বদলে তিনি দিলেন প্রাণ। হত্যা যখন পরের দিন জানতে পারলে ব্যাপারটা একটু ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, ভেবেছিল ঠিক জানি না, তবে ঘুণাক্ষরেও নিশ্চয়ই সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে জানতেও পারেনি যে, সবার অলক্ষ্যে যে একজন বিচারক আমাদের সকল পুণ্যের বিচার করছেন, তাঁরই অলঙ্ঘ্য নির্দেশে কিরীটী রায়কে সেরাত্রে থাকতে হয়েছিল ডাঃ ঘোষালের দাবা খেলার অনুরোধ না এড়াতে পেরে। আর একটা জিনিসই যে হত্যাকারীরা সর্বক্ষেত্রেই ভুলে যায়, হত্যা কখনো চাপা না। মৃত্যুই তার পশ্চাতে রেখে যায় তার সুনিশ্চিত পথরেখা।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই নির্বাক ও স্তম্ভিত। একাগ্র কৌতূহলে শুন যেন কিরীটীর কথা।

কিরীটী আবার শুরু করে।

হত্যার মোটিভ বা উদ্দেশ্যে আমি পরে আসছি। আগে আমি বলব, কি ক রাত্রে হতভাগ্য সলিল সরকার নিহত হয়েছিলেন। আগেই বলছি, পূর্ব হতেই কল্পনা করে আটঘাট বেঁধে হত্যাকারী আসরে নেমেছিল। যাকে হত্যা করা এবং যার ঘাড়ে দোষ চাপাবে ঠিক করেছিল, তাদের দুজনকেই দুখানা চিঠি দেয় সময় একই জায়গায় দেখা করবার জন্য। বেনামা চিঠির এমনই আকর্ষণ একটা যে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া, বলতে গেলে প্রায় মানুষমাত্রের পক্ষেই দুঃসাধ্য হয় করে ঠিক গোপনতার প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক লোভ বা কৌতূহল আ কিন্তু যাক যা বলছিলাম। হত্যাকারী একজনকে সেরাত্রে হত্যা করবার জন্য হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, আর এক তৃতীয় হতভা শেষের মুহূর্তটা সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে! এবং শুধু তাই নয়, সে যদি দৈব সেরাত্রে বেঁচেও যেত, তাহলেও তার নিস্তার অবিশ্যি ছিল না। প্রাণ তাকে দি হত আর দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো।

তার মানে ? প্রশ্নটা করলেন মথুরাপ্রসাদ।

মথুরাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, তার মানে হত্যাকারী সেরাত্রে র পূর্ব পর্যন্তও জানত না যে, তার পরিকল্পনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে বাধা হয়ে বে সে হচ্ছে ঐ সলিল সরকারই। যাকে সেরাত্রে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে ছিল সে নয়, কিন্তু সে যাকে সেরাত্রে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তাকে হত্যা ার পরই সে হত্যাটা আর হত্যাকারীর কাছে গোপন থাকত না। কিন্তু মৃত্যু নে সাক্ষাৎ নিয়তি হয়ে হতভাগ্য সলিল সরকারের একেবারে শিয়রে এসে য়েছে, সেখানে তাঁকে বাঁচায় কার সাধ্য।

বলতে বলতে কিরীটী একটু থেমে যেন নিজের ভাবধারাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে ার শুরু করল তার রতনগড় হত্যারহস্যের উদ্ঘাটন :

শুধু সেরাত্রে সলিল সরকারের মৃত্যুকেই যে নিয়তি এগিয়ে এনেছিল তাই নয়, িও সহসা অন্ধ ঝড়জল নিয়ে যেন হত্যাকারীকে সাহায্য করতেই চারিদিক থেকে য়ে এগিয়ে এসেছিল।

হত্যাকারীর চিঠি পেয়ে দুজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান থেকে যখন অকুস্থানে এগিয়ে ছ, তখন আকাশে ঝড়জলের তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তার কিছু পূর্বেই মৃত্যু-ত্যব অন্ধ আকর্ষণে হতভাগ্য সলিল সরকার আমার সঙ্গে এসে দেখা করবার জন্য গড় প্যালেস থেকে বের হয়ে এসেছেন।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ? আবার বাধা দিলেন মথুরাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, মথুরাপ্রসাদবাবু। সলিল সরকার সেরাত্রে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমার এই বাড়িতেই গোপনে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এবং ফিরবার পথেই তিনি -কারীর পূর্ব সঙ্কল্পিত ব্যক্তি ভ্রমে ঠিক সেই টিলাটার কাছাকাছি ইউক্যালিপটাস দুটোর বরাবর পৌঁছাতেই হত্যাকারী ফায়ার করে দুবার।

কিন্তু রবিশঙ্কর যে নিজে মুখেই বলেছেন—

বাধা দিল কিরীটী আবার মথুরাপ্রসাদের কথায়, হ্যাঁ—যে তিনি দুবার ফায়ার ছিলেন, কিন্তু সেকথা তাঁর মিথ্যা।

মিথ্যা !

হ্যাঁ, কারণ তার যে বন্দুকটা আমরা সেরাত্রে তাকে নজরবন্দী করে রাখার পর করে নিয়ে এসেছিলাম, সেটা পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, যে ধরনের ইংলিশ নর গুলিতে সলিল সরকারের মৃত্যু হয়েছে এবং তার মৃতদেহে যে বুলেট ময়না-ন্তের সময় পাওয়া গিয়েছে, সেটা আর রবিশঙ্করের গান-টা একজাতীয় নয়।

একটা অর্ডিনারী ডবলব্যারেল ইংলিশ গান, অন্তটা রাইফেল। দুটোর মেকানি
ও ম্যাগাজিন সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু এভাবে তাহলে নিজের ঘাড়ে দোষ নেওয়ার তার কি মানে হতে পা
আবার শুধালেন চৌবে।

সেও হত্যাকারীর ভয়ে।

ভয়ে!

আশ্চর্য হচ্ছেন মথুরাপ্রসাদবাবু আমার কথা শুনে, তাই নয়? কিন্তু সত্যিই তা
রবিশঙ্কর লোকটা আসলে যেমন ভীতু, তেমনি দুর্বল। নইলে আজ চার-পাঁচ দিন
নির্বিবাদে প্রাসাদের মধ্যে আমাদের বন্দীত্ব মেনে নিয়ে চুপচাপ অমন থাকতেন
তার যা কিছু আস্ফালন তার পশ্চাতে ছিল হত্যাকারীর দুঃসাহস ও ব্যক্তিত্ব। যা
বলছিলাম, দৈবক্রমে সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি নিহত হবার পর হত্যাকারী যে দুজনকে সেরা
সেখানে গোপনে পত্র দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তার আকস্মিক বন্দুকের গুলির
বিহ্বল হয়ে যে যার আবার গৃহে ফিরে যায়। হত্যাকারীও বোধ হয় সলিল সরকা
শেষ মুহূর্তের চিৎকারে বুঝতে পেরেছিল যে, ভুলক্রমে সে সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তিকে হ
করেছে। কতকটা তাও বটে, আবার কতকটা একটা হত্যা করবার পর সমস্ত সি
শনটা ওলটপালট হয়ে যাওয়ায় স্থানত্যাগ করতে সে বাধ্য হয়। এবং স্থান ত্যাগের
হত্যার জন্য যে গান-টা সে ব্যবহার করেছিল সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং বন্দু
ট্রিগারে যাতে তার আঙুলের ছাপ না পড়ে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করে যে দস্ত
ব্যবহার করেছিল সে দুটোও হাত থেকে পরম নিশ্চিন্তে খুলে ফেলে দেয়। কিন্তু ব
লাম না যে, মৃত্যু সর্বদা তার পথ-রেখা রেখে যায় পশ্চাতে। সেই পথ-রেখাই আম
চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। যথেষ্ট বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গেই হত্যাক
সঙ্কল্প নিয়েছিল—আর একজন নিরীহ ব্যক্তির উপরে, যদি ধরা পড়েও, তাতে
যাতে তারই কাঁধে সমস্ত হত্যাপরাধটা চাপে, তাই তারই বন্দুক ও দস্তানা চুরি
নিয়ে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না। দস্তানাটা হাত থে
খুলে ফেলবার সময় হত্যাকারী বুঝতেও পারেনি যে, হত্যার মোক্ষম নিদর্শন-স্ব
দস্তানাটা হাত থেকে খুলে ফেলবার সময় তার অলক্ষ্যে তার আঙুলের তার না
আদ্যাক্ষর মিনাঙ্কিত আংটিটাও খুলে দস্তানার মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

আংটি! প্রশ্ন করলেন মথুরাপ্রসাদ চৌবে।

হ্যাঁ। বলতে বলতে পকেট থেকে দস্তানা দুটো ও 'R' মিনাঙ্কিত আংটিটা
করে কিরীটী টেবিলের উপরে রেখে বললেন, এই সেই দস্তানা ও আংটি। আর

াম খোদাই করা বন্দুকটাও যে আমি পেয়েছি সেখানেই কুড়িয়ে, সেটা আমার কাছে এখনও আছে।

সকলে যেন স্তম্ভিত নির্বাক।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, সেই বন্দুক ও এই দস্তানা দুটোই হচ্ছে আমাদের ডাক্তারবাবুর—ডাঃ শ্যামাকান্ত ঘোষালের। তাই না ডাক্তারবাবু?

বিহ্বলভাবে শুধু মাথাটা ঈষৎ নাড়লেন ডাঃ ঘোষাল।

তবে ডাক্তারবাবুর ঘাড়েই হত্যাকারী দোষটা চাপাতে চেয়েছিল? প্রশ্ন করলেন মথুরাপ্রসাদ।

হ্যাঁ। আর হত্যাকারী সেরাত্রে চেয়েছিল হত্যা করতে হতভাগ্য সলিলকে নয়, ার পথের শেষ কাঁটা রবিশঙ্করকে।

রবিশঙ্করকে! এবারে কথা বললেন মিসেস ঘোষাল।

হ্যাঁ, রবিশঙ্করকে। কারণ হত্যাকারী ভাল করেই জানত পারিবারিক ব্যাপারে ডাঃ ঘোষালের ও রতনগড়ের মালিক রবিশঙ্করের প্রতি আক্রোশের কথাটা। সেই আক্রোশটাকে পুলিস অনায়াসেই হত্যার কারণ বলে ধরে নেবে এবং ডাঃ ঘোষালকে হত্যাকারী করে অনায়াসেই সনাক্ত করবে ভেবেই হত্যাকারী ভেবেছিল। আর াহ হয়েছিলও। আপনি মিঃ চৌবে, আপনিও কি তাই ডাঃ ঘোষালকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিলেন না, বলুন?

তাই বটে। তবে—তবে হত্যাকারী কে?

পরম সৌভাগ্য আমাদের যে, হত্যাকারীও আজ আমাদের এইখানেই উপস্থিত। ঐ যে—বলে সম্মুখেই উপবিষ্ট ক্ষণপূর্বের আগন্তুক ডাঃ ঘোষালের ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কঠিন কণ্ঠে বললে, There you are! ঐ যে—উনিই হচ্ছেন সকল দুষ্কৃতির হোতা, সলিল সরকার হত্যারহস্যের, আমাদের মেঘনাদ শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ঘোষাল।

এসব কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! আর্তকণ্ঠে যেন চিৎকার করে উঠলেন বাণবিদ্ধা হরিণীর মতই মিসেস ঘোষাল।

হ্যাঁ মিসেস ঘোষাল, নিষ্ঠুর সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত। আপনার ঐ দেবরটিই হচ্ছেন সকল চক্রান্তের মূলে—

ঠাকুরপো!

চুপ কর বৌদি। উনি গঞ্জিকা সেবন করে যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বললেন এতক্ষণ ধরে—রতিকান্ত বলবার চেষ্টা করে।

কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠে বাধা দিল তাকে কিরীটী, বললে, রতিকান্তবাবু, কুক্ষণে সেদিন আপনি আমার টালিগঞ্জের বাড়িতে পা দিয়েছিলেন—

কি বলছেন মিঃ রায় ? বললেন মথুরাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, পান্নার একটা ফটো দেখিয়ে উনি আমাকে তার অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিনা। বলতে বলতে কিরীটী ঘুরে তাকাল রতিকান্তের দিকে এবং কঠিন কণ্ঠে এবারে তাকেই লক্ষ্য করে বললে, কিন্তু রতিকান্তবাবু আপনি—তখনই বা বলি কেন, এখনো জানেন না যে হীরা ও চুনি সুষমা দেবীর দুই পুত্রকে বহু পূর্বেই চূর্ণ করে ধ্বংস করবার জন্য যার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, সে হীরা ও চুনিকে ধ্বংস করে রেখে এসেছিল গোপনে এক অনাথ আশ্রমে ধর্মের কল বুঝলেন—ধর্মের কল এমনি করেই বাতাসে নড়ে। আর শুনে হয়তো দুঃখিত হবেন, মাত্র দিনতিনেক হল তাদেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বিহারের এক খ্রীশ্চান মিশনারীদের অর্ফানেজে।

সত্যি বলছেন আপনি মিঃ রায় ? এসব কথা সত্যি ? মিসেস ঘোষালই আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, মিসেস ঘোষাল। কৌশলে অর্থ দিয়ে ব্রজকিশোর পাণ্ডেকে হাত করেছিলেন সেদিন আপনার দেবরটি। কিন্তু উনি সেদিন জানতেন না যে, অর্থে লোভই বাড়ায়। উৎকোচের দ্বারা মানুষের ঘুমন্ত লোভকে একবার জাগিয়ে তুললে, সে লোভ-রাহু উৎকোচের শেষ সীমানাকে পর্যন্ত গ্রাস করে উৎকোচ-প্রদানকারীকেই গ্রাস করতে এগিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। দুর্নীতির উপরে কোন চুক্তিই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই সেদিন ব্রজকিশোর হাতের মুঠোর মধ্যে হীরা ও চুনিকে পেয়েও তাদের ধ্বংস করতে পারেনি বৃহত্তর প্রলোভনের নেশায়। সে ভেবেছিল ঐ হীরা ও চুনিকে জিইয়ে রাখতে পারলে তার লাভ বই ক্ষতি হবেনা। কারণ ভবিষ্যতে কোন দিন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যদি সে ধরাও পড়ে, তবে অনায়াসেই হীরা ও চুনিকে রক্ষা করবার কৃতিত্বে সে সম্মান ও পুরস্কার পাবে, আর তা যদি একান্ত নাও হয়, তা হলেও উৎকোচ দিয়ে যে একদিন তাকে বশীভূত করবার চেষ্টা করেছিল, তাকে তো অন্তত: আরো ভাল করে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করা যাবেই।

কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে যে হীরা ও চুনি অর্ফানেজেই আছে ? শুধালেন আবার চৌবেই।

সেও আমার কমনসেন্স পরিচালিত একটা অনুমান মাত্র। হীরা-চুনির ব্যাপারে আমি ভেবেছিলাম, হয় তাদের একেবারে শেষ করে ফেলা হয়েছে, নচেৎ তারা এখনো

বেঁচে আছে। প্রথমেই মনে হল কোন আশ্রমের কথা। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে কোন আশ্রমই নিরাপদ জায়গা, সেই ভেবে ঐ ইনস্‌পেক্টর মন্মথবাবুকে আমি যেখানে যত অনাথ আশ্রম আছে অনুসন্ধান চালাতে বলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত পান্নার ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত বিহারের এক খ্রীষ্টান মিশনারী অর্ফানেজে তাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উনি—আমাদের রতিকান্তবাবু এসব ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি। অথচ হীরা ও চুনি অকস্মাৎ চুরি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, জগদীশনারায়ণ তাঁর স্ত্রীকে কন্যাসহ, ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস পেয়েই কলকাতা আর নিরাপদ নয় বুঝে হয়তো সরিয়ে দিয়েছিলেন অত্যন্ত গোপনে একেবারে সুদূর মীরাটে সম্ভবত। পান্নার বয়স তখন মাত্র সাত কি আট মাস। ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা পান্না বা তার সন্ধান করতে সক্ষম হয়নি বলেই আমার মনে হয়। গোপনে পিতাকে না জানিয়েই জগদীশনারায়ণ ভালবেসে ডাক্তার ঘোষালের একমাত্র বোন সুষমা দেবীকে রেজেষ্ট্রী করে বিবাহ করেন। সংবাদ অবিশ্যি কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের রেজেস্ট্রী অফিসেই পাওয়া গিয়েছে অনুসন্ধান করে। এবং ডাঃ ঘোষাল আপনি শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন, সেদিনকার বিবাহের রেজেস্ট্রী বা কন্যাপক্ষীয়ের অন্যতম সাক্ষী হিসাবে নাম সই করেছিলেন আপনারই ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রতিকান্তবাবু!

স্কাউণ্ড্রেল! শয়তান! অথচ ঘুণাক্ষরেও সেদিন কোন কথা আমাকে জানতে দেয় নি। গর্জে উঠলেন ডাঃ ঘোষাল।

না, কারণ উনি সেদিন ভেবেছিলেন রতনগড়ের সাত-সাতটা কোলমাইনস-এর একাধীশ্বর মুরলীনারায়ণের একমাত্র উত্তরাধিকারী যদি তাঁর বোনকে বিবাহ করেই, তাহলে তাঁরই লাভ, অর্থের জন্য।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল রতিকান্ত ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে, তার পর চাপা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললে, বলে যান আরো কি বলার আছে আপনার! দৌড়টা শেষ পর্যন্ত দেখিই না হয়!

দেখবেন বৈকি রতিকান্তবাবু। যাক দীর্ঘকাল পর্যন্ত পান্নার খোঁজ না পেয়ে পান্না ও তার জননীর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন, তাই না! কিন্তু বাঘের রক্তের স্বাদের মত অর্থের স্বাদ পেয়ে অর্থের লোভটা কিছুতেই বোধ হয় তখন আর ভুলতে পারছিলেন না। তাই শেষ পর্যন্ত মুরলীনারায়ণের কাছ থেকে আকস্মিক ব্ল্যাক মেলিং করে অর্থপ্রাপ্তির আশাতেও কুঠারাঘাত হওয়ায় তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করলেন, তাই নয় কি!

হঠাৎ এমন সময় পাশেই যে ঘরটি ডাঃ ঘোষাল কিরীটীকে থাকবার জন্য ছেড়ে

দিয়েছিলেন এবং এতক্ষণ সে ঘরের খোলা দরজাপথে দেখা যাচ্ছিল ঘরটা অন্ধকার ও সবাই ভেবেছিলেন সে ঘরের মধ্যে কেউ নেই, সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই রবিশঙ্করের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল।

রবিশঙ্কর অন্ধকার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, you are right, মিঃ রায়। আপনি ঠিকই বলেছেন।

অকস্মাৎ পাশের অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে রবিশঙ্করের উচ্চ কণ্ঠ শুনে ঐ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ চমকে সেই দিকে তাকাতেই কিরীটী মথুরাপ্রসাদকে লক্ষ্য করে বলল, ওঁকে ঘরের ভিতর থেকে এবারে সকলের সামনে এখানে নিয়ে আসুন মিঃ চৌবে। আশা করি এবারে আর উনি সত্য স্বীকৃতি দিতে সবার কাছে অস্বীকার করবেন না।

মথুরাপ্রসাদ চৌবের নির্দেশে তখন পাশের ঘর থেকে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় দুজন সশস্ত্র পুলিসপ্রহরী রবিশঙ্করকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রবিশঙ্করের মুখের দিকে।

চেহারা ও চোখের মুখের সেই ঔদ্ধত্য ও আভিজাত্যের যেন কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই ঐ মুহূর্তে। ক্লিষ্ট ক্লান্ত বিপর্যয়। আগেকার পরিচয়টা যেন একটা মুখোশের মতই রবিশঙ্করের আসল ও সত্যিকারের রূপটাকে সকলের দৃষ্টি থেকে এই ক'বছর লুকিয়ে রেখেছিল ; হঠাৎ সেটা যেন খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীরু দুর্বল মানুষ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় রবিশঙ্করবাবু, কেন আপনাকে ঐ ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে এনে অন্ধকারে বসিয়ে রেখেছিলাম এতক্ষণ এবং কেন আপনাকে এতক্ষণ কথা বলতে দিই নি ? কিরীটী রবিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে কথাগুলো।

হঠাৎ এমন সময় একটা 'গুড়ুম' করে গুলির শব্দ হওয়ায় সকলেই চমকে ওঠে।

কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গিয়েছে।

রতিকান্ত ঘোষাল তার বস্ত্রান্তরালে লুকায়িত ছোট্ট একটা আমেরিকান অটোমেটিক পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে—ঘরের মধ্যে কেউ কিছু বুঝে উঠবার পূর্বেই।

রক্তাক্ত দেহটা চেয়ারের উপর ঝুলে পড়েছে। হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে খসে পড়েছে।

পিস্তলের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী লাফিয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন আর করবার কিছুই ছিল না। রবিশঙ্করের পাশের ঘর থেকে আকস্মিক আবির্ভাবের

ব্যাপারে মুহূর্তের জন্য যে অন্যমনস্কতা জেগেছিল সকলের মনে, সেই মুহূর্তটুকুর সুযোগকেই পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছে অতি সতর্ক অতীব ধূর্ত রতিকান্ত ঘোষাল।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নেমে আসে।

একটা শ্বাসরোধকারী থমথমে গুরুভার যেন ঘরের মধ্যে বাতাসকে ভারী করে তোলে।

নির্বাক নিস্পন্দ সকলে।

ছুঁচপতনের শব্দটাও বুঝি শোনা যাবে। বাতাসে বারুদের একটা তীব্র কটু গন্ধ তখনো ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

॥ তেইশ ॥

রতিকান্ত ঘোষালের সেরাত্রে আকস্মিক আত্মহত্যার ব্যাপারটা সকলকেই এমন মুহ্যমান করে দিয়েছিল যে, কিরীটীকেও তার হীরা ও চুনি রহস্যের মীমাংসার কাহিনীর বিবৃতির মধ্যপথে দাঁড়ি টেনে দিতে হয়েছিল একান্ত বাধ্য হয়েই।

কিন্তু পরের দিন দ্বিপ্রহরে রবিশঙ্করই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মথুরাপ্রসাদের কাছে একটা স্বীকৃতি দিলেন। সে কাহিনী যেমনই মর্মস্পর্শী তেমনই বিস্ময়কর।

রবিশঙ্কর, জগদীশনারায়ণ ও রতিকান্ত ঘোষাল বোধ হয় দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির বিধানেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এক অদৃশ্য আকর্ষণে বাধা পড়েছিল সুদূর অতীতে একদা কোন এক অশুভ মুহূর্তে, নইলে রুচি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির তিনজনের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠাটাও তো সম্ভবপর ছিল না। এবং খুব সম্ভবতঃ তিনজন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও রুচির হলেও এক জায়গায় কিছুটা মিল ছিল বলেই তিনজনের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল।

সেটা হচ্ছে জুয়ো খেলার নেশা।

তিনজনের ফ্লাশ খেলার একটা অদ্ভুত নেশা ছিল। এবং সেই ফ্লাশ খেলার মধ্যে দিয়েই তিনজনের মধ্যে একদিন হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ধনী পিতার আজন্ম বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে বর্ধিত একমাত্র সন্তান জগদীশ-নারায়ণ যেমন ছিল ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির, তেমনি ছিল সরল ও নিরহঙ্কারী। রবিশঙ্কর মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেও ছিল একান্ত লোভী এবং সর্বাপেক্ষা যে বিশেষত্বটি ছিল তার চরিত্রে, সেটা হচ্ছে নিজের মধ্যে সাহস না থাকলেও অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হলে ও চালিত হলে, যে কোন দুঃসাহসিক কাজেই সে পেছপাও হত না। দ্বিতীয় একজন কারো দ্বারা চালিত হলে তার মত যন্ত্র (instrument) সত্যিই বিরল

ছিল। কিন্তু সুযোগমত তার সেই ধার করা সাহসে আঘাত করতে পারলে তাকে নুইয়ে আনাটাও কষ্টসাধ্য ছিল না। আর সকলের মধ্যে তৃতীয় রতিকান্ত ছিল যেমনি ধূর্ত, তেমনি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী, কূটচক্রী, দুঃসাহসী ও বেপরোয়া।

জগদীশ ও রবিশঙ্কর বি-এ পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও রতিকান্ত বহুপূর্বেই সে ব্যাপারে ইতি দিয়েছিল এবং কিশোর বয়স থেকেই জুয়ো খেলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্লু ডায়মণ্ড নামে কলকাতায় আধা অভিজাত পাড়ায় একটা ক্লাব ছিল, সেখানে অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের অন্তরালে রাত দশটার পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলত ফ্লাশ অর্থাৎ তাসের জুয়ো খেলা।

অদ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এবং পাকা একজন জুয়াড়ী হিসাবে রতিকান্তর সেখানে যাতায়াত ছিল। জগদীশনারায়ণ ও রবিশঙ্কর যখন কলকাতায় মুরলী-নারায়ণেরই একটা বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে মাত্র, সেই সময় একদিন রাত্রে রতিকান্ত ব্লু ডায়মণ্ড ক্লাবে যায় এবং সেইখানেই ওদের রতিকান্তর সঙ্গে পরিচয় হয় খেলার মধ্য দিয়ে ও ক্রমে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

তারপর এক গানের জলসায় সুষমার গান শুনে জগদীশ যখন মুগ্ধ হল এবং রতিকান্তর মুখে শুনল সুষমা রতিকান্তরই একমাত্র বোন, তখন হতে দুজনের মধ্যে আকর্ষণটা আরো বেড়ে ওঠে।

রতিকান্ত তারই কিছুদিন পূর্বে শ্যামাকান্তর সঙ্গে পৃথক হয়ে গিয়েছে। এবং সুষমা তখন লরেটোতে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করছে।

রতিকান্তই একদিন জগদীশ ও রবিশঙ্করের সঙ্গে সুষমার আলাপ করিয়ে দেয়। আলাপটা অবিশ্যি রতিকান্ত করিয়ে দিয়েছিল জগদীশের সঙ্গে নিজের বোনের এই আশাতেই যে, জগদীশ মিলিওনেয়ার বাপের একমাত্র পুত্র, বোকা ও সরল টাইপের, তাকে অনায়াসেই দোহন করতে পারবে চিরদিন রতিকান্ত। কিন্তু সে যাই হোক, আলাপের পর জগদীশ ও সুষমা পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ ও আকর্ষিত হল। এবং সে আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়।

হতভাগ্য রবিশঙ্করও সুষমাকে প্রথম দিন দেখেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল এবং মনে মনে তাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু প্রথমত তার জগদীশের মত অর্থসৌভাগ্য ছিল না, দ্বিতীয়ত সুন্দর চেহারা হলেও জগদীশ তার তুলনায় ঢের বেশী রূপবান ছিল, তৃতীয়ত নিজের ভালবাসাকে exhert করবার মত তার মনের জোর বা সাহস ছিল না। কাজেই নিরুপায় আক্রোশে সে দূর থেকে জগদীশ ও সুষমার ক্রমবর্ধমান হৃদ্যতা দেখে মনের মধ্যে রুদ্ধবিষ সর্পের মত নিশিদিন গর্জাতে লাগল, যে আক্রোশ ও ঘৃণা

থেকে পরবর্তীকালে জগদীশের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এবং যে ঘৃণা ও আক্রোশের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় ধূর্ত চক্রী রতিকান্ত সময় ও সুযোগমত।

বাপ মুরলীনারায়ণ সুষমার মত সামান্য এক ঘরের মেয়েকে বিবাহে সম্মতি কিছুতেই দেবেন না জেনেই গোপনে জগদীশ সুষমাকে রেজিস্ট্রী করে বিবাহ করে।

এবং ঐ বিবাহই হল কাল। জগদীশের চরমতম দুর্ভাগ্যের সূচনা। রতিকান্তর প্ররোচনাতেই রবিশঙ্কর বেনামী চিঠি দিয়েই মুরলীনারায়ণকে জানায়, গোপনে রেজেস্ট্রী করে জগদীশ সুষমাকে বিবাহ করেছে। নিজের মেয়ে বিমলা ভালবেসে তার গৃহ-শিক্ষক, তারই বেতনভুক এক সাধারণ কর্মচারীকে কলকাতায় গোপনে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করায় কোনদিনই বিমলা বা তার স্বামীকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেননি মুরলীনারায়ণ। এবং মুখে মেয়ে-জামাইয়ের মৃত্যুর কথাটা রটনা করে দিলেও গোপনে তাদের সমস্ত সংবাদই রাখতেন। কাজেই ছেলে জগদীশের বিবাহ-সংবাদে যখন আরো তাদের সম্পর্কে সংবাদ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন, সুষমা আর কেউ নয়, তারই আত্মজা কলঙ্কিনী বিমলার একমাত্র কন্যা—আভিজাত্যের অন্ধ দাম্ভিকতায় রাগে দুঃখে আক্রোশে যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠলেন মুরলীনারায়ণ।

গোপনে গোপনে সলিল সরকারকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, সে-ই এসে সব সংবাদ মুরলীনারায়ণের গোচরীভূত করে।

এদিকে শ্যামাকান্তকে ডেকে এনেও মুরলীনারায়ণ কুৎসিত অপমান ও গালাগালি দিলেন সুষমাকে জগদীশ বিবাহ করেছে এবং সে বিবাহ নিশ্চয়ই তার অনুমোদন-ক্রমেই হয়েছে বলে দোষারোপে করে, এবং সেইদিনই সর্বপ্রথম শ্যামাকান্ত জানতে পারেন, তাঁর স্বর্গীয় জননী ঐ মুরলীনারায়ণেরই একমাত্র পরিত্যক্তা কন্যা।

মুরলী সেদিন শ্যামাকান্তকে বলেছিলেন, ভেবেছিলাম মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে যাব, কিন্তু তুমি যখন সম্পত্তির লোভে এত বড় চক্রান্ত করলে আমার সঙ্গে তখন এক কানাকড়িও তোমাদের তিনজনের একজনকে তো দেবই না, বরং তোমাদের নির্মূল করে আমি ছাড়ব।

শ্যামাকান্ত জবাব দিয়েছিলেন, এসব কি বলছেন আপনি :

কেন, জান না তোমাদের গুণবতী গর্ভধারিণী 'আমারই একমাত্র কন্যা ?

সে কি !

হ্যাঁ হ্যাঁ,—যেমন বাপ তেমনি সন্তান হবে তো। যেমন বাপ, তেমনি আমার মেয়েটিও যে ছিলেন।

থামুন, মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন।

সতীলক্ষ্মী! আমার নিজের গুণবতী মেয়ের কথা আমি জানি না! কুলটা—কুলত্যাগিনী!

যার সম্পর্কে আপনি আর একটা কথা বলবেন তো একটা দাঁতও আপনার আস্ত রেখে যাব না। শ্যামাকান্ত অতঃপর গর্জাতে গর্জাতে বার হয়ে গেলেন রতনগড় প্যালেস থেকে নিরুপায় লজ্জায় ও অপমানে।

এইবার শুরু হল রতিকান্তের খেলা।

মুরলীনারায়ণের হাতে যাতে করে জগদীশ ও সুষমা না পড়ে এবং পড়লে তার দোহন 'ব্ল্যাক মেলিং' চলবে না বুঝতে পেরেই, মুরলী কোন কিছু করবার পূর্বেই নিজে কিছু টাকা দিয়ে জগদীশ ও সুষমাকে কাশীতে সরিয়ে দিল গোপনে রতিকান্ত পরামর্শ দিয়ে।

ভীরু জগদীশও রতিকান্তর পরামর্শমত পালিয়ে গেলেন কাশীতে।

তার পর মুরলীকে শুরু করল 'ব্ল্যাক মেলিং' রতিকান্ত।

অনন্যোপায় মুরলীনারায়ণ নিজের দুর্নামকে চাপা দেবার জন্য টাকা দিতে লাগলেন রতিকান্তকে মুঠো মুঠো করে। এবং তারই একটা অংশ নিয়মিত রতিকান্ত সুষমা ও জগদীশকে পাঠাতে লাগল।

এদিকে সলিল সরকারকে মুরলী পাঠালেন সুষমা ও জগদীশের সন্ধান নেবার জন্য আবার। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর পরে কাশীর অজ্ঞাতবাস তুলে দিয়ে দেড় বৎসরের যমজ দুই ছেলে হীরা-চুনি ও ছয় মাসের কন্যা পান্নাকে নিয়ে জগদীশ কলকাতায় ফিরে এলেন আবার।

স্টেটের আরো একজন জগদীশের গোপন বিবাহের সংবাদটা কোনক্রমে জেনেছিল। সে হল ব্রজকিশোর পাণ্ডে। মুরলীনারায়ণ ভাড়া করা গুণ্ডার সাহায্যে যখন জগদীশের সন্তানদের হত্যা করবার মতলব করছেন, ব্রজকিশোর সেকথা জানতে পেরে সকলের অজ্ঞাতে রতিকান্তরই পরামর্শমত লোক লাগিয়ে এক নিশিরাত্রে আহিরীটোলার বাসাবাড়ি থেকে হীরা-চুনিকে চুরি করে নিয়ে গেল—তাদের মুরলীর আক্রোশ থেকে বাঁচাতে। এবং রতিকান্তর যদিও মতলব ছিল হীরা-চুনিকে শেষ করে ফেলবার ও সেই পরামর্শই যদিও দিয়েছিল সে ব্রজকিশোরকে, সে কিন্তু তা করেনি।

যাহোক এদিকে ছেলেরা চুরি যাওয়ায় সুষমা পাগলের মতই হয়ে গেলেন। জগদীশ দেখলেন কলকাতায় থাকা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয় সেও এক কথা বটে, দ্বিতীয়ত রতিকান্তর সাহায্যের হাতটাও তখন ক্রমশঃ অত্যন্ত হ্রস্ব হয়ে আসতে থাকায়

এবং তৃতীয়ত চিরদিনের আদর সুখ ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত জগদীশ অসচ্ছলতা দিবারাত্র দুশ্চিন্তার মধ্যে কালযাপনে হাঁপিয়ে ওঠায় একটা শেষ মীমাংসার জন্য কোন একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। শিশু পান্না ও স্ত্রীকে নিয়ে জগদীশ মীরাট চলে গেলেন। এবং মীরাটে, স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে রেখে সোজা ফিরে গেলেন বাপের কাছে। ইচ্ছা ছিল তাঁর বাপের হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিজগৃহে নিয়ে যাবেন।

মুরলীনারায়ণ পুত্রের কাতর অনুরোধে কোন কানই দিলেন না, তাঁদের ত্যাগ করে আবার বিবাহের জন্য বারংবার পুত্রকে বলতে লাগলেন। এবং পাছে পুত্র আবার পালিয়ে যায় বলে পুত্রের গতিবিধির উপরে কড়া পাহারা বসালেন দিবারাত্র।

জগদীশ আটকা পড়লেন। নিজগৃহে বন্দী হয়ে দিবারাত্র ছটফট করতে লাগলেন। গোপনে গোপনে যে অর্থসাহায্য পাঠাবেন তারও উপায় রইল না। এদিকে জগদীশ তাঁর বাপের কাছে ফিরে যাওয়ায় এবং রোজগারের পথটা বন্ধ হওয়ায় রতিকান্ত রবিশঙ্করকে হাত করল।

প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে রতিকান্ত রবিশঙ্করকে মুঠোর মধ্যে এনে এবারে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জাল ধীরে ধীরে রতনগড়ের উপরে বিস্তৃত করল।

রবিশঙ্করকে বললে, সে যদি তার কথা শুনে চলে তো তাকেই একদিন রতনগড়ের গদিতে সে বসিয়ে দেবে। একদিকে প্রলোভন, অন্যদিকে সুষমাকে না পাওয়ার ব্যর্থতায় জগদীশের প্রতি এতদিনকার সঞ্চিত আক্রোশ ও ঘৃণা, লোভী রবিশঙ্কর সাগ্রহে রতিকান্তকে আশ্রয় করল। অকস্মাৎ একদিন এমন সময় মুরলীনারায়ণ রতিকান্তর ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে নিহত হলেন।

রতনগড়ের এবারে মালিক হলেন জগদীশনারায়ণ।

এদিকে দীর্ঘদিন অর্থসাহায্য না পাওয়ায় এবং দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতির জন্য অভিমান করে সুষমা উপায়ান্তর না দেখে মীরাট ছেড়ে লাহোরে এক স্কুলে সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়ে কন্যাকে নিয়ে চলে যান। ঐ ব্যাপারটা ঘটে মুরলীনারায়ণের মৃত্যুর ঠিক মাস দুই পূর্বে। মুরলীর মৃত্যুর পর যখন জগদীশ মনস্থ করলেন স্ত্রী ও কন্যাকে স্বগৃহে নিয়ে আসবেন, ঠিক সেই সময় জগদীশ মীরাটের ঠিকানায় যে টাকা পাঠিয়েছিলেন বাপের মৃত্যুর পর, সে টাকা ফিরে এল গ্রহীতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বলে।

জগদীশ ছুটলেন মীরাটে, কিন্তু সেখানে গিয়ে স্ত্রী বা কন্যার কোন সন্ধান পেলেন না। কারণ সুষমা তো তার আগেই মীরাট ছেড়ে চলে গিয়েছে।

এবং সুষমা লাহোরে রুক্মিণী দেবী ছদ্মনামে চাকরি করছেন তখন।

এমনি করে আরো চার বছর কেটে গেল। জগদীশ অনেক খুঁজেও স্ত্রী-কন্যার সন্ধান করতে পারলেন না।

তারপর তিনিও রতিকান্তর ষড়যন্ত্রে একদিন রাত্রে বিষপ্রয়োগে নিহত হলেন।

রবিশঙ্কর বসলেন এবারে রতনগড়ের শূন্য গদিতে সর্বেসর্বা হয়ে এবং রতিকান্তর হাতের ক্রীড়নক হয়ে। রতিকান্ত শোষণ করে চলতে লাগল রবিশঙ্করকেই এবারে।

এদিকে কেবল যে জীবিতকালে জগদীশই তাঁর স্ত্রী ও কন্যার অনুসন্ধান করেছিলেন তা নয়, আরো চারজনও তাদের সর্বত্র অনুসন্ধান করে ফিরছিল। একজন রতিকান্ত, দ্বিতীয় ব্রজকিশোর পাণ্ডে, তৃতীয় সলিল সরকার ও চতুর্থ রবিশঙ্কর।

নিযুক্ত লোকেরাই প্রথমে লাহোরে অবস্থিত রুক্মিণী নামের ছদ্মবেশের আড়ালে সুষমার সন্ধান নিয়ে আসে। তখন রতিকান্ত গোপনে গিয়ে দেখে আসে ও বুঝতে পারে যে রুক্মিণীই আসলে সুষমা।

এবং রবিশঙ্করকে সেকথা একদিন রতিকান্ত এসে যখন বলেছিল সলিল সরকার কথাটা জানতে পারে। রতিকান্ত মধ্যে মধ্যে রবিশঙ্করের সঙ্গে রতনগড়ে এসে দেখা করত। ব্রজকিশোর বর্ণিত ঢ্যাঙা লোকটি আর কেউ নয়, রতিকান্তই।

এদিকে রতিকান্তর মুখে পান্না ও তার মার সংবাদ পেয়ে রবিশঙ্কর এক চাল চালেন। গোপনে লোক নিযুক্ত করে পান্নাকে এক রাত্রে সরিয়ে ফেলে, কেননা তিনি তখন রতিকান্তকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

রতিকান্তও তখন এক দুঃসাহসিক চাল চালে। পান্নার ফটোটা দিয়ে সংবাদপত্রে তার হারানোর বিজ্ঞাপন দেয় রতনগড়ের নামে। এবং আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকেও পান্নার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে।

কিন্তু পান্না গেল কোথায় ?

মণিশঙ্করের মুখ থেকে পান্নার একদিন সহসা লাহোরে তাঁর জননী সুষমার আশ্রয় থেকে যে নিরুদ্দেশের কাহিনী জানা গিয়েছে, সেটা যেমনি অস্পষ্ট তেমনি রহস্যপূর্ণ।

এটা ঠিকই যে রতিকান্ত পান্নার কোন সংবাদই জানতে পারেনি, আর তা পারেনি বলেই চরম দুঃসাহসিকতার কাজ করেছিল আমার কাছে গিয়ে আমাকে পান্নার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করে। কারণ পান্না সুষমার আশ্রয় থেকে অদৃশ্য হয়েছে জানার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজে খুঁজে বের করবার অনেক চেষ্টা করেও যখন সফল হয়নি তখনই সে ঐ চরম দুঃসাহসের কাজ করেছিল।

কিন্তু সম্ভবতঃ সে পান্নার সংবাদ না জানতে পারলেও, রবিশঙ্কর যে পান্নার সংবাদ জানে সেটা মনের মধ্যে আঁচ করেছিল, কারণ রবিশঙ্করের স্বেচ্ছাকৃত শেষ জবানবন্দি

থেকেই জানা গিয়েছে। আভাসে ইঙ্গিতে নাকি সে কথাটা দু-একবার জানিয়েছিলও নাকি রবিশঙ্করকে। এবং রবিশঙ্করের শেষ জবানবন্দিতেই তিনি স্বীকার করেছেন, জগদীশের একটা পুরাতন চিঠি থেকেই মীরাটে একসময় সুষমার উপস্থিতির কথাটা রবিশঙ্কর জানতে পেরেছিলেন তার মৃত্যুর পরই এবং সেই চিঠি থেকেই সে ঠিকানাটাও সংগ্রহ করেন। চিঠিটা জগদীশেরই লেখা ছিল তাঁর স্ত্রী সুষমাকে। এবং চিঠির মালিককে না পাওয়ায় সেটা আবার ফেরত এসেছিল। চিঠিটা পেয়েছিলেন রবিশঙ্কর জগদীশের একটা বহুপঠিত বইয়ের মধ্যে। যা হোক, সেই চিঠির ঠিকানানুযায়ীই পরে রবিশঙ্কর পান্নার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘদিন পরে সেই নিযুক্ত লোকই মাসপাঁচেক আগে বর্তমান ঘটনার—পান্নার ও তার জননীর সংবাদ রবিশঙ্করকে রতনগড়ে এনে দেয়।

রবিশঙ্কর জানতেন, হীরা ও চুনি পূর্বেই রতিকান্ত দ্বারা নিহত হয়েছে কৌশলে। এখন তার রতনগড়ের সম্পত্তির ওয়ারিশনের পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে ঐ জগদীশ-কন্যা পান্না। অতএব পান্নাকে যদি কোনমতে হাতের মুঠোর মধ্যে আনা যায় তো তিনি নিশ্চিন্ত। এবং রতিকান্তকেও তিনি জব্দ করতে পারবেন। সেই আশাতেই কৌশলে তাঁর নিযুক্ত লোকেদের দ্বারা রবিশঙ্কর সহসা এক রাত্রে লাহোরে সুষমার গৃহ থেকে পান্নাকে চুরি করে সরিয়ে ফেলেন। এবং তাকে সময় ও সুযোগমত কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর গৃহে এনে বন্দিনী করে রেখে দিয়েছিলেন।

এদিকে পান্না সহসা নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় রহস্যজনকভাবে, রতনগড়ের গদিলোভী দুই চক্রান্তকারী রতিকান্ত ও রবিশঙ্করকে নিয়ে নাটক রীতিমত জমে উঠল এবং দুজনের মধ্যে আবার ধূর্ত ও শয়তান বেশী রতিকান্তই।

রতিকান্ত দেখল, এতকাল আমীরী করে এসে রতনগড়কে শোষণ করে করে এবার বুঝি ঐ পান্নাচক্রেই তার ভরাডুবি হয়! অতএব সে এবারে আটঘাট বেঁধেই বিরাট এক চক্রান্তের জাল বিছাল। কোন এক হতভাগ্যকে চক্রান্ত করে গলা টিপে হত্যা করে নিজের বেশভূষায় সজ্জিত করে আসানসোল ও বর্ধমানের মাঝামাঝি রেল লাইনের উপর ফেলে রেখে এল রাববেন্দ্রের আইডেন্টিটিকে চিরতরে পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দেবার জন্য। কারণ আমি যে মুহূর্তে পরের দিন হরিপদর বাড়িতে তার সন্ধানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, সেই মুহূর্তেই সে বুঝতে পেরেছিল আমার কাছে গিয়ে সে সবচাইতে বড় ভুল করেছে। এবং আমার দ্বারা এখন যদি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হয়ে পড়ে তো সর্বাগ্রে তারই হাতে দড়ি পড়বে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। আমাকে খোঁচানোর সঙ্গে সঙ্গেই পান্না-রহস্য আকর্ষণ করে ফেলেছিল

তখন। অন্যথায় রাঘবেন্দ্র ছদ্মপরিচয়ে রতিকান্ত আমার কাছে না গেলে কি হত কিছুই বলা যায় না। এমনি বোধ হয় অলঙ্ঘ্য নিয়তি মানুষের ভাগ্যের দড়িটা টেনে নিয়ে যায়। কাগজে পান্না হারাবার বিজ্ঞাপনটা রবিশঙ্কর দেননি, দিয়েছিল রতিকান্তই তবে সঠিক সেটা না জানলেও রবিশঙ্কর রতিকান্তকেই সে ব্যাপারে সন্দেহ করে-ছিলেন, কারণ রবিশঙ্কর পূর্বের মত আর রতিকান্তকে টাকা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, রতিকান্ত রবিশঙ্করকে গদিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠিরই নকলটা সলিল সরকার আমাকে সেরাত্রে পৌঁছে দিয়েছিল। পান্নাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পর থেকেই রতিকান্তর প্রতি রবিশঙ্করের দানের হাতটা গুটিয়ে আসতে শুরু করেছিল।

যা হোক, রবিশঙ্কর পান্নাকে চুরি করে নিয়ে এলেও তাকে একেবারে হত্যা করবার দুঃসাহস করেনি। তারও অন্য কারণ ছিল বৈকি। রতিকান্ত তাঁর ঘাড়ে তখন বসে এমন শোষণই শুরু করেছিল যে রবিশঙ্করও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। অথচ এমন জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন মাকড়সার জালের মত যে, বের হয়ে আসবারও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এদিকে কাগজে পান্না হারিয়ে যাবার বিজ্ঞাপন দেখে রবিশঙ্করের বুঝতে বাকি ছিল না কাজটা কার। অথচ সোজাসুজি রতিকান্তর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহসও সে পাচ্ছিল না। কাজেই কতকটা অনন্যোপায় হয়েই সাপের ছুঁচো গেলার মত কাগজে পান্না হারানোর বিজ্ঞাপনটা যে তাঁরই দেওয়া আমার কাছে স্বীকার করেছিল। যদিও বিজ্ঞাপন তিনি দেননি। বিজ্ঞাপন যে রবিশঙ্কর দেননি সেটা কিরীটীরও মনে হয়েছিল। কারণ রতনগড়ের সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করতে হলে রবিশঙ্করকে সম্পূর্ণভাবেই নিষ্কণ্টক হতে হবে, নচেৎ গোলযোগ বাধবার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে পান্নাকে ইহজগৎ হতে চিরতরে সর্বাগ্রে সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ তখনো রবিশঙ্কর জানেন যে, জগদীশের ওয়ারিশন হিসাবে তখন একমাত্র তাঁর কন্যা পান্নাই জীবিত। হীরা-চুনি যে তখনও বেঁচে আছে তা তিনি ধারণাই করতে পারেননি। আর তাই যদি তাঁকে করতে হয় তো গোপনেই সে কাজ সারতে হবে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোন কিছু করতে যাওয়াটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার কাজই হবে।

যা হোক রবিশঙ্কর ও রতিকান্তর মধ্যে স্বার্থের নাটক যখন বেশ জমে উঠেছে এবং তার কিছুদিন পূর্ব থেকে রবিশঙ্করকে কেন্দ্র করে একটা গোলমালের আভাস পেয়ে রবিশঙ্করের দুর্ব্যবহারে সলিল সরকার পূর্ব হতেই ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল, এখন সে আক্রোশে পরিণত হল। রবিশঙ্কর সম্পর্কে সে নানাভাবে খোঁজ নিতে লাগল যা করে তাকে একটু ভালরকম শিক্ষা দিতে পারে। অতীব ধূর্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল সলি

সরকারের। জগদীশনারায়ণকে কেন্দ্র করে মুরলীনারায়ণের আমলে তাঁর গোপন বিবাহের ব্যাপার নিয়ে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা সলিল সরকার ভেবেছিল নিছক পিতার অমতে গোপনে কোন একটি মেয়েকে বিবাহ করবার দরুনই বুঝি। কিন্তু তার পশ্চাতে যে মুরলীনারায়ণের সম্মান ও নিজগৃহের একটা অন্ধ আভিজাত্য বোধের নিদারুণ লজ্জা জড়িত হয়ে ছিল, সলিল সরকার সেটা জানতেও পারেনি এবং মুরলীনারায়ণও নিশ্চয়ই ঘুণাক্ষরেও সেটা জানতে দেন নি সলিল সরকারকে। জগদীশ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রতিকান্তর পরামর্শানুযায়ী কাশীতে গিয়ে আত্মগোপন করায় মুরলী-নারায়ণের লোকেরা তাঁর কোন সন্ধান করতে পারেনি বটে তবু নিরুৎসাহ হয়নি। দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে যখন আবার জগদীশ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন, মুরলীনারায়ণ তাঁর অনুচরদের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে তাদের সর্দারকে সেদিন ডেকে গোপনে আদেশ দিচ্ছিলেন, যেমন করে হোক জগদীশের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের শেষ করে ফেলবার জন্য, ব্রজকিশোর সেটা জানতে পারে। ব্রজকিশোর সেই কথা জানতে পেরে চমকে ওঠে। ব্রজকিশোর জগদীশকে মনে মনে ভালবাসত, তাই সে ব্যাপারটা জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে ওঠে এবং কালবিলম্ব না করে গোপনে কলকাতায় চলে যায়। এবং মুরলীনারায়ণের নিযুক্ত লোকেরা কিছু করে উঠবার আগেই একদিন রাত্রে জগদীশের দুই ছেলে হীরা ও চুনিকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি করে সরিয়ে বিহারের এক অর্ফানেজে গিয়ে রেখে আসে। এদিকে মুরলীনারায়ণের লোকেরা এসে তাঁকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে, জগদীশের ছেলে দুটিকে তারা শেষ করে ফেলেছে। মুরলী-নারায়ণ কতকটা নিশ্চিন্ত হন। ওদিকে ছেলে দুটি আকস্মিকভাবে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় জগদীশ আবার কলকাতা ছেড়ে মীরাটে গিয়ে আত্মগোপন করেন, কলকাতায় অবস্থান করাটা আর নিরাপদ নয় বিবেচনা করে। তারপর একদিন জগদীশ একা রতনগড়ে ফিরে আসেন। এবং তারকিছুদিন পরেই মুরলীনারায়ণের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটে। জগদীশ রতনগড়ের গদিতে বসল। জগদীশ তার পিতার কাছে ফিরে আসবার পর অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘদিন স্ত্রীকে কোন অর্থসাহায্য পাঠাতে পারেননি। এমন সময় মুরলীনারায়ণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল রহস্যজনকভাবে। জগদীশ রতনগড়ের মালিক হয়েই সর্বাগ্রে সলিল সরকারকে নিম্নপদে নামিয়ে দিলেন, কারণ তাঁর নির্যাতনের ব্যাপারে সলিল সরকারের হাত ছিল, এটা তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল। ব্রজ-কিশোরের পদোন্নতি হল।

জগদীশ রতনগড়ের মালিক হয়ে স্ত্রীর নামে প্রথমে মীরাটে যে অর্থ প্রেরণ করলেন, এক মাস বাদে গ্রহীতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বলে সে অর্থ ফেরত এল। তার

কারণ তার কিছুদিন পূর্বেই মীরাট ত্যাগ করে লাহোরে চাকরি নিয়ে গিয়ে সুষমা আত্মগোপন করেছিলেন স্বামীর প্রতি অভিমানে। স্বামীর প্রতি অভিমানে ঐভাবে সেদিন সুষমা যদি আত্মগোপন না করতেন, তাহলে হয়তো রত্নগড়ের ইতিহাস অন্যরূপ নিত। সে যাই হোক, স্ত্রীর নিরুদ্দেশের সংবাদে জগদীশের ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই তাঁর বাপই তাঁর স্ত্রীকে গোপনে হত্যা করিয়েছেন। ঐ সময় ব্রজকিশোরও যদি হীরা ও চুনির সংবাদটা জগদীশকে দিত, তাহলেও হয়তো ঘটনার গতি অন্য পথে প্রবাহিত হত। কিন্তু ব্রজকিশোর তা পারেনি ভয়ে। কারণ সে তখনো সলিল সরকারকে সন্দেহ করছে। হীরা ও চুনির সংবাদ জানতে পারলে সলিল হয়তো তাদের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হবে এই ভয়ে এবং আরো একটা কারণ ছিল, জগদীশকে কেন্দ্র করেও যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে এবং তার মধ্যে রবিশঙ্করও আছে, কেন জানি না ব্রজকিশোর সেটা আঁচ করেছিল। সে তখন ভাবছিল আরো কিছুদিন দেখে তারপর সে জগদীশের কাছে হীরা ও চুনির সংবাদটা দেবে। তাড়াতাড়িরই বা কি আছে! তারা তো নিরাপদেই আছে। ফলে ব্রজকিশোরও সেদিন ভুল করেছিলেন দ্বিতীয়বার এবং এমনি যখন পরিস্থিতি, রবিশঙ্করকে লেখা একটা গোপন চিঠি রতিকান্তর ব্রজকিশোরের হাতে পড়ে। রবিশঙ্কর সেই সময়ে প্রায়শই রত্নগড়ে যাতায়াত করছেন। চিঠিটায় কোন নামধাম অবিশ্যি ছিল না এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে লেখা হলেও ব্রজকিশোরের ব্যাপারটা আঁচ করতে কষ্ট হয়নি। ব্রজকিশোর তখন তলে তলে রবিশঙ্করের উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। রবিশঙ্করের সঙ্গে জগদীশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দেখে ব্রজকিশোরও সহসা কোন কথা রবিশঙ্করের বিরুদ্ধে বলতে সাহস পাচ্ছিল না জগদীশকে। ইতস্তত করছিল। তার পরই ঘটনাচক্রে জগদীশের আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু হওয়ায় হীরা ও চুনির ব্যাপাটা একেবারেই চেপে গেল ব্রজকিশোর।

ওদিকে জগদীশের মৃত্যুর পর রত্নগড়ের আর কোন সাক্ষাৎ ওয়ারিশন না থাকায় রবিশঙ্করই এসে রতনগড়ের গদিতে বসলেন এবং তার কিছুদিন পরেই ব্রজকিশোরকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরিয়ে সলিল সরকারকেই বসালেন নিজের প্রয়োজনে সেই পদে। সলিল সরকার লোকটা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং দীর্ঘদিন ম্যানেজারী করেছে, কাজ খুব ভাল বোঝে, তাই রবিশঙ্কর সলিল সরকারকেই ম্যানেজার করলেন, তাঁর প্রতি অহেতুক প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে না—নিজের গরজেই।

সলিল সরকার ম্যানেজারী হাতে নিয়েই দেখল, প্রতি মাসে একটা মোটা অঙ্কের টাকা বিশেষ একটি লোকের হাত দিয়ে স্টেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। একজন ঢ্যাঙা কালো মত লোক রহস্যজনক ভাবে মধ্যে মধ্যে রাত্রে রতনগড়ে রবিশঙ্করের সঙ্গে দে'

করতে এসে সেই টাকাটা নিয়ে যায়। সলিল সরকারের মনে সন্দেহ জাগল কে লোকটা, কি সম্পর্ক তার সঙ্গে রবিশঙ্করের আর কেনই বা প্রতি মাসে রবিশঙ্কর তাকে অতগুলো করে টাকা নির্বিবাদে দিয়ে যাচ্ছেন! গোপনে গোপনে সলিল সরকার অনুসন্ধান নেবার জন্য ব্যাপারটার লোক নিযুক্ত করল। কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝতে বা জানতে পারল না। ওদিকে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের একটা টাকা বের হয়ে যাওয়ায় ক্রমে স্টেটের ফিনানসিয়াল ব্যাপারে ক্রাইসিস্ দেখা দিতে লাগল। সলিল সরকার তখন স্পষ্টই রবিশঙ্করকে জানিয়ে দিল, এইভাবে চললে ভয়াবহ ক্রাইসিস্ অনিবার্য। ফলে সাক্ষাতে রবিশঙ্করের সঙ্গে সলিল সরকারের মন-কষাকষির ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হলেও, প্রকৃতপক্ষে আসল যুদ্ধ শুরু হল রতিকান্তরই সঙ্গে। কারণ কৌশলে পশ্চাতে থেকে রতিকান্তই সলিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে ধ্বংস করবার উপায় খুঁজছে তখন। কিন্তু সলিলের বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল, তাই সে ক্রমে বুঝতে পেরেছিল, কোথাও একটা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র চলেছে এবং সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, ক্রমশঃ সে নিজেও বিশ্রীভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। ওদিকে তখন রবিশঙ্করও ভিতরে ভিতরে রতিকান্তর দ্বারা শোষিত হতে হতে ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠেছেন। অথচ মুক্তির কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছেন না। সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা তখন তাঁর। ঠিক ঐ সময় নিযুক্ত চরের মুখে পান্না ও তার জননীর সংবাদ পেয়ে ও পাছে রতিকান্তর দ্বারা আরো বেশী শোষিত না হন ও জগদীশের সন্তান-সন্ততিরা জীবিত আবিষ্কৃত হলে পাছে তাঁকে ঐ নবাবীর গদি ছেড়ে দিতে হয় এই উভয় আশঙ্কাতেই একপ্রকার নিরুপায় হয়ে একটা চাল চাললেন রতিকান্তর উপরে। নিজেই লাহোর থেকে লোক লাগিয়ে পান্নাকে চুরি করে সরিয়ে ফেললেন রতিকান্তর অজ্ঞাতে। রবিশঙ্কর ঐখানে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। পান্নাকে হস্তগত করবার পরও যদি রতিকান্তর বিরুদ্ধে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন তো তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঐভাবে পর্যুদস্ত হতে হত না। এদিকে সংবাদপত্রে ঐ সময় পান্না সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেখে, সলিল সরকারের মনে রতনগড়ের সম্পত্তির লোভে একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা দৃঢ়বদ্ধ হল এবং ঐ সময়ই ব্রজকিশোরও দিন পরে সলিলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জানালা হীরা ও চুনির সংবাদ সে দিন। ব্রজকিশোরের কাছে ঐ সংবাদ জেনে সলিল তখন গোপনে গোপনে শঙ্করকে রতনগড় থেকে সরিয়ে হীরা, চুনি ও পান্নাকেই এনে সেখানে বসাতে করে। তাই সে যে রাত্রে কিরীটীকে চিঠিতে জানিয়েছিল হীরা ও চুনির বাদ সে জানে, তখনো পান্নার সংবাদ সে জানতে পারেনি—এই রকম এক অভাবনীয়

পরিস্থিতির মধ্যে নাটক যখন বেশ জমে উঠেছে, ধূর্ত রতিকান্ত বুঝতে পারে ঘটনার চাকা অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করেছে এবং সময় থাকতে রবিশঙ্কর ও সলিল সরকার দুজনকেই যদি না সরিয়ে ফেলতে পারে তো বিপদ অনিবার্য—তাঁর শেষরক্ষা হবে না। সে অবিশ্যি জানত না তখনো যে হীরা ও চুনি বেঁচে আছে। জানতো কেবল পান্নাই বেঁচে আছে। যা হোক রতিকান্ত অনন্যোপায় হয়ে তাই শেষ বা মরণকামড় বসাতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হল। প্রথমে রবিশঙ্করকে হত্যা করে—পরে সুযোগমত সলিলকে হত্যা করতে যখন হোক পারবে, এই আশায় শ্যামাকান্তরই ঘাড়ে রবিশঙ্করের হত্যাপরাধটা চাপাবার প্ল্যান করে শ্যামাকান্তরই বন্দুক ও দস্তানা চুরি করে এবং পূর্বাহ্নে রবিশঙ্কর ও শ্যামাকান্তকে আলাদা আলাদা দুখানা চিঠি দিয়ে কাজটা সুসম্পন্ন করতে মনস্থ করেছিল। কিন্তু রতিকান্তর লীলাখেলা তখন শেষ হয়ে এসেছিল, তাই নিয়তিই সলিল সরকারকে অকুস্থানে সেরাত্রে টেনে নিয়ে গেল এবং হতভাগ্য সলিল সরকার নিহত হল রতিকান্তরই হাতে। রতিকান্তর প্ল্যানমাফিক কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার আর হল না।

বেচারী রবিশঙ্কর রতিকান্তর হাতে ক্রীড়নক হয়ে পর্যুদস্ত ও কলঙ্কের ভাগীই শুধু হল শেষ পর্যন্ত। কারণ এত ষড়যন্ত্র করে যে সম্পত্তি এল তাও ফস্কে গেল।

ব্রজকিশোরকে আদৌ রবিশঙ্কর কলকাতায় পাঠাননি পরে স্বীকার করেছিলেন ব্রজকিশোর নিজেই উধাও হয়েছিলেন।

তিনি গিয়েছিলেন অর্ফানেজ থেকে হীরা ও চুনিকে নিয়ে আসবার জন্য সময়মত রতনগড়ে।

এবং দিন দুই বাদেই সংবাদপত্রে রতিকান্তর ও রবিশঙ্করের ব্যাপারটা প্রকাশিত হবার পরই হীরা ও চুনিকে নিয়ে তিনি রতনগড়ে এসে হাজির হলেন।

॥ চব্বিশ ॥

রবিশঙ্কর পান্নার সন্ধান বলে দিল এবং হীরা ও চুনিকেও আশ্রম থেকে নিয়ে আসা হল।

তার পর হীরা, চুনি ও পান্নার এক ফটো ছাপিয়ে কাগজে সুষমার নামে শ্যামাকা[ন্ত] বিজ্ঞাপন দিলেন।

সুষমা তখনো কলকাতাতেই ছিলেন। কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে রতনগড়ে এ[সে] হাজির হলেন।

টমটম থেকে নামতে শ্যামাকান্তর স্ত্রী নিজে এগিয়ে গেলেন সুষমা দেবীকে স্বা[গত]

াহ্বান জানাতে।

বৌদির পায়ে প্রণাম করতেই তিনি দুহাতে সুষমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

তার পর শ্যামাকান্ত যখন সুষমাকে বুকে টেনে নিলেন, ভাই-বোনের চক্ষু বেয়ে শ্রু নেমে এল দীর্ঘকাল পরে।

দাদা!

কাঁদিস না বোন, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সকলেই আমরা করেছি।

আমার পান্না ও হীরা-চুনি?

তারা রতনগড়ের প্রাসাদে—

রতনগড়ের প্রাসাদে!

হ্যাঁ, তারাই যে আজ রতনগড়ের সত্যিকারের মালিক।

এসব তুমি কি বলছ দাদা?

কেন, তুই কি কিছু জানতিস না? জগদীশ কি কিছু বলেনি?

না। তিনি তাঁর পরিচয় কোনদিনই আমাকে দেন নি। আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। বলেছিলেন পরে সব বলবেন।

শ্যামাকান্ত সংক্ষেপে তখন সমস্ত কাহিনী সুষমাকে শোনালেন।

শুনতে শুনতে সুষমা যেন স্তব্ধ হয়ে যান।

তার পর একসময় বললেন, চল, আমার ছেলেমেয়েদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।

চল্!

সকলে এলেন রতনগড় প্যালেসে।

বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন সুষমা চোখের জলের ভিতর দিয়ে তাঁর হারানো ন্যা ও দুই পুত্রকে, যাদের এতদিন তিনি মৃতই জেনে এসেছেন। পরের দিন রাত্রে শিশঙ্করও উপস্থিত হল রতনগড় প্যালেসে সংবাদপত্রে সব কথা পড়ে।

সুষমাই তাকে সাদর আহ্বান জানালেন।

এস মণি!

এবং সেইদিনই রাত্রে রতনগড় প্যালেসের কক্ষে বসে শেষ বিদায়ের পূর্বে কিরীটী প্রসাদের প্রশ্নের জবাবে বলছিল, কেমন করে রতিকান্তকে সে সলিল সরকারের ব্যাপারে সন্দেহ করে।

বলতে গেলে দুটি কারণে তার উপর আমার সন্দেহ জাগে। প্রথমতঃ যে আংটিটা যি দস্তানার মধ্যে পাই, তার উপরে 'আর' ইংরাজী শব্দটি মিনাঙ্কিত দেখে প্রথমে

আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। সত্যি কে হতে পারে ঐ আংটির মালিক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেছিলাম রবিশঙ্করকে। তাঁর নামের আদ্যাক্ষর 'আর', কি প্রমাণ পেয়েছি তিনি কখনো আংটি বা দস্তানা ব্যবহার করেননি। তারপরেই মনে পড়ল—ডাঃ ঘোষালের ডাকনাম রুনু—তাঁর আদ্যাক্ষর 'আর', মিসেস ঘোষালের অ একটা নাম রমা হলেও আংটির ফাঁদ দেখে তাঁর কথা মন থেকে দূর করেছিলাম তবে আর বাকি কে থাকে? ডাঃ ঘোষালের বাবার নাম রমাকান্ত ঘোষাল ছিল আজ তিনি যখন মৃত তখন তাঁর আংটি একমাত্র থাকতে পারে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে কারো হাতে। ডাঃ ঘোষাল আংটি ব্যবহার করেন না। অতএব একমাত্র থাকা সম্ভব তাঁর ভাইয়ের হাতে। এবং তার নিজের নামও রতিকান্ত ঘোষাল। যা ইংরাজী আদ্যাক্ষরও 'আর'। আরো একটা ব্যাপারে যে মুহূর্তে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, ডাঃ ঘোষালের বন্দুকের সাহায্যেই হত্যাকারী সলিল সরকারকে হত্যা করেছে, তখন ডাঃ ঘোষালের পক্ষেই ছিল বেশী সম্ভাবনা সলিল সরকারকে হত্যা করার, কিন্তু তিনিই যদি হবেন, তবে ডাঃ ঘোষাল বন্দুকটা ফেলে আসবেনই বা কেন আর দস্তানা যদি ব্যবহারই করবেন হত্যার সময়, তবে তার মধ্যে আংটি কোথা থেকে এল? ডাঃ ঘোষাল তো আংটি ব্যবহার করেন না! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তা কি ডাঃ ঘোষালের ঘাড়ে হত্যার অপরাধটা চাপানোর জন্যই এটা হত্যাকারীর একটা ষড়যন্ত্র মাত্র? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশী করে ভাবতে গিয়ে বুঝলাম সেটাই সম্ভব এবং তাহলে আংটিটা কার হাতের হতে পারে! রবিশঙ্করের নামের আদ্যাক্ষরও 'আর', কিন্তু তারও হাতে আংটি ব্যবহারের কোন চিহ্ন ছিল না। তার পর দস্তানা ও ডাঃ ঘোষালের বন্দুক—সে দুটোও রবিশঙ্কর পাবে কোথায়? যাদের সঙ্গে পরস্পরের মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত নেই! কাজেই রবিশঙ্কর সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়েন। তখন ভাবতে গিয়েই রতিকান্তর কথা আবার মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুভমেণ্টস্ সম্পর্কে আমি খোঁজখবর নেবার জন্য লোক লাগাই কলকাতায়। তারা সংবাদ দেয়, রতিকান্তর মুভমেণ্টস্ অত্যন্ত সন্দেহজনক। আসলে কোনদিনই সে বর্মায় ছিল না এবং রাঘবেন্দ্র নয়। রতিকান্ত নাম নিয়েই সে একটা হোটেলে স্যুইট্ নিয়ে থাকত। অথচ তার জীবনযাত্রার প্রণালী আমীরের মত। টাকা যে সে কোথা থেকে পায় তা কেউ বলতে পারে না। দুঃসাহসিক কাজ করে রতিকান্ত রত্নগড়ে যাহোক শেষ পর্যন্ত এল। সে জানে যে, একবার যে পদশব্দ আমি শুনি জীবনে তা আর ভুলি না এবং যে কণ্ঠস্বর শুনি তাও চিরদিন মনে আমার গাঁথা থাকে। তাই তাকে ডাঃ ঘোষালের

দেখে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। আর্টিস্ট মানুষ, তাই সে নিজের চেহ...
...ছদ্মবেশ ধারণের জন্য করলেও, আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পা...

প্রতি সন্দেহটা আমার আরো ঘনীভূত হয়েছিল ডাঃ ঘোষালের লেখা চিঠিটার কথা শুনে। আর্টিস্ট মানুষ, তাই তুলি ও রংয়ের সাহায্যেই চিঠি দুটো সে লেখে। এবং সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল রবিশঙ্করকে লেখা চিঠিটা দেখেই; সর্বশেষ ও মোক্ষম প্রমাণ তার বিরুদ্ধে তার নিজের হাতের আংটিটা ও তার আঙুলের সেই আংটির ছাপটা, যেটা তার হাতের দিকে নজর পড়তেই আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল শ্যামাকান্তর উপরে যখন পুলিসের সন্দেহটা পড়েছে তার ভয়ের আর কিছু নেই। সে অনায়াসেই এবারে আবির্ভূত হতে পারে রতন... তার পর রবিশঙ্করকে চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে পান্নাকে উদ্ধার করে এনে তার অ... ভাবক হয়ে বসে বাকি জীবনটা রতনগড়ের সম্পত্তি খোশমেজাজে ভোগদখল ... যেতে পারবে। অথচ কেউ তাকে কোনদিনই সন্দেহ করতে পারবে না। দুটি মাত্র মারাত্মক ভুলের জন্যই সে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। প্রথমতঃ রং তুলির সাহায্যে বেনামী চিঠি রবিশঙ্কর ও শ্যামাকান্তকে লিখে এবং দ্বিতীয়ত ... শ্যামাকান্তরই বন্দুক ও দস্তানা চুরি করে হত্যা করতে গিয়ে। হত্যা করে... সে ঐভাবে ধরা পড়ত না, যদি না অসীম আত্মবিশ্বাসে দস্তানাটা ঐখানেই ... দিয়ে যেত। কারণ সেই সময়েই দস্তানার মধ্যে অলক্ষ্যে তার আঙুলের ... খুলে থেকে গিয়েছিল। এতেই কি বোঝা যায় না যে, সেটাও পা... কর্তারই চরম বিচার! এখন শেষ কথা হচ্ছে, সলিল সরকার... সে সম্পর্কেও সকলের বিভিন্ন জবানবন্দি থেকে জানতে আমাদের ... সলিল সরকার ও রবিশঙ্করকে হত্যা করে এবং কার্যক্ষেত্র থেকে নিজের দা... হত্যাপরাধে সরিয়ে দিয়ে পান্নাকে গদিতে বসিয়ে রতনগড়ের সম্পত্তি ভোগ ক... ছিল তার উদ্দেশ্য। কারণ হীরা ও চুনির বেঁচে থাকবার কথাটা যে সে জানত ... তাও আমি পূর্বেই বলেছি।

কিন্তু মণিশঙ্কর তার দাদা রবিশঙ্কর সম্পর্কে যখন সকল কথা জানতে পার... সে লজ্জায় মরমে যেন মরে গেল।

এরপর আর কোন্ মুখ নিয়ে রতনগড়ে থাকবে? তাই সে চলে যাবার প্রস্তুত হল।

সুষমা, শ্যামাকান্ত ও মিসেস ঘোষাল অনেক বোঝালেন, কিন্তু সে বললে, না,

আপনারা আমাকে অনুরোধ করবেন না, যেতে আমাকে হবে

আমার ·· যাবার মুহূর্তে পান্না সামনে এসে দাঁড়াল এবং প্রশ্ন করলে, সত্যি
..হলে যাচ্ছেন !

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি যদি যেতে না দিই ?

পান্না !

হ্যাঁ, তোমার যাওয়া হবে না।

আ কিন্তু—

কারে ন কিন্তু নয়, বলে গেলাম আমার যা বলবার। বলে পান্না ঘর
স গেল।

ইং

দশম খণ্ড সমাপ্ত